AS-SUNNAI
Health Care

চিকিৎসার মাসআলা

চিকিৎসা বিষয়ে ৮৮টি শরঈ প্রশ্নের উত্তর

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে: রাব্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে ৪

পর্ব ১: চিকিৎসাসংক্রান্ত কিছু মাসআলায় শরঈ দিকনির্দেশনা

১ ভূমিকা, রোগীর তাহারাত-সালাত ও নিষিদ্ধ চিকিৎসাপদ্ধতি ৭

২ রোগ ও ওষুধের নির্ধারক আল্লাহ — নববী চিকিৎসা, তাওয়াক্কুল এবং রোগীর প্রতি নসীহত ৪৭

৩ রোগী ও চিকিৎসকের প্রতি নসীহত, এবং গর্ভপাতের বিধান ৭৬

৪ প্রাণ সংহারের ভয়াবহতা, রোজাদারের চিকিৎসা, অস্ত্রোপচারের শর্ত ও মস্তিষ্কের মৃত্যু ১০৮

৫ মৃত্যু-নিশ্চিতিতে ফুকাহাদের সতর্কতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও রোযা-সংক্রান্ত মাসআলা ১৩০

৬ রুকইয়াহর আয়াত ও দুআসমূহ, রাকীদের সতর্কতা এবং চিকিৎসায় জিন ব্যবহারের হুকুম ১৫৫

৭ জিন-ব্যবহারের প্রকারভেদ, রোগীর কাছে বাস্তবতা গোপন, এবং চিকিৎসাসংক্রান্ত জাল ও দুর্বল হাদীসসমূহ ১৮৩

৮ রোগীর তাওয়াফ-সাঈ ও হজের অবশিষ্ট মাসআলা এবং সুন্নাহয় বর্ণিত স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাসমূহ ২১৯

৯ অ্যালকোহলযুক্ত ওষুধ, লিঙ্গ-পরিবর্তন, চিকিৎসাসংক্রান্ত মুআমালাত, ধূমপান ও সিহর ২৫২

১০ সিহর নিরাময়ের বাকি পদ্ধতি, কৃত্রিম প্রজনন, মাদকের ক্ষতি, জাবীরার বিধান ও মানুষের রক্ত ২৭৭

১১ অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ময়নাতদন্ত, ওয়াসওয়াসার চিকিৎসা ও প্রতিবন্ধীদের হুকুম ২৯৮

১২ মানসিক রোগ, ক্রোধ ও জ্বরের চিকিৎসা; স্বাস্থ্যবীমা, মানব-ক্লোনিং, স্মৃতিভ্রংশ ও তালবীনা ৩২০

১৩ খাতনা, কর্তিত অঙ্গ ও অঙ্গ-বিক্রয়, অ্যানেস্থেশিয়া, ভিত্তিহীন চিকিৎসা ও তিলিসমাত, রোগের ফযীলত ও রোগী দেখতে যাওয়া ৩৪৭

১৪ দুগ্ধব্যাংক, কৃত্রিম দাঁত, ফার্মাসিস্টের দায় ও চিকিৎসাক্ষেত্রে ফিকহি কাওয়াইদের প্রয়োগ ৩৭৭

১৫ প্রয়োজন ও দায়মুক্তির কাওয়াইদ, চিকিৎসা-মাসআলায় অগ্রাধিকারযোগ্য মতসমূহ এবং গ্রন্থের সমাপ্তি ৩৯৭

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি ৪১১

..... ৪১২

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৪১৩

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

> বিকাশ / নগদ: +8801313-882464
> ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট: 2050 115 67 00438103
> নাম: Md. Mosharrof Hossain
> শাখা: পাবনা (Pabna) · কোড: 115 · রাউটিং: 125761787

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এটি saaid.net-এ প্রকাশিত (লেখকের নাম উৎস-ফাইলে উল্লেখ নেই) আরবি গ্রন্থ **«الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية»**-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-পদ্ধতি ও যাচাই

অনুবাদ করা হয়েছে মূল গ্রন্থের ডিজিটাল (.doc) টেক্সট থেকে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

চিকিৎসাসংক্রান্ত কিছু মাসআলায় শরঈ দিকনির্দেশনা

১ ভূমিকা, রোগীর তাহারাত-সালাত ও নিষিদ্ধ চিকিৎসাপদ্ধতি

২ রোগ ও ওষুধের নির্ধারক আল্লাহ — নববী চিকিৎসা, তাওয়াক্কুল এবং রোগীর প্রতি নসীহত

৩ রোগী ও চিকিৎসকের প্রতি নসীহত, এবং গর্ভপাতের বিধান

৪ প্রাণ সংহারের ভয়াবহতা, রোজাদারের চিকিৎসা, অস্ত্রোপচারের শর্ত ও মস্তিষ্কের মৃত্যু

৫ মৃত্যু-নিশ্চিতিতে ফুকাহাদের সতর্কতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও রোযা-সংক্রান্ত মাসআলা

৬ রুকইয়াহর আয়াত ও দুআসমূহ, রাকীদের সতর্কতা এবং চিকিৎসায় জিন ব্যবহারের হুকুম

৭ জিন-ব্যবহারের প্রকারভেদ, রোগীর কাছে বাস্তবতা গোপন, এবং চিকিৎসাসংক্রান্ত জাল ও দুর্বল হাদীসসমূহ

৮ রোগীর তাওয়াফ-সাঈ ও হজের অবশিষ্ট মাসআলা এবং সুন্নাহয় বর্ণিত স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাসমূহ

৯ অ্যালকোহলযুক্ত ওষুধ, লিঙ্গ-পরিবর্তন, চিকিৎসাসংক্রান্ত মুআমালাত, ধূমপান ও সিহর

১০ সিহর নিরাময়ের বাকি পদ্ধতি, কৃত্রিম প্রজনন, মাদকের ক্ষতি, জাবীরার বিধান ও মানুষের রক্ত

১১ অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ময়নাতদন্ত, ওয়াসওয়াসার চিকিৎসা ও প্রতিবন্ধীদের হুকুম

১২ মানসিক রোগ, ক্রোধ ও জ্বরের চিকিৎসা; স্বাস্থ্যবীমা, মানব-ক্লোনিং, স্মৃতিভ্রংশ ও তালবীনা

১৩ খাতনা, কর্তিত অঙ্গ ও অঙ্গ-বিক্রয়, অ্যানেস্থেশিয়া, ভিত্তিহীন চিকিৎসা ও তিলিসমাত, রোগের ফযীলত ও রোগী দেখতে যাওয়া

১৪ দুগ্ধব্যাংক, কৃত্রিম দাঁত, ফার্মাসিস্টের দায় ও চিকিৎসাক্ষেত্রে ফিকহি কাওয়াইদের প্রয়োগ

১৫ প্রয়োজন ও দায়মুক্তির কাওয়াইদ, চিকিৎসা-মাসআলায় অগ্রাধিকারযোগ্য মতসমূহ এবং গ্রন্থের সমাপ্তি

ভূমিকা, রোগীর তাহারাত-সালাত ও নিষিদ্ধ চিকিৎসাপদ্ধতি

http://www.saaid.net/

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

ثم أما بعد :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠজনের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপর এবং যাঁরা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণ করেন তাঁদের উপর। অতঃপর:—

এগুলো চিকিৎসাসংক্রান্ত কিছু মাসআলা, যেগুলো সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। আমার ইচ্ছা হলো, আপনার জন্য এগুলো এক জায়গায় জড়ো করি — যাতে এগুলোর বিধান জানা সহজ হয়, এবং যিনি এ বিষয়ে কিছু জানতে চান তাঁর জন্য এগুলো ঘেঁটে দেখা সহজ হয়। এ কাজের প্রেরণা হলো আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকামিতা; আর এ কারণেও যে, চিকিৎসক ও রোগীদের কাছে এই মাসআলাগুলোর প্রয়োজন অত্যন্ত প্রবল।

এতে আমি মূলনীতি-নির্ধারণ (তাকঈদ) ও দলিল উপস্থাপনের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়েছি। যদি কোনো কোনো জায়গায় আপনি দীর্ঘতা দেখেন, তবে তার প্রেরণা কেবল এটুকুই যে, উত্তরটি দিয়ে পাঠককে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছি, এবং উত্তরে যথাসম্ভব বেশি দিক পূর্ণ করতে চেয়েছি। আমি আমার সমস্ত সাধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছি আপনার জন্য ভাষাটি সহজ করতে এবং উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট করতে, যাতে যত বেশিসংখ্যক মুসলিম সম্ভব এ থেকে উপকৃত হতে পারেন — যদিও তাঁরা এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ না হন।

আমি প্রশ্ন-উত্তরের পদ্ধতি বেছে নিয়েছি, কারণ তা বোঝার জন্য এবং প্রতিটি মাসআলার সমাধান আলাদা করে জানার জন্য অধিকতর নিকটবর্তী। আর আমি পূর্ণ যত্ন নিয়েছি যেন শাখা-মাসআলাগুলোকে তাদের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বের করি এবং আংশিক বিষয়গুলোকে তাদের সামগ্রিক নীতির দিকে ফিরিয়ে দিই। এর বহু জায়গায় আমি অন্যদের বক্তব্য উদ্ধৃত করার উপর নির্ভর করেছি, যদিও সব জায়গায় সেদিকে ইঙ্গিত করিনি।

এ লেখার কৃতিত্ব প্রথমে ও শেষে আল্লাহর, তারপর ইলমের অধিকারীগণের — আল্লাহ তাঁদের মৃতদের প্রতি রহম করুন এবং জীবিতদের অবিচল রাখুন। এ লেখায় আমি বিরাট ঘাটতি ও বড় ত্রুটির কথা স্বীকার করছি; তবু যতটুকু পথ পেয়েছি ততটুকু দিয়ে একে নিখুঁত করার চেষ্টা করেছি। এতে যদি আপনি কোনো সঠিক জিনিস দেখেন — তা যত

অল্পই হোক — তবে তা কেবল একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, কেননা তিনিই নিয়ামতদাতা ও অনুগ্রহকারী। আর যদি এর বিপরীত কিছু দেখেন — এবং তা তো অনেকই — তবে তা আমারই ঘাটতি, আমার ইলমের স্বল্পতা ও বোঝার দুর্বলতার ফল; আমি সেই ত্রুটিকারী, মহান ও সুউচ্চ আল্লাহ ছাড়া যার কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।

এই বড় বড় মাসআলার সমুদ্রে আমি নেমেছি ইলমের প্রাচুর্যের কারণে নয় — না, আল্লাহর কসম, তা নয় — বরং কেবল এ কারণে যে, আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি, এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করি আপনার জন্যও তা-ই পছন্দ করি। আমার সীমিত দৃষ্টিতে আমি দেখলাম যে, এই মাসআলাগুলো থেকে আমি উপকৃত হয়েছি; তাই আমার ত্রুটিপূর্ণ মনটি ব্যাকুল হলো এগুলো আপনার সামনে রাখতে, যাতে আপনি এর লিপিবদ্ধকারীর ব্যাপারে ইহসানের কিংবা ঘাটতির সাক্ষ্য দিতে পারেন।

আমি আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে বলছি — সমস্ত অনুগ্রহ তাঁরই, সমস্ত নিয়ামত তাঁরই, সমস্ত দান তাঁরই, সমস্ত ইহসান তাঁরই, এবং সমস্ত তাওফীক তাঁর পক্ষ থেকেই। এ লেখায় আমার দায়িত্ব কেবল এটুকু — ইলমের অধিকারীগণ যা উল্লেখ করেছেন তা একত্র করা ও বিন্যস্ত করা; আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের মর্যাদা উন্নীত করুন।

আর এই সামান্য পত্রগুচ্ছের নাম আমি রেখেছি:

{ الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية }

> «চিকিৎসাসংক্রান্ত কিছু মাসআলায় শরঈ দিকনির্দেশনা»

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর দ্বারা সকল স্তরের সমস্ত মুসলিমকে উপকৃত করেন। তাঁর কাছে — যিনি মহান ও সুউচ্চ — প্রার্থনা করি, তিনি যেন এতে আমাকে হক ও সঠিকের তাওফীক দান করেন, এবং আমাকে আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক থেকে আশ্রয় দেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন সবচেয়ে সুন্দর পন্থায় ও পূর্ণতম অবস্থায় এটি সমাপ্ত করতে আমাকে সাহায্য করেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ইলমের অধিকারীগণকে ক্ষমা করেন, তাঁদের মৃতদের প্রতি রহম করেন ও জীবিতদের অবিচল রাখেন, তাঁদেরকে দুষ্টদের অনিষ্ট ও পাপাচারীদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন, এবং আমাদের ও তাঁদেরকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিভ্রান্তিকর ফিতনা থেকে আশ্রয় দেন। আর তিনি যেন তাঁদেরকে সেই উত্তম প্রতিদান দেন, যা কোনো আলিমকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়; এবং আমাদেরকে আকীদা, কথা ও কাজে তাঁদের পথনির্দেশ অনুসরণ করতে ও তাঁদের পদচিহ্নে চলতে সাহায্য করেন এবং তাঁদের দলভুক্ত করেই আমাদের পুনরুত্থিত করেন।

তাঁর কাছে তাঁর সর্বমহান নামের অসীলায় প্রার্থনা করি — তিনি যেন আমাদেরকে হককে হক হিসেবে দেখান ও তা অনুসরণের তাওফীক দেন, এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান ও তা বর্জনের তাওফীক দেন। আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাই ও তাঁর দিকে তাওবা করি, আবার তাঁর কাছে ক্ষমা চাই ও তাঁর দিকে তাওবা করি, আবারও তাঁর কাছে ক্ষমা চাই ও তাঁর দিকে তাওবা করি — নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

لله رب العالمين

> পবিত্র মহান আপনার প্রতিপালক, সম্মানের অধিকারী, তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে। আর রাসূলগণের উপর সালাম, এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। (সূরা আস-সাফফাত: ১৮০-১৮২)

আর আল্লাহ সালাত বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর এবং তাঁদের উপর প্রচুর সালাম বর্ষণ করুন। এবার মূল উদ্দেশ্যের দিকে; আল্লাহই সাহায্যকারী, তাঁর উপরই ভরসা, আর আল্লাহ — যিনি সুউচ্চ ও মহান — তিনি ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। তাই আমি বলি, আর তাওফীক আল্লাহরই কাছে, তাঁর কাছ থেকেই আমি অনুগ্রহ ও উত্তম নিরূপণের সাহায্য প্রার্থনা করি:—

প্রশ্ন ১

রোগীর তাহারাত ও সালাত যে মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই মূলনীতিটি কী? উদাহরণ ও দলিলসহ তা স্পষ্ট করুন।

উত্তর: আমি বলি:— মূলনীতিটি হলো: অক্ষমতার সঙ্গে কোনো ওয়াজিব থাকে না, আর প্রয়োজনের (দারূরাত) সঙ্গে কোনো হারাম থাকে না। এই মূলনীতিটি উৎসারিত হয়েছে "সংকট দূরীকরণ" (রাফউল হারাজ) মূলনীতি থেকে। এর দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

> আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। (সূরা আল-বাকারা: ২৮৬)

لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها

> আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তিনি যা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না। (সূরা আত-তালাক: ৭)

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, তোমাদের জন্য কঠিন চান না। (সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ

আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো সংকট সৃষ্টি করতে চান না। (সূরা আল-মায়িদা: ৬)

ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

এবং তিনি তাদের উপর থেকে তাদের ভার ও শৃঙ্খলগুলো নামিয়ে দেন, যা তাদের উপর ছিল। (সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭)

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا

আল্লাহ তোমাদের ভার হালকা করতে চান, আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে। (সূরা আন-নিসা: ২৮)

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

আমি তোমাদের যা থেকে নিষেধ করেছি তা বর্জন করো, আর যার আদেশ দিয়েছি তা থেকে যতটুকু পারো ততটুকু করো। — মুত্তাফাকুন আলাইহি

আর তিনি ﷺ ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন:

صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبٍ

> দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো; যদি না পারো তবে বসে; যদি তাও না পারো তবে কাত হয়ে। — বুখারী বর্ণনা করেছেন

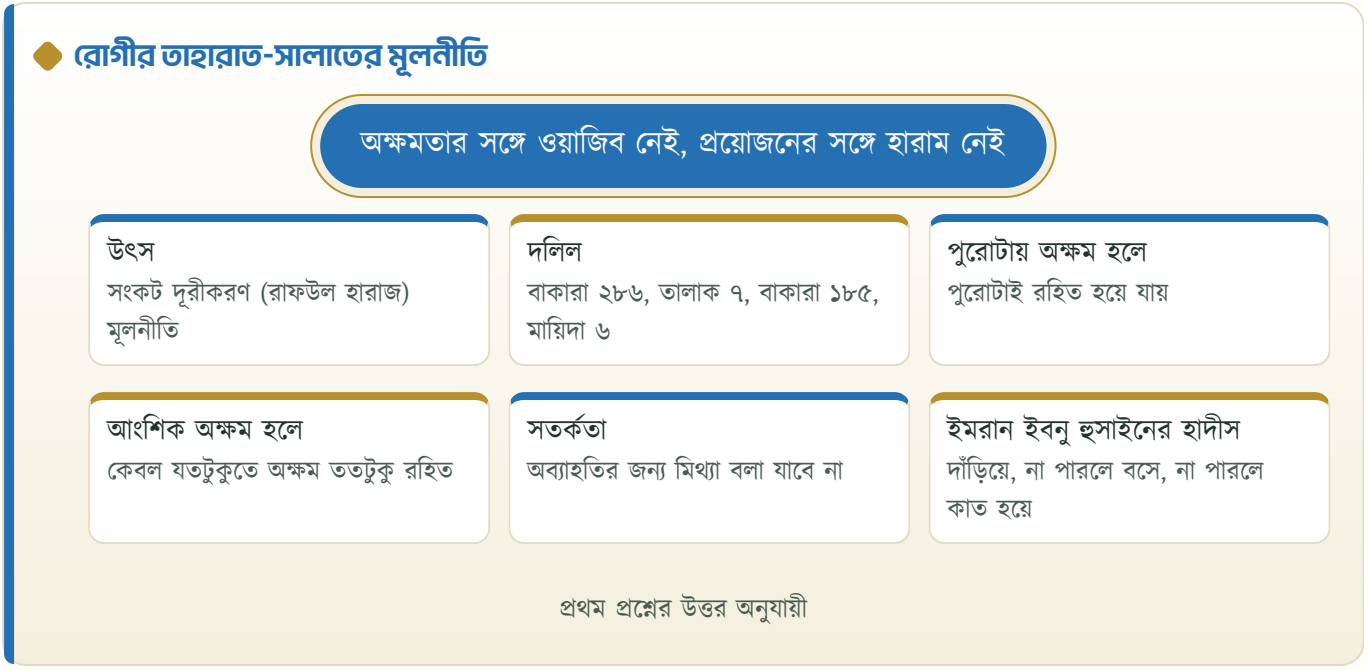
আর বাইহাকীতে এসেছে যে, নবী ﷺ এক রোগীকে দেখতে গেলেন এবং দেখলেন সে একটি বালিশের উপর সালাত আদায় করছে; তখন তিনি বালিশটি ছুঁড়ে ফেললেন এবং বললেন:

صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومِ إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك

> পারলে মাটিতে সালাত আদায় করো, নতুবা ইশারায় করো এবং তোমার সিজদাকে তোমার রুকু থেকে নিচু করো।

এটি একটি সর্বসম্মত মূলনীতি। এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, মূল বিধান হলো শরীয়তসম্মতভাবে ওয়াজিবের সমস্ত অংশ পালন করা আবশ্যক। কিন্তু কখনো মানুষের উপর এমন অবস্থা এসে পড়ে যে, সে ওয়াজিবটি পুরোপুরি বা আংশিকভাবে পালন করতে পারে না। তখন এই মূলনীতিটি এসে ফয়সালা দেয় যে, বান্দা যা থেকে অক্ষম তা তার উপর থেকে রহিত হয়ে যায়। সে যদি পুরোটির ব্যাপারেই অক্ষম হয় তবে পুরোটাই রহিত হয়ে যাবে; আর যদি আংশিক অক্ষম হয়, তবে কেবল যতটুকুতে সে অক্ষম ততটুকুই তার উপর থেকে রহিত হবে। এটি আল্লাহ তাআলার রহমতেরই অংশ।

এর ভিত্তিতে, ওয়াজিবসমূহের যে জিনিসটিতে রোগী অক্ষম, তা তার থেকে রহিত হয়ে যায় — অথবা কেবল ততটুকুই রহিত হয় যতটুকুতে সে অক্ষম। অর্থাৎ শরীয়ত তাকে সেটির জন্য দায়ী করে না। তবে এই মূলনীতির দিকে তাকানোর সময় বান্দার উচিত তার রবকে ভয় করা এবং ওয়াজিব পালনের কষ্ট থেকে নিজেকে অব্যাহতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ ব্যাপারে মিথ্যা না বলা। কেননা মহান ও সুউচ্চ আল্লাহর কাছে যমীনে বা আসমানে কোনো গোপন বিষয়ই গোপন থাকে না, এবং অন্তরে যা লুকানো আছে তিনি তা জানেন।



এই মূলনীতির উপরই ফকীহগণ রোগীর তাহারাত ও সালাতের বিধান বের করেন। তার বিবরণ কয়েকটি মাসআলায়:—

মাসআলা এক:— মূল বিধান হলো, রোগীর উপর ওয়াজিব হলো পানি দিয়ে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা, যদি সে তাতে সক্ষম হয় — নিজে নিজে হোক কিংবা অন্যের সাহায্যে। তাই পবিত্রতা অর্জনের সময় আমরা প্রথমে তাকে পানি ব্যবহারের কথাই বলব, কেননা সেটাই মূল বিধান। কিন্তু যদি সে বাস্তবিকভাবেই পানিশূন্য হয়, অথবা পানি ব্যবহার করলে তার রোগ বেড়ে যায় বা আরোগ্য বিলম্বিত হয়, তবে সে সেখান থেকে মাটির পবিত্রতার দিকে — অর্থাৎ তায়াম্মুমের দিকে — সরে যাবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন:

فلم تجدوا ماءً فتيمموا

> অতঃপর তোমরা পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করো। (সূরা আন-নিসা: ৪৩ ও সূরা আল-মায়িদা: ৬)

আর এ কথা প্রতিষ্ঠিত যে, মূল জিনিসটি অসম্ভব হয়ে গেলে তার বিকল্পের দিকে যাওয়া হয়। তবে যদি পানি ব্যবহারে অক্ষমতা কেবল পবিত্রতার কিছু অঙ্গের ক্ষেত্রে হয়, সব অঙ্গের ক্ষেত্রে নয় — তাহলে যতটুকুতে সে অক্ষম ততটুকু তার থেকে রহিত হবে এবং সে তার জন্য তায়াম্মুম করবে, আর বাকি অঙ্গগুলোতে তার উপর পানি ব্যবহার করা আবশ্যক। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা দুই:— যদি হাসপাতালে পানি থাকে, কিন্তু দূরত্বের কারণে সে তা আনতে অক্ষম হয়, এবং তার কাছে এমন কেউ না থাকে যে তা এনে দেবে, আর নার্সরাও ব্যস্ততার কারণে বা গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য না করে — তবে তার উপর থেকে পানির পবিত্রতার ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে এবং সে সেখান থেকে মাটির পবিত্রতার দিকে সরে যাবে; সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে, তার উপর পুনরায় সালাত আদায় করা লাগবে না — যদিও ওয়াক্তের ভেতরেই সে পানি পেয়ে যায়। কারণ ওয়াজিবসমূহ অক্ষমতার কারণে রহিত হয়ে যায়।

মাসআলা তিন:— রোগী যদি পানির ও মাটির — উভয় পবিত্রতার ব্যাপারেই অক্ষম হয়, তবে উভয়টিই তার থেকে রহিত হয়ে যাবে এবং সে তার অবস্থা অনুযায়ী সালাত আদায় করবে; তার উপর পুনরায় আদায় করা লাগবে না। তবে এই চিত্রটি অত্যন্ত বিরল; আমরা এটি উল্লেখ করেছি কেবল শাখা-নির্ণয়ের দিক থেকে। কারণ পবিত্রতা ওয়াজিবসমূহের

অন্তর্ভুক্ত, আর আমাদের কাছে এ কথা প্রতিষ্ঠিত যে, ওয়াজিবসমূহ অক্ষমতার কারণে রহিত হয়ে যায়; এখানে সে উভয় পবিত্রতার ব্যাপারেই অক্ষম, তাই তা তার থেকে রহিত হয়ে গেছে — কেননা অক্ষমতার সঙ্গে কোনো ওয়াজিব থাকে না।

মাসআলা চার:— যদি রোগীর বিছানা, কাপড় বা শরীর নাপাকিতে নোংরা হয়ে যায়, তবে তার উপর ওয়াজিব হলো সালাতে প্রবেশের আগে তা দূর করা; কেননা নাপাকি দূর করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের একটি শর্ত। কিন্তু সে যদি এই নাপাকি দূর করতে অক্ষম হয়, তবে সে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই সালাত আদায় করা তার জন্য জায়েয — আল্লাহ তাআলার বাণী অনুযায়ী:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ

> তোমরা যতটুকু পারো আল্লাহকে ভয় করো। (সূরা আত-তাগাবুন: ১৬)

আর এই নাপাকি দূর করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কোনো অবস্থাতেই সালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেওয়া তার জন্য জায়েয নয়; কেননা শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত যে, ওয়াজিবসমূহ অক্ষমতার কারণে রহিত হয়ে যায়।

মাসআলা পাঁচ:— যার অজুর কোনো অঙ্গে ক্ষত রয়েছে, তার উপর অজুর সময় প্রথমত ওয়াজিব হলো সেটি ধোয়া। কিন্তু এই ওয়াজিবটি সামর্থ্যের সঙ্গে শর্তযুক্ত। যদি সে না পারে, তবে হাত পানিতে ভিজিয়ে সেটির উপর মাসেহ করবে। যদি তাও না পারে, তবে সে তার সুস্থ অঙ্গগুলোতে অজু পূর্ণ করবে এবং ক্ষতযুক্ত অংশটি ছেড়ে দেবে, আর অজুর শেষে সেটির নিয়তে তায়াম্মুম করবে। সুতরাং প্রথম হলো ধোয়া, দ্বিতীয় হলো মাসেহ, আর তৃতীয় হলো সেটির জন্য তায়াম্মুম। এ সবই বিকল্প হিসেবে; অর্থাৎ প্রথমটিতে অক্ষম না হলে দ্বিতীয়টিতে যাবে না, আর দ্বিতীয়টিতে অক্ষম না হলে তৃতীয়টিতে যাবে না। কেননা মূল জিনিসটি অসম্ভব না হলে বিকল্পের দিকে যাওয়া হয় না, আর ওয়াজিবসমূহ অক্ষমতার কারণে রহিত হয়ে যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ক্ষতযুক্ত অঙ্গের অজু: তিন ধাপ

১. **প্রথম**
ক্ষতস্থানটি ধোয়া

২. **দ্বিতীয়**
না পারলে হাত ভিজিয়ে তার উপর মাসেহ করা

৩. **তৃতীয়**
তাও না পারলে সুস্থ অঙ্গে অজু পূর্ণ করে অজুর শেষে সেটির নিয়তে তায়াম্মুম

প্রথমটিতে অক্ষম না হলে দ্বিতীয়টিতে যাওয়া যাবে না; দ্বিতীয়টিতে অক্ষম না হলে তৃতীয়টিতে নয়

মাসআলা ছয়:— রোগীর সালাতের মূল বিধান হলো, সুস্থ ব্যক্তির কাছে যা যা দাবি করা হয় তার কাছেও তা-ই দাবি করা হয়। সুতরাং তার উপর ওয়াজিব হলো পূর্ণ দাঁড়ানোসহ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা, পূর্ণ রুকু ও পূর্ণ সিজদা করা। তবে এটি সামর্থ্য থাকা অবস্থায়। যদি সে দাঁড়াতে অক্ষম হয়, তবে বসে সালাত আদায় করবে; আর যদি বসতেও

অক্ষম হয়, তবে শুয়ে আদায় করবে — কিবলামুখী হয়ে ডান কাত হয়ে থাকবে; পূর্বোক্ত ইমরানের হাদীস অনুযায়ী। আর যদি সে পূর্ণ রুকু ও সিজদা করতে সক্ষম হয়, তবে তার উপর তা ওয়াজিব; নতুবা সে দুটোই ইশারায় করবে এবং সিজদাকে রুকু থেকে নিচু করবে। এ সবই এ কারণে যে, ওয়াজিবসমূহ সেগুলোর ব্যাপারে অক্ষমতার কারণে রহিত হয়ে যায়।

অক্ষম রোগীর সালাতের ধাপ

১ **দাঁড়িয়ে**
পূর্ণ দাঁড়ানো, পূর্ণ রুকু ও সিজদাসহ — সামর্থ্য থাকলে

২ **বসে**
দাঁড়াতে অক্ষম হলে

৩ **শুয়ে**
বসতেও অক্ষম হলে কিবলামুখী হয়ে ডান কাত হয়ে

৪ **ইশারায়**
পূর্ণ রুকু-সিজদায় অক্ষম হলে; সিজদা রুকুর চেয়ে নিচু

মাসআলা ছয় — ওয়াজিবসমূহ অক্ষমতার কারণে রহিত হয়ে যায়

মাসআলা সাত:— রোগীর উপর কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব, কেননা তা সালাতের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই ওয়াজিবটি নিরঙ্কুশ নয়, বরং সামর্থ্যের সঙ্গে শর্তযুক্ত। রোগী যদি তাতে সক্ষম ও সমর্থ হয়, তবে তার উপর তা ওয়াজিব; আর যদি কিবলামুখী হতে অক্ষম হয়, তবে তা তার থেকে রহিত হয়ে যাবে এবং সে তার অবস্থা অনুযায়ী সালাত আদায় করবে, এর বাইরে তার উপর কিছুই নেই। কেননা ওয়াজিবসমূহ অক্ষমতার কারণে রহিত হয়ে যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এভাবেই বাকিগুলো মিলিয়ে নিন। এই মূলনীতিটিই সেই ভিত্তি, যেখান থেকে ইলমের অধিকারীগণ রোগীদের কারও তাহারাত বা সালাত-সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শুরু করেন। সুতরাং একে আপনার চোখের সামনে রাখুন — কেননা এই প্রশ্নোত্তরগুলোর ক্ষেত্রে এটিই এ অধ্যায়ের মূল। আর আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ২

পুরুষদের দ্বারা নারীদের চিকিৎসা করা, কিংবা এর উল্টোটির হুকুম কী? দলিল ও কারণ ব্যাখ্যাসহ বলুন।

উত্তর: আমি বলি:— এ ব্যাপারে মূল বিধান হলো নিষেধ — বিশেষত যখন এর সঙ্গে নির্জনতা (খালওয়াত) থাকে। মূল বিধান আরও এই যে, পুরুষদের চিকিৎসা পুরুষরা ছাড়া কেউ করবে না, আর নারীদের চিকিৎসা নারীরা ছাড়া কেউ করবে না। এর দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:

وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

আর যখন তোমরা তাদের কাছে কোনো সামগ্রী চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; এটিই তোমাদের অন্তরের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। (সূরা আল-আহযাব: ৫৩)

ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن...الآية

আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তাদের স্বামী কিংবা তাদের পিতাদের ছাড়া... — আয়াতের বাকি অংশ। (সূরা আন-নূর: ৩১)

এই রোগী তো তার (নারীর) জন্য পরপুরুষ, আর এই নারী রোগী তার (পুরুষের) জন্য পরনারী; আর মাথা ও চেহারা সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় অংশ।

উকবা ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إياكم والدخول على النساء

তোমরা নারীদের কাছে প্রবেশ করা থেকে সাবধান থাকো।

তখন এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল, স্বামীর আত্মীয়দের ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন:

الحمو الموت

স্বামীর আত্মীয় হলো মৃত্যু। — মুত্তাফাকুন আলাইহি

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

سألت رسول الله عن نظر الفجاءة, فأمرني أن أصرف بصري

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম; তিনি আমাকে আদেশ দিলেন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে। — মুসলিম বর্ণনা করেছেন

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان, إذا

أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته

فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه

নিশ্চয়ই নারী শয়তানের রূপে সামনে আসে এবং শয়তানের রূপে পিছন ফিরে যায়। তোমাদের কারও কাছে যদি কোনো নারী ভালো লেগে যায় এবং তা তার অন্তরে স্থান করে নেয়, তবে সে যেন তার স্ত্রীর কাছে যায় ও তার সঙ্গে মিলিত হয়; কেননা তা তার মনের ভেতরের ভাবনাকে ফিরিয়ে দেবে। — মুসলিম বর্ণনা করেছেন

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما

কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে না থাকে; কেননা তখন শয়তান তাদের তৃতীয়জন হয়ে যায়।

উসামা ইবনু যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি। — মুত্তাফাকুন আলাইহি

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

((إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تعملون, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء

নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্টি ও সবুজ, আর আল্লাহ তাতে তোমাদের প্রতিনিধি বানাবেন, তারপর দেখবেন তোমরা কেমন আমল করো। সুতরাং দুনিয়া থেকে সাবধান থাকো এবং নারীদের ব্যাপারে সাবধান থাকো; কেননা বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীদের ব্যাপারে। — মুসলিম বর্ণনা করেছেন

আর তিনি ﷺ বলেছেন:

خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا))

পুরুষদের কাতারসমূহের মধ্যে উত্তম হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট হলো শেষ কাতার; আর নারীদের কাতারসমূহের মধ্যে উত্তম হলো শেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার। — মুসলিম বর্ণনা করেছেন

এর কারণ হলো, নারীদের শেষ কাতারটিই পুরুষদের থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী; তাই পুরুষদের থেকে দূরত্বের কারণেই তা এই উত্তমতা অর্জন করেছে। সুতরাং এটি এ কথার দলিল যে, নারীদেরকে পুরুষদের থেকে দূরে রাখা এবং পুরুষদেরকে নারীদের থেকে দূরে রাখা শরীয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য — কেননা তা বহু অনিষ্টের দরজা বন্ধ করে দেয়।

আর তিনি ﷺ বলেছেন:

المرأة عورة

> নারী হলো আওরাহ (আবৃত রাখার বস্তু)।

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

> মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে। (সূরা আন-নূর: ৩০)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

> আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে। (সূরা আন-নূর: ৩১)

এই দলিলগুলো নিশ্চিতভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, শরীয়ত পুরুষদেরকে নারীদের থেকে এবং নারীদেরকে পুরুষদের থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হয়েছে। এগুলো থেকে এ কথাও পাওয়া যায় যে, পুরুষদের চিকিৎসা পুরুষরা ছাড়া কেউ করবে না এবং নারীদের চিকিৎসা নারীরা ছাড়া কেউ করবে না।

এই মাসআলাটিকে বিতর্ক ও কথা-চালাচালির বিষয়ে পরিণত করা জায়েয নয়; কেননা এটি এমন একটি বিষয় যার ফয়সালা দলিলগুলোই করে দিয়েছে এবং যে বিষয়ে গভীর ইলমের অধিকারী আলিমগণ তাঁদের কথা বলে দিয়েছেন।

সুতরাং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপর ওয়াজিব হলো, তারা পূর্ণ যত্ন নিয়ে নারীদের জন্য বিশেষ বিভাগগুলোর ব্যবস্থা করবে, যেখানে নারী চিকিৎসক ছাড়া কেউ থাকবে না এবং যেখানে সমস্ত বিশেষায়িত শাখা থাকবে; আর পুরুষদের চিকিৎসা-বিভাগগুলো আলাদা হবে, যেখানে কেবল পুরুষ চিকিৎসকগণই থাকবেন। আল্লাহ চাহেন তো তারা এটি করতে সক্ষম। আর আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, কেননা রোগীদের মধ্য থেকে তাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে তারা দায়িত্বশীল। আমি মহান ও সুউচ্চ আল্লাহর কাছে তাঁর সর্বমহান নামের অসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর দায়িত্বশীলদের সকল কল্যাণের তাওফীক দেন, এটি বাস্তবায়নে তাঁদের সাহায্য করেন, এবং পাশ্চাত্যায়ন ও ফিতনার দিকে আহ্বানকারীদের অনিষ্ট থেকে তাঁদের রক্ষা করেন।

তবে যদি প্রয়োজন (দারূরাত) দেখা দেয় এবং কোনো নারী খোঁজাখুঁজি ও সাধ্যমতো চেষ্টার পরও পুরুষ ছাড়া কাউকে না পায়, কিংবা কোনো পুরুষ খোঁজাখুঁজি ও সাধ্যমতো চেষ্টার পরও নারী ছাড়া কাউকে না পায় — তখন বিষয়টি দারূরাতের পর্যায়ে চলে যায়। আর আমাদের কাছে পূর্বোক্ত মূলনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দারূরাতের সঙ্গে কোনো হারাম থাকে না। কিন্তু অবশ্যই এই দারূরাতকে তার পরিমাণ অনুযায়ীই নির্ধারণ করতে হবে; কেননা ফকীহগণের কাছে

প্রতিষ্ঠিত যে, দারূরাত নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে বৈধ করে দেয়, এবং এ কথাও প্রতিষ্ঠিত যে, দারূরাতসমূহ তার পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। সুতরাং তা থেকে কেবল ততটুকুই বৈধ হবে যতটুকুর প্রতি দারূরাত ডাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

> অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিশদভাবে বলে দিয়েছেন যা তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন — তবে যার প্রতি তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়ো তা ব্যতীত। (সূরা আল-আন'আম: ১১৯)

তবে যেসব রোগী পুরুষ ও নারী এ ব্যাপারে নিরুপায় হয়ে পড়েছেন, তাঁদের উচিত অন্তর থেকে এ বিষয়টিকে অপছন্দ করা এবং এই মনোভাব রাখা যে, এই অনিবার্য দারূরাত না থাকলে তাঁরা কখনোই তা করতেন না। আল্লাহই সাহায্যকারী; আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই; নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আর তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

নারী-পুরুষের চিকিৎসা: মূল বিধান ও দারূরাত

মূল বিধান	প্রয়োজন (দারূরাত) দেখা দিলে
পুরুষের চিকিৎসা পুরুষ ছাড়া নয়; নারীর চিকিৎসা নারী ছাড়া নয়	খোঁজাখুঁজি ও সাধ্যমতো চেষ্টার পরও বিপরীত লিঙ্গ ছাড়া কাউকে না পেলে দারূরাত
বিশেষত নির্জনতা (খালওয়াত) থাকলে নিষেধ	দারূরাতের সঙ্গে কোনো হারাম থাকে না
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়াজিব: নারীদের আলাদা বিভাগ ও নারী চিকিৎসক	দারূরাত তার পরিমাণ অনুযায়ী; যতটুকু ডাকে ততটুকুই বৈধ
এ মাসআলাকে বিতর্কের বিষয় বানানো জায়েয নয়	নিরুপায় রোগীর উচিত অন্তর থেকে বিষয়টিকে অপছন্দ করা

প্রশ্ন ৩

কিছু রোগীর অবস্থার চিকিৎসায় চিকিৎসাবিজ্ঞান দাবি করে যে, প্রস্রাব ও পায়খানার জন্য একটি নালী খুলে দেওয়া হবে, আর তা জমা হবে তাঁদের সঙ্গে ঝোলানো একটি থলিতে, কিংবা তাঁদের পাশেই কাছাকাছি রাখা কোনো পাত্রে। এমন অবস্থায় তাঁদের তাহারাত ও সালাত কেমন হবে?

উত্তর: আমি বলি:— আমরা পূর্বেই নির্ধারণ করেছি যে, সুস্থ ব্যক্তির কাছে যা দাবি করা হয় রোগীর কাছেও তা-ই দাবি করা হয়। এর ভিত্তিতে এই রোগীদের উপর ওয়াজিব হলো, তাঁরা সেটি থেকে মুক্ত হবেন, সেটিকে নিজেদের থেকে দূরে সরাবেন এবং তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবেন; কেননা নাপাকি থেকে পবিত্রতা সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের একটি শর্ত। কিন্তু যদি তাঁরা এতে অক্ষম হন — এ কারণে যে তাতে তাঁদের ক্ষতি হবে, কিংবা সেটি সরানোতে তাঁদের জন্য বিপদ রয়েছে, কিংবা চিকিৎসক তা প্রত্যাখ্যান করেছেন — তবে তাঁরা নিজেদের অবস্থা অনুযায়ীই সালাত আদায় করবেন, তাঁদের উপর পুনরায় আদায় করা লাগবে না, এবং এই শর্তটির দাবি তাঁদের থেকে রহিত হয়ে যাবে। কারণ

ওয়াজিবসমূহ সেগুলোর ব্যাপারে অক্ষমতার দ্বারা রহিত হয়ে যায়, যেমন আমরা পূর্বে নির্ধারণ করেছি। আর আল্লাহ তাআলার বাণী:

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

> আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। (সূরা আল-বাকারা: ২৮৬)

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ

> তোমরা যতটুকু পারো আল্লাহকে ভয় করো। (সূরা আত-তাগাবুন: ১৬)

আর তিনি ﷺ বলেছেন:

إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم

> আমি যখন তোমাদের কোনো আদেশ দিই, তখন তা থেকে যতটুকু পারো ততটুকু করো।

আমাদেরকে নাপাকি দূর করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই রোগীরা তা দূর করতে অক্ষম; সুতরাং তাঁদের উপর কিছুই নেই। তাঁরা ওয়াক্তের ভেতরেই যতটুকু পবিত্রতা সম্ভব ততটুকু নিয়ে সালাত আদায় করবেন এবং তাঁদের উপর পুনরায় আদায় করা লাগবে না। আর এই নাপাকি দূর করতে না পারার কারণে সালাত পিছিয়ে দেওয়া তাঁদের জন্য জায়েয নয় — যেমনটা কিছু রোগী ধারণা করেন; আল্লাহ তাআলা তাঁদের হিদায়াত দিন। কেননা ফকীহগণের — আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন — কাছে প্রতিষ্ঠিত যে, ওয়াক্ত হলো সালাতের শর্তসমূহের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় শর্ত; তাই ওয়াক্তের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাকি সব শর্তের দাবি রহিত হয়ে যায় — আমি বলতে চাচ্ছি সেগুলোর ব্যাপারে অক্ষম হওয়ার অবস্থায়।

আর রোগী যদি জানেও যে এই সরঞ্জাম ও এই থলি ওয়াক্তের পরে তার থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে, তবু ওয়াক্ত বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সালাত পিছিয়ে দেওয়া তার জন্য জায়েয নয়; বরং তার উপর ওয়াজিব হলো নিজের অবস্থা অনুযায়ী ওয়াক্তের ভেতরেই সালাত আদায় করা। আর আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তিনি যা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না। এটি বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত ও তাঁদের উপর তাঁর লঘুকরণেরই অংশ। এই শরীয়ত তো সেই সহজ-সরল হানীফী দ্বীন, যাতে কোনো ভার নেই, কোনো শৃঙ্খল নেই, এবং যাতে মানুষের সামর্থ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় এমন কোনো দায়িত্ব নেই। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই; তাওফীক ও সুরক্ষা তাঁরই কাছ থেকে। আর তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

প্রস্রাব-পায়খানার থলি বা নালী থাকলে

করুন

- ✓ সম্ভব হলে সেটি সরিয়ে নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করা
- ✓ ক্ষতি, বিপদ বা চিকিৎসকের প্রত্যাখ্যানে অক্ষম হলে অবস্থা অনুযায়ীই সালাত আদায়
- ✓ ওয়াক্তের ভেতরে যতটুকু পবিত্রতা সম্ভব ততটুকু নিয়ে সালাত

করবেন না

- ✗ নাপাকি দূর করতে না পারায় সালাত পিছিয়ে দেওয়া জায়েয নয়
- ✗ ওয়াক্তের পরে সরানো হবে জানলেও ওয়াক্ত পার করে দেওয়া জায়েয নয়

অক্ষম হলে পুনরায় আদায় করা লাগবে না

প্রশ্ন ৪

যার হাদাস (অপবিত্রতা) নিরন্তর চলতে থাকে, তার ব্যাপারে ফিকহি নিয়মটি কী? দলিল, কারণ ও উদাহরণসহ তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর: আমি বলি:— ফিকহি নিয়মটি বলে: যার হাদাস নিরন্তর, সে প্রতিটি সালাতের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে ও সালাত আদায় করবে; তার হাদাস বের হওয়া তার কোনো ক্ষতি করবে না।

এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, জেনে রাখুন — আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন — শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল করেন না। যেমন তিনি ﷺ বলেছেন:

لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ

আল্লাহ এমন ব্যক্তির সালাত কবুল করেন না, যার অজু ভেঙে গেছে, যতক্ষণ না সে অজু করে। — মুত্তাফাকুন আলাইহি

আর তিনি ﷺ বলেছেন:

لا يقبل الله صلاة بغير طهور

আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাত কবুল করেন না। — মুসলিম বর্ণনা করেছেন

এ কথাও প্রতিষ্ঠিত যে, অজু ভঙ্গকারী হাদাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো দুই রাস্তা দিয়ে বের হওয়া বস্তু। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ

> অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে। (সূরা আন-নিসা: ৪৩ ও সূরা আল-মায়িদা: ৬)

আর সাফওয়ান ইবনু আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে:

لكن من غائطٍ وبولٍ ونوم

> কিন্তু পায়খানা, প্রস্রাব ও ঘুমের কারণে (মোজা খুলে ফেলতে হবে)।

আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে: আমি অতিরিক্ত মযীযুক্ত এক ব্যক্তি ছিলাম, তাই আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে বললাম যেন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি ﷺ বললেন:

((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ))

> সে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে নেবে এবং অজু করবে।

আর সেই হাদীস:

لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

> সে যেন (সালাত থেকে) ফিরে না যায়, যতক্ষণ না সে শব্দ শোনে কিংবা গন্ধ পায়।

— এবং এ ছাড়াও আরও দলিল রয়েছে।

কিন্তু দুই রাস্তা দিয়ে বের হওয়া বস্তু তখনই অজু-ভঙ্গকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যখন তা স্বাভাবিক নিয়মে বের হয়। আর যদি তা তার পরিচিত স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে যায় — এমনভাবে যে তার উপর "নিরন্তরতা"র বর্ণনা প্রযোজ্য হয়ে যায় — তবে বলা হয়: তার হাদাস নিরন্তর। এই বর্ণিত পদ্ধতিতে হাদাস বের হওয়া অজু ভঙ্গ করে না; বরং তা শরীয়তে বাতিল ও ধর্তব্য নয়। আর এটিই এই নিয়মটির মর্মবাণী।

সুতরাং যার হাদাস রোগের কারণে বারবার বের হয়, এমনকি সেই পুনরাবৃত্তির কারণে তা তার পরিচিত, স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং এত বেশি হয়ে যায় যে তার উপর "নিরন্তরতা"র বর্ণনা প্রযোজ্য হয় — তখন শরীয়তে তার সঙ্গে "যার হাদাস নিরন্তর" এমন ব্যক্তির মতোই আচরণ করা হয়।

ফকীহগণ তার সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে আচরণ করেন:

প্রথম:— তাঁরা তাকে আদেশ দেন, পবিত্রতা অর্জনের ইচ্ছা করার সময় সে তার থেকে বের হওয়া বস্তুর চিহ্ন ধুয়ে নেবে।

দ্বিতীয়:— তাঁরা তাকে আদেশ দেন, সে কাপড়, ন্যাকড়া, ন্যাপকিন বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত রাখবে এবং তা তার লজ্জাস্থানের উপর বেঁধে নেবে, যাতে যথাসাধ্য হাদাস বের হওয়া কমে আসে।

তৃতীয়:— সে প্রতিটি সালাতের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে ও সালাত আদায় করবে; এরপর তার থেকে কিছু বের হলে তা অজু-ভঙ্গকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

নিরন্তর হাদাস: ফকীহগণের তিন নির্দেশ

১ **প্রথম**
পবিত্রতার ইচ্ছায় বের হওয়া বস্তুর চিহ্ন ধুয়ে নেওয়া

২ **দ্বিতীয়**
কাপড়, ন্যাকড়া বা ন্যাপকিনে লজ্জাস্থান বেঁধে সুরক্ষিত রাখা

৩ **তৃতীয়**
প্রতিটি সালাতের ওয়াক্তের জন্য অজু করে সালাত আদায়

এরপর কিছু বের হলে তা অজু-ভঙ্গকারী নয়; তার হাদাস নিরন্তর

এর দলিল হলো উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস — এক নারীর রক্তক্ষরণ হতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে; উম্মে সালামা তার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফতোয়া চাইলেন। তিনি বললেন:

لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن

يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة فيها, فإذا خلفت ذلك

فلتغتسل ثم لتستثفر بثوبٍ ثم لتصل

> সে যেন মাসের সেই রাত ও দিনগুলোর হিসাব করে, যেগুলোতে তার এই অবস্থা হওয়ার আগে সে হায়েযগ্রস্ত হতো; সেই দিনগুলোতে সে সালাত ছেড়ে দেবে। তারপর সেই সময়টি পার হয়ে গেলে সে গোসল করবে, এরপর একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে নেবে, তারপর সালাত আদায় করবে।

এই নারীর হাদাস নিরন্তর — অর্থাৎ ইসতিহাযার রক্ত নির্গমন, যা নিরন্তর হাদাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আদেশ দিলেন, সে আগে যত দিন হায়েযগ্রস্ত থাকত সেই দিনগুলো চলে গেলে যেন গোসল করে ও কাপড় দিয়ে বেঁধে নেয়; কেননা তার হুকুম পবিত্র নারীদের হুকুমের মতো। এ থেকে আমরা জানতে পারলাম, ইসতিহাযার রক্ত বের হওয়ায় পবিত্রতা ভঙ্গের কোনো প্রভাব নেই; বরং সে সালাত আদায় করবে যদিও তার থেকে সেই রক্ত বের হতে থাকে — কেননা এটি নিরন্তর হাদাস, আর নিরন্তর হাদাসের কোনো হুকুম নেই।

আরেক হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ এক নারীকে বলেছিলেন যার প্রবল ও তীব্র ইসতিহাযা হতো:

أَلفت لك الكرسف تحشين به المكان

> আমি তোমার জন্য তুলার ব্যবস্থা বলে দিচ্ছি, তা দিয়ে তুমি জায়গাটি ভরে রাখবে।

সে বলল: রক্ত তো এর চেয়েও বেশি। তখন তিনি বললেন:

تلجمي

> তবে লাগাম-বাঁধার মতো করে কাপড় বেঁধে নাও।

আর সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের একজন তাঁর সঙ্গে ইতিকাফ করেছিলেন; তিনি হলদে স্রাব ও রক্ত দেখতেন এবং সালাত আদায়রত অবস্থায় নিজের নিচে গামলা রেখে দিতেন। এটি প্রমাণ করে যে, এই পদ্ধতিতে বের হওয়া বস্তু অজু ভঙ্গ করে না।

আর ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং রক্তের বিষয়ে অভিযোগ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন:

إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك

فتطهري ثم صلي مابين القرء إلى القرء

ওটা তো একটি শিরা মাত্র। তুমি লক্ষ্য করো — যখন তোমার হায়েযের সময় আসবে তখন সালাত আদায় করবে না; আর যখন তোমার হায়েযের সময় পার হয়ে যাবে তখন পবিত্রতা অর্জন করবে, তারপর এক হায়েয থেকে আরেক হায়েযের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করবে।

এই দলিলগুলো কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করে:

প্রথম:— নিরন্তর পদ্ধতিতে বের হওয়া বস্তু অজু ভঙ্গ করে না।

দ্বিতীয়:— যে ব্যক্তি এতে আক্রান্ত হয়েছে তার উপর ওয়াজিব হলো, সে জায়গাটি ধুয়ে নেবে এবং কাপড় দিয়ে বেঁধে নেবে বা তুলা দিয়ে ভরে রাখবে।

আর প্রতিটি সালাতের ওয়াক্তের জন্য অজু করার বিষয়টির দলিল হলো — বুখারী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশের হাদীসে যা বর্ণনা করেছেন, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফতোয়া চেয়ে বললেন: আমি এমন এক নারী, যার ইসতিহাযা হয় এবং আমি পবিত্র হই না; আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? তিনি তাকে বললেন:

إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة

ওটা তো একটি শিরা মাত্র, হায়েয নয়। তাই তুমি যত দিন হায়েযগ্রস্ত থাকতে তত দিন সালাত ছেড়ে দাও, তারপর গোসল করো এবং প্রতিটি সালাতের জন্য অজু করো।

আহমাদ ও ইবনু মাজাহ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন:

ثم صلي وإن قطر على الحصير

তারপর সালাত আদায় করো, যদিও চাটাইয়ের উপর রক্ত ফোঁটা ফোঁটা পড়ে।

আরেক বর্ণনায় এসেছে:

توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

প্রতিটি সালাতের জন্য অজু করো, যতক্ষণ না সেই সময়টি আসে।

আরেক শব্দে এসেছে:

لوقت كل صلاة

প্রতিটি সালাতের ওয়াক্তের জন্য।

আর এটি আবু মুআবিয়ার অতিরিক্ত বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)। উসূলশাস্ত্রে এ কথা প্রতিষ্ঠিত যে, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য।

আবু দাউদ আদী ইবনু সাবিত থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, নবী ﷺ-এর সূত্রে ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন:

تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة

সে তার হায়েযের দিনগুলোতে সালাত ছেড়ে দেবে, তারপর গোসল করবে ও সালাত আদায় করবে, আর প্রতিটি সালাতের সময় অজু করবে।

আবু দাউদের কাছে আসমা বিনতে উমাইসের হাদীসেও মারফূ সূত্রে এসেছে:

لتجلس إحداكن في مركنٍ فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً وللمغرب والعشاء غسلاً, وللفجر غسلاً وتتوضأ فيما بين ذلك

তোমাদের কেউ যেন একটি গামলায় বসে; তারপর যখন পানির উপর হলদে রঙ দেখে, তখন সে যোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করবে, মাগরিব ও ইশার জন্য একবার গোসল করবে এবং ফজরের জন্য

> একবার গোসল করবে, আর এর মধ্যবর্তী সময়ে অজু করবে।

এই হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, ইসতিহাযাগ্রস্ত নারী প্রতিটি সালাতের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে। আর এটিই শরীয়তের সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা হলো মুকাল্লাফদের থেকে সংকট ও কাঠিন্য দূর করা।

আপনি যদি বলেন: এই হাদীসগুলোতে তো কেবল ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর হুকুম বর্ণিত হয়েছে; তবে কি তার সঙ্গে অন্যরাও অন্তর্ভুক্ত হবে? উত্তর: হ্যাঁ, শর্ত ও রুকনসমূহ পূর্ণকারী বিশুদ্ধ কিয়াসের মাধ্যমে অন্যরাও তার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবে। এখানে মূল (আসল) হলো ইসতিহাযাগ্রস্ত নারী, শাখা (ফার) হলো নিরন্তর হাদাসের অধিকারী ব্যক্তি, আর সংযোগকারী কারণ (ইল্লত) হলো হাদাসের নিরন্তরতা ও ধারাবাহিকতা। আর হুকুম হলো — যেমন ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর হাদাস নিরন্তর হওয়ার কারণে তার উপর থেকে ভার লঘু করা হয়েছে, তেমনি সহজীকরণের দিক থেকে নিরন্তর হাদাসের অধিকারী ব্যক্তির উপর থেকেও ভার লঘু করা হবে।

শরীয়তে এ কথা প্রতিষ্ঠিত যে, তা দুটি সদৃশ বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করে না এবং দুটি বিপরীত বস্তুকে এক করে না; আরও প্রতিষ্ঠিত যে, শর্ত ও রুকনসমূহ পূর্ণকারী বিশুদ্ধ কিয়াস একটি প্রমাণ, যা থেকে বিধান বের করা হয়। এই হলো দলিল ও কারণের দিক থেকে নিয়মটির ব্যাখ্যা। আর শাখা-নির্ণয়ের দিক থেকে আমি বলি:—

এর অন্তর্ভুক্ত:— প্রস্রাবের ফোঁটা ঝরার রোগে (সালাসুল বাউল) আক্রান্ত রোগী — এটি এক ধরনের রোগ, যা চিকিৎসকগণ জানেন। সে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে নেবে, কিছু দিয়ে বেঁধে নেবে এবং প্রতিটি সালাতের ওয়াক্তের জন্য অজু করে সালাত আদায় করবে; তার হাদাস বের হওয়া তার ক্ষতি করবে না। কারণ তার হাদাস নিরন্তর, এবং হাদাসের নিরন্তরতা উভয়ের মধ্যে অভিন্ন হওয়ায় ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর উপর কিয়াস করে এ কথা বলা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এর অন্তর্ভুক্ত:— ইসতিহাযাগ্রস্ত নারী, অর্থাৎ (রক্তক্ষরণ) নামে পরিচিত রোগ; শরীয়তে তার হুকুম ও তার দলিলসমূহ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

এর অন্তর্ভুক্ত:— যার পাকস্থলীর নিচে একটি ছিদ্র খুলে দেওয়া হয়েছে, যা দিয়ে তার পায়খানা বের হয়। সে "যার হাদাস নিরন্তর" — এমন ব্যক্তির স্থানে গণ্য হবে, কেননা তখন সে তা বের হওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে না। তাই সে ওয়াক্ত প্রবেশ করার পরই কেবল অজু করবে, এবং ছিদ্রের চারপাশ যথাসাধ্য ধুয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে — যদি তাতে তার ক্ষতি না হয় — এবং ওয়াক্তের ভেতরেই সালাত আদায় করবে। সালাতের মধ্যে পায়খানা বের হওয়া তার ক্ষতি করবে না; বরং ঐ ওয়াক্তের বাকি পুরোটা সময়েও পায়খানা বের হওয়া ক্ষতি করবে না, যতক্ষণ না পরবর্তী সালাতের ওয়াক্ত প্রবেশ করে।

এর অন্তর্ভুক্ত:— যার জন্য এমন একটি ছিদ্র খুলে দেওয়া হয়েছে যা দিয়ে তার প্রস্রাব বের হয়। তার উপর "যার হাদাস নিরন্তর" এমন ব্যক্তির হুকুম প্রযোজ্য হবে, এবং এ ব্যাপারে তা-ই বলা হবে যা আমরা এর আগের শাখাটিতে বলেছি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এর অন্তর্ভুক্ত:— যার বায়ু নির্গমন অনিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ তার পায়ুপথ থেকে নিরন্তরভাবে বায়ু বের হয়। সেও এই নিয়মটির অধীনে পড়ে; তবে তার উপর পায়ুপথ ধোয়া ওয়াজিব নয়, কেননা বায়ু থেকে মূলত ইস্তিঞ্জা করা ওয়াজিব নয় — যতক্ষণ না তার সঙ্গে কোনো ভেজা বস্তু বের হয়। বরং তার উপর ওয়াজিব হলো কেবল এটুকু যে, ওয়াক্ত প্রবেশ করার পর সে প্রতিটি সালাতের জন্য অজু করবে এবং ওয়াক্তের ভেতরে সালাত আদায় করবে; তার হাদাস বের হওয়া তার ক্ষতি করবে না।

এর অন্তর্ভুক্ত:— যার নাক দিয়ে অবিরাম রক্ত ঝরে, কিংবা যার এমন ক্ষত আছে যা থেকে রক্ত ঝরে ও বন্ধ হয় না — আর আমরা বলেছি যে রক্ত বের হওয়া অজু-ভঙ্গকারীগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সে-ও এই নিয়মের অধীনে পড়বে। সুতরাং সে ক্ষতস্থানটি ধুয়ে নেবে, যদি ধোয়াতে তার ক্ষতি না হয় এবং সে তাতে সক্ষম হয়; আর তা বেঁধে দেবে বা এমন কিছু দিয়ে ভরে রাখবে যা রক্ত বের হওয়া ঠেকায়; এরপর ওয়াক্ত প্রবেশ করার পর প্রতিটি সালাতের জন্য অজু করে সালাত

আদায় করবে, তার হাদাস বের হওয়া তার ক্ষতি করবে না। এটি লঘুকরণ ও সহজীকরণের দিক থেকে; কেননা যে বিধানের প্রয়োগে কাঠিন্য থাকে, তার সঙ্গে সহজতা যুক্ত করা হয়।

এর অন্তর্ভুক্ত:— সেই পুরুষ, যার শারীরিক রোগের কারণে — কামভাবের কারণে নয় — অতিরিক্ত মযী নির্গত হয়। তাকে ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর হুকুম দেওয়া হবে। সুতরাং তার গায়ে যে মযী লেগেছে তা সে ধুয়ে নেবে, তার লজ্জাস্থানের উপর কিছু বেঁধে নেবে, প্রতিটি সালাতের ওয়াক্তের জন্য অজু করে সালাত আদায় করবে; তার হাদাস বের হওয়া তার ক্ষতি করবে না। এভাবেই বাকিগুলো মিলিয়ে নিন। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

নিরন্তর হাদাসের শাখা-দৃষ্টান্ত

যার হাদাস নিরন্তর: প্রতি ওয়াক্তে অজু, বের হওয়া ক্ষতি করবে না

- প্রস্রাবের ফোঁটা ঝরার রোগ — ধুয়ে বাঁধবে; প্রতি ওয়াক্তে অজু
- ইসতিহাযাগ্রস্ত নারী — কিয়াসের মূল (আসল)
- পাকস্থলীর নিচের ছিদ্র — ওয়াক্ত প্রবেশের পরই অজু; পরের ওয়াক্ত পর্যন্ত ক্ষতি নেই
- প্রস্রাবের ছিদ্র — একই হুকুম
- অনিয়ন্ত্রিত বায়ু নির্গমন — পায়ুপথ ধোয়া ওয়াজিব নয়
- অবিরাম নাকের বা ক্ষতের রক্ত — ধুয়ে বেঁধে প্রতি ওয়াক্তে অজু
- রোগের কারণে অতিরিক্ত মযী — ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর হুকুম

ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর হাদীসের উপর কিয়াস করে

প্রশ্ন ৫

হারাম চিকিৎসার কিছু প্রকার উল্লেখ করুন, সেগুলো হারাম হওয়ার কারণ দলিল ও যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর: আমি বলি:— এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। বিস্তারিত উত্তর দেওয়ার আগে আমি চাই আপনি এই নিয়মটি মুখস্থ করে নিন: চিকিৎসাগ্রহণের মূল বিধান হলো বৈধতা ও অনুমোদন, তবে নস (শরঈ দলিল) যা হারাম করেছে তা ছাড়া।

এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, চিকিৎসকগণ অতীতে যে চিকিৎসা জানতেন, কিংবা যা তাঁরা এখন আবিষ্কার করেছেন, অথবা পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা যা আবিষ্কারের ব্যবস্থা করবেন — সবকিছুরই মূল বিধান হলো বৈধতা ও অনুমোদন; তবে যদি এমন হয় যে সেটির হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট শরঈ দলিল এসেছে, তবে তা হারাম হবে। এর কারণ আল্লাহ তাআলার ব্যাপক বাণী:

ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض

> তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ যমীনে যা কিছু আছে তা তোমাদের জন্য অধীন করে দিয়েছেন? (সূরা আল-হজ্জ: ৬৫)

সুতরাং এই যমীনের বুকে যা কিছু আছে সবই আমাদের জন্য অধীন করা হয়েছে; আর অধীন করার দাবি হলো তা হালাল ও পবিত্র হওয়া — কেননা হারাম ও নাপাক বস্তু আমাদের জন্য অধীন নয়, যেহেতু তা থেকে উপকার নেওয়া জায়েয নয়। আর এই ওষুধগুলো তো এ যমীনের উপর যা আছে — উদ্ভিদ, খনিজ, প্রাণী ইত্যাদি — সেসব থেকেই নিষ্কাশিত।

আরও কারণ, নবী ﷺ বলেছেন:

تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام

> হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, তবে হারাম দিয়ে চিকিৎসা করো না।

তাঁর বাণী "تداووا" (চিকিৎসা গ্রহণ করো) — এটি একটি নিরঙ্কুশ (মুতলাক) শব্দ; আর উসূলশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত যে, মূল বিধান হলো নিরঙ্কুশ শব্দ তার নিরঙ্কুশতার উপরেই থাকবে, যতক্ষণ না সীমিতকারী (মুকাইয়্যিদ) আসে। কিন্তু নবী ﷺ এই চিকিৎসাগ্রহণকে সীমিত করেছেন তাঁর বাণী "ولا تتداووا بحرام" (হারাম দিয়ে চিকিৎসা করো না) দিয়ে। তাঁর কথা "ولا تتداووا" — এটি একটি নিষেধাজ্ঞা, আর তাঁর কথা "بحرام" — এটি একটি নাকিরা (অনির্দিষ্ট শব্দ)। উসূলশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত যে, নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষাপটে নাকিরা ব্যাপকতা বোঝায়। সুতরাং এর মধ্যে শরীয়তসম্মতভাবে প্রতিটি হারাম বস্তু অন্তর্ভুক্ত হবে; তা দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয নয়। কেননা হারামের প্রকৃত স্বরূপ হলো, তা রোগ — ওষুধ নয়।

আমি চিকিৎসা-অধ্যায়ের এই উপকারী নিয়মটির দলিল উপস্থাপনে দীর্ঘ করতে চাই না; সম্ভবত অন্য কোনো স্থানে তা বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। উদ্দেশ্য হলো, আমি এখন চাই আপনি এই নিয়মটি মুখস্থ করে নিন — অর্থাৎ চিকিৎসাগ্রহণের মূল বিধান হলো বৈধতা, তবে শারী (আল্লাহ) যা হারাম করেছেন তা ছাড়া।

এই নিয়মটির শাখা হিসেবে আমি আপনাকে এমন কিছু হারাম বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি, যা এ যুগে ছড়িয়ে পড়েছে এবং কিছু মানুষ যেগুলোকে চিকিৎসা মনে করে; অথচ সেগুলো হারাম ও ক্ষতিকর বিষয়, যা বান্দার দুর্বলতার উপর আরও দুর্বলতা বাড়িয়ে দেয়। তাই আমি বলি, আর তাওফীক আল্লাহরই কাছে:—

এর অন্তর্ভুক্ত:— তামীমা দিয়ে চিকিৎসা করা। তামীমা হলো ঝিনুক, সুতা, কিছু লেখা কাগজ বা এ জাতীয় জিনিস, যা ঝোলানো ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তা তার থেকে অনিষ্ট দূর করে ও কল্যাণ এনে দেয়। ভেষজ চিকিৎসকদের কেউ কেউ এই (হিজাব) বা (আহরায) চড়া দামে বিক্রি করে। এগুলোর অনেকগুলোতেই থাকে তিলিসমাত ও দুর্বোধ্য লেখা, আর অনেকগুলোতে থাকে জিন, বড় শয়তান ও তাদের সর্দারদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা। এগুলো হারাম চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত; বরং এগুলো রোগ, ওষুধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادني الله بضرٍ هل هن كاشفات ضره, أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله, عليه يتوكل المتوكلون

বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ — আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো, আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি চান, তবে তারা কি তাঁর সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি রহমত চান, তবে তারা কি তাঁর রহমত আটকে রাখতে পারবে? বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তাঁরই উপর ভরসাকারীগণ ভরসা করে। (সূরা আয-যুমার: ৩৮)

সহীহ গ্রন্থে আবু বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

أنه كان مع النبي في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت

তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কোনো এক সফরে ছিলেন। তখন তিনি একজন দূত পাঠালেন এই ঘোষণা দিয়ে যে, কোনো উটের গলায় ধনুকের ছিলার তৈরি কোনো মালা — অথবা কোনো মালাই — যেন অবশিষ্ট না থাকে, বরং তা কেটে ফেলা হয়।

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার হাতে পিতলের একটি বালা ছিল। তিনি বললেন:

ماهذه؟

এটি কী?

সে বলল: এটি ওয়াহিনা (হাত-কাঁধের এক ধরনের ব্যথা) থেকে বাঁচার জন্য। তিনি বললেন:

انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لوْ مِتَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً

এটি খুলে ফেলো; কেননা এটি তোমার দুর্বলতাই কেবল বাড়াবে। আর যদি এটি তোমার গায়ে থাকা অবস্থায় তুমি মারা যাও, তবে তুমি কখনোই সফল হবে না। — আহমাদ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম বর্ণনা করেছেন

আহমাদের বর্ণনায় উকবা ইবনু আমির থেকে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من تعلق تميمة فلا أتم الله له, ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له

যে ব্যক্তি তামীমা ঝুলিয়েছে, আল্লাহ যেন তার কাজ পূর্ণ না করেন; আর যে ব্যক্তি ঝিনুক ঝুলিয়েছে, আল্লাহ যেন তাকে স্বস্তি না দেন।

আরেক বর্ণনায় এসেছে:

من تعلق تميمة فقد أشرك

যে ব্যক্তি তামীমা ঝুলিয়েছে, সে শিরক করেছে।

— এটি হাকিমের কাছেও রয়েছে।

ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

إن التمائم والرقى والتولة شرك

> নিশ্চয়ই তামীমা, রুকইয়াহ ও তিওয়ালা (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টির জাদু) শিরক। — আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম বর্ণনা করেছেন

আর আবদুল্লাহ ইবনু উকাইমের হাদীসে মারফূ সূত্রে এসেছে:

إن من تعلق شيئاً وُكِلَ إليه

> নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি কোনো কিছুর সঙ্গে নিজেকে ঝুলিয়ে দেয়, তাকে সেটিরই কাছে সোপর্দ করা হয়। — আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন

আর রুওয়াইফি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد

لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابةٍ أو عظم فإن محمداً

بريء منه

> হে রুওয়াইফি, সম্ভবত তোমার জীবন দীর্ঘ হবে। তখন তুমি মানুষকে জানিয়ে দিও যে, যে ব্যক্তি তার দাড়িতে গিঁট দেয়, কিংবা ধনুকের ছিলা গলায় ঝোলায়, কিংবা পশুর গোবর বা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করে — মুহাম্মদ তার থেকে দায়মুক্ত। — আহমাদ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন

সুতরাং সব ধরনের তামীমাই হারাম। শিরকি তামীমা তো ইজমার ভিত্তিতে হারাম; আর কুরআনের তামীমাও বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হারাম — দলিলগুলোর ব্যাপকতার কারণে। উসূলশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত যে, ব্যাপক (আম) শব্দ তার ব্যাপকতার উপরেই বহাল থাকা আবশ্যক এবং দলিল ছাড়া তাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। এ ছাড়াও এর কারণ হলো — অন্তরের কোনো অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পথ বন্ধ করা, কুরআনকে অবমাননা করার পথ বন্ধ করা এবং শিরকি তামীমা ঝোলানোর পথ বন্ধ করা। পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলিমের অভিমত এটিই।

সুতরাং বান্দার জন্য চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তামীমা গ্রহণ করা জায়েয নয়, কেননা তা রোগ — ওষুধ নয়। আর এই তামীমাগুলোর প্রভাব সম্পর্কে দ্বীনের কাঙাল, ঈমানে দেউলিয়া ও ফিতনার দিকে আহ্বানকারীরা যেসব বাতিল বর্ণনা ও মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে, সেগুলো যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে। সত্যই অনুসরণের অধিক যোগ্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এর অন্তর্ভুক্ত:— রোগী যে মাটির উপর পড়ে গিয়েছিল, সেই মাটি থেকে কিছুটা সংগ্রহ করা। এটি এমন একটি কাজ যা কিছু রোগী করে থাকেন: কেউ কোনো জায়গায় পড়ে গিয়ে অসুস্থ হলে সে ঠিক সেই জায়গায় যায় এবং সেখানকার

মাটি নিয়ে আসে, কিংবা সেখানে কুরআন পড়া পানি ঢেলে দেয় — আর এ সবই সে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে করে।

এটি এমন একটি কাজ যা জায়েয নয়, কেননা এটি জিনদের নৈকট্য লাভের একটি প্রকার। এই কাজ এবং ঐ রোগের চিকিৎসার মধ্যে কোনো প্রকাশ্য সম্পর্ক নেই। এটি নিছক অনুমান, অজ্ঞতা, এবং সহীহ-অসহীহ সংবাদ যাচাই না করেই বাতিল কাহিনীর পেছনে ছুটে চলা। এই কাজের প্রকৃত স্বরূপ হলো — জিনদের সন্তুষ্ট করার একটি প্রকার, তাদের নৈকট্য লাভের একটি প্রকার, এবং এমন এক জিনিস দিয়ে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা চাওয়া, যার পক্ষে কোনো দলিল নেই।

সুতরাং এটি মূলত কোনো চিকিৎসাই নয় যে আমরা এর উপর পূর্বোক্ত মূলনীতি প্রয়োগ করব। কেননা কোনো কিছুকে চিকিৎসা হিসেবে প্রমাণ করতে হলে সে ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা থাকা অপরিহার্য — যাঁরা তাঁদের ইলম, অভিজ্ঞতা ও দ্বীনদারিতে নির্ভরযোগ্য। অথচ এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমরা একটি কথাও জানি না; বরং তাঁদের অনেকের কাছ থেকে সংরক্ষিত কথা হলো এ ধরনের জিনিস অস্বীকার করা, আর তাঁদের কেউ কেউ তো এ বিষয়ে কখনো শোনেনইনি। এটি কেবল সাধারণ মানুষের দিশাহীন ঘোরাফেরা, যারা আরোগ্যের লোভে এ ধরনের জিনিস লুফে নেয় — যদিও তা তাদের দ্বীন ও আকীদার বিনিময়ে হয়।

সুতরাং এটিকে চিকিৎসার পরিসরে ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর এর হারাম হওয়ার দলিল চাওয়া — এ কথা মূলতই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং হক হলো এটি নিষিদ্ধ করা। আর শাসকগণের প্রতি ওসিয়ত হলো, তাঁরা যেন প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে থামিয়ে দেন যে এটিকে অনুমোদন করে এবং সাধারণ মানুষকে এর নির্দেশ দেয়। কেননা এটি একটি শয়তানি ও বিদআতি চিকিৎসা, যার কোনো ভিত্তি নেই, যাকে সমর্থন করার মতো কোনো দলিল নেই এবং যাকে সত্যায়ন করার মতো কোনো অভিজ্ঞতাও নেই।

আর কিছু সাধারণ মানুষের এই দাবি যে সে তা করেছে ও তাতে উপকার পেয়েছে — এটি কিছুই নয়। কেননা এ ধরনের পথ চিকিৎসার পদ্ধতি জানার উপায় হওয়ার যোগ্য নয়। চিকিৎসার পথ জানা যায় নস দ্বারা, অথবা ইলম ও অভিজ্ঞতার অধিকারীদের থেকে আসা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা। যা-ই হোক, এই বর্ণিত পদ্ধতিটি রোগ — ওষুধ নয়। সুতরাং ওয়াজিব হলো তা বর্জন করা, তা থেকে সতর্ক থাকা এবং অন্যকে সতর্ক করা। আল্লাহই সাহায্যকারী।

এর অন্তর্ভুক্ত:— জাদুকর, গণক, কাহিন ও ভেলকিবাজদের কাছে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া। এটি সর্বসম্মতভাবে হারাম এবং কুফর ও শিরকের অন্যতম মাধ্যম; বরং এর কোনো কোনো রূপ তো এমন বড় শিরক, যা পুরোপুরি মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। বরং তাদের কাছে যাওয়াটাই স্বয়ং রোগ এবং পুরোপুরি বিপর্যয়। কত তাওহীদ যে তাদের কাছে যবাই হয়েছে, আর কত ঈমান যে তাদের ঘরের আঙিনায় নিহত হয়েছে!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له الصلاة أربعين يوماً

> যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গেল এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না। — মুসলিম বর্ণনা করেছেন

আর তিনি ﷺ বলেছেন:

من أتى كاهناً فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمدٍ

যে ব্যক্তি কোনো কাহিনের কাছে গেল, তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল এবং তাকে সত্য বলে মানল — সে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করল। — হাদীসটি সহীহ

আর হাদীসে এসেছে:

ليس منا من تطير أو تُطير له, أو تكهن أو تُكهن له أو سحر أو سُحر له ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمدٍ

সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কুলক্ষণ গ্রহণ করে কিংবা যার জন্য কুলক্ষণ গ্রহণ করা হয়; অথবা যে গণকবৃত্তি করে কিংবা যার জন্য গণকবৃত্তি করা হয়; অথবা যে জাদু করে কিংবা যার জন্য জাদু করা হয়। আর যে কাহিনের কাছে গেল এবং সে যা বলে তাতে তাকে সত্যায়ন করল, সে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করল। — বাযযার উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন

মুআবিয়া ইবনুল হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, জাহিলিয়াতে আমরা কিছু কাজ করতাম — আমরা কাহিনদের কাছে যেতাম। তিনি বললেন:

فلا تأتوا الكهان...الحديث

তবে তোমরা কাহিনদের কাছে যেয়ো না... — হাদীসের বাকি অংশ। মুসলিম বর্ণনা করেছেন

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাহিনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন:

((إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ))

> তারা কিছুই নয়।

তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল, তারা তো কখনো কখনো এমন কথা বলে যা সত্য হয়ে যায়! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

تلك الكلمة من الحق, يخطفها الجني, فيقرها في أذن وليه قَرَّ الدجاجة, فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة

> ওটি সত্যের একটি কথা, যা জিন ছোঁ মেরে নিয়ে আসে এবং মুরগির কক্‌কক্ শব্দের মতো করে তার বন্ধুর কানে ঢেলে দেয়; তারপর তারা তার সঙ্গে একশোরও বেশি মিথ্যা মিশিয়ে দেয়। — মুত্তাফাকুন আলাইহি

সুতরাং এই নোংরা ও দুর্গন্ধময় দলটির প্রাপ্য হলো — তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে এবং তাদের বিষয়টি শাসকদের কাছে তুলে ধরা হবে, যাতে তাদের মূলোৎপাটন করা যায় ও তাদের নির্মূল করা যায় — যেমনভাবে তারা বহু মানুষের দ্বীন ও ঈমানকে উপড়ে ফেলেছে। সুতরাং তাদের কাছে যাওয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে সতর্ক থাকুন; কেননা তারা দ্বীনের শত্রু, ইবলীসের বন্ধু এবং তার অভিশপ্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়নকারী। তাদের কাছে যাওয়ার পথ কেটে দিয়ে আপনি আপনার দ্বীনকে হেফাযত করুন, এবং এই নোংরা দলটির ব্যাপারে খবর পৌঁছে দিয়ে আপনার পরবর্তী মুসলিমদের প্রতি কল্যাণকামিতা প্রকাশ করুন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এর অন্তর্ভুক্ত:— সংগীত দিয়ে চিকিৎসা, যা কিছু পাশ্চাত্যপন্থী ও পাশ্চাত্যমুখী মনোরোগ-চিকিৎসক করে থাকেন। তাঁদের চিকিৎসাদৃষ্টিতে সংগীত কিছু কিছু মানসিক রোগের অবস্থার জন্য চিকিৎসা হওয়ার যোগ্য। এটি জায়েয নয়, কেননা এটি শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের বিরোধী; কারণ বাদ্যযন্ত্র, গান ও সব ধরনের সংগীত হারাম।

এ ব্যাপারে দলিল অসংখ্য। মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ { تحريم آلات الطرب } (বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়া)-তে সেগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করেছেন; তাঁর আগে ইমাম আল্লামা ইবনুল কাইয়িম তাঁর গ্রন্থ { الكلام على مسألة السماع } (সামা-র মাসআলা প্রসঙ্গে আলোচনা)-এ; এবং তাঁদের উভয়ের আগে ইমাম আল্লামা শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন ইবনু তাইমিয়া তাঁর গ্রন্থ { الاستقامة } (আল-ইসতিকামা)-য়। ইলমের অধিকারীদের অনেকেই এই মাসআলায় লিখেছেন, তাতে দলিলগুলো স্পষ্ট করেছেন, বিরোধীদের যুক্তিগুলোর জবাব দিয়েছেন এবং সেগুলোর অসারতা দেখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং গ্রহণযোগ্য হক কথা হলো — গান ও বাদ্যযন্ত্র হারাম।

যখন এগুলোর হারাম হওয়া প্রমাণিত, তখন স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য এগুলোকে পথ হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয নয়; কেননা আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের আরোগ্য তাদের উপর যা হারাম করেছেন তার মধ্যে রাখেননি। আর হাদীসের কারণে:

ولا تداووا بحرام

হারাম দিয়ে চিকিৎসা করো না।

আহমাদ, ইবনু আবী শাইবা, বুখারী তাঁর তারীখ গ্রন্থে, ইবনু মাজাহ এবং ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু গানম থেকে, তিনি আবু মালিক আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ليشربن ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها, يعزف على

رؤوسهم بالمعازف والمغنيات, يخسف الله بهم الأرض ويجعل

منهم القردة والخنازير

আমার উম্মতের কিছু লোক অবশ্যই মদ পান করবে এবং তার নাম বদলে অন্য নামে ডাকবে; তাদের মাথার কাছে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে ও গায়িকারা গাইবে। আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেবেন এবং তাদের কতককে বানর ও শূকরে পরিণত করবেন।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين, صوت عند نغمة ولعب

ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب

আমাকে দুটি নির্বোধ ও পাপাচারী আওয়াজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে: সুর, খেলাধুলা ও শয়তানের বাঁশির সময়কার আওয়াজ, এবং বিপদের সময় গালে চাপড় মারা ও জামার বুক ছেঁড়ার আওয়াজ। — আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান বলেছেন

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة, مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة

দুটি আওয়াজ দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত: সুরের সময়কার বাঁশি, আর বিপদের সময়কার আর্তনাদ। — বাযযার উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন

আবু আমির অথবা আবু মালিক আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন:

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু সম্প্রদায় হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল গণ্য করবে। — বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

কাযী ইয়ায উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি গানকে হালাল মনে করে তার কুফরের ব্যাপারে ইজমা রয়েছে; ইবনু মুফলিহ "আল-ফুরূ" গ্রন্থে তাঁর থেকে এটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম তাবারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: বিভিন্ন শহরের আলিমগণ গান মাকরূহ হওয়া ও তা থেকে নিষেধ করার ব্যাপারে ইজমা করেছেন। — উদ্ধৃতি শেষ।

আমি বলি: এখানে মাকরূহ বলতে হারাম হওয়ার অর্থে মাকরূহ উদ্দেশ্য।

আর এ কথা প্রমাণিত যে, গান ও সংগীতে বিরাট ক্ষতি রয়েছে। এটি অন্তরকে নষ্ট করে দেয়। দাহহাক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: গান অন্তরের জন্য বিনাশকারী ও রবের ক্রোধ আনয়নকারী। ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: গান অন্তরকে নষ্ট করে দেয়; আর অন্তর নষ্ট হয়ে গেলে তাতে মুনাফিকী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। — উদ্ধৃতি শেষ।

এর ক্ষতির মধ্যে রয়েছে — এটি অন্তরে মুনাফিকী গজায়, যেমন পানি ফসল গজায়; এ কথা ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। এর ক্ষতির মধ্যে রয়েছে — এটি মহান ও পরাক্রমশালী রবকে ক্রুদ্ধ করে। এর ক্ষতির মধ্যে রয়েছে — এটি শোকরের বিপরীত, কেননা গায়ক তার জিহ্বাকে এমন কাজে ব্যবহার করল যা শারী তার উপর হারাম করেছেন। এটি ব্যভিচারের মন্ত্র ও ব্যভিচারের দূত — যেমন ফুযাইল ইবনু ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেছেন। এটি আল্লাহর যিকির থেকে, কুরআন বোঝা ও তা নিয়ে চিন্তা করা থেকে এবং তাতে যা আছে তা আমল করা থেকে বাধা দেয়; কেননা কুরআন ও গান কখনোই একই অন্তরে একত্র হয় না। এটি শয়তানের বাঁশি — যেমন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একে নাম দিয়েছেন এবং নবী ﷺ তা অনুমোদন করেছেন।

এটি আল্লাহ তাআলার পথ থেকে বিভ্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ; আর যে আল্লাহ তাআলার পথ থেকে বিভ্রান্ত হলো সে ধ্বংস হলো। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم

> আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যে অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য অসার বাক্য কিনে নেয়। (সূরা লুকমান: ৬)

আর সাহাবীগণের একাধিকজন থেকে প্রমাণিত যে, এখানে গানই উদ্দেশ্য।

গান হলো "যূর" (মিথ্যা/অসার)-এর অন্তর্ভুক্ত। মুহাম্মদ ইবনুল হানীফা আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ

> আর যারা মিথ্যায় উপস্থিত হয় না। (সূরা আল-ফুরকান: ৭২)

— সম্পর্কে বলেছেন: এটি হলো গান। আর এটি কোনো জিনিসকে তার কিছু উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার অন্তর্ভুক্ত।

ইবনুল কাইয়িম বলেছেন: গান কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে মুনাফিকী সৃষ্টি করে, কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে জেদ, কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথ্যা, কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে পাপাচার এবং কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে চপলতা সৃষ্টি করে। — উদ্ধৃতি শেষ।

আর এটি শয়তানের আওয়াজ, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

واستفزز من استطعت منهم بصوتك...الآية

> আর তুমি তোমার আওয়াজ দিয়ে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারো উত্তেজিত করো... — আয়াতের বাকি অংশ। (সূরা আল-ইসরা: ৬৪)

তাবিঈ ও আলিমগণের একটি দল ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইবলীসের আওয়াজ হলো গানসমূহ।

আর এটি "মুকা" ও "তাসদিয়া"-র অন্তর্ভুক্ত, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية

> আর বাইতুল্লাহর নিকট তাদের সালাত শিস দেওয়া ও তালি বাজানো ছাড়া কিছুই ছিল না। (সূরা আল-আনফাল: ৩৫)

ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, আতিয়্যা, মুজাহিদ, দাহহাক, হাসান ও কাতাদা বলেছেন: "মুকা" হলো শিস দেওয়া এবং "তাসদিয়া" হলো তালি বাজানো।

গান হলো সেই পাপাচারী আওয়াজগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা অশ্লীলতার দিকে ডাকে। এ কারণেই অশ্লীলতায় লিপ্ত লোকেরা সর্বদা তাদের অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় তা শোনে। তাই দেখুন নৈশ প্রমোদকেন্দ্র ও যেসব বারে মদ পান করা হয় এবং যেসব আড্ডায় ব্যভিচার করা হয় — সেগুলোতে আপনি গান ছাড়া কিছুই পাবেন না; আমরা এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। এ ছাড়াও আরও এমন ক্ষতি রয়েছে যা গণনার ঊর্ধ্বে।

এর ভিত্তিতে, গান ও সংগীতকে চিকিৎসা ও আরোগ্যলাভের উপকরণ বানানো জায়েয নয়; বরং তা রোগ, ওষুধ নয়। আল্লাহ আমাদের ও আমাদের ভাইদের সকল বিপদ থেকে নিরাপদ রাখুন। আমি মহান ও সুউচ্চ আল্লাহর কাছে তাঁর সর্বমহান নামের অসীলায় প্রার্থনা করি — তিনি যেন গায়ক ও তার শ্রোতাদের প্রতি অনুগ্রহ করে মৃত্যুর আগে বিশুদ্ধ তাওবার তাওফীক দেন, তাঁদের অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তাঁর দিকে হিদায়াত দেন, তাঁদেরকে সুন্দরভাবে তাঁর দিকে ফিরিয়ে আনেন, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তাঁদের আশ্রয় দেন এবং তার অনিষ্ট থেকে তাঁদের রক্ষা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী, দুআ কবুলকারী। আর আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

এর অন্তর্ভুক্ত:— কিছু রুকইয়াহকারী কারী — আল্লাহ তাআলা তাঁকে হিদায়াত দিন — চিকিৎসায় বিদ্যুতের তার ব্যবহার করেন। এটি হারাম ও নাজায়েয, এবং তা কয়েকটি কারণে:—

প্রথম:— এটি সরাসরি শরীরকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া। অথচ তিনি ﷺ বলেছেন:

ولا يعذب بالنار إلا ربها

> আগুন দিয়ে শাস্তি দেন কেবল তার রব-ই।

— অথবা তিনি ﷺ যেমন বলেছেন। আর বিদ্যুৎ তার প্রকৃত স্বরূপে আগুনই। এ কারণেই যে ব্যক্তি বিদ্যুতে পুড়ে মারা যায়, তার শাহাদাতের আশা করা হয়; কেননা আগুনে দগ্ধ ব্যক্তি শহীদ — যেমনটি তাঁর ﷺ থেকে প্রমাণিত।

দ্বিতীয়:— এ দিয়ে চিকিৎসা করায় রোগীর উপর রয়েছে বিরাট ঝুঁকি ও গুরুতর বিপদ। এটি তাকে মেরে ফেলতে পারে, তার কোনো কোনো ইন্দ্রিয় অকেজো করে দিতে পারে, তার কোনো কোনো অঙ্গকে নড়াচড়ায় পঙ্গু করে দিতে পারে এবং তার শরীরের কোনো কোনো অংশ বিকৃত করে দিতে পারে। এসবের কিছুই জায়েয নয়; কেননা মানুষকে — তার নফস, দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও রূহসহ — আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেছেন। সুতরাং এ ধরনের কাজ দিয়ে তার উপর সীমালঙ্ঘন করা জায়েয নয়। আর শাসক এ ধরনের চিকিৎসা নিষিদ্ধ করেছেন, এবং এ জাতীয় বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব; কেননা এটি সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং বহু বিপর্যয় রুদ্ধ করা। সুতরাং ওয়াজিব হলো তা বর্জন করা, তা থেকে সতর্ক থাকা এবং অন্যকে সতর্ক করা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এর অন্তর্ভুক্ত:— মদ দিয়ে চিকিৎসা। এটি হারাম; একে অনুমোদন দেওয়া জায়েয নয়, বরং ওয়াজিব হলো তা নিষিদ্ধ করা। এই বিষয়টির ব্যাপারে বিশেষভাবে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট শরঈ দলিল দিয়ে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ

من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون... الآية بعدها

> হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক তীর শয়তানের কাজের অপবিত্র বস্তু; সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফল হও... — এবং এর পরের আয়াত। (সূরা আল-মায়িদা: ৯০)

ওয়াইল আল-হাদরামী থেকে বর্ণিত, তারিক ইবনু সুওয়াইদ নবী ﷺ-কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি তাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন: আমি তো এটি কেবল ওষুধের জন্য বানাই। তখন তিনি বললেন:

إنه ليس بدواء ولكنه داءٌ

> এটি ওষুধ নয়, বরং এটি রোগ। — মুসলিম বর্ণনা করেছেন

এর অন্তর্ভুক্ত:— সেই ওষুধগুলো, যেগুলোর উপাদানে শূকরের চর্বি রয়েছে, কিংবা যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম তাদের কোনো অংশ রয়েছে। এই ওষুধগুলো হারাম; সেগুলো গ্রহণ করা জায়েয নয়, কেননা তা ঐ হারাম বস্তু গ্রহণকেই অনিবার্য করে তোলে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون

ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل

لغير الله به

বলুন, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে আমি কোনো ভক্ষণকারীর জন্য তার খাদ্যের মধ্যে কিছুই হারাম পাই না — তবে মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত, কিংবা শূকরের গোশত ছাড়া; কেননা তা অপবিত্র; অথবা এমন পাপাচার, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। (সূরা আল-আন'আম: ১৪৫)

হারাম চিকিৎসার প্রকার

চিকিৎসা	হুকুম ও কারণ (লেখকের ভাষ্যে)
তামীমা (ঝিনুক, সুতা, লেখা কাগজ ঝোলানো)	রোগ, ওষুধ নয়; শিরকি তামীমা ইজমায় হারাম, কুরআনের তামীমাও বিশুদ্ধ মতে হারাম
পড়ে যাওয়া জায়গার মাটি সংগ্রহ	জায়েয নয়; জিনদের নৈকট্য লাভের একটি প্রকার
জাদুকর, গণক, কাহিনের কাছে চিকিৎসা	সর্বসম্মতভাবে হারাম; কুফর ও শিরকের মাধ্যম
সংগীত দিয়ে চিকিৎসা	জায়েয নয়; গান ও বাদ্যযন্ত্র হারাম
বিদ্যুতের তার ব্যবহার	হারাম ও নাজায়েয; আগুনের শাস্তি এবং রোগীর ঝুঁকি
মদ দিয়ে চিকিৎসা	হারাম; ওষুধ নয়, বরং রোগ
শূকরের চর্বি বা হারাম প্রাণীর অংশযুক্ত ওষুধ	হারাম; গ্রহণ করা জায়েয নয়

মূল নিয়ম: চিকিৎসাগ্রহণ বৈধ, তবে নস যা হারাম করেছে তা ছাড়া

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এর অন্তর্ভুক্ত:— হুপিং কাশি (পার্টুসিস) ইত্যাদি কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য দব্ব (মরুভূমির গোসাপজাতীয় প্রাণী)-এর রক্ত পান করে চিকিৎসা নেওয়া; এটি হারাম।

এ ব্যাপারে সমাহাতুশ শাইখ মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; তিনি এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ, নিরাময়কারী ও যথেষ্ট উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

দব্ব-এর রক্ত যদি প্রবাহিত রক্ত হয়, তবে তা হারাম এবং তা দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে মূল দলিল হলো কিতাব, সুন্নাহ ও যুক্তি-বিবেচনা (নযর)।

কিতাবের দিক থেকে দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী ও রক্ত। (সূরা আল-মায়িদা: ৩)

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী:

قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون

ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير...الآية

> বলুন, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে আমি কোনো ভক্ষণকারীর জন্য তার খাদ্যের মধ্যে কিছুই হারাম পাই না — তবে মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত, কিংবা শূকরের গোশত ছাড়া... — আয়াতের বাকি অংশ। (সূরা আল-আন'আম: ১৪৫)

আর এ দুই আয়াতের অর্থে কুরআনে যা কিছু এসেছে সেগুলোও দলিল।

দলিল গ্রহণের দিকটি হলো: আল্লাহ তাআলা প্রথম আয়াতে রক্তকে নিরঙ্কুশভাবে হারাম করেছেন, আর দ্বিতীয় আয়াতে সীমিতভাবে হারাম করেছেন; সুতরাং নিরঙ্কুশকে সীমিতের উপর ধরে নেওয়া হবে। উসূলশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত যে, বিধানসমূহ কাজের বিশেষণ; সুতরাং যখন সেগুলো কোনো সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন উদ্দেশ্য হয় সেই কাজ যার জন্য ঐ সত্তাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সুতরাং প্রবাহিত রক্তের সঙ্গে হারাম হওয়ার সম্পৃক্তি মানে হলো — তা যেসব কাজের জন্য প্রস্তুত, যেমন পান করা, চিকিৎসা করা, বিক্রি করা ইত্যাদি — সেগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্তি।

আর সুন্নাহর দিক থেকে কয়েকটি দলিল:—

প্রথম:— বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুআল্লাক সূত্রে ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন:

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আরোগ্য এমন জিনিসে রাখেননি, যা তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন।

তাবারানী এটিকে মাউসূল সূত্রে বর্ণনা করেছেন এমন সনদে যার রাবীগণ সহীহ গ্রন্থের রাবী। আহমাদ, ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে, বাযযার এবং আবু ইয়ালা তাঁদের মুসনাদে এটি বের করেছেন; আবু ইয়ালার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

দলিল-প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা: তাঁর বাণী "يجعل" একটি ক্রিয়া-বর্তমান (ফি'ল মুদারি), যা নেতিবাচক প্রেক্ষাপটে এসেছে, আর তা হলো "لم"। ক্রিয়া-বর্তমান একটি মাসদার ও একটি কালকে অন্তর্ভুক্ত করে; এই মাসদারটি নাকিরা (অনির্দিষ্ট), আর নেতিবাচকতা এর দিকেই নিবদ্ধ। উসূলশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত যে, নেতিবাচকতার প্রেক্ষাপটে নাকিরা ব্যাপক হয়ে যায় — যখন তা ক্রিয়ার দুই অর্থের একটি না হয়; আর যে নাকিরা ক্রিয়ার দুই অর্থের একটি, তাকেও এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আর বাক্যটি শুরু হয়েছে জোরদানকারী "إن" দিয়ে।

সুতরাং অর্থ হলো, তিনি ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে হারাম ওষুধগুলোতে কোনো আরোগ্য নেই। আর খবর (সংবাদমূলক বাক্য)-এর অধ্যায় — শব্দে ও অর্থে উভয় দিক থেকে, কেবল শব্দে নয় — সেসব স্থানের অন্তর্ভুক্ত যেখানে রহিতকরণ (নসখ) প্রবেশ করে না; সুতরাং এর বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বহাল, আর তা বিশ্বাস করা ওয়াজিব।

এর ব্যাখ্যা: ওষুধ দিয়ে আরোগ্য লাভের অন্যতম কারণ হলো — তা গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করা, তার উপকারিতায় বিশ্বাস রাখা, এবং আল্লাহ তাতে আরোগ্যের যে বরকত রেখেছেন তার প্রতি আস্থা রাখা। আর এ কথা জানা যে, মুসলিমের এই বিশ্বাস যে এই বস্তুটি হারাম — তা তার ও ঐ বস্তুর উপকারিতা ও বরকতে বিশ্বাসের মাঝখানে, তার প্রতি সুধারণা রাখার মাঝখানে এবং তা গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বরং সে যতই তা অপছন্দ করবে, তার সম্পর্কে যতই খারাপ বিশ্বাস রাখবে, তার স্বভাবও ততই তার প্রতি সবচেয়ে বেশি বিতৃষ্ণ হবে। সুতরাং এ অবস্থায় সে যদি তা গ্রহণ করে, তবে তা রোগই হবে, ওষুধ নয় — যতক্ষণ না তার ভেতরকার নোংরা হওয়ার বিশ্বাস, খারাপ ধারণা ও অপছন্দ দূর হয়ে ভালোবাসায় রূপ নেয়; আর এটি তো ঈমানের পরিপন্থী। সুতরাং মুমিন তা কখনোই গ্রহণ করবে না — এই দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া যে তা রোগ।

দ্বিতীয় হাদীস:— মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে তারিক ইবনু সুওয়াইদ আল-জুফী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন; তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং তা বানানো অপছন্দ করলেন। তখন তিনি বললেন: আমি তো এটি কেবল ওষুধের জন্য বানাই। তিনি বললেন:

((إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ))

এটি ওষুধ নয়, বরং এটি রোগ।

আর সহীহ মুসলিমে তারিক ইবনু সুওয়াইদ আল-হাদরামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের দেশে আঙুর আছে, আমরা তা নিংড়ে তা থেকে পান করি। তিনি বললেন:

لا

না।

আমি আবার বললাম: আমরা তো রোগীর জন্য আরোগ্য চাই। তিনি বললেন:

إن ذلك ليس بشفاءٍ ولكنه داء

নিশ্চয়ই ওটি আরোগ্য নয়, বরং ওটি রোগ।

এ দুই হাদীস থেকে দলিল-প্রতিষ্ঠা পূর্বোক্তভাবেই হয়; তবে এটি মদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নস, আর কিয়াসের মাধ্যমে অন্যান্য হারাম বস্তুকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

তৃতীয় হাদীস:— সুনানের সংকলকগণ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

نهى رسول الله عن الدواء الخبيث

রাসূলুল্লাহ ﷺ নোংরা ওষুধ থেকে নিষেধ করেছেন।

দলিল গ্রহণের দিকটি হলো: তিনি ﷺ নোংরা ওষুধ থেকে নিষেধ করেছেন, আর নিষেধাজ্ঞা হারাম হওয়া দাবি করে; সুতরাং তা ব্যবহার করা হারাম হবে। আর তা হারাম করা হয়েছে কেবল তার কদর্যতার কারণেই; আর কদর্য জিনিসে কোনো উপকার নেই; আর উপকার না থাকলে আরোগ্যও থাকে না।

দব্ব-এর রক্ত: ফতোয়ার দলিল

দব্ব-এর রক্ত দিয়ে চিকিৎসা

ফতোয়ার সারকথা
প্রবাহিত রক্ত হলে হারাম; চিকিৎসা জায়েয নয়

কিতাব
রক্ত হারাম (মায়িদা ৩); প্রবাহিত রক্ত (আন'আম ১৪৫)

প্রথম হাদীস
আল্লাহ হারাম বস্তুতে আরোগ্য রাখেননি

দ্বিতীয় হাদীস
মদ: এটি ওষুধ নয়, বরং রোগ

তৃতীয় হাদীস
নোংরা ওষুধ থেকে নিষেধ

সমাহাতুশ শাইখ মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীমের উত্তর থেকে

এক নজরে

- ★ অক্ষমতার সঙ্গে ওয়াজিব নেই; প্রয়োজনের সঙ্গে হারাম নেই
- ★ অক্ষম হলে ততটুকুই রহিত হয়; অব্যাহতির জন্য মিথ্যা বলা যাবে না
- ★ নারীর চিকিৎসা নারী, পুরুষের চিকিৎসা পুরুষ; দারূরাতে প্রয়োজন পরিমাণ
- ★ পানি-তায়াম্মুম, বসে-শুয়ে সালাত: সামর্থ্য অনুযায়ী ধাপে ধাপে
- ★ নিরন্তর হাদাসে প্রতি ওয়াক্তে অজু; সালাত ওয়াক্ত থেকে পিছানো যাবে না
- ★ চিকিৎসাগ্রহণের মূল বিধান বৈধতা, নস যা হারাম করেছে তা ছাড়া
- ★ তামীমা, জাদুকর-গণক, সংগীত, মদ ও হারাম উপাদান: চিকিৎসা হিসেবে হারাম

যাচাই করুন

1. রোগীর তাহারাত ও সালাতের মূলনীতি কোনটি?

ক. অক্ষমতার সঙ্গে কোনো ওয়াজিব থাকে না, প্রয়োজনের সঙ্গে কোনো হারাম থাকে না

খ. অক্ষমতা থাকলেও সব ওয়াজিব পূর্ণ পালন করতে হবে

গ. রোগীর উপর থেকে সালাত পুরোপুরি রহিত

2. মূল বিধান অনুযায়ী নারীর চিকিৎসা কে করবে?

ক. পুরুষ চিকিৎসক

খ. নারী চিকিৎসক

গ. যে-কেউ

3. যার হাদাস নিরন্তর, সে সালাতের জন্য কী করবে?

ক. একবার অজু করে সারা দিন সালাত পড়বে

খ. সালাত পিছিয়ে দেবে

গ. প্রতিটি সালাতের ওয়াক্তের জন্য অজু করে সালাত আদায় করবে

4. তামীমা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য কী?

ক. কুরআনের তামীমা বৈধ

খ. সব ধরনের তামীমাই হারাম

গ. কেবল শিরকি তামীমা হারাম

5. মদ দিয়ে চিকিৎসা সম্পর্কে নবী তারিককে কী বললেন?

ক. এটি ওষুধ

খ. প্রয়োজনে সামান্য পান করো

গ. এটি ওষুধ নয়, বরং রোগ

6. চিকিৎসাগ্রহণের মূল বিধান কী?

ক. নিষিদ্ধ

খ. বৈধতা ও অনুমোদন, তবে নস যা হারাম করেছে তা ছাড়া

গ. কেবল মুস্তাহাব

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-খ

আবু দাউদ তাঁর সুনানে আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داءٍ دواءً فتداووا ولا تتداووا بحرام

> নিশ্চয়ই আল্লাহ রোগ ও ওষুধ উভয়ই নাযিল করেছেন এবং প্রতিটি রোগের জন্য ওষুধ রেখেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, তবে হারাম দিয়ে চিকিৎসা করো না।

তাবারানীও এটি বের করেছেন, আর তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। দলিল গ্রহণের দিকটি হলো: তিনি ﷺ স্পষ্ট করেছেন যে ওষুধ রয়েছে বৈধ বস্তুতে; আর হারাম বস্তুতে কোনো ওষুধ নেই। এর বিবরণ কয়েকটি দিক থেকে:—

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

রোগ ও ওষুধের নির্ধারক আল্লাহ – নববী চিকিৎসা, তাওয়াক্কুল এবং রোগীর প্রতি নসীহত

হারাম দিয়ে চিকিৎসা নিষিদ্ধ হওয়ার দিকসমূহ (পূর্ব-আলোচনার ধারাবাহিকতা)

প্রথম: আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা-ই রোগসমূহ নির্ধারণ করেছেন এবং সেগুলোর জন্য ওষুধও নির্ধারণ করেছেন; তিনিই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী। সুতরাং তিনি যা সাব্যস্ত করেছেন সেটিই সাব্যস্ত হওয়ার যোগ্য, আর তিনি যা নাকচ করেছেন সেটিই নাকচ হওয়ার যোগ্য — কথায়, কাজে ও আকীদায়।

দ্বিতীয়: আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা রোগ দূর করার জন্য শরঈ উপায়-উপকরণ এবং প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উপায়-উপকরণ বিধিবদ্ধ করেছেন। শরঈ উপায়-উপকরণ যেমন কুরআন তিলাওয়াত, দুআসমূহ, তাওয়াক্কুলের শক্তি এবং এ জাতীয় বিষয়। আর প্রাকৃতিক উপকরণ যেমন রোগীর দেহে বিদ্যমান সেই শক্তি, যা রোগ দূর হওয়া পর্যন্ত রোগের মোকাবিলা করে। আর স্বাভাবিক উপকরণ যেমন সেসব ওষুধ, যেগুলো মুবাহ বস্তু দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। তাহলে বিধিসম্মত উপকরণগুলো ছেড়ে এমন উপকরণের দিকে কীভাবে যাওয়া হবে, যার ব্যবহারকারী — বিধান জানা থাকলে — গুনাহগার হয়?

তৃতীয়: চিকিৎসা গ্রহণের মূল বিধান হলো তা মাশরূ (বিধিসম্মত), ওয়াজিব নয়। সুতরাং একটি জায়েয কাজের জন্য নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।

চতুর্থ: মুবাহ ওষুধ দিয়ে রোগ দূর হওয়া একটি প্রবল ধারণার বিষয়; আর হারাম ওষুধ দিয়ে তা নিছক কল্পনামাত্র। তাহলে একটি কল্পিত বিষয়ের জন্য হারামে লিপ্ত হওয়া হবে কেন?

পঞ্চম: তিনি ﷺ বলেছেন «ولا تتداووا بحرام» — অর্থাৎ "হারাম দিয়ে চিকিৎসা করো না"। এটি একটি নিষেধাজ্ঞা, আর নিষেধাজ্ঞা মূলত হারাম হওয়াই দাবি করে। আর তা হারাম করা হয়েছে তার নিকৃষ্টতার কারণেই, সুতরাং তাতে শিফা থাকতে পারে না।

আর 'নযর' (সঠিক বিচারবুদ্ধি)-এর দিক থেকে কয়েকটি দিক রয়েছে:—

প্রথম: আল্লাহ তাআলা একে হারাম করেছেন তার খবীস (নিকৃষ্ট) হওয়ার কারণে। কেননা তিনি এই উম্মতের ওপর কোনো পবিত্র বস্তু শাস্তিস্বরূপ হারাম করেননি, যেমনটি বনী ইসরাঈলের ওপর হারাম করেছিলেন এই বাণীতে, জাল্লা ওয়া আলা:

فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم...الآية

> "সুতরাং ইয়াহুদীদের যুলুমের কারণে আমি তাদের ওপর হারাম করেছিলাম বহু পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য হালাল ছিল..." (সূরা আন-নিসা: ১৬০)

এই উম্মতের ওপর তিনি যা হারাম করেছেন তা কেবল তার খবীস হওয়ার কারণেই করেছেন; আর তা হারাম করা হয়েছে উম্মতকে রক্ষা করার জন্য এবং তা গ্রহণ থেকে হেফাজত করার জন্য। সুতরাং রোগব্যাধি ও অসুস্থতা থেকে শিফা তার দ্বারা তালাশ করা মানানসই নয়। কেননা তা রোগ দূর করতে প্রভাব ফেললেও তার ভেতরে থাকা খবীসের শক্তির কারণে অন্তরে তার চেয়েও বড় রোগ রেখে যায়। ফলে যে তার দ্বারা চিকিৎসা করল, সে অন্তরের রোগ দিয়ে দেহের রোগ দূর করার চেষ্টা করল।

দ্বিতীয়: তা হারাম হওয়ার দাবি হলো সর্বতোভাবে তা বর্জন করা ও তা থেকে দূরে থাকা; অথচ তাকে ওষুধরূপে গ্রহণের মধ্যে রয়েছে তার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও তার সংস্পর্শে যাওয়ার প্ররোচনা — আর এটি শারিআর উদ্দেশ্যের বিপরীত।

তৃতীয়: তা তো রোগ, যেমনটি শারি নিজেই স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। সুতরাং তাকে ওষুধ বানানো বৈধ নয়।

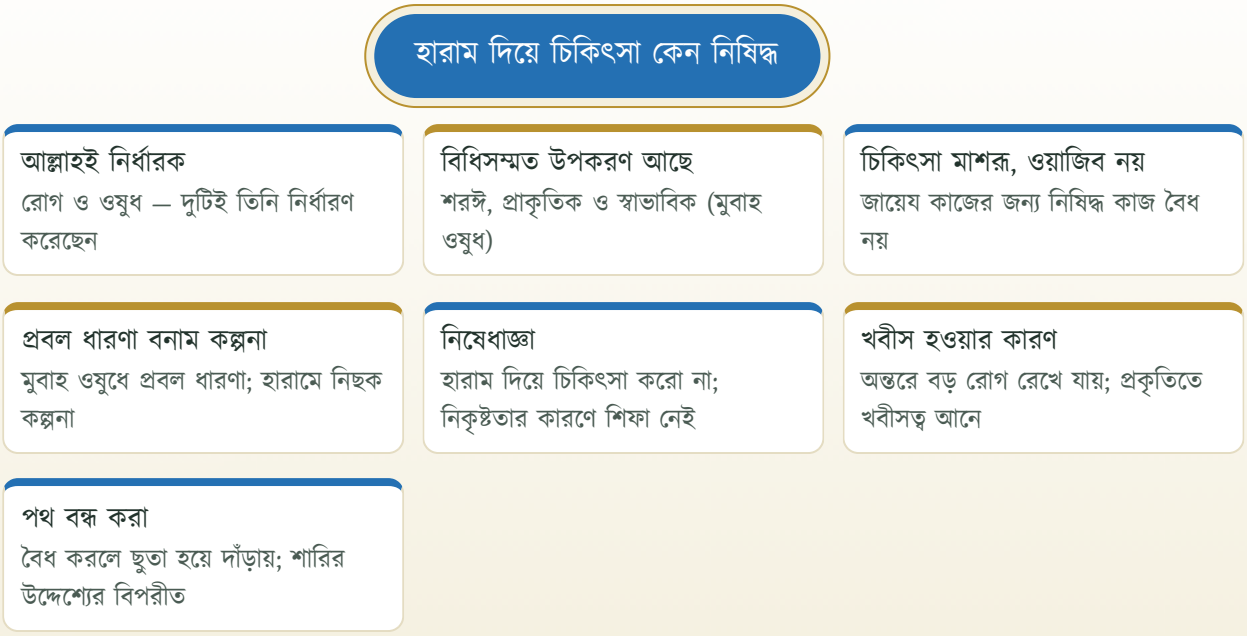
চতুর্থ: তা প্রকৃতি ও রূহকে খবীসের গুণ অর্জন করায়; কেননা প্রকৃতি ওষুধের গুণ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং ওষুধের গুণ যদি খবীস হয়, তবে তা প্রকৃতিকে তা থেকে খবীসত্ব দান করে — তাহলে বস্তুটি নিজেই যদি খবীস হয় তবে কী দশা হবে! এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর বান্দাদের ওপর খবীস খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম করেছেন — কেননা তাতে নফস খবীসের আকৃতি ও গুণ অর্জন করে।

পঞ্চম: তার দ্বারা চিকিৎসা বৈধ করা হলে তা কামনা ও স্বাদের জন্য তা গ্রহণের একটি ছুতা (যরীআ) হয়ে দাঁড়ায় — বিশেষত মনগুলো যখন জেনে যাবে যে তা তার জন্য উপকারী, তার রোগ দূরকারী, তার শিফা আনয়নকারী, তখন তা-ই হয়ে যাবে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। অথচ শারি সর্বসম্ভব উপায়ে তা গ্রহণের পথ বন্ধ করেছেন। আর সন্দেহ নেই যে, তা গ্রহণের পথ বন্ধ করা এবং সেই পথ খুলে দেওয়ার মধ্যে বিরাট স্ববিরোধ রয়েছে।

ষষ্ঠ: এই হারাম ওষুধের মধ্যে এমন সব রোগ রয়েছে, যা তাতে যে শিফা অনুমান করা হয় তার চেয়েও বেশি। — উদ্ধৃতি শেষ; এই ছিল তাঁর কথা, রহিমাহুল্লাহু তাআলা।

এর সারকথা হলো: প্রবাহিত দব্ব (মরুভূমির গোসাপজাতীয় প্রাণী)-এর রক্ত পান করে চিকিৎসা করা হারাম এবং এর কর্তা গুনাহগার। কিতাব, সুন্নাহ, সহীহ বিচারবুদ্ধি ও শরীআতের মাকাসিদের ভিত্তিতে গড়া এই দলিলগুলোর মোকাবিলায় কারও কথারই কোনো ধর্তব্য নেই। ওয়াল্লাহু আলা ওয়া আলাম।

হারাম দিয়ে চিকিৎসা নিষিদ্ধের দিক



দব্ব-এর রক্তের ফতোয়ার ধারাবাহিক দলিল; সারকথা: প্রবাহিত দব্ব-এর রক্ত পান করে চিকিৎসা হারাম

আর ইনশাআল্লাহু তাআলা প্রশ্নগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এমন কিছু ওষুধের কথা আসবে, যেগুলোর হারাম হওয়া নস দ্বারা প্রমাণিত। এখন আমরা প্রশ্নের ধারায় ফিরে যাই:—

প্রশ্ন ৬ – নববী ওষুধসমূহ

প্রশ্ন ৬: আমাদের কিছু নববী ওষুধের কথা বলুন, সেগুলোর দলিল ও কিছু উপকারিতার বর্ণনাসহ?

উত্তর: আমি বলি:— এটি একটি ব্যাপক প্রশ্ন। আশা করি আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এটি সহজ করে দেবেন, যেন আমরা এ বিষয়ে নস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলো একত্র করতে পারি, সঙ্গে আলিমগণের কথা থেকে উদ্ধৃত করে তার কিছু উপকারিতার বর্ণনাও দিতে পারি। সুতরাং আমি বলি:—

সেগুলোর একটি — এবং এটিই সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মহান ও নিরঙ্কুশভাবে সর্বোত্তম — কুরআন দিয়ে চিকিৎসা, অর্থাৎ রুকইয়াহ শরইয়্যাহ দিয়ে। আর জানা কথা যে, রুকইয়াহ কেবল তখনই মাশরূ হবে যখন তা কুরআন দিয়ে হয় অথবা সহীহ দুআসমূহ দিয়ে হয়; এবং তা আরবি ভাষায় হয়; এবং পাঠকারী ও যার ওপর পড়া হচ্ছে উভয়েই বিশ্বাস করে যে, এটি কেবল শিফার একটি উপায়-উপকরণমাত্র, আর শিফাদানকারী একমাত্র আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين

إلا خساراً

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত; আর তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।" (সূরা আল-ইসরা: ৮২)

এখানে «مِن» তাব্‌ঈযিয়্যাহ (অংশবাচক) নয়, বরং সঠিক অভিমত অনুযায়ী তা জিনস (শ্রেণি) বর্ণনার জন্য; ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ এবং অন্য একাধিক মুহাক্কিক এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

قل هو للذين آمنوا هدىً وشفاء

"বলুন, তা মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও শিফা।" (সূরা ফুসসিলাত: ৪৪)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

وهدىً ورحمة للمؤمنين

"হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশ, আর অন্তরসমূহে যা আছে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (সূরা ইউনুস: ৫৭)

কেউ যেন ধারণা না করে যে, কুরআন কেবল বদনজর, সিহর ও জিন-স্পর্শের রোগেরই শিফা; বরং তা আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে প্রতিটি রোগেরই শিফা — রূহানি রোগ হোক বা দৈহিক রোগ। রুকইয়াহর বিস্তারিত বিবরণ, তার বিধান ও দলিল এ স্থান ছাড়া অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

রুকইয়াহ মাশরূ হওয়ার শর্ত

- [ ] কুরআন দিয়ে হতে হবে, অথবা সহীহ দুআসমূহ দিয়ে
- [ ] আরবি ভাষায় হতে হবে
- [ ] পাঠকারী ও যার ওপর পড়া হচ্ছে — উভয়ের বিশ্বাস: এটি শিফার একটি উপায়মাত্র
- [ ] শিফাদানকারী একমাত্র আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা

কুরআন দিয়ে চিকিৎসা নববী ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মহান ও নিরঙ্কুশভাবে সর্বোত্তম

সেগুলোর একটি: শরীআতে বর্ণিত দুআ ও ওযীফাসমূহ দিয়ে চিকিৎসা। এসব দুআর রয়েছে কল্যাণ ও সুস্থতা আকর্ষণে এবং ক্ষতি ও রোগ প্রতিহত করায় বিরাট প্রভাব। খাওলা বিনতে হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما

خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك

"যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করে বলে: 'আঊযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব', সে ঐ স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।" — রিওয়ায়াত করেছেন মুসলিম

আর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, গত রাতে একটি বিচ্ছু আমাকে দংশন করেছে — কী কষ্টই না পেয়েছি!" তিনি বললেন:

أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما

خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ))

"যদি তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতে: 'আঊযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব', তবে তা তোমার ক্ষতি করত না।" — রিওয়ায়াত করেছেন মুসলিম

আর সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাবিতকে বললেন: "আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুকইয়াহ দিয়ে ঝাড়ব না?" তিনি বললেন: "অবশ্যই।" তখন তিনি পড়লেন:

اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا

أنت, اشفه شفاءً لا يغادر سقماً

"হে আল্লাহ, মানুষের রব, কষ্ট দূরকারী! শিফা দিন; আপনিই শিফাদানকারী, আপনি ছাড়া কোনো শিফাদানকারী নেই। তাকে এমন শিফা দিন যা কোনো ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।"

আর মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে উসমান ইবনু আবিল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং তাঁর এমন এক ব্যথা ছিল যা প্রায় তাঁকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

امسحه بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ((

"তোমার ডান হাত দিয়ে সাতবার তাতে হাত বুলাও এবং বলো: 'আঊযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু' — অর্থাৎ আমি যা অনুভব করছি ও যার আশঙ্কা করছি তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর ইয্যত ও কুদরতের আশ্রয় চাই।"

তিনি বলেন, আমি তা করলাম, ফলে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমার সেই কষ্ট দূর করে দিলেন। এরপর আমি সর্বদা আমার পরিবার ও অন্যদের এর নির্দেশ দিতে থাকতাম।

আর আবু দাউদ হাসান সনদে আমর ইবনু শুআইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ভীতি-আতঙ্কের সময়ের জন্য কিছু বাক্য শেখাতেন:

أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون

"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় চাই তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তারা আমার কাছে উপস্থিত হওয়া থেকে।"

আর সহীহাইনে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كان النبي يقول لإنسان إذا اشتكى يقول بريقه, ثم قال به في التراب, تربة أرضنا, بريقة بعضنا, يشفى سقيمنا بإذن ربنا

"কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে নবী ﷺ তার জন্য নিজ থুতু নিয়ে, তারপর তা মাটিতে লাগিয়ে বলতেন: 'আমাদের ভূমির মাটি, আমাদের কারও থুতু — আমাদের রবের অনুমতিতে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করুক।'"

এর অন্তর্ভুক্ত নবী ﷺ-এর জন্য জিবরীলের রুকইয়াহর হাদীসটিও, আর তা হলো তাঁর এই বাণী:

باسم الله أرقيك من كل داءٍ يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسدٍ الله يبريك باسم الله أرقيك

"আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ছি — এমন প্রতিটি রোগ থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রতিটি নফসের বা হিংসুকের নজরের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ছি।"

আর সেগুলোর একটি এই হাদীসটি:

ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض, كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع

"আমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানে; পবিত্র আপনার নাম; আসমান ও যমীনে আপনারই হুকুম চলে। আপনার রহমত যেমন আসমানে, তেমনি যমীনেও আপনার রহমত নাযিল করুন। আপনি পবিত্রদের রব। আমাদের

অপরাধ ও গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন। আপনার রহমত থেকে রহমত এবং আপনার শিফা থেকে শিফা এই ব্যথার ওপর নাযিল করুন।"

আর সেগুলোর একটি হলো, বান্দা যার ওপর রুকইয়াহ করতে চায় তার কাছে সাতবার বলবে:

((أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ))

"আমি মহান আল্লাহর কাছে, মহান আরশের রবের কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি আপনাকে শিফা দান করেন।"

— যেমনটি নস দ্বারা প্রমাণিত।

বর্ণিত দুআ ও ওযীফা

অবস্থা	হাদীসে বর্ণিত বাক্য
কোনো স্থানে অবতরণ	আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব
ব্যথার জায়গায়	ডান হাত বুলিয়ে সাতবার: আউযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু
ভীতি-আতঙ্কের সময়	আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় চাই তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তারা আমার কাছে উপস্থিত হওয়া থেকে
অসুস্থের জন্য	আমাদের ভূমির মাটি, আমাদের কারও থুতু — আমাদের রবের অনুমতিতে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করুক
যার ওপর রুকইয়াহ করা হবে	সাতবার: আমি মহান আল্লাহর কাছে, মহান আরশের রবের কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি আপনাকে শিফা দান করেন

সহীহ সুন্নাহর হাদীস থেকে

এ ছাড়া আরও যা কিছু সহীহ সুন্নাহয় প্রমাণিত, সেসবও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বান্দার কর্তব্য হলো এসব দিয়ে চিকিৎসা করা থেকে গাফিল না থাকা; কেননা এটি সবচেয়ে উপকারী চিকিৎসাসমূহের একটি, সবচেয়ে কম ব্যয়সাপেক্ষ এবং সবচেয়ে দ্রুত ফলদায়ক। তবে বলো না: "একবার পরীক্ষা করে দেখি" — কেননা এটি অন্তরে ইয়াকীনের দুর্বলতার প্রমাণ। বরং এই দুআগুলোর দিকে এগিয়ে যাও এমন অন্তর নিয়ে যা পূর্ণ ইয়াকীন ও দৃঢ়তায় ভরা, এবং কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের সব মন্দ, বিপদ ও ফিতনা থেকে হেফাজত করুন।

দুআ দিয়ে চিকিৎসায় মনোভাব

করুন	করবেন না
✓ এসব দিয়ে চিকিৎসা করা থেকে গাফিল না থাকা	✗ "একবার পরীক্ষা করে দেখি" বলা — তা ইয়াকীনের দুর্বলতার প্রমাণ
✓ পূর্ণ ইয়াকীন ও দৃঢ়তায় ভরা অন্তর নিয়ে এগিয়ে যাওয়া	

সেগুলোর একটি: মধু দিয়ে চিকিৎসা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۚ

"তাদের পেট থেকে বের হয় বিভিন্ন রঙের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে শিফা।" (সূরা আন-নাহল: ৬৯)

আর সহীহাইনে আবু সাঈদের হাদীসে এসেছে যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল: "আমার ভাই পেটের পীড়ায় ভুগছে।" তিনি বললেন: «اسقه عسلاً» — "তাকে মধু পান করাও।" এরপর সে দ্বিতীয়বার এল, তিনি বললেন: "তাকে মধু পান করাও।" এরপর সে তৃতীয়বার এল, তিনি বললেন: "তাকে মধু পান করাও।" এরপর সে চতুর্থবার এসে বলল: "আমি তো করেছি!" তখন তিনি বললেন:

صدق الله وكذب بطن أخيك, اسقه عسلاً

"আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলেছে; তাকে মধু পান করাও।"

অতঃপর সে তাকে পান করাল এবং সে সুস্থ হয়ে গেল।

আর আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত: «عليكم بالشفائين العسل والقرآن» — "তোমরা দুই শিফাকে আঁকড়ে ধরো: মধু ও কুরআন।" — বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ ও হাকিম; হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন।

আর সহীহাইনে জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

إن كان في شيء من أدويتكم خير, ففي شرطة محجم أو شربة

عسلٍ أو لذعة نار توافق الداء, وما أحب أن أكتوي

"তোমাদের ওষুধসমূহের কোনোটিতে যদি কল্যাণ থেকে থাকে, তবে তা আছে শিঙার কাটায় (হিজামা), কিংবা এক ঢোক মধুতে, কিংবা রোগের উপযোগী আগুনের দাগে; আর আমি নিজে দাগ নেওয়া পছন্দ করি না।"

আর বুখারীতে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে মারফূ সূত্রে এসেছে:

الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار,

وأنا أنهى أمتي عن الكي

"শিফা তিনটি জিনিসে: শিঙার কাটায়, এক ঢোক মধুতে, কিংবা আগুন দিয়ে দাগানোয়; আর আমি আমার উম্মতকে দাগানো থেকে নিষেধ করছি।"

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন: "মধুতে রয়েছে বিরাট উপকারিতা। তা শিরা-উপশিরা, অন্ত্র ও অন্যান্য অঙ্গের ময়লা পরিষ্কারকারী; খাওয়া ও প্রলেপ — উভয়ভাবেই আর্দ্রতা (রুতূবাত) বিশ্লেষণকারী; বৃদ্ধদের ও কফপ্রধান প্রকৃতির লোকদের জন্য উপকারী; এটি পুষ্টিদায়ক ও প্রকৃতির জন্য কোমলকারী; মাজূন-জাতীয় ওষুধের শক্তি এবং তাতে যা সংরক্ষণ করা হয় তার রক্ষাকারী; কফ থেকে সৃষ্ট কাশির জন্য উপযোগী..." ইত্যাদি — এ পর্যন্তই তাঁর কথা, রহিমাহুল্লাহু তাআলা। ওয়াল্লাহু আলাম।

সেগুলোর একটি: হিজামা (শিঙা লাগানো) দিয়ে চিকিৎসা। এ সম্পর্কিত হাদীস কিছুক্ষণ আগেই গত হয়েছে, তাতে ছিল «شرطة محجم» — এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হিজামা। ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে নিজ সনদে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك

بالحجامة

> "মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলের পাশ দিয়েই অতিক্রম করেছি, তারাই বলেছে: 'হে মুহাম্মাদ, আপনার উম্মতকে হিজামার নির্দেশ দিন।'"

বূসীরী বলেন: এই সনদ দুর্বল, কাসীর ও জুবারার দুর্বলতার কারণে। তবে এর একটি শাহিদ রয়েছে ইবনু মাসঊদের হাদীস থেকে; তিরমিযী ও হাকিম ইবনু আব্বাসের হাদীস থেকে তা বর্ণনা করেছেন, এবং বাযযার তাঁর মুসনাদে ইবনু উমরের হাদীস থেকে তা বর্ণনা করেছেন; আর আলবানী একে সহীহ বলেছেন। শাইখ আলবানীর এই সহীহ বলাটি কেবল তার শাহিদগুলোর বিবেচনায়। ওয়াল্লাহু আলাম।

আর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: «إن كان في شيء من تداوون به خير فالحجامة» — "তোমরা যেসব জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করো তার কোনোটিতে যদি কল্যাণ থেকে থাকে, তবে তা হিজামায়।" — রিওয়ায়াত করেছেন ইবনু মাজাহ।

আর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: "নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজামার অনুমতি চাইলেন; তখন নবী ﷺ আবু তাইবাকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি তাঁকে হিজামা করান।" — হাদীসটি সহীহ।

আর আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: "নবী ﷺ 'আল-আখয আইন' ও কাঁধের ওপর হিজামা করিয়েছেন।" — রিওয়ায়াত করেছেন ইবনু মাজাহ, এর সনদ সহীহ।

তাঁরই (ইবনু মাজাহর) বর্ণনায় আবু কাবশা আল-আনমারী থেকে আছে যে, নবী ﷺ তাঁর মাথার তালুতে ও দুই কাঁধের মাঝখানে হিজামা করাতেন এবং বলতেন:

من اهرق منه هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيءٍ لشيء

> "যে ব্যক্তি এই রক্তগুলো বের করে ফেলল, অন্য কোনো কিছুর জন্য অন্য কোনো কিছু দিয়ে চিকিৎসা না করলেও তার কোনো ক্ষতি নেই।" — হাদীসটি সহীহ

আর হিজামার সময় সম্পর্কে তিরমিযী তাঁর জামিতে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণনা করেছেন: "নবী ﷺ সতেরো, ঊনিশ ও একুশ তারিখে হিজামা করাতেন।" — এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আর সুনানু ইবনি মাজাহতে হাসান সনদে আনাস থেকে মারফূ সূত্রে আছে:

من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين, لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله

> "যে হিজামা করাতে চায়, সে যেন সতেরো, ঊনিশ বা একুশ তারিখ বেছে নেয়; তোমাদের কারও রক্ত যেন উথলে উঠে তাকে মেরে না ফেলে।"

আর আবু দাউদ তাঁর সুনানে হাসান সনদে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন: «من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء» — "যে ব্যক্তি সতেরো, ঊনিশ বা একুশ তারিখে হিজামা করাল, তা তার জন্য প্রতিটি রোগের শিফা হবে।" ইবনুল কাইয়িম বলেন: "এই হাদীসগুলো চিকিৎসকগণ যেসব বিষয়ে ইজমা করেছেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।" — উদ্ধৃতি শেষ।

সেগুলোর একটি: কালোজিরা (আল-হাব্বাতুস সাওদা) দিয়ে চিকিৎসা। সহীহাইনে উম্মু সালামার হাদীসে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داءٍ إلا السام

> "তোমরা এই কালোজিরাকে আঁকড়ে ধরো; কেননা তাতে 'সাম' ছাড়া প্রতিটি রোগের শিফা রয়েছে।"

আর 'সাম' অর্থ মৃত্যু। ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহু তাআলা সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন যে, এটি 'শূনীয', আর এটি ফারসি ভাষার শব্দ। তিনি রহিমাহুল্লাহু তাআলা 'আল-হাদী' গ্রন্থে এর বহু ফায়দা ও উপকারিতা উল্লেখ করেছেন — সেখানে দেখে নিন, কেননা তা উদ্ধৃত করলে দীর্ঘ হয়ে যাবে। ওয়াল্লাহু আলাম।

সেগুলোর একটি: 'কাই' (আগুন দিয়ে দাগানো) দিয়ে চিকিৎসা। এ বিষয়ে আমাদের কাছে ইতিপূর্বে কয়েকটি হাদীস গত হয়েছে। বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন: "আবু তালহা ও আনাস ইবনুন নাযর তাঁকে দাগিয়েছিলেন, আর আবু তালহা নিজ হাতে তাঁকে দাগিয়েছিলেন।" আর মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনু কাব-এর কাছে একজন চিকিৎসক পাঠালেন; সে তাঁর একটি শিরা কেটে দিল, তারপর তার ওপর দাগ দিল।" তাঁরই (মুসলিমের) বর্ণনায় তাঁর থেকে আছে, তিনি বলেন: "সা'দ ইবনু মুআযের 'আকহাল' শিরায় তীর বিদ্ধ হলো; তিনি বলেন, তখন নবী ﷺ নিজ হাতে চওড়া ফলাযুক্ত তীরের ফলা দিয়ে তা দাগিয়ে দিলেন; পরে তা ফুলে উঠলে দ্বিতীয়বার দাগালেন।" আর বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণনা করেছেন: "নবী ﷺ জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁকে 'যাতুল জাম্ব' (পাঁজরের প্রদাহ) রোগের কারণে দাগানো হয়েছিল।" আর তিরমিযীতে আনাস থেকে আছে: "নবী ﷺ আসআদ ইবনু যুরারাকে 'শাওকা' রোগের কারণে দাগিয়েছিলেন।" — এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

তবে এতে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়; বরং একে চিকিৎসার সর্বশেষ ধাপ বানাবে। আর দাগানোর 'কর্ম'-সংক্রান্ত হাদীস ও নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত হাদীসগুলোর সমন্বয় এভাবে হবে যে, কর্মটি জায়েয হওয়ার দলিল আর নিষেধাজ্ঞাটি মাকরূহ হওয়ার দলিল। সুতরাং কাই জায়েয, তবে মাকরূহ। তাঁর বাণী «وأنهى أمتي عن الكي» ("আমি আমার উম্মতকে দাগানো থেকে নিষেধ করছি") তার মূল অর্থে — অর্থাৎ হারাম অর্থে — নয়; বরং তা মাকরূহ বোঝানোর জন্য, কারণ এখানে একটি 'সারিফ' (অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া দলিল) বিদ্যমান — আর তা হলো তাঁর নিজেরই দাগানোর নির্দেশ দেওয়া

এবং তাঁর ﷺ নিজ হাতে কতিপয় সাহাবীকে দাগানো। আর তাঁর বাণী «ولا أحب الكي» ("আমি দাগানো পছন্দ করি না") কেবল মাকরূহ হওয়াই বোঝায়। সুতরাং সঠিক কথা হলো, কাই জায়েয কিন্তু মাকরূহসহ; আর যখনই তা ছাড়া চলা সম্ভব হয়, তখন তা দিয়ে চিকিৎসা করবে না। ওয়াল্লাহু আলাম।

সেগুলোর একটি: রোগের প্রকৃতির বিপরীত জিনিস দিয়ে চিকিৎসা — যেমন জ্বরের চিকিৎসা ঠান্ডা পানি দিয়ে, আর ক্রোধের চিকিৎসা অজু দিয়ে। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء

> "জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে; সুতরাং তোমরা তা পানি দিয়ে ঠান্ডা করো।" — মুত্তাফাকুন আলাইহি

আর তাঁদের দুজনের (বুখারী-মুসলিমের) এক বর্ণনায় রাফি ইবনু খাদীজের হাদীসে মারফূ সূত্রে আছে:

الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء

> "জ্বর জাহান্নামের ফুটন্ত তাপ থেকে; সুতরাং তোমরা পানি দিয়ে তা তোমাদের থেকে ঠান্ডা করো।"

আর আসমা বিনতে আবি বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে বর্ণিত: "তাঁর কাছে জ্বরাক্রান্ত কোনো নারী এলে তিনি তার জন্য দুআ করতেন, পানি নিয়ে তার ও তার জামার গলার ফাঁকের মাঝে ঢেলে দিতেন এবং বলতেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিতেন যেন আমরা তা পানি দিয়ে ঠান্ডা করি।" আর হাদীসে আছে: «إن هذا الغضب نار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» — "নিশ্চয়ই এই ক্রোধ আগুন; সুতরাং তোমাদের কেউ ক্রুদ্ধ হলে সে যেন অজু করে।"

এর অন্তর্ভুক্ত উটের গোশত খাওয়ার পর অজু ওয়াজিব হওয়াও, যেমনটি মুসলিমে জাবির ইবনু সামুরার হাদীসে এসেছে। আর তা এ কারণে যে, উট জিন-স্বভাবের, জিন থেকে সৃষ্ট; তাই তার মধ্যে শয়তানি স্বভাবের অনেক কিছু রয়েছে, আর খাদ্য গ্রহণকারী খাদ্যের সদৃশ হয়ে যায়, এবং শয়তানরা আগুন থেকে সৃষ্ট। সুতরাং মানানসই হলো যে, তা খাওয়ার পর অজু ওয়াজিব করা হবে, যাতে পানি সেই কষ্টদায়ক আগুনসুলভ শয়তানি উত্তাপকে নিভিয়ে দেয়; ফলে তার ক্ষতি চলে যায় এবং উপকার বাকি থাকে।

সেগুলোর একটি: সংক্রামক রোগে আক্রান্তদের সঙ্গে না মেশা এবং তাদেরকে সুস্থদের সঙ্গে না মেশার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষা করে চিকিৎসা করা; কেননা প্রতিরোধ চিকিৎসার চেয়ে উত্তম, আর প্রতিহত করা দূর করার চেয়ে শক্তিশালী। আমর ইবনুশ শারীদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "সাকীফের প্রতিনিধি দলে একজন কুষ্ঠরোগী ছিল; নবী ﷺ তার কাছে বার্তা পাঠালেন: «إنا قد بايعناك فارجع» — 'আমরা তো তোমার বাইআত গ্রহণ করেছি, তুমি ফিরে যাও।'" — রিওয়ায়াত করেছেন মুসলিম। আর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: «لا يوردن ممرض على مصح» — "রোগাক্রান্ত পশুর মালিক যেন সুস্থ পশুর মালিকের কাছে তার পশু না নিয়ে আসে।"

আর মুত্তাফাক আলাইহিতেও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে আছে যে, আবদুর রহমান ইবনু আউফ বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি — অর্থাৎ প্লেগ সম্পর্কে:

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه

"কোনো ভূখণ্ডে তার কথা শুনলে সেখানে যেয়ো না; আর যে ভূখণ্ডে তা দেখা দিল আর তোমরা সেখানে আছ, তবে তা থেকে পালিয়ে বেরিয়ে এসো না।"

আর এটি স্বাস্থ্য-রক্ষারই অন্তর্ভুক্ত। এর অন্তর্ভুক্ত তাঁর ﷺ এই বাণীও:

بحسب ابن آدم لقيماتٍ يقمن صلبه فإن كان لابد فاعلاً فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ))

"আদম-সন্তানের জন্য কয়েক লোকমাই যথেষ্ট, যা তার মেরুদণ্ড সোজা রাখে। আর যদি করতেই হয়, তবে এক-তৃতীয়াংশ তার খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ তার পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ তার শ্বাসের জন্য।"

কেননা তিনি অপর হাদীসে বলেছেন: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه» — "আদম-সন্তান পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করেনি।" আর চিকিৎসাশাস্ত্র পথ্য-নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য-রক্ষার ওপরই প্রতিষ্ঠিত, যেমনটি ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহু তাআলা জানিয়েছেন।



সেগুলোর একটি: তাঁর ﷺ কর্তৃক 'উযরা' (শিশুর গলার তালুর ফোলা) রোগের চিকিৎসা 'উদে হিন্দি' দিয়ে করা। সহীহাইনে তাঁর ﷺ থেকে আছে, তিনি বলেছেন:

خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا

صبيانكم بالغمز في العذرة

"তোমরা যা দিয়ে চিকিৎসা করো তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো হিজামা ও কুস্তে বাহরি; আর তোমরা উযরা রোগে তালুতে চাপ দিয়ে তোমাদের শিশুদের কষ্ট দিয়ো না।"

আর উম্মু কায়স বিনতে মিহসান আল-আসাদিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা — তিনি ছিলেন সেই প্রথম মুহাজির নারীদের একজন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বাইআত করেছিলেন, এবং তিনি উক্কাশা বিনতে মিহসানের বোন — তাঁর থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন, যার উযরা রোগের কারণে তালুতে চাপ দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন:

اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق, عليكم بهذا

العود الهندي فإن فيه سبعة أشفيه, منها ذات الجنب

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো — এসব চাপাচাপি করে তোমরা যে তোমাদের সন্তানদের গলা টিপে ধরো তার ব্যাপারে। তোমরা এই উদে হিন্দি আঁকড়ে ধরো; কেননা তাতে সাতটি শিফা রয়েছে, যার একটি যাতুল জাম্ব।" — মুত্তাফাকুন আলাইহি

আর তাঁদের দুজনেরই এক বর্ণনায় আছে: «عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفيه يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب» — "তোমরা এই উদে হিন্দি আঁকড়ে ধরো; কেননা তাতে সাতটি শিফা রয়েছে: উযরা রোগে তা নাকে দেওয়া হয়, আর যাতুল জাম্ব রোগে তা মুখের একপাশ দিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়।"

আর সুনান ও মুসনাদে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশার কাছে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর কাছে একটি শিশু ছিল যার নাসারন্ধ্র দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তিনি বললেন: "এ কী?" তাঁরা বললেন: "তার উযরা হয়েছে, অথবা মাথায় ব্যথা।" তখন তিনি বললেন:

ويلكم, لا تقتلن أولادكن, أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو

وجع في رأسه فلتأخذ قسطاً هندياً فلتحكه بماءٍ, ثم تسعطه إياه

"ধিক তোমাদের! তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। যে নারীরই সন্তান উযরা রোগে বা মাথাব্যথায় আক্রান্ত হবে, সে যেন কুস্তে হিন্দি নিয়ে তা পানিতে ঘষে, তারপর তা তার নাকে দেয়।"

তখন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নির্দেশ দিলেন, ফলে শিশুটির জন্য তা করা হলো এবং সে সুস্থ হয়ে গেল। এর সনদ সহীহ। আর আমাদের এখানে উযরার প্রসিদ্ধ চিকিৎসা হলো আঙুল দিয়ে আলজিভে চাপ দেওয়া — অথচ এটিই নিষিদ্ধ, কেননা এতে শিশুকে কষ্ট দেওয়া হয়। তাই নবী ﷺ আমাদের এমন জিনিসের দিকে পথ দেখিয়েছেন যা শিশুদের জন্য অধিক উপকারী ও অধিক সহজ। আর হাদীসে উল্লিখিত 'কুস্তে বাহরি'-ই হলো 'উদে হিন্দি', যেমনটি অন্যান্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে; আর সুন্নাহর সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হলো সুন্নাহ নিজেই।

সেগুলোর একটি: অর্থাৎ উপকারী ওষুধসমূহের একটি — 'কামআহ' (মরুভূমির ছত্রাক), আর তা চোখের শিফা, যেমনটি মাসূম ﷺ সংবাদ দিয়েছেন। সহীহাইনে সাঈদ ইবনু যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين

> "কামআহ 'মান্ন'-এর অন্তর্ভুক্ত, আর তার পানি চোখের জন্য শিফা।"

আর মুসলিমের বর্ণনায়: «الكمأة من المن الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين» — "কামআহ সেই 'মান্ন'-এর অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের ওপর নাযিল করেছিলেন, আর তার পানি চোখের জন্য শিফা।"

কামআহ জমিনে জন্মে চাষ করা ছাড়াই; একে 'কামআহ' বলা হয় মাটি ফুঁড়ে ওঠার কারণে। এর পাতা নেই, কাণ্ডও নেই; আকার ও রূপে তা জমিনের জন্য বসন্তের গুটির মতো, তাই একে বলা হয় 'জমিনের বসন্ত'। এটি বসন্তকালে পাওয়া যায় এবং কাঁচা ও রান্না — উভয় অবস্থায় খাওয়া হয়। আরবরা একে বলে 'বজ্রের উদ্ভিদ', কারণ বজ্র বেশি হলে তা-ও বেশি জন্মে। এর সর্বোত্তম হলো তা, যার জমিন বেলে ও অল্প পানিবিশিষ্ট। এ কথা জানিয়েছেন ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ 'আল-হাদী' গ্রন্থে। ওয়াল্লাহু আলাম। আর ইনশাআল্লাহু তাআলা, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতায়, প্রশ্নগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এর চেয়েও বেশি আলোচনা আসবে।

নববী ওষুধ: হাদীসের ভাষ্য

ওষুধ	হাদীস ও হুকুম
মধু	আয়াত: যাতে মানুষের জন্য শিফা; হাদীস: দুই শিফাকে আঁকড়ে ধরো — মধু ও কুরআন
হিজামা	ওষুধের কোনোটিতে কল্যাণ থাকলে তা হিজামায়; সতেরো, উনিশ বা একুশ তারিখ
কালোজিরা	সাম (মৃত্যু) ছাড়া প্রতিটি রোগের শিফা রয়েছে — হাদীসের ভাষ্য
কাই (আগুনে দাগানো)	জায়েয, তবে মাকরূহ; সর্বশেষ ধাপ; ছাড়া চলা গেলে করবে না
উদে হিন্দি (কুস্তে বাহরি)	উযরায় তালুতে চাপ নিষিদ্ধ; তাতে সাতটি শিফা রয়েছে
কামআহ (মরুভূমির ছত্রাক)	তার পানি চোখের জন্য শিফা

বর্ণিত হাদীসের ভাষ্যই এখানে সংক্ষেপে

প্রশ্ন ৭ – চিকিৎসা গ্রহণ কি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী?

প্রশ্ন ৭: চিকিৎসা গ্রহণ করা এবং চিকিৎসকদের কাছে যাওয়া কি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী?

উত্তর: আমি বলি:— আহলুস সুন্নাহ রহিমাহুমুল্লাহু তাআলার কাছে প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো, উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পূর্ণতারই অংশ। কেননা আহলুস সুন্নাহর কাছে তাওয়াক্কুল দুটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ তাআলার ওপর পূর্ণ নির্ভরতা, এবং বিধিসম্মত উপায়-উপকরণ গ্রহণ। কেননা আল্লাহ এই বিশ্বজগৎকে একটিকে অপরটির ওপর নির্ভরশীল করে সাজিয়েছেন। উপায়-উপকরণের গুরুত্বের প্রতি সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আমি তোমার কাছে দুটি বিষয় উল্লেখ করছি:—

প্রথম: মারইয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন সন্তান প্রসব করলেন এবং তাঁর খাবারের প্রয়োজন হলো, তখন তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলো খেজুরগাছের কাণ্ড নাড়া দিতে — অথচ তিনি একজন দুর্বল নারী, নিফাসগ্রস্ত, এবং সামনে যা আছে তা নিয়ে ভীত। এরপরও তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলো খেজুরগাছের কাণ্ড নাড়াতে — অথচ সংখ্যাধিক্যসম্পন্ন পুরুষরা একত্র হলেও তা নাড়াতে সক্ষম হতো না! কিন্তু এটিই তো উপায়-উপকরণ গ্রহণ। ফলে তিনি নাড়া দিলেন এবং তাঁর ওপর তাজা পাকা খেজুর ঝরে পড়ল। এ থেকে তুমি উপায় গ্রহণের গুরুত্ব এবং অক্ষমতা, গড়িমসি ও অলসতা বর্জনের শিক্ষা পাবে।

দ্বিতীয়: মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর কওম যখন সমুদ্রের কিনারে এসে দাঁড়ালেন, আর ফিরআউন ও তার কওম তাঁদের পেছনে:

فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون, قال كلا إن

معي ربي سيهدين, فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر

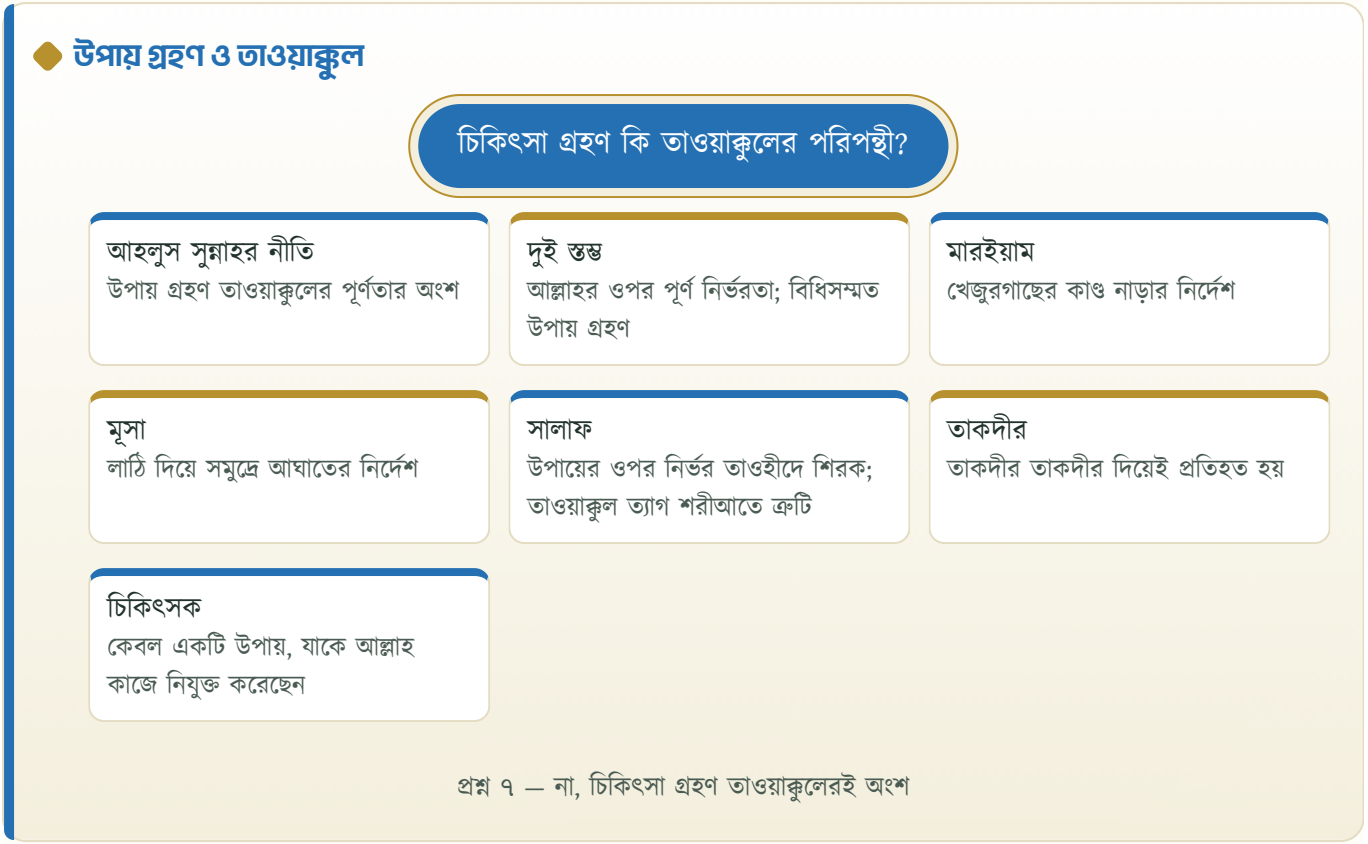
فانفلق فكان كل فرقٍ كالطود العظيم

> "অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল: 'আমরা তো ধরা পড়েই গেলাম!' তিনি বললেন: 'কখনো নয়; নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আমার রব আছেন, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।' অতঃপর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো। ফলে তা বিদীর্ণ হলো এবং প্রতিটি অংশ বিশাল পাহাড়ের মতো হয়ে গেল।" (সূরা আশ-শুআরা: ৬১-৬৩)

এই কঠিন সংকটময় মুহূর্তে মূসাকে নির্দেশ দেওয়া হলো সমুদ্রে আঘাত করতে — অথচ আল্লাহ ঐ আঘাত ছাড়াই সমুদ্র বিদীর্ণ করতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এটি উপায় গ্রহণের গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই। এ দুটি তো কেবল দুটি উদাহরণ; নতুবা উপায়-উপকরণ গ্রহণের ওপর শরঈ দলিল অত্যন্ত বেশি। আমরা উপায়-উপকরণ ও তার মূলনীতি নিয়ে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ «إتحاف أهل الألباب في العقيدة»-তে আলোচনা করেছি।

এখানে উদ্দেশ্য হলো: উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পূর্ণতারই অংশ। এ কারণেই সালাফ বলেছেন: উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভর করা তাওহীদে শিরক; তাওয়াক্কুল সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা শরীআতে ত্রুটি; আর আল্লাহ তাআলার ওপর পূর্ণ নির্ভরতার সঙ্গে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করাই শরীআতের প্রকৃত রূপ। এর ভিত্তিতে চিকিৎসা গ্রহণ করা ও চিকিৎসকদের কাছে যাওয়া উপায়-উপকরণ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত, আর তা তাওয়াক্কুলেরই অংশ — তবে অন্তরের পূর্ণ

নির্ভরতা আল্লাহ তাআলার ওপর রেখে, এবং এই বিশ্বাস রেখে যে, এই চিকিৎসক কেবল একটি উপায়, যাকে আল্লাহ তাআলা কাজে নিযুক্ত করেছেন।



সুতরাং রোগের চিকিৎসা, রিযিক অন্বেষণ ইত্যাদি উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা তাকদীরের পরিপন্থী নয়; কেননা আল্লাহ সুবহানাহু তাকদীর নির্ধারণ করেছেন এবং উপায়-উপকরণেরও নির্দেশ দিয়েছেন, আর প্রত্যেককে সহজ করে দেওয়া হয়েছে সেই কাজের জন্য যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণেই মুবাহ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করাও আল্লাহ তাআলার তাকদীরেরই অংশ; আর তাকদীর তাকদীর দিয়েই প্রতিহত করা হয়। কেননা ক্ষুধার তাকদীর প্রতিহত করা হয় খাওয়ার তাকদীর দিয়ে; পিপাসার তাকদীর প্রতিহত করা হয় পান করার তাকদীর দিয়ে; যুদ্ধের তাকদীর প্রতিহত করা হয় তার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে; দারিদ্র্য ও অভাবের তাকদীর প্রতিহত করা হয় হালাল রিযিক অন্বেষণে চেষ্টার তাকদীর দিয়ে; বেকারত্বের তাকদীর প্রতিহত করা হয় কাজ খোঁজার তাকদীর দিয়ে। এর অন্তর্ভুক্ত রোগের তাকদীরও — তা প্রতিহত করা হয় চিকিৎসা গ্রহণ ও শিফা কামনার তাকদীর দিয়ে। আর তা তেমনই, যেমন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্লেগের বছরে বলেছিলেন: «نفر من قدر الله إلى قدر الله» — "আমরা আল্লাহর এক তাকদীর থেকে আল্লাহর আরেক তাকদীরের দিকেই পালাচ্ছি।" ওয়াল্লাহু আলাম।

প্রশ্ন ৮ – চিকিৎসকদের শ্রেণিবিভাগ, দক্ষ চিকিৎসকের পরিচয় ও ক্ষতিসাধনের বিধান

প্রশ্ন ৮: চিকিৎসকদের শ্রেণি কয়টি? দক্ষ চিকিৎসককে কীভাবে চেনা যাবে? আর চিকিৎসকের পক্ষ থেকে যদি কোনো ক্ষতি ঘটে যায়, তবে তার বিধান কী?

উত্তর: আমি বলি:— চিকিৎসকগণ কয়েক শ্রেণির:

যে ব্যক্তি এই পেশা সম্পর্কে অজ্ঞ, অথচ চিকিৎসা করে বেড়ায় এবং চিকিৎসকের বেশে আত্মপ্রকাশ করে, অথচ চিকিৎসাশাস্ত্রের সামান্য ছাড়া কিছুই জানে না, কিংবা কিছুই জানে না — এদের মধ্যে রয়েছে বহু লোকজ (হাতুড়ে) চিকিৎসক; কেননা তাদের অনেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের এতটুকু জানে না যা তাকে ওষুধ নির্ধারণের যোগ্য করে। এদের

মধ্যে এমনও আছে যাকে একটি নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞতার জন্য আনা হয়েছে এবং সে কেবল সেটুকুই ভালো জানে, অথচ তাকে অন্য এমন বিশেষজ্ঞতায় কাজে লাগানো হয় যে বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই — আর এমনটি বহু ঘটে কিছু প্রত্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, যেগুলোর প্রতি মনোযোগ কম দেওয়া হয়। এদের মধ্যে সেসব লোকও আছে, যারা ব্যাপকভাবে রুকইয়াহ চর্চা করে অথচ এর বিষয়ে সামান্য ছাড়া কিছুই জানে না। এ হলো এক শ্রেণি।

আর দ্বিতীয় শ্রেণি: এমন চিকিৎসক যে এখনো শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে আছে এবং এখনো এই পেশায় পারদর্শী হয়নি, বরং এখনো পথের শুরুতেই রয়েছে — এরা সেসব ছাত্র যারা এখনো তলবের স্তরেই আছে।

আর তৃতীয় শ্রেণি: পারদর্শী, দক্ষ ও জ্ঞানী চিকিৎসকগণ, যাঁরা নিজ নিজ বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহু তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, দক্ষ চিকিৎসক তিনিই, যিনি তাঁর চিকিৎসায় বিশটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখেন:—

প্রথমটি: রোগের প্রকৃতির দিকে দেখা — এটি কোন ধরনের রোগ?

দ্বিতীয়: তার কারণের দিকে দেখা — কোন জিনিস থেকে তা সৃষ্টি হলো, এবং রোগ সৃষ্টির কারণ হওয়া 'ইল্লাতে ফাইলা' (ক্রিয়াশীল কারণ) কী?

তৃতীয়: রোগীর শক্তি — তা রোগের মোকাবিলায় সক্ষম কি না? যদি তা রোগের মোকাবিলায় সক্ষম ও তার ওপর প্রবল হয়, তবে তিনি তাকে ও রোগকে ছেড়ে দেবেন এবং ওষুধ দিয়ে স্থির কিছু নাড়াবেন না।

চতুর্থ: দেহের স্বাভাবিক মেজাজ (প্রকৃতি) কী?

পঞ্চম: স্বাভাবিক ধারার বাইরে নতুন করে সৃষ্ট মেজাজ।

ষষ্ঠ: রোগীর বয়স।

সপ্তম: তার অভ্যাস।

অষ্টম: বর্তমান সময় — বছরের কোন ঋতু এবং তার সঙ্গে কী মানানসই।

নবম: রোগীর দেশ ও তার মাটি।

দশম: রোগের সময়ে বাতাসের অবস্থা।

একাদশ: সেই ব্যাধির বিপরীতধর্মী ওষুধের দিকে দেখা।

দ্বাদশ: ওষুধের শক্তি ও তার মাত্রার দিকে দেখা এবং তার সঙ্গে রোগীর শক্তির ভারসাম্য বিবেচনা করা।

ত্রয়োদশ: তাঁর উদ্দেশ্য যেন কেবল ঐ ব্যাধি দূর করা না হয়; বরং তা এমনভাবে দূর করা যাতে তার চেয়ে কঠিনতর কিছু সৃষ্টি হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

চতুর্দশ: সহজতর দিয়ে, তারপর তার চেয়ে সহজতর দিয়ে চিকিৎসা করা। কেননা চিকিৎসকের দক্ষতার অংশ হলো ওষুধের বদলে খাদ্য দিয়ে চিকিৎসা করা এবং যৌগিক ওষুধের বদলে সরল ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা।

পঞ্চদশ: ব্যাধির দিকে দেখা — এটি কি চিকিৎসাযোগ্য, না নয়? যদি তার চিকিৎসা সম্ভব না হয়, তবে তিনি নিজের পেশা ও মর্যাদা রক্ষা করবেন এবং স্বভাব যেন তাঁকে এমন চিকিৎসায় প্ররোচিত না করে যা কোনো উপকার করে না। আর যদি তার চিকিৎসা সম্ভব হয়, তবে দেখবেন তা দূর করা সম্ভব কি না? যদি জানেন যে তা দূর করা সম্ভব নয়, তবে দেখবেন তা লাঘব করা ও কমানো সম্ভব কি না? আর যদি তা কমানোও সম্ভব না হয় এবং তিনি দেখেন যে তাঁর সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো তাকে থামিয়ে দেওয়া ও তার বৃদ্ধি রোধ করা, তবে চিকিৎসা দিয়ে সেটিই উদ্দেশ্য করবেন — ফলে শক্তিকে সাহায্য করবেন এবং রোগ-উপাদানকে দুর্বল করবেন।

ষোড়শ: 'খিলত' (দোষ/হিউমার) পরিপক্ক (নুযজ) হওয়ার আগে 'ইস্তিফরাগ' (নিষ্কাশন) দিয়ে তাতে হাত না দেওয়া; বরং তাকে পরিপক্ক করাই উদ্দেশ্য করবেন, আর পরিপক্কতা পূর্ণ হলে দ্রুত তা নিষ্কাশন করবেন।

সপ্তদশ: তাঁর যেন অন্তর ও রূহের ব্যাধি এবং সেগুলোর ওষুধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকে; আর এটি দেহের চিকিৎসায় একটি মহান মূলনীতি।

অষ্টাদশ: রোগীর সঙ্গে কোমল ও নম্র আচরণ করা — যেমন শিশুর সঙ্গে কোমলতা করা হয়।

ঊনবিংশ: প্রাকৃতিক ও ইলাহি — উভয় প্রকার চিকিৎসা এবং কল্পনাশক্তি দিয়ে চিকিৎসা প্রয়োগ করা। কেননা দক্ষ চিকিৎসকদের কল্পনাশক্তির ব্যবহারে এমন বিস্ময়কর বিষয় রয়েছে যেখানে ওষুধ পৌঁছাতে পারে না। সুতরাং দক্ষ চিকিৎসক প্রতিটি সহায়ক জিনিস দিয়েই রোগের মোকাবিলায় সাহায্য নেন।

বিংশ: — এবং এটিই চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল বিষয় — তাঁর চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনাকে ছয়টি স্তম্ভের ওপর ঘূর্ণায়মান রাখা: বিদ্যমান সুস্থতা রক্ষা করা; সাধ্যানুযায়ী হারানো সুস্থতা ফিরিয়ে আনা; দুই ক্ষতির মধ্যে বড়টি দূর করার জন্য ছোটটি সহ্য করা; এবং দুই কল্যাণের মধ্যে বড়টি অর্জনের জন্য ছোটটি হাতছাড়া করা। সুতরাং চিকিৎসার আবর্তন এই ছয়টি মূলনীতির ওপরই; আর যে চিকিৎসকের কাছে এগুলো সেই খুঁটি নয় যার দিকে সে ফিরে আসে, সে চিকিৎসকই নয়। — উদ্ধৃতি শেষ; এই ছিল তাঁর কথা, রহিমাহুল্লাহু তাআলা।

দক্ষ চিকিৎসকের বিশটি লক্ষ্য

- [ ] ১. রোগের প্রকৃতি
- [ ] ২. রোগের কারণ
- [ ] ৩. রোগীর শক্তি রোগ মোকাবিলায় সক্ষম কি না
- [ ] ৪. দেহের স্বাভাবিক মেজাজ
- [ ] ৫. নতুন করে সৃষ্ট মেজাজ
- [ ] ৬. রোগীর বয়স
- [ ] ৭. রোগীর অভ্যাস
- [ ] ৮. বর্তমান সময় ও ঋতু
- [ ] ৯. রোগীর দেশ ও মাটি
- [ ] ১০. রোগের সময়ে বাতাসের অবস্থা
- [ ] ১১. রোগের বিপরীতধর্মী ওষুধ
- [ ] ১২. ওষুধের শক্তি ও মাত্রার সঙ্গে রোগীর শক্তির ভারসাম্য
- [ ] ১৩. ব্যাধির চেয়ে কঠিন কিছু সৃষ্টি হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা
- [ ] ১৪. সহজতর দিয়ে চিকিৎসা; ওষুধের বদলে খাদ্য
- [ ] ১৫. ব্যাধি চিকিৎসাযোগ্য কি না; দূর, লাঘব বা থামানো
- [ ] ১৬. খিলত পরিপক্ক হওয়ার আগে নিষ্কাশন না করা
- [ ] ১৭. অন্তর ও রূহের ব্যাধি এবং তার ওষুধে অভিজ্ঞতা
- [ ] ১৮. রোগীর সঙ্গে কোমল ও নম্র আচরণ
- [ ] ১৯. প্রাকৃতিক ও ইলাহি চিকিৎসা এবং কল্পনাশক্তি
- [ ] ২০. ছয় স্তম্ভ: সুস্থতা রক্ষা, হারানো সুস্থতা ফেরানো, ছোট ক্ষতি সহ্য করে বড় ক্ষতি দূর, ছোট কল্যাণ ছেড়ে বড় কল্যাণ অর্জন

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী

আর প্রশ্নের তৃতীয় অংশের ব্যাপারে, তার উত্তরে তাফসীল (বিস্তারিত বিভাজন) রয়েছে:—

চিকিৎসকের পক্ষ থেকে যদি কোনো ক্ষতি ঘটে যায়, তবে তা দুই অবস্থার বাইরে নয়:

প্রথমত, দক্ষ চিকিৎসক — যিনি পেশার হক আদায় করেছেন এবং যাঁর হাত বাড়াবাড়ি বা অবহেলা করে কোনো অপরাধ করেনি — তাঁর সেই কাজ থেকে, যা শারিআর দিক থেকেও অনুমোদিত এবং যাকে চিকিৎসা করা হচ্ছে তার দিক থেকেও অনুমোদিত, যদি অঙ্গহানি, প্রাণহানি বা কোনো গুণ (ইন্দ্রিয়শক্তি) বিলুপ্ত হয় — তবে এতে আহলুল ইলমের ঐকমত্যে কোনো 'যমান' (ক্ষতিপূরণের দায়) নেই।

আর তা এ কারণে যে, এই 'সিরায়াহ' (পরিণামগত ক্ষতি) একটি অনুমোদিত কাজের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে; আর কাওয়াইদে (ফিকহি মূলনীতিতে) প্রতিষ্ঠিত যে, ওয়াজিব কাজের সিরায়াহ সর্বসম্মতিক্রমে অগ্রাহ্য। এটি তেমনই, যেমন কোনো শিশুর খতনা করা হলো এমন সময়ে যখন তার বয়স খতনার উপযোগী, এবং পেশার হকও আদায় করা হলো, অতঃপর অঙ্গ বা শিশুটি নষ্ট হয়ে গেল — এতে কোনো যমান নেই। তেমনি কোনো বুদ্ধিমান বা অন্য কারও এমন কিছু চিরে দেওয়া হলো যা তার সময়ে যথাযথ পন্থায় চিরে দেওয়াই উচিত ছিল, অতঃপর তাতে ক্ষতি হলো — তাতেও যমান নেই।

এভাবে অনুমোদিত কাজ থেকে জন্ম নেওয়া প্রতিটি সিরায়াহতেই যমান নেই, যতক্ষণ না সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা ঘটে — যেমন সর্বসম্মতিক্রমে হদ্দের সিরায়াহ; জমহুরের মতে কিসাসের সিরায়াহ, হানাফীদের মতভেদ সত্ত্বেও; তাযীরের সিরায়াহ; স্ত্রীকে স্বামীর প্রহারের সিরায়াহ, শিক্ষক কর্তৃক শিশুকে প্রহারের সিরায়াহ, এবং ভাড়াটে কর্তৃক পশুকে প্রহারের সিরায়াহ — হানাফী ও শাফিয়ীদের মতভেদ সত্ত্বেও; এবং অনুমোদিত অস্ত্রোপচার চলাকালে চিকিৎসকের পক্ষ থেকে ঘটে যাওয়া সিরায়াহ, ইত্যাদি। এসবের কোনোটিতেই যমান নেই — তবে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে, আর তা হলো: চিকিৎসক তাঁর পেশায় দক্ষ হবেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোনো সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা ঘটবে না।

আর মানুষের সামনে এ ছাড়া কোনো পথ নেই; কেননা আমরা যদি এ কথা না বলতাম, তবে চিকিৎসার উপকারিতাই অচল হয়ে যেত — কারণ প্রত্যেক চিকিৎসকই যমানের ভয়ে যেকোনো চিকিৎসা-কর্ম করা থেকে বিরত থাকত, এবং ক্ষতি ঘটার কারণে পরিণামের ভয়ে যোগ্য ব্যক্তি চিকিৎসা-চর্চা থেকে দূরে থাকায় চিকিৎসার দায়িত্ব এমন লোকেরা নিয়ে নিত যারা তার যোগ্য নয়।

এর আরেকটি উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তি, যে 'কাই' (দাগানো) চর্চা করে এবং তাতে পারদর্শী, অথচ তার পক্ষ থেকে ক্ষতি ঘটে গেল — সে যমানদার হবে না, কেননা সে সৎকর্মশীল, আর সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনো পথ নেই। তবে উল্লিখিত দুই শর্তসাপেক্ষে: সে কাই দিয়ে চিকিৎসায় দক্ষ হবে, এবং তার পক্ষ থেকে কোনো বাড়াবাড়ি বা অবহেলা ঘটবে না। এ হলো দক্ষ, পেশায় পারদর্শী চিকিৎসকের পক্ষ থেকে ঘটে যাওয়া ক্ষতির বিধান।

আর যে ব্যক্তি চিকিৎসা-চর্চা করল অথচ সে তাতে অজ্ঞ, সে নিরঙ্কুশভাবে সংঘটিত ক্ষতির জন্য যমানদার — অর্থাৎ সে অবহেলা করুক বা না করুক। কেননা এই চর্চার দ্বারা সে যালিম; আর কাওয়াইদে প্রতিষ্ঠিত যে, যালিম নিরঙ্কুশভাবে যমানদার হয় — সুতরাং এই অজ্ঞ ব্যক্তি যালিম। আর প্রথমজন তো আমীন (বিশ্বস্ত); আর কাওয়াইদে প্রতিষ্ঠিত যে, আমীন সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা ছাড়া ক্ষতির জন্য যমানদার হয় না। সুতরাং এই দুটি নীতি মুখস্থ রাখো, কেননা এ অধ্যায়ে এ দুটি অত্যন্ত উপকারী:—

প্রথম নীতি: অপরাধের সিরায়াহ সর্বসম্মতিক্রমে যমানযোগ্য, আর ওয়াজিব কাজের সিরায়াহ সর্বসম্মতিক্রমে অগ্রাহ্য। সুতরাং পেশায় দক্ষ চিকিৎসকের সিরায়াহ ওয়াজিব কাজের সিরায়াহ, তাই তা অগ্রাহ্য; আর অজ্ঞ চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর সিরায়াহ অপরাধের সিরায়াহ, তাই তা যমানযোগ্য। আর এসবই সর্বসম্মতিক্রমে।

দ্বিতীয় নীতি: আমীন সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা ছাড়া ক্ষতির জন্য যমানদার হয় না, আর যালিম নিরঙ্কুশভাবে যমানদার হয়। পেশায় দক্ষ চিকিৎসক আমীন, সুতরাং যা নষ্ট হলো তাতে তাঁর ওপর যমান নেই — যদি না তিনি সীমালঙ্ঘন করেন বা অবহেলা করেন। আর অজ্ঞ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী যালিম, সুতরাং সে নিরঙ্কুশভাবে যমানদার। আর তাকে যমানদার সাব্যস্ত করা — অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে অজ্ঞ ব্যক্তিকে সে যা নষ্ট করেছে তার জন্য যমানদার সাব্যস্ত করা — আলিমগণের মধ্যে সর্বসম্মত। তবে তাকে যমানদার করা হবে দিয়াতের মাধ্যমে, কেননা সে রোগীর অনুমতি ছাড়া চিকিৎসায় হাত দেয় না। তবে রোগী যদি জানে যে, এই চিকিৎসা-ব্যবসায়ী অজ্ঞ এবং চিকিৎসার বিষয়ে তার কোনো

জ্ঞান নেই, এরপরও সে নিজেকে তার হাতে চিকিৎসার জন্য সঁপে দেয়, আর রোগী প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হয় — তবে এ অবস্থায় চিকিৎসকের ওপর কোনো যমান নেই।

এ বিষয়ে দলিলের মূল ভিত্তি হলো আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ কর্তৃক আমর ইবনু শুআইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত হাদীসটি; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من تطبب ولم يُعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن

> "যে ব্যক্তি চিকিৎসা করল অথচ এর পূর্বে তার সম্পর্কে চিকিৎসাজ্ঞান জানা ছিল না, সে যমানদার।" — হাদীসটি হাসান

আর আবু দাউদ তাঁর সুনানে বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনুল আলা, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন হাফস, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল আযীয ইবনু উমর ইবনু আবদিল আযীয, তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন সেই প্রতিনিধি দলের কয়েকজন যাঁরা আমার পিতার কাছে এসেছিলেন; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أيما طبيب تطبب على قومٍ لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن

> "যে চিকিৎসকই কোনো সম্প্রদায়ের ওপর চিকিৎসা করল, অথচ এর পূর্বে তার কোনো চিকিৎসা-অভিজ্ঞতা জানা ছিল না, আর সে ক্ষতি করে ফেলল — সে যমানদার।" — হাদীসটি হাসান

সুতরাং এই দুটি হাদীসের মানতূক (স্পষ্ট বক্তব্য) ও মাফহূম (বিপরীত ইঙ্গিত) উভয়ই রয়েছে। মানতূক জানাচ্ছে যে, অজ্ঞ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী যমানদার — আর ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এটি আহলুল ইলমের ঐকমত্যে। আর এর মাফহূম জানাচ্ছে যে, যে চিকিৎসক তার চিকিৎসায় দক্ষ বলে পরিচিত, তিনি যমানদার নন। আর আমরা আগেই বলেছি যে, যমান না থাকা কেবল সেখানেই যেখানে তাঁর পক্ষ থেকে কোনো সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা ঘটেনি। সুতরাং শ্রেণি দাঁড়াল তিনটি:—

প্রথম: যে চিকিৎসা-চর্চা করল অথচ সে অজ্ঞ — সে সর্বসম্মতিক্রমে যমানদার।

দ্বিতীয়: যে চিকিৎসা-চর্চা করল এবং সে দক্ষ, আর সে অবহেলাও করেনি — সে সর্বসম্মতিক্রমে যমানদার নয়।

তৃতীয়: যে চিকিৎসা-চর্চা করল এবং পেশার হকও আদায় করল, কিন্তু সীমালঙ্ঘন, অবহেলা বা এমন গাফলতির কারণে ভুল করল যা ক্ষতি ডেকে আনল — যেমন ওষুধ নির্ধারণে ভুল, কিংবা তা ব্যবহারের পদ্ধতিতে ভুল; অথবা তার হাত কোনো সুস্থ অঙ্গের ওপর অপরাধ করে বসল ও তা নষ্ট করে দিল; অথবা রোগীকে প্রাপ্য মাত্রার চেয়ে বেশি অবেদন-ওষুধ (বেহুঁশকারী) দিয়ে দিল; অথবা রোগের প্রকৃত পরিচয় জানার আগেই ওষুধ নির্ধারণ করল, অর্থাৎ কোনো পরীক্ষা-

নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ছাড়াই; অথবা নষ্ট দাঁত মনে করে একটি সুস্থ দাঁত তুলে ফেলার সীমালঙ্ঘন করল — এবং এ জাতীয় বিষয়। এই অপরাধ শরীআতে 'ভুলজনিত অপরাধ' (জিনায়াতুল খাতা), যা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়; বরং তা যমানযোগ্য। অতঃপর তা যদি দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশের কম হয়, তবে তা চিকিৎসকের নিজের সম্পদ থেকে; অন্যথায় তা তাঁর 'আকিলা'র (দিয়াত বহনকারী স্বজনদের) ওপর।

চিকিৎসকের ক্ষতি: যমানের তিন শ্রেণি

চিকিৎসক	যমান (ক্ষতিপূরণের দায়)
চিকিৎসা-চর্চা করল অথচ অজ্ঞ	সর্বসম্মতিক্রমে যমানদার
দক্ষ, সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা করেননি	সর্বসম্মতিক্রমে যমানদার নন
পেশার হক আদায় করেও সীমালঙ্ঘন, অবহেলা বা গাফলতিতে ভুল	ভুলজনিত অপরাধ; যমানযোগ্য
দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশের কম হলে	চিকিৎসকের নিজের সম্পদ থেকে
অন্যথায়	আকিলার (দিয়াত বহনকারী স্বজনদের) ওপর

রোগী প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হয়ে জেনেশুনে অজ্ঞের হাতে নিজেকে সঁপে দিলে চিকিৎসকের ওপর যমান নেই

এ হলো চিকিৎসকদের কারণে সংঘটিত ক্ষতিসংক্রান্ত বিধানসমূহ। আর ফায়দা পূর্ণ করার জন্য আমাদের কাছে আরও দুটি মাসআলা বাকি রয়েছে:

প্রথম মাসআলা: সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা নির্ণয়ের ভার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ওপর। সুতরাং এমন কিছু ঘটলে অবশ্যই চিকিৎসা ও শরীআত — উভয় ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে; তাঁরা ঘটনার বিস্তারিত অনুসন্ধান করবেন, ক্ষতির কারণ, চিকিৎসক কী করেছেন এবং তিনি কী চিকিৎসা দিয়েছেন — এসব খতিয়ে দেখবেন। আর কমিটির প্রতিবেদনটি বিচারকের কাছে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে, ফলে আদালতের রায় এই প্রতিবেদন থেকেই উৎসারিত হবে।

ক্ষতির বিবাদে দুই মাসআলা

প্রথম মাসআলা	দ্বিতীয় মাসআলা
সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা নির্ণয়ের ভার অভিজ্ঞদের ওপর	চিকিৎসক বলেন অবহেলা করেননি, অভিভাবক বলেন করেছেন
চিকিৎসা ও শরীআত উভয় ক্ষেত্রের অভিজ্ঞদের কমিটি গঠন	কসমসহ চিকিৎসকের কথাই গ্রহণযোগ্য
কমিটির প্রতিবেদন বিচারকের কাছে নির্ভরযোগ্য	চিকিৎসকের দিক দুর্বল মনে হলে বিচারক কমিটি গঠনের নির্দেশ দিতে পারেন

দ্বিতীয় মাসআলা: যদি চিকিৎসকের পক্ষ থেকে ক্ষতি ঘটে, অতঃপর তিনি দাবি করেন যে তিনি অবহেলা করেননি, আর অভিভাবক দাবি করেন যে চিকিৎসক অবহেলা করেছেন — তবে শরঈ মূলনীতি হলো, কসমসহ চিকিৎসকের কথাই গ্রহণযোগ্য; কেননা মূলনীতিতে প্রতিষ্ঠিত যে, মতভেদের সময় কসমসহ আমীনের কথাই গ্রহণযোগ্য। তবে বিচারক যদি দেখেন যে চিকিৎসকের দিকটি দুর্বল এবং রায় দেওয়ার আগে তিনি আরও নিশ্চিত হতে চান, তবে তাঁর জন্য উল্লিখিত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়ার অধিকার রয়েছে। ওয়াল্লাহু আলাম।

প্রশ্ন ৯ – রোগীকে যেসব নসীহত করা হয়

প্রশ্ন ৯: রোগীকে যেসব ওসিয়ত (নসীহত) করা হয় সেগুলো কী কী, দলিলসহ তার বর্ণনা?

উত্তর: আমি বলি:— কিছু উপকারী ও ব্যাপক নসীহত রয়েছে, যা রোগীর সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:—

প্রথম: ধৈর্যের নসীহত। কেননা যে বালা নাযিল হয়েছে তার ওপর ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব; আর ধৈর্য হলো অসন্তোষ ও অভিযোগ থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখা এবং শরীআতে যা বৈধ নয় তা থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিরত রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

واصبروا إن الله مع الصابرين

> "আর তোমরা ধৈর্য ধরো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" (সূরা আল-আনফাল: ৪৬)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

> "নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে বেহিসাব।" (সূরা আয-যুমার: ১০)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

وبشر الصابرين الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون

> "আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন — যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে: 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।'" (সূরা আল-বাকারা: ১৫৫-১৫৬)

আর জেনে রাখো, অসন্তোষ ও অভিযোগ ওয়াজিব ঈমানের পূর্ণতার পরিপন্থী। সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, নবী ﷺ বলেছেন:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ))

"সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে গালে চপেটাঘাত করে, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলিয়্যাতের ডাক দেয়।"

আর সহীহ গ্রন্থেই তাঁর ﷺ থেকে আরও এসেছে যে, তিনি 'সালিতা', 'হালিকা' ও 'শাক্কা' থেকে সম্পর্কমুক্ত ঘোষণা করেছেন — অর্থাৎ যে নারী উচ্চস্বরে বিলাপ করে, যে মাথা মুড়িয়ে ফেলে এবং যে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।

সুতরাং রোগীর ওপর ওয়াজিব হলো ধৈর্য ধারণ করা, এবং সে যেন যত্নবান হয় যে সেই ধৈর্য যেন হয় 'সাবরে জামীল' (সুন্দর ধৈর্য) — আর তা হলো এমন ধৈর্য, যার অধিকারী নিজের দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ একমাত্র তার রব জাল্লা ওয়া আলার কাছেই করে, নির্জনতার মুহূর্তে।

রোগীর প্রতি প্রথম নসীহত: ধৈর্য

করুন

- ✓ অসন্তোষ ও অভিযোগ থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখা
- ✓ শরীআতে অবৈধ কাজ থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিরত রাখা
- ✓ সাবরে জামীল — দুঃখের অভিযোগ কেবল রবের কাছে, নির্জনে

করবেন না

- ✗ গালে চপেটাঘাত, জামার বুক ছেঁড়া, জাহিলিয়্যাতের ডাক
- ✗ উচ্চস্বরে বিলাপ, মাথা মুড়ানো, কাপড় ছেঁড়া

হাদীস: যে এসব করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়

আমি আমাদের শাইখ আবদুর রহমান আল-জাসির রহিমাহুল্লাহর অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়েছি। তাঁর ওপর অত্যন্ত কঠিন এক দুরারোগ্য ব্যাধি নেমে এসেছিল, আর আমি সর্বদা তাঁর কাছে কিছু কিতাব পাঠ করার জন্য যেতাম। তিনি সর্বদা বলতেন: "আমার সান্ত্বনা তো কেবল ইলমেই।" কখনো কখনো বলতেন: "পড়াশোনা ও ইলম শোনার সময় ছাড়া আমি রোগের কথা ভুলি না।" কখনো কখনো আমি উদ্দেশ্য করতাম যে তাঁকে একটু হালকা করব এবং তিনি টের না পেয়েই ধৈর্যের কথা বলব — কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই হয়ে যেতাম নসীহতপ্রাপ্ত, আমিই হয়ে যেতাম সান্ত্বনাপ্রাপ্ত; কারণ তাঁর কাছ থেকে আমি শুনতাম আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তাঁর অজস্র শোকরের বাণী। আর তিনি সর্বদা আমাকে ধৈর্যের এবং তাকদীরের প্রতি ঈমানের নসীহত করতেন, এবং বলতেন যে নবীগণ ও সৎকর্মশীলগণের ওপর এর চেয়েও বড় বিপদ এসেছিল, কিন্তু তা তাঁদের দৃঢ়তা, ধৈর্য, ইয়াকীন এবং তাঁদের রব জাল্লা ওয়া আলার প্রতি সন্তুষ্টিই কেবল বাড়িয়ে দিয়েছিল।

একদিন আমি তাঁকে বললাম: "হে আমাদের শাইখ, আপনি যা অনুভব করছেন তা কি আপনি যাদের ভালোবাসেন তাদের কাছে বলেন না? হয়তো তা আপনাকে কিছুটা হালকা করত।" তখন তিনি তিরস্কারের দৃষ্টিতে আমার দিকে

ফিরে বললেন: "তুমি কি চাও যে আমি আল্লাহর নামে তাঁর সৃষ্টির কাছে অভিযোগ করি? আমি কার নামে কার কাছে অভিযোগ করব?" ফলে আমি এই ভুলের জন্য নিজেকে বহু তিরস্কার করেছি।

আরেক দিন আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম, তখন তিনি রোগের প্রবলতায় শুয়ে ছিলেন। আমি বললাম: "আজ যদি আমরা না পড়তাম!" তিনি বললেন: "এটি তো দরসের সময়, আমি তা হাতছাড়া করতে চাই না; কেননা ইলম শোনায় আমি প্রশান্তি পাই।" তখন আমি পড়া শুরু করলাম, আর শাইখ মাঝে মাঝে টীকা দিচ্ছিলেন; আর টীকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধীরে ধীরে উঠে বসছিলেন। আমি পড়া শেষ করতেই দেখি শাইখ বসে পড়েছেন — যেন তিনি দরসের হালকায় বসে আছেন! রোগের কথা ভুলে গিয়ে ইলম দান ও দিকনির্দেশনায় মগ্ন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর ব্যাপক রহমত বর্ষণ করুন, তাঁকে প্রচুর প্রতিদান ও পুরস্কার দিন, ফিরদাউসে আলায় তাঁর অবস্থান উঁচু করুন, উম্মতের জন্য কোনো আলিমকে যে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হয় তা তাঁকে দিন, এবং সর্বশক্তিমান বাদশাহর সন্নিধানে সত্যের আসনে জান্নাত ও নহরসমূহে আমাদের তাঁর সঙ্গে একত্র করুন।

আর উদ্দেশ্য হলো: বিপদ নেমে আসার সময় ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব।

এক নজরে

- ★ হারাম দিয়ে চিকিৎসা নিষিদ্ধ; হারামে শিফা নেই
- ★ প্রবাহিত দব্ব-এর রক্ত পান করে চিকিৎসা হারাম; কর্তা গুনাহগার
- ★ কুরআন দিয়ে চিকিৎসা সবচেয়ে মহান; শর্ত: কুরআন বা সহীহ দুআ, আরবি, শিফাদাতা একমাত্র আল্লাহ
- ★ কাই জায়েয, তবে মাকরূহ; ছাড়া চলা গেলে ব্যবহার নয়
- ★ উপায় গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার অংশ
- ★ অজ্ঞ চিকিৎসক সর্বসম্মতিক্রমে যমানদার; দক্ষ ও অবহেলাহীন নন
- ★ রোগীর প্রতি প্রথম নসীহত: ধৈর্য ধারণ ওয়াজিব

যাচাই করুন

1. প্রবাহিত দব্ব-এর রক্ত দিয়ে চিকিৎসা সম্পর্কে ফতোয়ার সারকথা কী?

ক. জায়েয | খ. মাকরূহ | গ. হারাম, কর্তা গুনাহগার

2. নববী ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মহান ও নিরঙ্কুশভাবে সর্বোত্তম কোনটি?

ক. মধু | খ. কুরআন দিয়ে চিকিৎসা, অর্থাৎ রুকইয়াহ শরইয়্যাহ | গ. হিজামা

3. কাই (আগুনে দাগানো)-এর হুকুম কী বলা হয়েছে?

ক. হারাম | খ. ওয়াজিব | গ. জায়েয, তবে মাকরূহ

4. আহলুস সুন্নাহর নীতিতে উপায় গ্রহণ ও তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক কী?

ক. পরস্পরবিরোধী | খ. উপায় গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার অংশ | গ. তাওয়াক্কুল থাকলে উপায় অপ্রয়োজনীয়

5. চিকিৎসা-চর্চাকারী অজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষতি করলে কী হবে?

ক. সর্বসম্মতিক্রমে যমানদার | খ. যমানদার নন | গ. কেবল ইচ্ছাকৃত হলে যমানদার

6. চিকিৎসক অবহেলা করেননি বলে দাবি করলে এবং অভিভাবক করেছেন বললে মূলনীতি কী?

ক. অভিভাবকের কথা গ্রহণযোগ্য | খ. কসমসহ চিকিৎসকের কথা গ্রহণযোগ্য | গ. উভয়ের কথাই বাতিল

উত্তর: ১–গ, ২–খ, ৩–গ, ৪–খ, ৫–ক, ৬–খ

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

রোগী ও চিকিৎসকের প্রতি নসীহত, এবং গর্ভপাতের বিধান

রোগীর প্রতি নসীহতসমূহ – প্রশ্ন ৯-এর উত্তরের ধারাবাহিকতা

দ্বিতীয়:— আজরের প্রত্যাশা করা। কেননা এই রোগের প্রকৃত স্বরূপ হলো, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি নিআমত — যদি এর ভুক্তভোগীকে ধৈর্যের তাওফীক দেওয়া হয়; কারণ এটি তার গুনাহ ও পাপরাশির কাফফারা। সুতরাং বান্দা অসুস্থ হলে তার কর্তব্য আজরের নিয়ত করা এবং সেই রোগটিকে নিজের নেকির পাল্লায় জমা রাখা। কেননা নবী ﷺ বলেছেন:

إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه

الله في جسده أو في ماله أو في ولده

«বান্দার জন্য যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন মর্যাদা পূর্বনির্ধারিত থাকে যা সে নিজের আমল দিয়ে পৌঁছাতে পারেনি, তবে আল্লাহ তাকে তার শরীরে, কিংবা তার সম্পদে, কিংবা তার সন্তানে পরীক্ষায় ফেলেন।» — হাদীসটি সহীহ

আর নবী ﷺ বলেছেন:

ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى

الشوكة يشاكها

«মুসলমানের ওপর এমন কোনো মুসীবত আসে না, যার দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করেন না — এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও।» — মুত্তাফাকুন আলাইহি

বুখারী ও মুসলিমে তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন:

ما يصيب المسلم من نصبٍ ولا وصبٍ ولاهمٍّ ولا حزن ولا

أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله من خطاياه

«মুসলমানের ওপর যে ক্লান্তি, যে ব্যাধি, যে দুশ্চিন্তা, যে দুঃখ, যে কষ্ট ও যে বিষণ্নতা আসে — এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও — তার দ্বারা আল্লাহ তার ভুলত্রুটিগুলো মোচন করে দেন।»

তাঁদের উভয়ের কিতাবেই আরও আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন:

ما من مسلم تصيبه مصيبة، مرض فيما سواه إلا حط الله له

سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا))

«কোনো মুসলমানের ওপর মুসীবত আসে — রোগ হোক বা তা ছাড়া অন্য কিছু — আল্লাহ তার দ্বারা তার পাপগুলো ঝরিয়ে দেন, যেমন গাছ তার পাতা ঝরায়।»

বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من يرد الله به خيراً يصب منه

«আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন।»

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:— যখন এ আয়াত নাযিল হলো —

من يعمل سوءاً يجز به

«যে মন্দ কাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে।» — সূরা আন-নিসা: ১২৩

— তখন তা মুসলমানদের ওপর অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

قاربوا و سددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة

يُنْكَبُهَا أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا((

«তোমরা কাছাকাছি থাকো ও সঠিক পথে চলো; কেননা মুসলমানের ওপর আসা প্রতিটি বিপদেই কাফফারা রয়েছে — এমনকি সে যে হোঁচট খায়, কিংবা যে কাঁটা তার পায়ে ফোটে, তাতেও।»

সহীহ মুসলিমে আরও আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুস সাইব — অথবা উম্মুল মুসাইয়িব — এর কাছে গেলেন এবং বললেন:

مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفرين؟

«হে উম্মুস সাইব — অথবা হে উম্মুল মুসাইয়িব — তোমার কী হয়েছে যে তুমি হাঁপাচ্ছ?»

তিনি বললেন:— জ্বর, আল্লাহ এতে বরকত না দিন। তখন তিনি ﷺ বললেন:

لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير

خبث الحديد

«জ্বরকে গালি দিয়ো না; কেননা তা আদম-সন্তানের গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করে।»

আতা ইবনু আবী রাবাহ বলেন, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আমাকে বললেন:— আমি কি তোমাকে জান্নাতবাসী একজন নারীকে দেখাব? আমি বললাম:— অবশ্যই। তিনি বললেন:— এই কালো নারীটি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলেছিল:— আমার মৃগীরোগ হয়, আর তাতে আমার সতর খুলে যায়; আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তিনি বললেন:

إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك

> «তুমি চাইলে ধৈর্য ধরো, তোমার জন্য জান্নাত; আর তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করে দেন।»

সে বলল:— আমি ধৈর্য ধরব। আর বলল:— আমার সতর খুলে যায়, আপনি দুআ করুন যেন আমার সতর না খোলে। তখন তিনি তার জন্য দুআ করলেন। — মুত্তাফাকুন আলাইহি।

আর সহীহ বুখারীতে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন:

إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر, عوضته منهما الجنة

> «আমি যখন আমার বান্দাকে তার দুই প্রিয় বস্তু দিয়ে পরীক্ষা করি, আর সে ধৈর্য ধরে, তখন আমি তার বিনিময়ে তাকে জান্নাত দিই।»

— অর্থাৎ তার দুই চোখ।

তৃতীয়:— তুমি জেনে রাখবে যে, যা তোমার ওপর এসেছে তা তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না, আর যা তোমাকে এড়িয়ে গেছে তা তোমার ওপর আসার ছিল না; আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে, আর যা চাননি তা হয়নি; আর গোটা উম্মত যদি একত্র হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন তার বাইরে কিছুতেই তারা তোমার উপকার করতে পারবে না — এবং বিপরীতটিও তেমনই। আর তোমার যে রোগটি হয়েছে, তা আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিখে রাখা হয়েছে, যেমনটি ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و

الأرض بخمسين ألف سنة

«আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সৃষ্টিজগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন।»

আর এ এমন এক বিষয় যা নিয়ে কলম শুকিয়ে গেছে, তার পাতাগুলো গুটিয়ে ফেলা হয়েছে এবং তাতে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। আরও জেনে রাখো, আল্লাহই তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন — তোমার ঈমান ও ধৈর্য যাচাই করতে, এবং এ কারণে যে তিনি তোমাকে ভালোবাসেন, যেমনটির দলীল আগে গত হয়েছে। অন্য হাদীসে আছে:

إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط

فَلَهُ السَّخَطُ))

«আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তিনি তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। অতঃপর যে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য সন্তুষ্টি; আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য অসন্তুষ্টি।»

আর এটিই তাকদীরের প্রতি ঈমানের প্রকৃত রূপ, যা ঈমানের ছয়টি রুকনের ষষ্ঠ রুকন; তা ছাড়া বান্দার ঈমান পূর্ণই হয় না। মুসলমানের কাছে এই আলনাটি রয়েছে, যাতে সে তার ওপর আপতিত সমস্ত বালা ঝুলিয়ে দেয়। আর এটি মুসলমান ও কাফিরের মধ্যকার একটি পার্থক্য। কেননা কাফিরের ওপর যখন বিপদ নেমে আসে, তখন দুনিয়া তার চোখে সংকীর্ণ হয়ে যায়, আর নিজের থেকে মুক্তি পাওয়া ছাড়া সে কোনো নিঃশ্বাসের পথ খুঁজে পায় না — ফলে সে আত্মহত্যা করে বসে, আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর মুমিন — সে তো জানে, যা তার ওপর এসেছে তা আল্লাহরই ফয়সালা ও তাকদীর। বুদ্ধিমান সেই, যে যতবার নতুন বালা আসে ততবার নিজের ঈমান নবায়ন করে। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

চতুর্থ:— ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার ওসিয়ত। সন্তুষ্টি (রিদা) একটি অন্তরের কাজ, যা ধৈর্যের ঊর্ধ্বে। কেননা ধৈর্য ওয়াজিব, এতে কোনো বিকল্প নেই; আর রিদা সম্পর্কে সঠিক কথা হলো তা মুস্তাহাব — এ মতটিই শাইখ তাকিউদ্দীন রহিমাহুল্লাহ, ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য মুহাক্কিকগণ গ্রহণ করেছেন। পূর্ণ আত্মসমর্পণসহ ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি অন্তরের হিদায়াত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সরলতার কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ

«আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো মুসীবত আসে না; আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হিদায়াত দেন।» — সূরা আত-তাগাবুন: ১১

সালাফের একাধিক ব্যক্তি বলেছেন: সে হলো এমন ব্যক্তি, যার ওপর মুসীবত আসে, অতঃপর সে জানে যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, ফলে সে সন্তুষ্ট হয় ও আত্মসমর্পণ করে। এটি কারও কারও জন্য কঠিন হলেও, আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন তার জন্য এটি সহজ। সুতরাং তা আল্লাহ তাআলার কাছেই চাও — বেশি বেশি ও নাছোড়বান্দা হয়ে এর জন্য দুআ করে, তাঁর কাছে প্রবল আগ্রহ ও আশা পোষণ করে যেন তিনি তোমার জন্য তা বাস্তবায়িত করেন, এবং অন্তরকে

এতে অভ্যস্ত করে তুলে। আর কোনো রোগ কিংবা অন্য কোনো মুসীবত এসে পড়লে নিজের ও ভাইদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করেও তা অর্জন করতে হবে; কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকার করে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين

> «আর উপদেশ দিতে থাকো; কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকার করে।» — সূরা আয-যারিয়াত: ৫৫

এটি আরও চাওয়া হবে নেককারদের জীবনী নিয়মিত পাঠ করার মাধ্যমে — যাঁরা যুহদ ও ইবাদতের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন — আল্লাহ তাঁদের ওপর যেসব কষ্টদায়ক তাকদীর জারি করতেন, তাঁরা তার সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতেন? কেননা সেই মানুষগুলো আমাদের পূর্বসূরি, আর আমরা তাঁদের পদাঙ্ক-অনুসারী। সুতরাং তাঁদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা অপরিহার্য — কেবল তাঁদের ফিকহি নির্বাচনগুলোতেই নয়, বরং অনুসরণের পরিধিটি আরও প্রশস্ত করা চাই।

ধৈর্য ও সন্তুষ্টি (রিদা)

ধৈর্য (সবর)	সন্তুষ্টি (রিদা)
ওয়াজিব; এতে কোনো বিকল্প নেই	সঠিক কথা হলো মুস্তাহাব
অসন্তোষ ও অভিযোগ থেকে বিরত থাকা	অন্তরের কাজ, যা ধৈর্যের ঊর্ধ্বে
—	পূর্ণ আত্মসমর্পণসহ ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি

শাইখ তাকিউদ্দীন রহিমাহুল্লাহ, ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য মুহাক্কিকের গৃহীত মত

পঞ্চম:— নিজেকেই অভিযুক্ত করার ওসিয়ত, এবং নিজেকে এ কথা বোঝানো যে, তার ওপর যা এসেছে তা তার নিজেরই দুই হাতের উপার্জনের ফল; আর আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা বান্দাদের প্রতি মোটেই যালিম নন। সে নিজের ওপর তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم

بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

> «স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের হাতের কামাইয়ের কারণে, যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করান — হয়তো তারা ফিরে আসবে।» — সূরা আর-রূম: ৪১

এবং তাঁর এই বাণী:

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير

«তোমাদের ওপর যে মুসীবতই আসে, তা তোমাদের হাতের কামাইয়ের কারণেই; আর তিনি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন।» — সূরা আশ-শূরা: ৩০

সুতরাং তখন অপরিহার্য হলো নিজের হিসাব নেওয়া, নিজেকে জবাবদিহি করা, নিজের লাগাম ধরা এবং সে লাগাম শক্ত করে ধরা; আর দ্রুত তাওবায়ে নাসূহা করা — যা তার সমস্ত শর্ত পূর্ণ করে। কেননা কোনো বালা নাযিল হয় না গুনাহ ছাড়া, আর তা ওঠানো হয় না তাওবা ছাড়া। বিশেষত রোগ তো মৃত্যুর দূত এবং তার ভূমিকাগুলোর একটি; তাই রোগের মধ্যে তাওবায়ে নাসূহা করা বান্দার প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় তাওফীকগুলোর একটি এবং এর অর্থ আল্লাহ তাআলা তার কল্যাণ চেয়েছেন। তাওবা যদি সর্বাবস্থায়ই ওয়াজিব হয়, তবে এই সময়ে তা আরও বেশি ওয়াজিব; আর তা যদি বান্দার কাছ থেকে সব সময়ই চাওয়া হয়, তবে এই সংকটাপন্ন ও কঠিন সময়ে তা সবচেয়ে বড় দাবি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসগুলো অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে তার অন্তর্ভুক্ত।

আর তুমি কিছু রোগীর অবস্থা দেখে বিস্মিত হবে — তাদের থেকে কী প্রকাণ্ড বিমুখতাই না প্রকাশ পায়! না নামায, না সদকা, না যিকির, না ইহসান; না তাওবা, না কল্যাণের কথা শোনা, না কোনো উপদেশদাতার উপদেশ কবুল করা। এ তো স্পষ্ট লাঞ্ছনা; আর যার অবস্থা এই, আল্লাহর কসম সে-ই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা অন্তর যদি ফিতনা ও মুসীবত নেমে আসার সময়ও তার ঘুম থেকে না জাগে, তবে আল্লাহর কসম আর কখন সে জাগবে? আর তাকদীরের এই ধমকগুলো যদি তার পথভ্রষ্টতা থেকে তাকে উপদেশ না দেয়, তবে আল্লাহর কসম বলো, আর কখন সে উপদেশ গ্রহণ করবে? অন্তর যদি ভয়ের অবস্থাতেই বিমুখ থাকে, তবে নিরাপত্তার অবস্থায় সে আরও বেশি বিমুখ; আর তা যদি রোগ ও মুসীবতের অবস্থায় উদাসীন ও খেলাধুলায় মত্ত থাকে, তবে সুস্থতা ও নিরাপত্তার অবস্থায় সে আরও বেশি মত্ত ও আরও বেশি উদাসীন। আর মৃতের ক্ষতে ব্যথা লাগে না।

ষষ্ঠ:— মৃত্যু কামনা করা থেকে সতর্ক থাকা, তা মুখে উচ্চারণ করা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাওয়া, এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি বেশি আশ্রয় নেওয়া যেন তিনি তাকে অপদস্থ না করেন এবং সে যেন তা মুখে না আনে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد متمنياً،

فليقل: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت

الوفاة خيراً لي

«তোমাদের কেউ যেন তার ওপর আপতিত কষ্টের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি কামনা করতেই হয়, তবে সে যেন বলে:— হে আল্লাহ, আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন যতক্ষণ বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, আর আমাকে মৃত্যু দিন যখন মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর।» — মুত্তাফাকুন আলাইহি

তাঁদের উভয়ের এক বর্ণনায় আছে: «আমি যদি নবী ﷺ-কে বলতে না শুনতাম:

((لَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ))

«তোমরা মৃত্যু কামনা করো না।»

— তবে আমি কামনা করতাম।» তাঁদের উভয়ের কিতাবেই কায়স ইবনু আবী হাযিম থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন:

اتيت خباباً وقد اكتوى سبعاً في بطنه فسمعته يقول: لولا أن النبي نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به

«আমি খাব্বাবের কাছে এলাম, তাঁর পেটে সাতবার দাগ দেওয়া হয়েছিল। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম:— নবী ﷺ যদি আমাদেরকে মৃত্যুর দুআ করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি তার দুআ করতাম।»

মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يتمنى أحدكم الموت, ولا يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله, وإنه ليزيد المؤمن من عُمره إلا خيراً

«তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং তা আসার আগে তার জন্য দুআও না করে। কেননা সে মরে গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়; আর মুমিনের আয়ু তার কল্যাণই বাড়ায়।»

সুতরাং রোগ তোমাকে যেখানেই পৌঁছে দিক, খবরদার — আবারও খবরদার — তুমি যেন তা মুখে না আনো।

মৃত্যু কামনা প্রসঙ্গে

করুন

- ✓ কামনা করতেই হলে: আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন যতক্ষণ বাঁচা আমার জন্য কল্যাণকর; মৃত্যু দিন যখন মৃত্যুই কল্যাণকর

করবেন না

- ✗ আপতিত কষ্টের কারণে মৃত্যু কামনা করা
- ✗ মৃত্যু আসার আগে তার জন্য দুআ করা
- ✗ রোগ যেখানেই পৌঁছাক, তা মুখে আনা

হাদীস: মুমিনের আয়ু তার কল্যাণই বাড়ায়

সপ্তম:— সে যেন মুক্তিকে বিলম্বিত মনে না করে; কেননা মুক্তি নিকটেই, যদিও আমরা তা দূরে দেখি। এর পাশাপাশি তার কর্তব্য ক্ষমা ও সুস্থতার জন্য বেশি বেশি দুআ করা; আর সে যেন না বলে "আমি দুআ করলাম, দুআ করলাম, কিন্তু আমার দুআ কবুল হলো না" — কেননা এ কথাটি দুআ কবুল না হওয়ার অন্যতম কারণ। আর সে যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়; কেননা আল্লাহর রহমত থেকে সে-ই নিরাশ ও হতাশ হয়, যার অন্তর ঈমানশূন্য। আবূ দাউদ ও তিরমিযী নুমান ইবনু বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন:

الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم

«দুআই ইবাদত। "আর তোমাদের রব বলেছেন: তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"» — হাদীসটি সহীহ; আয়াতটি সূরা গাফির: ৬০

আর তার কর্তব্য ব্যাপক অর্থবোধক দুআগুলো (জাওয়ামিউদ দুআ) করা। আবূ দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে হারুন ইবনু আবদিল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে ইয়াযীদ ইবনু হারুন বর্ণনা করেছেন, আসওয়াদ ইবনু শাইবান থেকে, তিনি আবূ নাওফাল থেকে, তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে, তিনি বলেছেন:

كان رسول الله يستحب الجوامع من الدعاء, ويدع ما سوا ذلك

«রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যাপক অর্থবোধক দুআগুলো পছন্দ করতেন এবং তা ছাড়া অন্যগুলো ছেড়ে দিতেন।» — হাদীসটি সহীহ

আর সে যেন তার দুআয় (إن شاء الله) — "যদি আল্লাহ চান" — না বলে; কেননা মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে নিজ সনদে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يقل أحدكم اللهم اغفرلي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت

ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له

«তোমাদের কেউ যেন না বলে: হে আল্লাহ, আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন; হে আল্লাহ, আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন। বরং সে যেন দৃঢ়ভাবে চায় এবং আগ্রহ বড় করে; কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।»

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يستجاب لأحدكم مالم يعجل, فيقول: قد دعوت فلم

يستجب لي

«তোমাদের প্রত্যেকের দুআ কবুল করা হয়, যতক্ষণ সে তাড়াহুড়ো করে না বলে:— আমি তো দুআ করলাম, কিন্তু আমার দুআ কবুল হলো না।»

আর সে যেন জেনে রাখে, তার রব জাল্লা ওয়া আলা অত্যন্ত দানশীল; তিনি দুআকারীদের দুআ ফিরিয়ে দেন না এবং আশাবাদীদের আশা ব্যর্থ করেন না। কেননা আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ নিজ নিজ সনদে সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إن ربكم تبارك وتعالى حييٌّ كريم يستحي من عبده إذا رفع

يديه إليه أن يردهما صفراً

«নিশ্চয় তোমাদের রব তাবারাকা ওয়া তাআলা অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দানশীল; তাঁর বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত ওঠায়, তখন সে দুটিকে শূন্য অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।» — হাদীসটি সহীহ

মোটকথা, সে দুআর আদবগুলো মেনে চলবে; কেননা আল্লাহর দেওয়া মুক্তি নিকটেই, আর আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যা নির্বাচন করেছেন তা তোমার নিজের নির্বাচনের চেয়ে উত্তম। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

দুআর আদব (সপ্তম নসীহত)

করুন	করবেন না
✓ ক্ষমা ও সুস্থতার জন্য বেশি বেশি দুআ করা	✗ "আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন" বলা
✓ ব্যাপক অর্থবোধক দুআ করা	✗ তাড়াহুড়ো করে বলা: দুআ করলাম, কবুল হলো না
✓ দৃঢ়ভাবে চাওয়া; আগ্রহ বড় করা	✗ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া

অষ্টম:— বেশি বেশি যিকিরের ওসিয়ত। বিশেষত রোগীদের সময় প্রশস্ত এবং তাদের ব্যস্ততা কম। তাই তার কর্তব্য এই সময়টিকে আল্লাহ তাআলার যিকিরে কাজে লাগানো; কেননা যিকিরের রয়েছে মহান উপকারিতা এবং অন্তর, রূহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর তার সুন্দর প্রভাব। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তাঁর "আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব" গ্রন্থে সেগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করেছেন; ইচ্ছা হলে তা দেখে নাও। আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

«জেনে রাখো, আল্লাহর যিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।» — সূরা আর-রা'দ: ২৮

আর আল্লাহ তাআলা বলেন:

ولذكر الله أكبر

«আর আল্লাহর যিকির সর্বশ্রেষ্ঠ।» — সূরা আল-আনকাবূত: ৪৫

আর আল্লাহ তাআলা বলেন:

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً وأصيلاً

«হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করো।» — সূরা আল-আহযাব: ৪১-৪২

আর আল্লাহ তাআলা বলেন:

والذاكرين الله كثيراً والذاكرات

«আর অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষগণ ও স্মরণকারিণী নারীগণ।» — সূরা আল-আহযাব: ৩৫

আর নবী ﷺ বলেছেন:

مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت

«যে আল্লাহকে স্মরণ করে আর যে আল্লাহকে স্মরণ করে না, তাদের উপমা জীবিত ও মৃতের মতো।»

আর নবী ﷺ বলেছেন:

ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله, قال ذكر الله

«আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের সর্বোত্তম আমল, তোমাদের মালিকের কাছে সবচেয়ে পবিত্র আমল, স্বর্ণ-রৌপ্য দান করার চেয়েও উত্তম আমল এবং শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া ও তাদের হাতে নিজেদের গর্দান উড়ে যাওয়ার চেয়েও উত্তম আমলের কথা বলে দেব না? তাঁরা বললেন:— অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: আল্লাহর যিকির।» — হাদীসটি সহীহ

আর নবী ﷺ বলেছেন:

لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

«"সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" বলা আমার কাছে সূর্য যার ওপর উদিত হয় তার সবকিছুর চেয়ে প্রিয়।»

আর নবী ﷺ বলেছেন:

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى

الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ((

«দুটি বাক্য জিহ্বায় হালকা, মীযানে ভারী, আর রহমানের কাছে প্রিয়:— সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম।» — মুত্তাফাকুন আলাইহি

আর নবী ﷺ বলেছেন:

من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة غفرت خطاياه

وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ((

«যে ব্যক্তি দিনে একশত বার "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" বলে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।»

আর নবী ﷺ বলেছেন:

من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة

«যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" বলে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুরগাছ রোপণ করা হয়।»

আর নবী ﷺ বলেছেন:

من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كتب له مئة حسنة وحط عنه مئة خطيئة وكتب كأنما أعتق عشر رقابٍ من ولد إسماعيل وكانت حرزاً له من الشيطان يومه ذلك

«যে ব্যক্তি দিনে একশত বার বলে: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" — তার জন্য একশত নেকি লেখা হয়, তার থেকে একশত গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়, এবং তা তার জন্য এমন লেখা হয় যেন সে ইসমাঈলের বংশের দশজন দাস মুক্ত করল; আর তা সেদিনের জন্য তার পক্ষে শয়তান থেকে হিফাযত হয়ে যায়।»

আর নবী ﷺ তাঁর এক স্ত্রীকে বলেছিলেন — যিনি ফজরের পর থেকে চাশতের সময় উঁচু হওয়া পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করছিলেন:

لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه وسبحان الله وبحمده رضا نفسه وسبحان الله وبحمده زنة عرشه وسبحان الله وبحمده مداد كلماته

«আমি তোমার পরে চারটি বাক্য বলেছি; আজ সকাল থেকে তুমি যা বলেছ তার সঙ্গে যদি সেগুলো ওজন করা হয়, তবে সেগুলোই ভারী হবে:— সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহ, ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি রিদা নাফসিহ, ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি যিনাতা আরশিহ, ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি মিদাদা কালিমাতিহ।»

আর যিকিরের প্রকারভেদ। এবং আমি আমার রোগী ভাইদের ওসিয়ত করছি, তাদের শিয়রে যেন আল্লাহ তাআলার কিতাব থাকে; কেননা তা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির ও সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী। সে যেন তিলাওয়াত, তাদাব্বুর ও হিফযের মাধ্যমে নিজের সময়টুকু তা দিয়ে আবাদ করে; কেননা তা নিঃসঙ্গতার সঙ্গী, বুকের শীতলতা, দুশ্চিন্তার নিরাময়, রূহের সান্ত্বনা এবং আনন্দের নগরীর দিকে তার পথপ্রদর্শক।

নবম:— সে যেন ওসিয়ত করার ব্যাপারে যত্নবান হয়; কেননা ওসিয়ত লিখে রাখা সুন্নত, আর যার ওপর অন্যদের হক রয়েছে — যা ওসিয়ত না করলে নষ্ট হয়ে যাবে — তার ক্ষেত্রে তা আরও জোরালো। ওসিয়ত তো সুস্থ ব্যক্তির কাছেই চাওয়া হয়, তাহলে রোগীর কথা কী! সহীহ হাদীসে ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وله شيء يوصي به

إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ))

«কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য উচিত নয় যে, তার ওসিয়ত করার মতো কিছু আছে অথচ সে এক বা দুই রাত এমনভাবে কাটাবে যে তার ওসিয়তনামা তার কাছে লেখা নেই।»

আর ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ বিষয়টির ওপর যত্নসহকারে আমল করতেন।

দশম:— সে যেন তার রোগী ভাইদের প্রতি কোমল হয়, তাদের কাছে কল্যাণ পৌঁছে দেয়, তাদের থেকে নিজের হাত ও জিহ্বা সংযত রাখে — কেননা প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে; তাদেরকে আল্লাহর কথা, দুনিয়ার তুচ্ছতার কথা, সুস্থতার নিআমতের কথা ও মানুষের দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; পবিত্রতা ও নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের যা প্রয়োজন তা শিখিয়ে দেয়; তাদের অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করায় — কেননা বান্দার অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করানো এমন আমল যা আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, বিশেষত এ ধরনের অবস্থা ও পরিস্থিতিতে; চিকিৎসকদের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করে ও তাঁদের কল্যাণকামী হয়; তাঁদের নির্দেশনা মেনে চলে, যতক্ষণ না তা শরীয়তের কোনো বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়; কথার আগে কাজ দিয়ে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়; সাধ্যমতো ওয়াক্তমতো জামাআতে নামায আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হয় — আর আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না; সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে; দৃষ্টি অবনত রাখে; লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; কথায় সত্যবাদী হয়; বিপদমুক্ত-নির্ভরযোগ্য হয়; তার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ দেখা না যায়; তার চারপাশের চিকিৎসক ও রোগীদের সঙ্গে সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হয় — রূঢ় নয়, কঠোর নয়, অভদ্র নয়, অপমানের সঙ্গী নয়। আল্লাহই সাহায্যস্থল, তাঁরই ওপর ভরসা; আর মহান ও সুউচ্চ আল্লাহ ছাড়া কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

রোগীর প্রতি নসীহত: দ্বিতীয় থেকে দশম

- [ ] দ্বিতীয়: আজরের প্রত্যাশা — রোগ গুনাহের কাফফারা
- [ ] তৃতীয়: যা এসেছে তা এড়ানোর ছিল না — তাকদীরে ঈমান
- [ ] চতুর্থ: ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি (রিদা)
- [ ] পঞ্চম: নিজেকে অভিযুক্ত করা; তাওবায়ে নাসূহা
- [ ] ষষ্ঠ: মৃত্যু কামনা থেকে সতর্ক থাকা
- [ ] সপ্তম: মুক্তিকে বিলম্বিত মনে না করা; দুআর আদব
- [ ] অষ্টম: বেশি বেশি যিকির; শিয়রে আল্লাহর কিতাব
- [ ] নবম: ওসিয়ত লিখে রাখা
- [ ] দশম: রোগী ভাইদের প্রতি কোমল আচরণ

প্রশ্ন ৯ এর উত্তরের ধারাবাহিকতা; প্রথম নসীহত ছিল ধৈর্য

প্রশ্ন ১০

স_১০/ চিকিৎসকদের কী কী ওসিয়ত করা হয়?

জবাব/ আমি বলি:— চিকিৎসকের সমাজে গভীর প্রভাব রয়েছে; সে কারণেই তাঁকে কয়েকটি ওসিয়ত রক্ষা করে চলতে হবে:—

প্রথম:— আমি তাঁকে আল্লাহ তাআলার তাকওয়া ও তাঁর ভয়ের ওসিয়ত করছি। কেননা মানুষ তাঁকে নিজেদের শরীর ও সম্মানের ব্যাপারে আমানতদার বানিয়েছে এবং তাঁর হাতে নিজেদের লাগাম সঁপে দিয়েছে। সুতরাং তিনি যদি এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার ব্যাপারে যত্নবান না হন, তবে তিনি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। তাই তাঁর কর্তব্য আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার নিরন্তর নজরদারির অনুভূতি রাখা এবং এ বিষয়ে গাফিল বা বিস্মৃত না হওয়া।

দ্বিতীয়:— আমি তাঁকে তাঁর কাজে ইখলাসের ওসিয়ত করছি — কাজে তাঁর মূলনীতি হবে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য, তাঁর সন্তুষ্টি ও পরকালের গৃহের অন্বেষণ। কেননা মানুষের চিকিৎসা করা কল্যাণকর কাজগুলোরই একটি এবং তা আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার এক প্রকার ইবাদত। তাই চিকিৎসাকে কেবল পেশা বানানো উচিত নয়; বরং তাকে সেই নেক আমলগুলোর অন্তর্ভুক্ত করবেন, যেগুলোর কল্যাণ, সওয়াব ও প্রতিদান তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে আশা করেন। কেননা তা নেকি ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত, আর আমলের ভিত্তি নিয়তের ওপর। সুতরাং যাঁর চিকিৎসা আল্লাহর জন্য, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিদানপ্রাপ্ত ও পুরস্কৃত; আর যাঁর চিকিৎসা কেবল বেতন নেওয়ার জন্য, তাঁর চিকিৎসা থেকে তিনি তা-ই পাবেন যা তিনি নিয়ত করেছেন।

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً

«আর যে আখিরাত চায় এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদের চেষ্টাই স্বীকৃত হবে।» — সূরা আল-ইসরা: ১৯

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب

«যে আখিরাতের ফসল চায়, আমি তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দিই; আর যে দুনিয়া চায়, আমি তাকে তা থেকে কিছু দিই, কিন্তু আখিরাতে তার কোনো অংশ নেই।» — সূরা আশ-শূরা: ২০

সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন, আল্লাহকে ভয় করুন — ইখলাসের ব্যাপারে; কেননা তা দুনিয়া ও আখিরাতে বরকত, তাওফীক, সফলতা ও সঠিকতার কারণ।

তৃতীয়:— আমি তাঁকে রোগীদের প্রতি কোমল হওয়ার এবং তাদের পক্ষ থেকে যে কথায় ও কাজে কষ্ট আসতে পারে তা সহ্য করার ওসিয়ত করছি; তিনি যেন তাদের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ না করেন এবং যে তাঁকে কষ্ট দিয়েছে তার থেকে প্রতিশোধের নিয়ত না করেন। হাদীসে এসেছে:

فإن الله الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه

«কোমলতা যে জিনিসে থাকে তাকে সুশোভিত করে, আর যে জিনিস থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাকে কলঙ্কিত করে।»

অন্য হাদীসে এসেছে:

وإن الله ليعطي على الرفق مالا يعطي على العنف

> «নিশ্চয় আল্লাহ কোমলতার বিনিময়ে এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার বিনিময়ে দান করেন না।»

সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন, আল্লাহকে ভয় করুন, হে বরকতময় চিকিৎসক — কোমলতা, ধৈর্য ও ধীরস্থিরতার ব্যাপারে। চিকিৎসক যেন নিজের রোগীদের অন্তরে নিজের ভালোবাসা রোপণ করেন; কেননা তা-ই সর্বোত্তম চিকিৎসা এবং আরোগ্যের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

চতুর্থ:— আমি তাঁকে রোগ নির্ণয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার এবং কেবল রোগীর বর্ণনার ওপর নির্ভর না করার ওসিয়ত করছি — যেমনটি কিছু চিকিৎসক করে থাকেন। কেননা তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্ট স্বীকার করেন না, বরং কেবল অভিযোগ শুনেই চিকিৎসা লিখে দেন; আর এটি ভুল। তাঁরা এ কথা জানেনও, তবু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দিক থেকে বলছি; কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকার করে। এ কারণে কত-শত ভুল যে ঘটে গেছে! এটি জায়েয নয়। বরং স্বাস্থ্য সংরক্ষণের দিক থেকে চিকিৎসকের ওপর ওয়াজিব হলো, তিনি কষ্টের কারণ উদ্‌ঘাটনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে শক্তি দিয়েছেন তা দিয়ে রোগের প্রকৃত রূপ অনুসন্ধান করবেন। কেননা শরীয়তের অপরিহার্য উদ্দেশ্যগুলোর একটি হলো প্রাণ রক্ষা, আর চিকিৎসকের তাতে যথেষ্ট বড় অংশ রয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন, আল্লাহকে ভয় করুন, হে সম্মানিত চিকিৎসকগণ — এ বিষয়ে। আল্লাহ আপনাদের হিফাযত করুন, দেখাশোনা করুন এবং আপনাদের পদক্ষেপ সঠিক রাখুন।

পঞ্চম:— আমি তাঁকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার কাছে সাহায্য চাওয়ার ওসিয়ত করছি। কেননা চিকিৎসা-পেশা একটি কঠিন পেশা এবং এর দায়িত্বভার বহন করা কাঁধের সাধ্যাতীত। তাই তাঁর কর্তব্য নিরন্তর আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়া এবং কেবল নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শক্তির ওপর নির্ভর না করা; কেননা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই। সুতরাং আল্লাহ যদি তাঁর সাহায্যকারী না হন, তবে তাঁর ব্যাপারে সালাম লিখে দিন — এটি অপরিহার্য। আর এটি কেবল চিকিৎসকের জন্যই নয়, বরং তা প্রত্যেকের জন্যই সাধারণ বিধান; তবে যেহেতু আমরা চিকিৎসাবিষয়ক বিষয়ে লিখছি, তাই কথাটি তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলেছি। সুতরাং আপনি যখন আপনার কাজে যাবেন, তখন আল্লাহ তাআলার কাছে কাকুতি-মিনতি করুন — দুআ করতে করতে, বিনীতভাবে, উপস্থিত অন্তর ও সত্যনিষ্ঠ নিয়ত নিয়ে — যেন তিনি আপনাকে সঠিক পথের ইলহাম দেন, আপনার কথা সঠিক রাখেন, আপনার রোগীদের আরোগ্য দেন, নিজ তত্ত্বাবধানে তাদের দেখাশোনা করেন, এবং আপনার জন্য সাহায্যকারী, সহায়, হিফাযতকারী, পথপ্রদর্শক, সমর্থক ও উদ্ধারকারী হন। নিঃসন্দেহে চিকিৎসকদের মধ্যে সেই-ই তাওফীকপ্রাপ্ত, যাকে আল্লাহ তাআলা এর তাওফীক দিয়েছেন। আর যাঁর অন্তরকে এ বিষয়ে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং যাঁর অন্তর্দৃষ্টির আলো এ পথ থেকে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই — দুনিয়ার মর্যাদা ও পদে তিনি যত উঁচুতেই পৌঁছান। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

ষষ্ঠ:— আমি তাঁকে ওসিয়ত করছি, তিনি যেন তাঁর কাছে থাকা চিকিৎসক ও রোগীদের জন্য উত্তম আদর্শ হন — সুন্দর ও প্রশংসিত আদবে আদবপূর্ণ এবং পরিপালিত উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান; তাঁর ওপর যেন সুন্নাহর নিদর্শন প্রকাশ পায় ও তিনি গুনাহ থেকে দূরে থাকেন। আর তিনি যেন সর্বোচ্চ যত্ন নেন নিজের রোগীদেরকে আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, শিফা তাঁরই — তাবারাকা ওয়া তাআলা — পক্ষ থেকে, আর তিনি (চিকিৎসক) কেবল সেসব উপকরণেরই একটি যা আল্লাহ তাদের জন্য অধীন করে দিয়েছেন। কত বিবেকবান, সঠিক-পথপ্রাপ্ত ও কল্যাণকামী চিকিৎসক বহু রোগীর হিদায়াতের কারণ হয়েছেন! তিনি আল্লাহ তাআলার অনুমতিতে তাদের কাছে অন্তরের সুস্থতা ও শরীরের সুস্থতা — দুটিই পৌঁছে দিয়েছেন। কতই না উত্তম এই চিকিৎসক! আমি তাঁর কাছে — জাল্লা ওয়া আলা — প্রার্থনা করি, তিনি যেন উম্মতের মধ্যে এমন মানুষ আরও বাড়িয়ে দেন। আর

কত উত্তম ও প্রশংসিত সম্পর্ক রোগী হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও তার ও তার চিকিৎসকের মধ্যে টিকে থেকেছে — কেবল এ কারণে যে, সে এই চিকিৎসকের কাছে উত্তম আদর্শ দেখেছে। সুতরাং চিকিৎসকের কর্তব্য নিজের কাজে, কথায় ও বাহ্যিক বেশভূষায় উত্তম আদর্শ হওয়া। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সপ্তম:— আমি তাঁকে ওসিয়ত করছি, তিনি যেন কেবল চিকিৎসাবিদ্যাতেই সীমাবদ্ধ না থাকেন; বরং শরীয়তের বিষয়েও তাঁর জ্ঞান থাকা চাই — বিশেষত রোগীদের পবিত্রতা ও নামাযসংক্রান্ত বিষয়ে, এ ছাড়া আকীদা ও ইবাদতের শুদ্ধতা যেসবের ওপর নির্ভরশীল সেসব শেখা তো ওয়াজিবই। আল্লাহর কসম, আমার খুব ভালো লাগে সেসব চিকিৎসককে, যাঁরা নিজেদের চিকিৎসাকক্ষে একটি ছোট গ্রন্থাগার বসিয়েছেন; সময় একটু ফাঁকা পেলেই তার ওপর ঝুঁকে পড়ে অধ্যয়ন করেন, তার স্বচ্ছ জলাশয়ের উৎস থেকে পরিতৃপ্ত হন এবং তার মিষ্টি ও আরোগ্যদায়ী ঘাট থেকে তৃষ্ণা মেটান। আরও ভালো লাগে কিছু চিকিৎসকের শাইখগণ, আলিমগণ ও ইলমের তালিবদের সঙ্গে সম্পর্ক — তাঁদের দরসের হালকায় হোক বা তাঁদের ঘরে বিশেষ মজলিসে হোক। চিকিৎসক যদি এমন হন, তবে তিনি নিজের কর্মপরিবেশে, পরিবারে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাওফীক ও সঠিকতার সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

অষ্টম:— আমি তাঁকে ওসিয়ত করছি, তিনি যেন তাঁর জন্য হালাল নয় এমন নারীদের সঙ্গে নির্জনতা অবলম্বন না করেন। হাদীসে এসেছে:

ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما

> «কোনো পুরুষ কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে মিলিত হয় না, শয়তান তাদের তৃতীয়জন হওয়া ছাড়া।»

নারীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা ও তাদের সঙ্গে নির্জনতা কারও জন্যই জায়েয নয় — চিকিৎসকের জন্যও নয়, অন্য কারও জন্যও নয়; বিশেষত তারা যদি বেপর্দা ও অনাবৃত হয়। তাই চিকিৎসকের ওপর ওয়াজিব এই অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে থাকা এবং কাজের প্রয়োজনের অজুহাতে নিজের জন্য তা বৈধ করে না নেওয়া। তাদের কারও সঙ্গে করমর্দন করা হারাম; কেননা তা এক মহা অনিষ্টের মাধ্যম, যার পথ বন্ধ করা অপরিহার্য। হাদীসে আছে যে, নবী ﷺ-এর হাত কখনো কোনো পরনারীর হাত স্পর্শ করেনি; তিনি নারীদের বাইআত কেবল কথার মাধ্যমেই গ্রহণ করতেন। সুতরাং কোনো পুরুষের জন্য পরনারীর সঙ্গে নির্জনে থাকা বৈধ নয় — না রাতে, না দিনে; আর চিকিৎসকের জন্যও বৈধ নয়, অন্য কারও জন্যও বৈধ নয়, নারী-চিকিৎসকের সঙ্গে নির্জনে থাকা কিংবা যাদের সঙ্গে নির্জনতা হালাল নয় এমন অন্য কারও সঙ্গে নির্জনে থাকা। আর শরীয়তের দিক থেকে তাঁর জন্য জায়েয নয় কোনো নার্সের সঙ্গে পর্দার আড়াল ছাড়া সরাসরি কোনো লেনদেন করা, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

> «আর তোমরা যখন তাদের কাছে কোনো সামগ্রী চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকেই চাইবে; এটিই তোমাদের

অন্তর ও তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্র।» — সূরা আল-আহযাব: ৫৩

চিকিৎসক ও পরনারী (অষ্টম ওসিয়ত)

করুন

✓ চিকিৎসকের ওপর ওয়াজিব এ থেকে দূরে থাকা

করবেন না

✗ হালাল নয় এমন নারীর সঙ্গে নির্জনতা — শয়তান তৃতীয়জন

✗ অবাধ মেলামেশা; কাজের প্রয়োজনের অজুহাতে তা বৈধ করে নেওয়া

✗ পরনারীর সঙ্গে করমর্দন — হারাম

✗ নার্সের সঙ্গে পর্দার আড়াল ছাড়া সরাসরি লেনদেন

আল্লাহই সাহায্যস্থল।

নবম:— আমি নারী-চিকিৎসকদের ওসিয়ত করছি শালীনতার এবং হিজাবের ব্যাপারে শরঈ নিয়মগুলো মেনে চলার; আর চাকরির অবস্থা যেন তাকে ধোঁকা না দেয় এবং এ কথা ভুলিয়ে না দেয় যে, সে একজন মুসলিম নারী, যাকে হিজাব ও জিলবাব পরিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن

من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين

«হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণ, আপনার কন্যাগণ ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়; এতে তাদের চেনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবে না।» — সূরা আল-আহযাব: ৫৯

আর জিলবাব হলো তা-ই, যা নারী তার মাথা ও শরীরের ওপর রাখে যাতে সে তা দিয়ে তার মুখমণ্ডল ও শরীর ঢেকে ফেলে — সাধারণ পোশাকের ওপর অতিরিক্ত হিসেবে। আর আল্লাহ সুবহানাহু বলেছেন:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن...الآية

«আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে তাদের স্বামী, কিংবা তাদের পিতা, কিংবা তাদের স্বামীদের পিতা, কিংবা তাদের পুত্র, কিংবা তাদের স্বামীদের পুত্র, কিংবা তাদের ভাই, কিংবা তাদের ভাইয়ের পুত্র, কিংবা তাদের বোনের পুত্রদের কাছে ছাড়া... আয়াতের বাকি অংশ।» — সূরা আন-নূর: ৩১

সুতরাং নার্সের ওপর ওয়াজিব তার মুখমণ্ডল ও শরীরের সমস্ত অংশ এমন আবৃতকারী ঢিলেঢালা পোশাক দিয়ে ঢেকে রাখা, যা তার সতরের কোনো অংশ ফুটিয়ে তোলে না। আর সে যেন নবী ﷺ-এর এই বাণীটি স্মরণ করে:

صنفان من أهل النار لم أرهما, رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

«জাহান্নামীদের দুই শ্রেণিকে আমি এখনো দেখিনি: এমন পুরুষ, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা মানুষকে মারবে; আর এমন নারী, যারা পোশাক পরেও উলঙ্গ, নিজেরা বাঁকা চলে ও অন্যদের বাঁকা চলায়, তাদের মাথা বাঁকা উটের কুঁজের মতো — তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না; অথচ তার সুগন্ধ এত এত দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।» — মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

আর এটি এক ভয়ানক হুঁশিয়ারি। এই নারীরা পোশাক পরে বটে, কিন্তু তা স্বচ্ছ কিংবা এমন আঁটসাঁট পোশাক যা তার আকর্ষণীয় অঙ্গগুলো ফুটিয়ে তোলে, ফলে সে যেন উলঙ্গই — বাহ্যত সে বস্ত্রাবৃত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উলঙ্গ; যেমন সে নারী, যে তার মাথা কিংবা গলা কিংবা বাহু কিংবা পায়ের গোছা বা এ জাতীয় কিছু খুলে রাখে। সুতরাং এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার তাকওয়া অবলম্বন করা ওয়াজিব, এই মন্দ কাজ থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব, এবং নারীর জন্য আবৃত থাকা ও পুরুষদের ক্ষেত্রে ফিতনার উপকরণগুলো থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। আর নারীদের মধ্যে তার জন্য বিধান হলো, তাদের মধ্যে যা পরা প্রথাসিদ্ধ তা-ই সে পরবে। এ কথাগুলো আমরা কেবল কল্যাণকামিতার দিক থেকেই বলছি, আর আল্লাহই সাক্ষী। আর যদি নারী এ কাজ ছাড়া অন্য কিছু না পায় এবং পুরুষদের থেকে তাকে আলাদা করার

ব্যাপারে কেউ তার আবেদনে সাড়া না দেয়, তবে তার ওপর ওয়াজিব এই কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যাওয়া। আর যে আল্লাহর জন্য কিছু ছাড়ে, আল্লাহ তাকে তার চেয়ে উত্তম কিছু বিনিময়ে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب

«আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দেন যা সে কল্পনাও করে না।» — সূরা আত-তালাক: ২-৩

চিকিৎসকদের প্রতি নয়টি ওসিয়ত

- [ ] প্রথম: তাকওয়া — মানুষ তাঁকে শরীর ও সম্মানের আমানতদার বানিয়েছে
- [ ] দ্বিতীয়: কাজে ইখলাস — চিকিৎসা এক প্রকার ইবাদত
- [ ] তৃতীয়: রোগীদের প্রতি কোমলতা; তাদের কষ্ট সহ্য করা
- [ ] চতুর্থ: রোগ নির্ণয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা; কেবল রোগীর বর্ণনায় নির্ভর নয়
- [ ] পঞ্চম: সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া
- [ ] ষষ্ঠ: উত্তম আদর্শ হওয়া; রোগীকে স্মরণ করানো যে শিফা আল্লাহর পক্ষ থেকে
- [ ] সপ্তম: শরীয়তের জ্ঞান, বিশেষত রোগীর পবিত্রতা ও নামায
- [ ] অষ্টম: হালাল নয় এমন নারীর সঙ্গে নির্জনতা না করা
- [ ] নবম: নারী-চিকিৎসকের হিজাব ও শালীনতা; পুরুষদের থেকে আলাদা করার আবেদনে সাড়া না পেলে এ কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যাওয়া ওয়াজিব

প্রশ্ন ১০ — চিকিৎসকদের কী কী ওসিয়ত করা হয়

আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন ১১

স_১১/ গর্ভপাতে পতিত ভ্রূণের জানাযা কি পড়া হবে? আর তার পরে নির্গত রক্ত কি নিফাস বলে গণ্য হবে?

জবাব/ আমি বলি:— নারী যখন তার গর্ভস্থ ভ্রূণ ফেলে দেয়, তখন দুটি অবস্থার বাইরে নয়:—

হয় তাতে মানুষের আকৃতি — মাথা, হাত বা পা কিংবা এ জাতীয় কিছু — স্পষ্ট হয়ে গেছে; নয়তো সে এমন একটি মাংসপিণ্ড ফেলেছে যাতে কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়। যদি প্রথমটি হয়, তবে সে নিফাসগ্রস্ত (নুফাসা); তার জন্য নিফাসের বিধান প্রযোজ্য — সে নামায পড়বে না, রোযা রাখবে না, তার স্বামীর জন্য তার সঙ্গে সহবাস হালাল নয়, এবং পবিত্র

না হওয়া পর্যন্ত সে বাইতুল হারামের তাওয়াফ করবে না। চল্লিশ দিনের আগেই যদি সে পবিত্রতা দেখে, তবে গোসল করে নামায পড়বে; নতুবা নিফাসের সর্বোচ্চ সীমা চল্লিশ দিন। আর কাওয়ায়িদে (ফিকহি মূলনীতিতে) সাব্যস্ত হয়েছে যে, হায়েয ও নিফাসের বিধান নির্ভর করে এমন রক্তের অস্তিত্বের ওপর, যা হায়েয বা নিফাস হওয়ার যোগ্য; আর উসূলে সাব্যস্ত হয়েছে যে, বিধান তার কারণের সঙ্গেই আবর্তিত হয় — কারণ থাকলে বিধান থাকে, কারণ না থাকলে বিধানও থাকে না। সুতরাং নারীকে নুফাসা বলা হবে না, যতক্ষণ না সে এমন কিছু ফেলে যাতে মানুষের আকৃতি স্পষ্ট হয়েছে।

আর যদি সে এমন কিছু ফেলে যাতে তা স্পষ্ট হয়নি, বরং তা কেবল একটি মাংসপিণ্ড যাতে কোনো অবয়ব নেই, তবে তার পরে যে রক্ত বের হয় তা ফাসাদের (রোগজনিত) রক্ত বলে গণ্য হবে; তাকে ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর বিধান দেওয়া হবে, নুফাসার বিধানও নয়, হায়েযগ্রস্তার বিধানও নয়। তার কর্তব্য নামায পড়া, রমযানে রোযা রাখা; তার স্বামীর জন্য তার সঙ্গে সহবাস হালাল; আর তার কর্তব্য প্রতি নামাযের ওয়াক্তের জন্য অযু করা — এই হাদীসের কারণে:

وتوضئي لكل صلاة

«আর তুমি প্রতি নামাযের জন্য অযু করো।»

গর্ভপাতের পর নির্গত রক্ত

মানুষের আকৃতি স্পষ্ট হলে	আকৃতিহীন মাংসপিণ্ড হলে
নারী নুফাসা (নিফাসগ্রস্ত)	ফাসাদের (রোগজনিত) রক্ত; ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর বিধান
নামায পড়বে না, রোযা রাখবে না	নামায পড়বে, রমযানে রোযা রাখবে
স্বামীর জন্য সহবাস হালাল নয়; পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ নয়	স্বামীর জন্য সহবাস হালাল
নিফাসের সর্বোচ্চ সীমা চল্লিশ দিন; আগে পবিত্র হলে গোসল করে নামায	প্রতি নামাযের ওয়াক্তের জন্য অযু

এই হলো প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর। আর দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে আমি বলি:— সে যা ফেলেছে তাতে যদি রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে, তার জানাযা পড়া হবে এবং তার নাম রাখা হবে; কেননা তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়ার পর সে একজন মানুষে পরিণত হয়েছে এবং তার নিজস্ব বিধান রয়েছে; বরং তার পক্ষ থেকে আকীকাও করা হবে। আর যদি তা রূহ ফুঁকে দেওয়ার আগেই পড়ে যায়, তবে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে — জানাযা ছাড়া ও গোসল ছাড়া; কেননা এসব বিধান সেই মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যার থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আর এর মধ্যে তো রূহ ফুঁকেই দেওয়া হয়নি। এই ফতোয়াই এ দেশের আলিমগণ দিয়েছেন — আল্লাহ তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান বাড়িয়ে দিন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

গর্ভপাতে পতিত ভ্রূণের জানাযা

রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়ে থাকলে	রূহ ফুঁকে দেওয়ার আগে পড়ে গেলে
গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে	জানাযা ছাড়া ও গোসল ছাড়া
জানাযা পড়া হবে এবং নাম রাখা হবে	মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন
তার পক্ষ থেকে আকীকাও করা হবে	রূহ ফুঁকা হয়নি বলে এসব বিধান সম্পৃক্ত নয়

প্রশ্ন ১২

স_১২/ চিকিৎসকগণ যেহেতু সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে ভ্রূণটির জন্মগত বিকৃতি (তাশাউহ খালকি) রয়েছে, সে কারণে কি ভ্রূণটিকে নষ্ট করে ফেলা জায়েয? দলীল ও ইল্লতসহ তা বর্ণনা করুন।

জবাব/ আমি বলি:— পাঁচ বছর আগে আমাকে এ প্রশ্নটি করা হয়েছিল, তখন আমি যা উত্তর দিয়েছিলাম তার সারকথা হলো:— এ কাজটি জায়েয নয়; বরং তা সবচেয়ে বড় হারামগুলোর একটি এবং সবচেয়ে বড় মুনকারগুলোর একটি। এটি জাহেলিয়াতের সুন্নতগুলোর একটিকে জীবিত করা — তারা লজ্জার ভয়ে নিজেদের কন্যাদের হত্যা করত এবং দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করত; আর এই দলটি বিকৃতির ভয়ে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে। এ সবই হারাম ও মুনকার, যার পথ বন্ধ করা ওয়াজিব; এমনকি এ নিয়ে চিন্তাভাবনা কাজে লাগানোও উচিত নয় — নিছক চিন্তাটুকুও নয়। কেননা এই ভ্রূণ একটি মানবপ্রাণ, যার নিজস্ব বিধান ও মর্যাদা রয়েছে; সুতরাং তার ওপর সীমালঙ্ঘন করা এবং এই কুৎসিত ও নিন্দনীয় রূপে তার ওপর কর্তৃত্ব চালানো জায়েয নয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কী যুক্তি পেশ করা হবে — এই সম্মানিত, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মানবপ্রাণটিকে, যাকে তার রব জাল্লা ওয়া আলা সম্মানিত করেছেন, নিঃশেষ করে দেওয়ার ব্যাপারে? আল্লাহর কসম বলো, কিয়ামতের দিন যখন জিজ্ঞাসা করা হবে "কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো?" — তখন কী জবাব দেবে? সে কী অপরাধ করেছিল? আর তার বিকৃত অবস্থায় থাকা কি আমাদের জন্য তাকে হত্যা করা ও তার রূহ নিঃশেষ করে দেওয়াকে বৈধ করে দেয়? না, আল্লাহর কসম — এসবের কোনোটিই এই কুৎসিত কাজ, এই ভয়ানক অপরাধ ও এই মহাপাপকে বৈধ করার পক্ষে যুক্তি নয়। আর এর হারাম হওয়ার দলীল কয়েকটি বিষয়:—

তার মধ্যে একটি:— আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

> «আর তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন — তবে যথাযথ কারণ ছাড়া।» — সূরা আল-ইসরা: ৩৩

তাঁর বাণী لا تقتلوا — এটি নিষেধাজ্ঞা; আর উসূলে সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোনো কারিনা (প্রাসঙ্গিক ইঙ্গিত) থেকে মুক্ত নিরঙ্কুশ নিষেধাজ্ঞা হারাম হওয়া বোঝায়। আর তাঁর বাণী النفس — এটি একবচন, যা "আলিফ-লাম ইসতিগরাকিয়্যা" দ্বারা যুক্ত; আর কাওয়ায়িদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, আলিফ-লাম যখন ইসতিগরাকের অর্থে একবচনের ওপর প্রবেশ করে,

তখন তা তাকে ব্যাপকতা দান করে। আর এই ভ্রূণকেও "নাফস" (প্রাণ) বলা হয়, সুতরাং সে এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁর বাণী إلا بالحق — অর্থাৎ শরীয়ত যে কারণ বর্ণনা করেছে তা ছাড়া। আর আল্লাহর কসম বলো, শরীয়ত কি এ কথা বলেছে যে, নারী তার ভ্রূণটি বিকৃত হওয়ার ভয়ে তা নষ্ট করে ফেলতে পারে? অবশ্যই না। কেননা দলীল সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান যার আছে, সে-ও নিশ্চিতভাবে জানে যে এটি হারাম এবং এ কারণে তাকে হত্যা করা কেবলই যুলুম, সীমালঙ্ঘন, নগ্ন কর্তৃত্ববাজি এবং তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্টি। আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তার মধ্যে একটি:— আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً...الآية

«আর যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন যথাযথ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না, এবং ব্যভিচার করে না; আর যে তা করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সে সেখানে চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে... আয়াতের বাকি অংশ।» — সূরা আল-ফুরকান: ৬৮-৬৯

সুতরাং আল্লাহ তাআলা যে প্রাণকে হারাম করেছেন তাকে হত্যা করা সেই হারামগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা গুরুত্বের দিক থেকে আল্লাহর সঙ্গে শিরকের পরপরই আসে। এ থেকে বোঝা যায় এর হারাম হওয়ার তীব্রতা এবং এ কথা যে, কোনো অবস্থাতেই এই নিরাপত্তাপ্রাপ্ত প্রাণটিকে হত্যা করা বৈধ নয় — তবে যদি তার টিকে থাকায় মায়ের ওপর নিশ্চিত ক্ষতি থাকে; তখন বলা হবে:— দুটি ক্ষতি সাংঘর্ষিক হলে অধিকতর ক্ষতিকরটিই বিবেচিত হবে, লঘুতরটি গ্রহণ করার মাধ্যমে।

তার মধ্যে একটি:— আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً

«আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার প্রতিদান জাহান্নাম — সেখানে সে চিরকাল থাকবে; আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।» — সূরা আন-নিসা: ৯৩

এ কারণে গর্ভপাত ঘটানোর প্রকৃত রূপ হলো, তা ইচ্ছাকৃতভাবে ও জবরদস্তিমূলকভাবে একটি মুমিন প্রাণকে হত্যা করা। সুতরাং যে তা করে, যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং যে তার কারণ হয় — নিঃসন্দেহে তারা এই হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাঁর বাণী ومن يقتل — এটি শর্তবাচক; আর তাঁর বাণী مؤمناً — এটি নাকিরা (অনির্দিষ্ট); আর কাওয়ায়িদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, শর্তের প্রসঙ্গে নাকিরা ব্যাপকতা বোঝায়। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনই এতে অন্তর্ভুক্ত, আর মুসলিম তো আরও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত; কেননা ঈমান হলো ইসলামের পরবর্তী স্তর। আর এই প্রাণটির ব্যাপারে বিধান দেওয়া হয় যে, সে একটি মুসলিম প্রাণ; সুতরাং হত্যার মাধ্যমে তার ওপর সীমালঙ্ঘন করা জায়েয নয়। আর যে সীমালঙ্ঘন করে তা করে ফেলে, সে এই ভয়ানক হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তার মধ্যে একটি:— আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علمٍ وحرموا ما رزقهم

الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين

> «নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নির্বুদ্ধিতাবশত অজ্ঞতার কারণে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটিয়ে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না।» — সূরা আল-আনআম: ১৪০

আর উসূলে সাব্যস্ত হয়েছে যে, ধর্তব্য হলো নসের শব্দের ব্যাপকতা, তার শানে-নুযূলের বিশেষত্ব নয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এ কাজের কারীর ব্যাপারে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ততার বিধান দিয়েছেন এবং একে নির্বুদ্ধিতা গণ্য করেছেন। আর এই আয়াতটি হুবহু প্রযোজ্য সেই ব্যক্তির ওপর, যে এই শয়তানি যুক্তি ও ইবলিসি ওয়াসওয়াসার ভিত্তিতে এই নিরাপত্তাপ্রাপ্ত নিরপরাধ প্রাণটিকে হত্যা করে। আর এই নিন্দাবাদ প্রমাণ করে যে এ কাজটি হারাম, এটি কুৎসিত, এটি একটি অপরাধ এবং এমন এক ক্ষতি যা সত্যনিষ্ঠ তাওবায়ে নাসূহা ছাড়া পূরণ হয় না; আর এটি বিবেকের দিক থেকে নির্বুদ্ধিতা, উন্মত্ততা ও অনুমাননির্ভরতা — যার কোনো সত্যতার ভিত্তি নেই, যা কোনো হিদায়াতের ওপর গড়ে ওঠেনি, এবং যার কর্তার কাছে ইলমের কোনো অবশেষও নেই; বরং তা নিছকই প্রবৃত্তি, সীমালঙ্ঘন ও কর্তৃত্ববাজি।

তার মধ্যে একটি:— আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم و إياكم

> «আর দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিই।» — সূরা আল-আনআম: ১৫১

আর সূরা আল-ইসরার আয়াতে তিনি বলেছেন:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ

«আর দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; আমিই তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দিই।» — সূরা আল-ইসরা: ৩১

আর আমাদের সামনে এখন এমন একটি দল আবির্ভূত হয়েছে, যারা ত্রুটির ভয়ে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে। তাদেরকে বলা হবে:— ত্রুটির ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; আল্লাহই তা নির্ধারণ করেছেন, তিনিই তাদের হিফাযতকারী ও রিযিকদাতা, তিনি তাদেরকে কখনোই নষ্ট হতে দেবেন না। সন্তান হত্যা করা নিরঙ্কুশভাবে সর্বসম্মতিক্রমে মুনকার; আর এখানে হারাম হওয়াকে দারিদ্র্য বা তার ভয়ের সঙ্গে শর্তযুক্ত করার কোনো "মাফহূম" (বিপরীত অর্থ) নেই, কারণ আলিমগণ একমত হয়েছেন যে অন্য কোনো কারণেও তা হারাম। আর প্রথম আয়াতগুলোতে ব্যাপকতা ও নিরঙ্কুশতা রয়েছে; আর কাওয়ায়িদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, "আম" (ব্যাপক) তার ব্যাপকতার ওপরই বহাল থাকে এবং দলীল ছাড়া তা বিশেষায়িত হয় না; আর "মুতলাক" (নিরঙ্কুশ) তার নিরঙ্কুশতার ওপরই বহাল থাকে এবং দলীল ছাড়া তা শর্তযুক্ত হয় না। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

তার মধ্যে একটি:— আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم

«হে নবী, মুমিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এই মর্মে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজেদের হাত ও পায়ের মাঝখানে কোনো অপবাদ রচনা করে আনবে না, এবং সৎ কাজে আপনার অবাধ্য হবে না — তখন আপনি তাদের বাইআত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।» — সূরা আল-মুমতাহিনা: ১২

আর এটি একটি নাফী (নেতিবাচক গঠন); আর কাওয়ায়িদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নাফী হলো নিষেধাজ্ঞা এবং তার চেয়েও বেশি কিছু। সুতরাং নবী ﷺ কর্তৃক এই নারীদের বাইআত গ্রহণ শর্তযুক্ত ছিল এই মর্মে যে, তারা নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আর এটি নিরঙ্কুশ, তাই ওয়াজিব হলো একে তার নিরঙ্কুশতার ওপরই রেখে দেওয়া এবং দলীল ছাড়া কোনো কিছু দিয়ে তা শর্তযুক্ত না করা। আর এমন কোনো গ্রহণযোগ্য দলীল আসেনি, যা মায়ের জন্য সন্তান বিকৃত হওয়ার ভয়ে তাকে হত্যা করাকে বৈধ করে — এমনকি চিকিৎসকগণ সে সিদ্ধান্ত দিলেও। কেননা তা তো গায়েবের ইলম; আর কত-শত রিপোর্ট চিকিৎসক-কমিটিগুলোর পক্ষ থেকে বেরিয়েছে, পরে তা মিথ্যা ও অসত্য প্রমাণিত হয়েছে,

আল্লাহ পাল্লা উল্টে দিয়েছেন এবং ধারণাগুলোর বিপরীত ঘটিয়েছেন — সমস্ত কিছুই তাঁর হাতে। এমনকি এই রিপোর্টের সত্যতা প্রমাণিত হলেও এই নিরাপত্তাপ্রাপ্ত প্রাণটিকে হত্যা করা বৈধ হয় না।

তার মধ্যে একটি:— সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে যা এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول

الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس و الثيب الزاني و المفارق

لدينه التارك للجماعة

«এমন কোনো মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়, যে সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল — তবে তিনটি কারণের একটির ভিত্তিতে: প্রাণের বদলে প্রাণ, বিবাহিত ব্যভিচারী, এবং দ্বীন পরিত্যাগকারী ও জামাআত ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তি।»

মুসলিমে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর ইসলামের কারণে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এই প্রাণটি এই তিনটির কোনোটিই তো করেনি, যার জন্য তার রূহ নিঃশেষ করা হবে। সে না হত্যাকারী যে তাকে হত্যা করা হবে, না সে বিবাহিত ব্যভিচারী, না সে তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাহলে আল্লাহর কসম বলো, কোন অধিকারে তার রক্ত হালাল করা হবে ও তার রূহ নিঃশেষ করা হবে? এ তো কেবল প্রবৃত্তি, যা তার অনুসারীদের নিয়ে ছুটে চলে। যেন এতে সন্তুষ্ট এই লোকেরা আমাদের কাছে হাদীসে বর্ণিত তিনটির ওপর একটি চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বাড়িয়ে নিতে চায়, আর তা হলো (والرجل يقتل ولده إذا كان مشوهاً) — "আর সেই ব্যক্তি, যে নিজের সন্তানকে হত্যা করে যখন সে বিকৃত হয়"। আর এটি মিথ্যা, অসত্য ও অপবাদ। সুতরাং এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে মুসলিম প্রাণ মর্যাদাপূর্ণ এবং তা চিকিৎসকদের রিপোর্টের অধীন নয়, প্রবৃত্তিপরায়ণদের খেলারও অধীন নয়। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

তার মধ্যে একটি:— ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه مالم يصب دماً حراماً

«মুমিন তার দ্বীনের ব্যাপারে প্রশস্ততার মধ্যেই থাকে, যতক্ষণ না সে কোনো হারাম রক্ত ঝরায়।» — বুখারী বর্ণনা করেছেন

আর তাঁর থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন:

إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها

سفك الدم الحرام بغير حله

«নিশ্চয় সেসব সংকটাপন্ন বিষয়ের একটি — যাতে নিজেকে ফেলে দিলে আর বেরোনোর পথ থাকে না — তা হলো অবৈধভাবে হারাম রক্ত প্রবাহিত করা।»

আর যে এই কারণে নিজের সন্তানকে হত্যা করে, এই হাদীসটি হুবহু তার ওপর প্রযোজ্য। সুতরাং সবচেয়ে বড় সংকটে পড়ে যাওয়ার পর সে যেন মুক্তির পথ খোঁজে।

তার মধ্যে একটি:— সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে যা এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ))

«তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কাজ থেকে বিরত থাকো।»

জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল, সেগুলো কী? তিনি বললেন:

الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق

وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات

المحصنات الغافلات

«আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, যাদু, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন যথাযথ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ খাওয়া, যুদ্ধের দিন পিঠ ফিরিয়ে পালানো, এবং সতী-সাধ্বী, উদাসীন মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ দেওয়া।»

আর এ থেকে দলীল গ্রহণের দিকটি স্পষ্ট।

তার মধ্যে একটি:— এ যুক্তিতে ভ্রূণকে হত্যা করা একটি মাফসাদা (ক্ষতি), আর তা সংঘটিত করার কারণ হলো একটি মাসলাহাত (কল্যাণ) অর্জন করা — অর্থাৎ যেন পিতা-মাতা তার লালন-পালনে ও তাকে দেখতে কষ্ট না পান এবং সে নিজেও তাতে কষ্ট না পায়। এখানে একটি মাফসাদা ও একটি মাসলাহাত সাংঘর্ষিক হয়েছে; আর কাওয়ায়িদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, মাফসাদা প্রতিহত করা মাসলাহাত অর্জনের চেয়ে অগ্রগণ্য।

তার মধ্যে একটি:— এখন গর্ভপাত ঘটিয়ে তাকে হত্যা করা একটি নিশ্চিত মাফসাদা, আর তার কারণ হলো একটি কল্পিত মাফসাদা প্রতিহত করা। কেননা চিকিৎসাবিদগণ জন্মগত বিকৃতির যে রূপ উল্লেখ করেছেন, সে অবস্থায় তার থাকা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না; কারণ তা গায়েবের ইলম, যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং তা একটি কল্পিত মাফসাদা; আর কাওয়ায়িদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, একটি কল্পিত মাফসাদা বিবেচনায় নেওয়ার জন্য একটি নিশ্চিত মাফসাদায় অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়।

বিকৃতির ভয়ে ভ্রূণ নষ্ট: দলিলসমূহ

জন্মগত বিকৃতির কারণে ভ্রূণ নষ্ট করা জায়েয নয়

ফতোয়ার সারকথা
সবচেয়ে বড় হারাম ও মুনকারগুলোর একটি

ইসরা ৩৩
আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না

ফুরকান ৬৮-৬৯
যথাযথ কারণ ছাড়া প্রাণ হত্যা — শিরকের পরপরই আসে

নিসা ৯৩
ইচ্ছাকৃত মুমিন হত্যার শাস্তি জাহান্নাম

আন'আম ১৫১ ও ইসরা ৩১
সন্তান হত্যা করো না; ত্রুটির ভয়েও নয়

ইবনু মাসঊদের হাদীস
মুসলিমের রক্ত হালাল কেবল তিনটি কারণে

মাফসাদা প্রতিহত
কল্পিত মাফসাদার জন্য নিশ্চিত মাফসাদা জায়েয নয়

ব্যতিক্রম
টিকে থাকায় মায়ের নিশ্চিত ক্ষতি থাকলে: দুই ক্ষতির অধিকতরটি বিবেচিত, লঘুতরটি গ্রহণ করে

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত দলিল; আলোচনা পরের অধ্যায়ে চলেছে

এক নজরে

- ★ রোগ গুনাহের কাফফারা; আজরের নিয়ত করা
- ★ ধৈর্য ওয়াজিব; রিদা সঠিক মতে মুস্তাহাব
- ★ মৃত্যু কামনা করা যাবে না; দুআয় তাড়াহুড়ো নয়
- ★ চিকিৎসকের জন্য হালাল নয় এমন নারীর সঙ্গে নির্জনতা ও করমর্দন হারাম
- ★ আকৃতি স্পষ্ট ভ্রূণ পড়লে নারী নুফাসা; আকৃতিহীন হলে ইস্তিহাযার বিধান
- ★ রূহ ফুঁকে দেওয়ার পর পড়লে গোসল, কাফন, জানাযা; আগে পড়লে জানাযা ছাড়া দাফন
- ★ বিকৃতির ভয়ে ভ্রূণ নষ্ট করা জায়েয নয়; চিকিৎসকের রিপোর্ট গায়েবের ইলম

যাচাই করুন

1. লেখকের মতে নিফাসের সর্বোচ্চ সীমা কত?

ক. চল্লিশ দিন | খ. সাত দিন | গ. ষাট দিন

2. আকৃতিহীন মাংসপিণ্ড পড়ে গেলে তার পরের রক্ত কী?

ক. নিফাসের রক্ত | খ. হায়েযের রক্ত | গ. ফাসাদের রক্ত; ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর বিধান

3. রূহ ফুঁকে দেওয়ার পর পড়ে যাওয়া শিশুর বিধান কী?

ক. গোসল, কাফন, জানাযা ও নাম রাখা; আকীকাও | খ. জানাযা ছাড়া দাফন | গ. ফেলে দেওয়া

4. মৃত্যু কামনা সম্পর্কে নবীর নির্দেশ কী?

ক. রোগীরা কামনা করতে পারে | খ. কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে | গ. কষ্ট বেশি হলে কামনা উত্তম

5. ধৈর্য ও রিদার হুকুম কী?

ক. ধৈর্য মুস্তাহাব, রিদা ওয়াজিব | খ. উভয়ই মুবাহ | গ. ধৈর্য ওয়াজিব, রিদা সঠিক মতে মুস্তাহাব

6. জন্মগত বিকৃতির কারণে ভ্রূণ নষ্ট করা সম্পর্কে ফতোয়া কী?

ক. চিকিৎসকগণ সিদ্ধান্ত দিলে জায়েয | খ. জায়েয নয়; সবচেয়ে বড় হারামগুলোর একটি | গ. মাকরূহ

উত্তর: ১-ক, ২-গ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-গ, ৬-খ

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত

প্রাণ সংহারের ভয়াবহতা, রোজাদারের চিকিৎসা, অস্ত্রোপচারের শর্ত ও মস্তিষ্কের মৃত্যু

এবং তার মধ্যে রয়েছে:— অন্যায়ভাবে প্রাণ সংহার করার ব্যাপারে যে কঠোর হুমকি ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা এসেছে, তা তো এসেছেই; সুতরাং এটি এমন এক বিরাট ক্ষতি (মাফসাদা), যা সহ্য করারও নয়, বহন করারও নয়। আর চিকিৎসাবিদগণ যে অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন সেই অবস্থায় তার টিকে থাকাও — যদি আমরা তাঁদের কথার সত্যতা মেনেও নিই — একটি ক্ষতি বটে, কিন্তু প্রথম ক্ষতিটির পাশে তা কিছুই নয়; তাকে হত্যা করার ক্ষতি বহু বহু গুণ বড়। আর মূলনীতিতে সাব্যস্ত আছে যে, দুটি ক্ষতি পরস্পরবিরোধী হলে লঘুতরটি মেনে নিয়ে গুরুতরটি থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতি লক্ষ রাখা হয়।

এবং তার মধ্যে রয়েছে:— যে ব্যক্তি এ কাজ করে, সে তো এ কারণেই করে যে, সন্তানটি জন্মগত ত্রুটিসম্পন্ন হবে — হয় পাগল, নয় নির্বোধ, নয়তো অঙ্গহীন, কিংবা এ জাতীয় কোনো ত্রুটি নিয়ে জন্মাবে। এখন আমরা যদি তাকে প্রশ্ন করি এবং বলি:— পৃথিবীতে কি এখন পাগল ও জন্মগতভাবে বিকৃত মানুষ নেই? স্বভাবতই সে বলবে:— হ্যাঁ, আছে। তখন তাকে বলা হবে:— তবে চলো আমরা তাদেরও হত্যা করি, কেননা যে কারণে (ইল্লত) তুমি এই ভ্রূণকে হত্যা করা বৈধ বলেছ, ঠিক সেই কারণটিই তো তাদের মধ্যে বাস্তবে বিদ্যমান! স্বভাবতই সে বলবে:— না, এটি জায়েয নয়। তখন তাকে বলা হবে:— কেন নয়? সে বলবে:— কারণ তারা তো সংরক্ষিত প্রাণ (নাফসে মা'সূমা)। তখন তাকে বলো:— এই ভ্রূণটিও কি সংরক্ষিত প্রাণ নয়? আর যদি সে বলে:— তারা তো জন্ম নিয়ে ফেলেছে, ব্যাপারটি চুকে গেছে; তবে তাকে বলো:— এই ভ্রূণটিও তো গঠন লাভ করেছে এবং তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়েছে, ব্যাপারটি চুকে গেছে। সে তো উত্তরাধিকার পায়, তার ওপর অপরাধ সংঘটিত হলে তার দিয়াত (রক্তপণ) দিতে হয়, বরং কোনো কোনো আলিমের মতে তার পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব। সুতরাং সে একটি বিদ্যমান প্রাণ। বরং আরও বলা হবে: — এই ভ্রূণের ত্রুটি তো নিশ্চিতভাবে জানা কোনো বিষয় নয়, কারণ সে এখনো জন্মই নেয়নি; পক্ষান্তরে ঐ পাগল ও জন্মগতভাবে বিকৃত মানুষদের মধ্যে ত্রুটি বাস্তবেই সংঘটিত হয়ে গেছে, সেটি ধারণাগত কোনো বিষয় নয়, বরং ঘটমান বাস্তবতা। কাজেই তোমার মতানুসারে তাদের হত্যা করা তো আরও অগ্রাধিকারযোগ্য হওয়ার কথা! কেননা বিকৃত হওয়ার আশঙ্কায় তুমি যদি ভ্রূণ হত্যা বৈধ করো, তবে যার বিকৃতি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত তাকে হত্যা করা বৈধ বলা তো আরও অগ্রাধিকারযোগ্য। এদের হত্যার বিরুদ্ধে তার যে উত্তর হবে, বিকৃতির আশঙ্কায় গর্ভপাত বৈধ করার বিরুদ্ধেও সেটিই তার প্রতি আমাদের উত্তর। বরং আমরা তাকে এ-ও বলব:— যার মধ্যে ত্রুটি চোখে দেখা যাচ্ছে তাকে হত্যা করাই যদি জায়েয না হয়, তবে যার মধ্যে ত্রুটি কেবল অনুমান করা হচ্ছে এবং যার বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাকে হত্যা করা কীভাবে জায়েয হবে? সন্দেহ নেই, অগ্রাধিকারক্রমে তা আরও বেশি নাজায়েয। আর উসূলে সাব্যস্ত আছে যে, মাফহূমুল মুওয়াফাকা আল-আওলাবি (অগ্রাধিকারমূলক সম্মতিসূচক অর্থ) দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। উসূলে আরও সাব্যস্ত আছে যে, শরীয়ত সদৃশ বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য করে না, আর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলোকে একত্রও করে না।

এবং তার মধ্যে রয়েছে:— সাব্যস্ত নিশ্চিত বিষয় হলো, এই প্রাণটির টিকে থাকা অপরিহার্য এবং তার ওপর সীমালঙ্ঘন হারাম — যতক্ষণ না আরেকটি নিশ্চিত জ্ঞান তার বিপরীত সাব্যস্ত করে। আর এই দ্বিতীয় নিশ্চিত জ্ঞানকে অবশ্যই কোনো শরঈ দলিলের ওপর ভিত্তি করতে হবে — কুরআন, সুন্নাহ, কিংবা এ দুটি থেকে উৎসারিত সাব্যস্ত ইজমা অথবা বিশুদ্ধ কিয়াস। অথচ এ মাসআলায় চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে যেসব প্রতিবেদন আসে, সেগুলো ধারণা, অনুমান ও ভবিষ্যৎ-পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কিছুই দেয় না; সেগুলো সংশয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে না। আর মূলনীতিতে সাব্যস্ত আছে

যে, নিশ্চিত জ্ঞান সংশয় দ্বারা দূর হয় না, আর এমন মিথ্যা ধারণা দ্বারাও নয় যা কোনো ইলম বা হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

এবং তার মধ্যে রয়েছে:— শিশুটির বিকৃত অবস্থায় থাকা একটি ক্ষতি, আর তাকে হত্যা করাও একটি ক্ষতি। মূলনীতিতে সাব্যস্ত আছে যে, ক্ষতি দ্বারা ক্ষতি দূর করা যায় না। এটি যদি সমপরিমাণ ক্ষতির ক্ষেত্রেই হয়, তবে আমরা কীভাবে লঘুতর ক্ষতিটি দূর করব গুরুতর ক্ষতিটি সংঘটিত করে? কেননা তাকে গর্ভপাতের মাধ্যমে ফেলে দেওয়া মানে তাকে হত্যা করা, তাকে তার বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, তার ওপর সীমালঙ্ঘন ও অপরাধ করা। সুতরাং ক্ষতি যখন সমপরিমাণ ক্ষতি দ্বারা দূর করা যায় না, তখন তার চেয়ে গুরুতর ক্ষতি দ্বারা দূর করলে কী হবে? সন্দেহ নেই, তা নিষেধের দিক থেকে আরও বড় এবং অপরাধের দিক থেকে আরও কঠিন। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা।

এসবের ভিত্তিতে বলা যায় যে, তাকে গর্ভপাত করা জায়েয নয়। আর যে ব্যক্তি এই কারণে গর্ভপাত ঘটাল, তার ওপর দিয়াত ও কাফফারা বর্তাবে, এবং কিয়ামতের দিন তার হিসাব আল্লাহর কাছে। কেননা কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়ে ফয়সালা করা হবে তা হলো রক্তপাতের বিষয়। এই মাসআলার অনুরূপ একটি মাসআলা সম্পর্কে "আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল-বুহূসিল ইলমিয়্যা ওয়াল-ইফতা" (স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটি)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা উত্তরে বলেন:—

بأنه لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال مع العلم بأنه قد يشفيه الله تعالى بما بقي من المدة ويولد سليماً كما وقع ذلك لكثير من الناس

"প্রশ্নে উল্লিখিত বিকৃতির কারণে তাকে গর্ভপাত করা জায়েয নয়; বিশেষত জেনে রাখা দরকার যে, অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ করে দিতে পারেন এবং সে সুস্থ অবস্থায়ই জন্ম নিতে পারে — যেমনটি বহু মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটেছে।" — উদ্ধৃতি শেষ

তাঁদের কাছে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এমন এক ভ্রূণ সম্পর্কে, যার ব্যাপারে কিছু চিকিৎসকের ধারণা ছিল যে সে হাড় ছাড়া জন্ম নেবে; তাঁরা উত্তরে বলেন:—

لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد ظن الأطباء أنه يولد بلا عظام لأن الأصل تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق

"কেবল চিকিৎসকদের এই ধারণার ভিত্তিতে যে সে হাড় ছাড়া জন্ম নেবে, ভ্রূণ গর্ভপাত করা জায়েয নয়; কারণ মূলনীতি হলো, অন্যায়ভাবে সংরক্ষিত প্রাণ হত্যা করা হারাম।" — উদ্ধৃতি শেষ

সম্মানিত পিতৃতুল্য শায়খ আবদুল আযীয ইবনু বায রহিমাহুল্লাহু তাআলাকে এমন গর্ভ নষ্ট করার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যার মধ্যে জন্মগত ত্রুটি ও বিকৃতি ধরা পড়েছে। তিনি উত্তরে বলেন:—

لا يجوز ذلك بل الواجب تركه فقد يغيره الله, وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليماً والله يبتلي عباده بالسراء والضراء ولا يجوز إسقاطه من أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوهاً بل يجب الإبقاء عليه وإذا وجد مشوهاً فالحمد لله, يستطيع والده تربيته والصبر عليه ولهما في ذلك أجر عظيم ولهما أن يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك ولا حرج في ذلك, وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس ثم تتعدل الأمور ويشفيه الله تعالى وتزول أسباب التشوه

"এটি জায়েয নয়; বরং একে ছেড়ে দেওয়াই ওয়াজিব। হতে পারে আল্লাহ তার অবস্থা বদলে দেবেন। চিকিৎসকেরা অনেক রকম ধারণা করে থাকেন, অথচ আল্লাহ তাঁদের ধারণা বাতিল করে দেন এবং সন্তান সুস্থ অবস্থায় জন্ম নেয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সুখ ও দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করেন। চিকিৎসকের কাছে বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে — এ কারণে গর্ভপাত করা জায়েয নয়; বরং তাকে রেখে দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি সে বিকৃত অবস্থায়ই জন্ম নেয়, তবে আলহামদুলিল্লাহ; তার পিতা তাকে লালন-পালন করতে পারেন ও তার ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে পারেন, এতে তাদের উভয়ের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আর তারা চাইলে তাকে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠিত পরিচর্যাকেন্দ্রে সমর্পণ করতে পারেন, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। অনেক সময় অবস্থা বদলে যায় — পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে তাঁরা বিকৃতির ধারণা করেন, তারপর অবস্থা ঠিক হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ করে দেন এবং বিকৃতির কারণগুলো দূর হয়ে যায়।" — উদ্ধৃতি শেষ

এই ছিল তাঁর রহিমাহুল্লাহু তাআলার বক্তব্য। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

বিকৃতির ভয়ে গর্ভপাত: আরও দলিল

বিকৃতির আশঙ্কায় গর্ভপাত জায়েয নয়

ক্ষতির তুলনা
হত্যার ক্ষতি বহু গুণ বড়; লঘুতর মেনে গুরুতর থেকে রক্ষা

বিকৃত মানুষদের যুক্তি
একই ইল্লতে তাদেরও হত্যা বৈধ হতো; তারা সংরক্ষিত প্রাণ

ভ্রূণ বিদ্যমান প্রাণ
উত্তরাধিকার পায়; অপরাধে দিয়াত

নিশ্চিত ও সংশয়
চিকিৎসকদের প্রতিবেদন ধারণা মাত্র; নিশ্চিত জ্ঞান সংশয়ে দূর হয় না

ক্ষতি দ্বারা ক্ষতি
ক্ষতি সমপরিমাণ ক্ষতি দ্বারা দূর করা যায় না

স্থায়ী কমিটি
জায়েয নয়; আল্লাহ সুস্থ করে দিতে পারেন

ইবনু বায
জায়েয নয়; ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব

পরিণতি
গর্ভপাতকারীর ওপর দিয়াত ও কাফফারা; হিসাব আল্লাহর কাছে

পূর্বের প্রশ্ন ১২-এর ধারাবাহিক দলিল

প্রশ্ন ১৩

রোজাদারের জন্য ডায়াবেটিসের ইনজেকশন এবং মুখ, নাক বা চোখের ড্রপ ব্যবহারের শরঈ হুকুম কী? আর রোজাদারকে যদি রক্ত দেওয়া হয় তার হুকুম কী; রোজা অবস্থায় রক্তদান করার, কিংবা রক্তের গ্রুপ ইত্যাদি জানার জন্য তার শরীর থেকে রক্তের নমুনা নেওয়ার হুকুম কী? আর রোজাদারের জন্য রোজা অবস্থায় হাঁপানির স্প্রে (ইনহেলার) ব্যবহার করা কি জায়েয?

উত্তর: এ প্রশ্নটির অনেকগুলো শাখা রয়েছে; উত্তর সহজ করার জন্য আমি একে কয়েকটি মাসআলায় ভাগ করছি:—

প্রথম মাসআলা:— প্রথমেই তোমাকে রোজার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক নীতি (দাবিত) জানতে হবে। এই নীতি বলে:— অভ্যস্ত প্রবেশপথের ক্ষেত্রে পথের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আর তা ছাড়া অন্য পথের ক্ষেত্রে পুষ্টির দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এর ব্যাখ্যা এই যে, কোনো জিনিস যখন রোজাদারের পেটের ভেতরে (জাওফ) প্রবেশ করে, তখন দুই অবস্থার বাইরে যায় না:— হয় তা কোনো অভ্যস্ত পথ দিয়ে প্রবেশ করে — যা দ্বারা উদ্দেশ্য মুখ ও নাক; নয়তো অনভ্যস্ত পথ দিয়ে প্রবেশ করে — যেমন শিরা-উপশিরা, চোখ, কান ইত্যাদি। এখন এই জিনিসটি যদি কোনো অভ্যস্ত পথ দিয়ে প্রবেশ করে পেটে পৌঁছায়, তবে তা রোজা নষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে — জিনিসটির প্রকৃতির দিকে না তাকিয়েই, অর্থাৎ তা পুষ্টিকর কি না তা না দেখেই; কারণ এখানে পথের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আর যদি জিনিসটি অনভ্যস্ত পথ দিয়ে পেটে পৌঁছায়, তবে তা রোজায় প্রভাব ফেলবে না — যদি না তা পুষ্টিকর হয়, অর্থাৎ এমন কিছু হয় যা দ্বারা দেহ পুষ্টি লাভ করে এবং যা খাদ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়। অর্থাৎ আমরা দেখব: প্রবেশকারী বস্তুটি যদি পুষ্টিকর হয় তবে রোজা নষ্ট হবে, আর পুষ্টিকর না হলে তাতে কিছু নেই, কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং অনভ্যস্ত পথের ক্ষেত্রে পুষ্টির দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আর অভ্যস্ত পথের ক্ষেত্রে আমরা কোনো তাফসীল (ভাগ) করি না।

রোজার নিয়ামক নীতি: পথ ও পুষ্টি

অভ্যস্ত পথ (মুখ, নাক)	অনভ্যস্ত পথ (শিরা, চোখ, কান)
পথের দিকটি প্রাধান্য পায়	পুষ্টির দিকটি প্রাধান্য পায়
পেটে পৌঁছালে রোজায় প্রভাব ফেলে	পুষ্টিকর হলে রোজা নষ্ট হয়
পুষ্টিকর কি না তা দেখা হয় না	পুষ্টিকর না হলে কোনো অসুবিধা নেই

এর ভিত্তিতে আমি বলি:— ডায়াবেটিসের ইনজেকশন দুই প্রকার: এক প্রকার ইনজেকশন সুগারের মাত্রা কমে গেলে তা বাড়িয়ে দেয়, আরেক প্রকার মাত্রা বেড়ে গেলে তা কমিয়ে দেয়। প্রথমটি রোজা ভঙ্গকারী, আর দ্বিতীয়টিতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এই ইনজেকশন তো — যেমনটি সুবিদিত — অনভ্যস্ত পথ দিয়েই পেটে প্রবেশ করে; কিন্তু প্রথম অবস্থায় তা দেহকে বাড়তি খাদ্য জোগায়, ফলে তা খাওয়া-পান করার অর্থে গণ্য হয়; কেননা তা দেহের দুর্বলতাকে শক্তিতে এবং নিস্তেজতাকে সবলতায় ফিরিয়ে দেয় — আর এটিই তো খাওয়া-পান করার ফল। সুতরাং তা খাওয়া-পান করার অর্থেই ধর্তব্য। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থার এই ইনজেকশন বাড়তি খাদ্য নিঃশেষ করে ও পুড়িয়ে দেয়, দেহকে বাড়তি কোনো খাদ্য দেয় না; তার প্রকৃতি হলো অপসারণ, বৃদ্ধি নয়। কাজেই তা খাওয়া-পানও নয়, খাওয়া-পানের অর্থেও নয়। সুতরাং যে ইনজেকশন সুগারের মাত্রা বাড়ায় তা রোজা ভঙ্গকারী, আর যে ইনজেকশন মাত্রা কমায় তা প্রভাব ফেলে না। তবে রোজাদার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি তা ইফতারের পর পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়, তবে সেটিই উত্তম — মতভেদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য।

আর মুখের ড্রপের ব্যাপারে কথা হলো, তা পেটে পৌঁছালে রোজা নষ্ট করে; কারণ তা মুখ দিয়ে প্রবেশ করে, আর মুখ একটি অভ্যস্ত পথ; আর নিয়ামক নীতিতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, অভ্যস্ত পথের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। নাকের ড্রপও তেমনি, পেটে পৌঁছালে রোজা নষ্ট করে; কারণ নাকও একটি অভ্যস্ত পথ, তাই তার দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর চোখের ড্রপ রোজা নষ্ট করে না; কারণ তা পুষ্টিকর নয় এবং তা অনভ্যস্ত পথ দিয়ে প্রবেশ করেছে। কানের ড্রপও রোজা ভঙ্গকারী নয়; কারণ তা পুষ্টিকর নয় এবং অনভ্যস্ত পথ দিয়ে প্রবেশ করেছে।

আর রোজাদারকে যদি স্বেচ্ছায়, জেনেশুনে ও রোজার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় কিছু রক্ত দেওয়া হয়, তবে তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে; কারণ এই রক্ত দ্বারা দেহের পুষ্টি ও শক্তি অর্জিত হয়, তাই তা খাওয়া-পান করার অর্থে গণ্য। যদি তুমি বলো:— কিন্তু তা তো শিরা দিয়ে প্রবেশ করেছে, আর শিরা তো অনভ্যস্ত পথ? তবে আমি বলি:— হ্যাঁ, কিন্তু তা পুষ্টিকর; আর আমাদের নিয়ামক নীতিতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, অনভ্যস্ত পথ দিয়ে প্রবেশ করা জিনিসের ক্ষেত্রে পুষ্টির দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আর হাঁপানির স্প্রের ব্যাপারে অগ্রগণ্য মত — আল্লাহই ভালো জানেন — এই যে, তা রোজা নষ্ট করে; কারণ তা মুখ দিয়ে পেটে পৌঁছায়, আর মুখ একটি অভ্যস্ত পথ। সুতরাং এটি উল্লিখিত নিয়ামক নীতিরই একটি শাখা। এসব মাসআলার অধিকাংশেই মতভেদ রয়েছে, আর সেই মতভেদ ইজতিহাদি; কারও মতকে কারও ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কাজেই রোজাদার যদি হাঁপানির স্প্রে ব্যবহারে বাধ্য হয়, তবে সে তা ব্যবহার করতে পারবে এবং পরে অন্য দিনগুলোতে কাযা আদায় করবে। আর যদি তার রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং দিনে-রাতে সর্বক্ষণ স্প্রে ব্যবহারে বাধ্য হয়, আর প্রবল ধারণা হয় যে সে এ রোগ থেকে সুস্থ হবে না, তবে সে রোজা ভাঙতে পারবে এবং তার ওপর কাফফারা বর্তাবে; কারণ সে এমন রোগে আক্রান্ত যা তাকে রোজা রাখতে দেয় না এবং মানবীয় জ্ঞানের সীমার মধ্যে যার আরোগ্যের আশা করা যায় না। কেননা হাঁপানির স্প্রে এমন একটি বস্তু যার দেহ (জরম) আছে এবং যা অভ্যস্ত পথ দিয়ে পেটে পৌঁছায়, তাই তা রোজা নষ্টকারী। সুতরাং এই সব শাখা-মাসআলাই উল্লিখিত নিয়ামক নীতির অধীনে পড়ে,

যে নীতি বলে:— অভ্যস্ত প্রবেশপথের ক্ষেত্রে পথের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আর তা ছাড়া অন্য পথের ক্ষেত্রে পুষ্টির দিকটিকে। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্বিতীয় মাসআলা:— রক্তদান বা রক্ত পরীক্ষার মাসআলা। এই মাসআলাটি গড়ে উঠেছে হিজামা (শিঙ্গা লাগানো) রোজা ভঙ্গকারী কি না — সেই মাসআলার ওপর, এবং অল্প ও বেশির মধ্যে পার্থক্য করার মাসআলার ওপর। কোনো কোনো দিক থেকে একে বমির মাসআলার ওপরও কিয়াস করা যায়। সুতরাং আমি বলি — আর আল্লাহর কাছেই তাওফিক, তাঁর কাছেই সাহায্য, অনুগ্রহ ও উত্তম তাহকীক প্রার্থনা করি:—

জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করুন, আলিমগণ রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা ফয়সালা করেছেন যে, শরীয়তে যেসব হুকুম এসেছে অথচ শরীয়তেও তার কোনো সীমা নির্ধারিত হয়নি, ভাষাতেও নয় — সেসবের সীমা নির্ধারণে উরফ (প্রচলিত রীতি)-এর দিকে ফিরে যেতে হয়। এটি একটি উসূলি কায়েদা, আর আমরা তা কবিতায় গেঁথেছি এই বলে:—

وكل ما ليس له في الشرع حد

فاحدده بالعرف كحرز دون رد

> "শরীয়তে যে বিষয়ের কোনো সীমা নির্ধারিত নেই, / তুমি তা উরফ দিয়েই নির্ধারণ করো — যেমন 'হিরয' (সংরক্ষিত হেফাজতস্থল), এতে কোনো প্রত্যাখ্যান নেই।"

আলিমগণ এমন কিছু মাসআলায় অল্প ও বেশির মধ্যে পার্থক্য করেন; তাঁরা বলেন:— এটি প্রভাব ফেলে না, কারণ এটি অল্প; আর ওটি প্রভাব ফেলে, কারণ ওটি বেশি। রক্ত পরীক্ষার মাসআলাটিও এই মূলনীতির অধীনেই পড়ে। সুতরাং পরীক্ষার জন্য যে রক্ত প্রয়োজন হয় তা যদি উরফের বিচারে অল্প হয়, তবে রোজাদারের জন্য তা বের করা জায়েয, এতে কোনো অসুবিধা নেই; এ ধরনের বিষয়ে ছাড় দেওয়া হয়। আর যদি প্রয়োজনীয় রক্ত উরফের বিচারে বেশি হয়, অর্থাৎ উরফের হিসেবে "অধিক"-এর সীমায় পড়ে, তবে তা রোজা নষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে; কাজেই রোজাদারের জন্য রোজা অবস্থায় সেই পরিমাণ রক্ত বের করা জায়েয নয়। আর আমাদের এখানে সাব্যস্ত প্রচলিত উরফে জানা কথা হলো, যে রক্ত দিয়ে পরীক্ষা করা হয় তা অল্প রক্ত, এমনটিতে ছাড় দেওয়া হয়। তবে রোজাদারের জন্য উত্তম হলো, সম্ভব হলে তা রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া। কিন্তু কিছু ধরনের পরীক্ষা আছে যেগুলোতে অনেক রক্ত প্রয়োজন হয়; তা যদি উরফের বিচারে অধিক হয়, তবে তা জায়েয নয় এবং তাতে রোজা নষ্ট হয়ে যায়। এই হলো পরীক্ষার মাসআলার হুকুম।

আর রক্তদানের মাসআলার ব্যাপারে কথা হলো, চালু উরফে রক্তদানের প্রক্রিয়া উরফের বিচারে অধিক পরিমাণ রক্ত টেনে নেওয়া ছাড়া হয় না; রক্তদান প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ রক্ত নেওয়া হয় তা অনেক। কাজেই যেহেতু তা উরফের বিচারে "অধিক"-এর সীমায় পড়ে, তাই রোজাদারের জন্য রক্তদান করা জায়েয নয়; কারণ এই দানের মাধ্যমে সে তার রোজা নষ্ট করে ফেলে, অথচ তাকে তার রোজা রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর রক্তদান বর্জন করা ছাড়া সেই রক্ষা পূর্ণ হয় না; সুতরাং তা বর্জন করা ওয়াজিব — কেননা হারাম বর্জন যা ছাড়া পূর্ণ হয় না, তা বর্জন করাও ওয়াজিব।

এই মাসআলার দলিল কিয়াসনির্ভর — অর্থাৎ হিজামার ওপর কিয়াস। কেননা সহীহ দলিল — তার সমস্ত সনদ ও সমর্থক বর্ণনার সমষ্টি দ্বারা — সাব্যস্ত হয়েছে যে, হিজামা রোজা নষ্টকারী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। হিজামা হলো দূষিত রক্ত বের করা, কিন্তু যেহেতু তা দেহে দুর্বলতা ও নিস্তেজতা সৃষ্টি করে, তাই তার ওপর রক্তদানের জন্য রক্ত বের করাকে কিয়াস করা হয়। বরং এখানকার কিয়াস অগ্রাধিকারমূলক (কিয়াসে আওলা), কেননা রক্তদানে যে রক্ত বের হয় তা হিজামায় বের হওয়া রক্তের চেয়ে অনেক বেশি — যেমনটি সুবিদিত। সুতরাং যেহেতু ইল্লত এক, তাই কিয়াসের কথা বলা হয়; কারণ শরঈভাবে সাব্যস্ত যে, শরীয়ত সদৃশ বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য করে না এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলোকে একত্র করে না। মূলনীতিতে আরও সাব্যস্ত যে, অগ্রাধিকারমূলক কিয়াস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য; উসূলে আরও সাব্যস্ত যে, বিশুদ্ধ কিয়াস দলিল, তা থেকে শরঈ হুকুম উদ্ভাবন করা হয়। সুতরাং এখানে মূল (আসল) হলো হিজামা, শাখা (ফার') হলো রক্তদান, ইল্লত হলো দেহের দুর্বলতা, নিস্তেজতা ও শক্তিহীনতা, আর হুকুম হলো:— যেমন এই ইল্লতের কারণে হিজামা রোজা ভঙ্গকারী, তেমনি রক্তদানও রোজা ভঙ্গকারী — কেননা ইল্লতটি তাতে বিদ্যমান; বরং তা অগ্রাধিকারযোগ্য, যেমনটি একটু আগেই উল্লেখ করলাম যে, রক্তদানে সৃষ্ট দুর্বলতা ও নিস্তেজতা হিজামায় সৃষ্ট দুর্বলতার চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও অধিক পরিমাণ।

কাজেই তোমাকে যদি বলা হয়:— রক্তদান রোজা নষ্ট করে — এর দলিল কী? তবে তুমি বলো:— দলিল হলো হিজামার ওপর তার কিয়াস। আর আরেকটি কিয়াস রয়েছে:— তা হলো ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করার ওপর রক্তদানের কিয়াস, উভয়ের মধ্যকার অভিন্ন দিক হলো এরপর দেহে যে দুর্বলতা ও নিস্তেজতা সৃষ্টি হয়। এখানে মূল হলো ইচ্ছাকৃত বমি করা, শাখা হলো রক্তদান, ইল্লত হলো দেহের দুর্বলতা, নিস্তেজতা ও শক্তির অবসন্নতা, আর হুকুম হলো:— যেমন ইচ্ছাকৃত বমি করা রোজা নষ্টকারী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি রক্তদানও।

সম্মানিত পিতৃতুল্য শায়খ আবদুল আযীয ইবনু বাযকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, দেহ থেকে বের হওয়া যে রক্ত রোজা নষ্ট করে তার নিয়ামক সীমা কী? তিনি উত্তরে বলেন:—

الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة لقول النبي ﷺ أفطر الحاجم والمحجوم ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً فإنه يفسد الصوم كالحجامة لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف وكالجرح في البدن من السكين عند تقطيع اللحم أو وطئه على زجاج ونحوه فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير كذلك لو خرج

دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة, كالدم الذي يؤخذ للتحليل فإنه لا يفسد الصوم أيضاً

"রোজা নষ্টকারী রক্ত হলো সেই রক্ত যা হিজামার মাধ্যমে বের হয় — নবী ﷺ-এর বাণীর কারণে: ((শিঙ্গা লাগানো ব্যক্তি ও যাকে শিঙ্গা লাগানো হলো — উভয়ের রোজা ভেঙে গেল))। আর হিজামার ওপর কিয়াস করা হবে সেই সবকিছু যা তার অর্থে পড়ে, অর্থাৎ মানুষ স্বেচ্ছায় যা করে এবং তাতে তার শরীর থেকে অনেক রক্ত বের হয়ে দেহে দুর্বলতা সৃষ্টি করে — তা হিজামার মতোই রোজা নষ্ট করে; কারণ ইসলামী শরীয়ত দুটি সদৃশ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না, যেমন দুটি ভিন্ন বিষয়কে একত্র করে না। পক্ষান্তরে মানুষ থেকে যা অনিচ্ছাকৃতভাবে বের হয় — যেমন নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ, কিংবা গোশত কাটার সময় ছুরির আঘাতে দেহে জখম, অথবা কাচ ইত্যাদির ওপর পা পড়ে জখম — তা রোজা নষ্ট করে না, যদিও তা থেকে অনেক রক্ত বের হয়। তেমনি যদি অল্প রক্ত বের হয় যা হিজামার মতো প্রভাব ফেলে না — যেমন পরীক্ষার জন্য যে রক্ত নেওয়া হয় — তবে তাও রোজা নষ্ট করে না।" — উদ্ধৃতি শেষ

রোজাদার ও চিকিৎসা: হুকুম

বিষয়	হুকুম
ডায়াবেটিসের ইনজেকশন — সুগারের মাত্রা বাড়ায়	রোজা ভঙ্গকারী
ডায়াবেটিসের ইনজেকশন — সুগারের মাত্রা কমায়	প্রভাব ফেলে না
মুখের ড্রপ ও নাকের ড্রপ (পেটে পৌঁছালে)	রোজা নষ্ট করে
চোখের ড্রপ ও কানের ড্রপ	রোজা নষ্ট করে না
স্বেচ্ছায়, জেনেশুনে ও রোজার কথা স্মরণে থাকা অবস্থায় রক্ত দেওয়া হলে	রোজা নষ্ট হয়
হাঁপানির স্প্রে	অগ্রগণ্য মতে রোজা নষ্ট করে; মতভেদ ইজতিহাদি
পরীক্ষার জন্য উরফের বিচারে অল্প রক্ত	জায়েয; সম্ভব হলে রাত পর্যন্ত পিছানো উত্তম
রক্তদান	জায়েয নয়; রোজা নষ্ট হয় (হিজামার ওপর কিয়াস)

লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী

এই ছিল তাঁর রহিমাহুল্লাহু তাআলার বক্তব্য।

প্রশ্ন ১৪

চিকিৎসাগত অস্ত্রোপচারের (সার্জারি) হুকুম কী, এবং তা বৈধ হওয়ার শর্তগুলো কী কী?

উত্তর: আমি বলি:— চিকিৎসাগত অস্ত্রোপচার জায়েয, যদি তার শর্তগুলো পাওয়া যায় এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো অনুপস্থিত থাকে। এর বৈধতার দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:—

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

> "আর যে কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতির প্রাণ রক্ষা করল।" — সূরা আল-মায়িদা: ৩২

আর চিকিৎসাগত অস্ত্রোপচার মানব-প্রাণ রক্ষার অন্যতম উপকরণ। কত প্রাণই তো মৃত্যুর মুখে কিংবা কোনো অঙ্গ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ছিল, অথচ প্রথমত আল্লাহর অনুগ্রহে এবং দ্বিতীয়ত অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ভয় নিরাপত্তায় রূপ নিয়েছে এবং সেই প্রাণের সর্বাঙ্গে প্রাণসঞ্চার ফিরে এসেছে। এ কারণেই অস্ত্রোপচার শরীয়তের মহান উদ্দেশ্যগুলোর একটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে, আর তা হলো প্রাণরক্ষা। কত প্রাণকেই তো আল্লাহ তাআলা এ ধরনের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন! আর মূলনীতিতে জানা কথা যে, ওয়াজিব যা ছাড়া পূর্ণ হয় না, তা-ও ওয়াজিব। কাজেই প্রাণরক্ষা যদি অস্ত্রোপচার ছাড়া বাস্তবায়িত না হয়, তবে অস্ত্রোপচার ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং অস্ত্রোপচার মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহের একটি — বিশেষত এই বিপুল চিকিৎসা-অগ্রগতির যুগে, যা এসব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির রূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে বহু কল্যাণ অর্জিত হয় এবং বহু অকল্যাণ প্রতিহত হয়; আর এ সবই আল্লাহ তাআলার তাওফিক এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ, তিনি মহান ও সমুন্নত।

এর বৈধতার আরেকটি দলিল:— ইমাম মুসলিম তাঁর "সহীহ"-এ জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:—

بعث رسول الله ﷺ إلى أبي بن كعبٍ طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه

> "রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনু কা'বের কাছে একজন চিকিৎসক পাঠালেন; সে তাঁর একটি শিরা কেটে দিল, তারপর তাতে দাগ (কাই) দিয়ে দিল।"

নবী ﷺ চিকিৎসকের এই কর্তন ও দাগ দেওয়ার কাজটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আর এটি অস্ত্রোপচার-জাতীয় কাজেরই একটি প্রকার। যখন তিনি ﷺ তা স্বীকৃতি দিলেন, তখন তা বৈধতার প্রমাণ বহন করে; কারণ মূলনীতিতে সাব্যস্ত যে, তাঁর ﷺ-এর স্বীকৃতি বৈধতার দলিল।

বৈধতার আরেকটি দলিল হলো হিজামা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো, যার কিছু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কারণ হিজামা চামড়ার উপরিভাগ চিরে দূষিত রক্ত বের করার ওপর ভিত্তি করে হয়, সুতরাং তা অস্ত্রোপচার-জাতীয় কাজেরই একটি প্রকার।

বৈধতার আরেকটি দলিল:— খতনা সম্পর্কে বর্ণিত দলিলসমূহ; সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস:—

الفطرة خمس، الختان و الاستحداد و تقليم الأظافر و قص الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ

> "ফিতরাত পাঁচটি: খতনা করা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, গোঁফ ছোট করা এবং বগলের লোম উপড়ে ফেলা।"

সকলের কাছেই জানা যে, খতনা অস্ত্রোপচারমূলক কাজেরই অন্তর্ভুক্ত; কারণ তা ক্ষুর ব্যবহার করে বাড়তি চামড়া কেটে ফেলার ওপর ভিত্তি করে হয়। তবে তা ছোট অপারেশনগুলোর অন্তর্ভুক্ত; তা সত্ত্বেও তা অস্ত্রোপচারমূলক কাজের সাধারণ অর্থের মধ্যেই পড়ে, অথচ শরীয়তপ্রণেতা একে ফিতরাতের বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি বানিয়েছেন। কাজেই এ থেকে অস্ত্রোপচারের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

বৈধতার আরেকটি দলিল হলো ইজমা; কেননা কোনো কোনো আলিম বর্ণনা করেছেন যে, শর্তসমূহ পাওয়া গেলে ও প্রতিবন্ধকতা অনুপস্থিত থাকলে অস্ত্রোপচারমূলক কাজ বৈধ — এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত।

আরেকটি দলিল হলো এই অস্ত্রোপচারগুলোকে উসূল, কায়েদা ও শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলির শাখা হিসেবে বিন্যস্ত করা। এসব অপারেশনের মাধ্যমে প্রাণ কিংবা অঙ্গ রক্ষা পায়, আর এগুলোর রক্ষা শরীয়তের অপরিহার্য (দরূরি) উদ্দেশ্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এসব অপারেশনের মাধ্যমে বিরাট কল্যাণ অর্জিত হয় এবং বহু অকল্যাণ প্রতিহত হয়; আর শরীয়ত এসেছে কল্যাণ সাব্যস্ত করতে ও পূর্ণ করতে এবং অকল্যাণ হ্রাস ও অচল করতে। এসব অপারেশনে কিছু ক্ষতি থাকলেও তা এর চেয়ে বড় ও কঠিন ক্ষতিকে প্রতিহত করে; আর দুটি ক্ষতি সাংঘর্ষিক হলে লঘুতরটি মেনে নিয়ে গুরুতরটি থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতি লক্ষ রাখা হয়। এ-ও সাব্যস্ত যে, গুরুতর ক্ষতি লঘুতর ক্ষতি দ্বারা প্রতিহত করা হয়।

সুতরাং এসব দলিল তোমাকে অস্ত্রোপচারের বৈধতা জানিয়ে দেয়। তবে এই বৈধতা কতিপয় শর্তসাপেক্ষ, যেগুলো আলিমগণ রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ:—

প্রথম শর্ত:— অস্ত্রোপচারটি শরীয়তসম্মত হতে হবে। এই শর্তের ভিত্তিতে বলা যায়, শরীয়তে হারাম অস্ত্রোপচারগুলো করা জায়েয নয়; চিকিৎসকের জন্য এমন কিছু করা জায়েয নয়, আর রোগীর জন্যও মূলত জায়েয নয় যে সে চিকিৎসকের কাছে তা করে দিতে বলে। কাজেই হারাম গর্ভপাতের অস্ত্রোপচার জায়েয নয়; যে তা করে এবং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে উভয়েই গুনাহগার, আর তার মাধ্যমে অর্জিত উপার্জন অবৈধ ও হারাম। তেমনি কিছু কসমেটিক (সৌন্দর্যবর্ধক) অস্ত্রোপচারও — যেমনটির বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহু তাআলা সামনে আসছে। তেমনি লিঙ্গ পরিবর্তনের অস্ত্রোপচার — তা তার সব রূপেই হারাম; বরং তা কঠিনতম হারাম ও গুরুতরতম অন্যায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় শর্ত:— রোগীর এই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন থাকতে হবে। এর ভিত্তিতে, রোগীর যদি এই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন না থাকে, তবে তা চাওয়া তার জন্য জায়েয নয়; আর সে চাইলেও চিকিৎসকের জন্য তাতে সাড়া দেওয়া জায়েয নয়। কারণ অস্ত্রোপচারমূলক কাজ মূলত নিষিদ্ধ, কেবল তা ছাড়া যা দরূরত (অপরিহার্যতা) কিংবা দরূরতের স্থলাভিষিক্ত হাজত (প্রয়োজন) দাবি করে। অর্থাৎ অবশ্যই একটি শরঈ কারণ ও অনুমোদনযোগ্য যুক্তি থাকতে হবে; নতুবা মূলনীতি হলো নিষেধ। আর রোগীর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন না থাকা অবস্থায় মূলনীতি হলো নিষেধের ওপরই বহাল থাকা।

তৃতীয় শর্ত:— সার্জন চিকিৎসক ও তাঁর সহকারীদের মধ্যে যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ তাঁকে অবশ্যই এমন ইলম ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হবে যা তাঁকে এই অস্ত্রোপচার সম্পাদনের যোগ্য করে তোলে, এবং এমন সক্ষমতা থাকতে হবে যে তিনি তা এ ধরনের অস্ত্রোপচারের জন্য যেভাবে দাবি করা হয় সেভাবেই প্রয়োগ ও সম্পাদন করতে পারেন। কেননা যে অজ্ঞ থেকেও চিকিৎসা করতে যায়, সে ক্ষতিপূরণে দায়ী। এর ভিত্তিতে, যে ব্যক্তির ঐ অস্ত্রোপচার সম্পর্কে ইলম ও অভিজ্ঞতা নেই কিংবা যথাযথভাবে তা সম্পাদনের সক্ষমতা নেই, তার জন্য কোনো অপারেশনে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়।

চতুর্থ শর্ত:— চিকিৎসকের প্রবল ধারণা হতে হবে যে এই অপারেশন সফল হবে। এর ভিত্তিতে, যদি তাঁর প্রবল ধারণা হয় যে তা সফল হবে না, বরং তাতে রোগী ধ্বংস হয়ে যাবে কিংবা তার বিদ্যমান ক্ষতির চেয়েও বড় ক্ষতির শিকার হবে, তবে তাঁর জন্য এই অপারেশনে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়; আর এখানে প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। কাজেই সফল না হওয়ার প্রবল ধারণা হলে বর্জন করাই ওয়াজিব। এখন তিনি যদি ফলপ্রসূ না হওয়ার প্রবল ধারণা সত্ত্বেও তা করেন, তবে তাঁর এই অপারেশনের ফলে সংঘটিত সমস্ত ক্ষতির জন্য তিনি দায়ী থাকবেন; কারণ তিনি এমন কাজ করেছেন যা শরীয়তে করা জায়েয নয়। সুতরাং তিনি জালিম এবং তাঁর হাত সীমালঙ্ঘনকারী; আর জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী হাত নিঃশর্তভাবে দায়ী — অর্থাৎ সে অবহেলা করুক বা না করুক। আর শরীয়ত এসেছে মানব-প্রাণ রক্ষার অপরিহার্যতা এবং তার ধ্বংসের কারণ হতে পারে এমন সব কিছু থেকে তাকে রক্ষা করার বিধান নিয়ে।

পঞ্চম শর্ত:— অস্ত্রোপচারের চেয়ে কম ক্ষতিকর কোনো বিকল্প বিদ্যমান না থাকা। এর ভিত্তিতে, যদি এমন উপযুক্ত বিকল্প পাওয়া যায় যা দ্বারা অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যই অর্জিত হয়, তবে সেদিকেই যাওয়া ওয়াজিব এবং এই অস্ত্রোপচার বর্জন করা ওয়াজিব — প্রাণরক্ষার স্বার্থেই। কেননা অপারেশনকে ঘিরে থাকে এমন সব ঝুঁকি ও ক্ষতি, যা প্রাণ ও দেহের জন্য হুমকি। কাজেই তাতে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়, কেবল তখনই জায়েয যখন বিকল্প না থাকায় তা-ই একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়। আর উপযুক্ত বিকল্প বিদ্যমান থাকলে তাতে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়; কারণ তা বদল (বিকল্প), আর মূলটি অসম্ভব না হলে বদলের দিকে যাওয়া জায়েয নয়।

ষষ্ঠ শর্ত:— রোগী কিংবা তার অভিভাবক এই অস্ত্রোপচারের অনুমতি দেবে। মূলনীতি হলো রোগীর নিজের অনুমতি — যদি তার অনুমতি দেওয়ার যোগ্যতা থাকে, অর্থাৎ সে প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান ও বিচক্ষণ হয়। আর যদি সে তেমন না হয়, তবে তার সেই অভিভাবকের দিকে ফিরে যেতে হবে যাকে শরীয়তপ্রণেতা তাদের কল্যাণ দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করেছেন। এর ভিত্তিতে, রোগী রাজি না হলে সার্জন চিকিৎসকের জন্য তার ওপর অস্ত্রোপচার করা জায়েয নয়; আর আমাদের এখানে এ নিয়মেই কাজ হয়, সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই। তবে অস্ত্রোপচারটি যদি এতটাই জরুরি হয় যে তা না করলে প্রাণ কিংবা কোনো অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাবে, আর রোগী অচেতন অবস্থায় থাকে এবং কাজটি পিছিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়, তবে এ অবস্থায় তার অনুমতির শর্ত রহিত হয়ে যায় এবং তার স্থলে অভিভাবকদের অনুমতিই যথেষ্ট হয় — যেমনটি ফকীহগণ রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা সাব্যস্ত করেছেন।

সপ্তম শর্ত:— এই অস্ত্রোপচারের ফলে যে ক্ষতি প্রতিহত করা উদ্দেশ্য, তার চেয়ে বড় কোনো ক্ষতি সৃষ্টি না হওয়া। কেননা মূলনীতিতে সাব্যস্ত যে, ক্ষতি সমপরিমাণ ক্ষতি দ্বারা দূর করা যায় না — তাহলে গুরুতর ক্ষতি দ্বারা কীভাবে? অর্থাৎ লঘুতর ক্ষতি গুরুতর ক্ষতি দ্বারা দূর করা যায় না। কাজেই অস্ত্রোপচারে যদি এমনটি ঘটে, তবে সার্জনের জন্য তা করা হারাম; কারণ তাতে প্রাণ ও দেহকে বৃহত্তর ক্ষতির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। আর রোগীর ওপর ওয়াজিব হলো লঘুতর ক্ষতির ওপরই থাকা এবং এমন অস্ত্রোপচার থেকে বিরত থাকা যা নিজেকে ধ্বংস ও বিনাশের মুখে নিক্ষেপ করার শামিল। সুতরাং চিকিৎসকদের ওপর ওয়াজিব হলো, অস্ত্রোপচারের নেতিবাচক ফলাফল ও তা থেকে সৃষ্ট অকল্যাণগুলোর সঙ্গে, স্বয়ং যে রোগটির জন্য অস্ত্রোপচার দরকার তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণগুলোর তুলনা করা। এখন অস্ত্রোপচারের ফলে সৃষ্ট অকল্যাণ যদি রোগের মধ্যে বিদ্যমান অকল্যাণের চেয়ে বড় হয়, তবে তাঁদের জন্য অস্ত্রোপচারে অগ্রসর হওয়া হারাম; কারণ শরীয়ত মানুষকে সমপরিমাণ বা গুরুতর ক্ষতি দ্বারা ক্ষতি দূর করার অনুমতি দেয় না — যেমনটি সেই কায়েদায় সাব্যস্ত, যা বলে: ক্ষতি অনুরূপ ক্ষতি দ্বারা দূর করা যায় না। আর যদি অস্ত্রোপচারের ফলে সৃষ্ট অকল্যাণ, ঐ রোগের মধ্যে বিদ্যমান অকল্যাণের চেয়ে লঘুতর হয়, তবে তাঁদের জন্য তাতে অগ্রসর হওয়া জায়েয —

এই শরঈ কায়েদার প্রয়োগে যে, দুটি অকল্যাণ সাংঘর্ষিক হলে লঘুতরটি মেনে নিয়ে গুরুতরটি থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতি লক্ষ রাখা হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

অস্ত্রোপচার বৈধ হওয়ার সাত শর্ত

- [ ] ১. অস্ত্রোপচারটি শরীয়তসম্মত — হারাম গর্ভপাত ও লিঙ্গ পরিবর্তন নয়
- [ ] ২. রোগীর এই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন থাকা
- [ ] ৩. সার্জন ও সহকারীদের যোগ্যতা থাকা
- [ ] ৪. সফল হওয়ার প্রবল ধারণা থাকা
- [ ] ৫. কম ক্ষতিকর কোনো বিকল্প না থাকা
- [ ] ৬. রোগী বা তার অভিভাবকের অনুমতি
- [ ] ৭. প্রতিহত করা ক্ষতির চেয়ে বড় ক্ষতি সৃষ্টি না হওয়া

শর্তসমূহ পাওয়া গেলে ও প্রতিবন্ধকতা না থাকলে চিকিৎসাগত অস্ত্রোপচার জায়েয

প্রশ্ন ১৫

কসমেটিক (সৌন্দর্যবর্ধক) অস্ত্রোপচারের প্রকারভেদ কী কী, প্রতিটি প্রকারের হুকুম ও দলিলসহ বর্ণনা করুন?

উত্তর: আমি বলি:— কসমেটিক অস্ত্রোপচার তিন প্রকারের বাইরে নয়: সৌন্দর্যবর্ধক (তাহসীনি) কসমেটিক অস্ত্রোপচার, প্রয়োজনভিত্তিক (হাজি) কসমেটিক অস্ত্রোপচার এবং অপরিহার্যতাভিত্তিক (দরূরি) কসমেটিক অস্ত্রোপচার। এদের প্রত্যেকটির নিজস্ব প্রকারভেদ ও হুকুম রয়েছে; নিচে তার বিস্তারিত বিবরণ:—

প্রথম প্রকার — তাহসীনি (সৌন্দর্যবর্ধক) কসমেটিক অস্ত্রোপচার। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চেহারা-অবয়ব উন্নত করা, আরও ভালো আকৃতি ও আরও সুন্দর রূপ অর্জন করা — অথচ এর পেছনে কোনো অপরিহার্য বা প্রয়োজনভিত্তিক তাড়না নেই; এটি নিছক প্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশির বশে বাড়তি সৌন্দর্যবর্ধন মাত্র। এর অন্তর্ভুক্ত "তাশবীব" তথা যৌবন ফিরিয়ে আনার অপারেশন — দেহ থেকে বার্ধক্যের চিহ্নগুলো মুছে ফেলা, যার পর বয়স্ক ব্যক্তিকে আকৃতি ও রূপে দেখে মনে হয় যেন সে শৈশব-যৌবনের প্রাণচাঞ্চল্যে ফিরে গেছে।

এই অস্ত্রোপচারের অধীনে বহু প্রকার পড়ে: যেমন নাকের কসমেটিক অস্ত্রোপচার — তা ছোট করা এবং প্রস্থ ও উচ্চতার দিক থেকে তার আকৃতি বদলে দেওয়া; থুতনির কসমেটিক অস্ত্রোপচার — অর্থাৎ থুতনির হাড় বড় হলে তা ছোট করা, কিংবা কৃত্রিম থুতনি বসিয়ে তা বড় করা যা মাংসপেশির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়; স্তনের কসমেটিক অস্ত্রোপচার — বড় হলে ছোট করা, কিংবা ছোট হলে বড় করা — হয় যৌন হরমোন ইনজেকশনের মাধ্যমে, নয়তো স্তনের ভেতরে কৃত্রিম বস্তু প্রবেশ করিয়ে; তেমনি কানের কসমেটিক অস্ত্রোপচার — কান সামনের দিকে বেরিয়ে থাকলে তা পেছনে ফিরিয়ে দেওয়া; তেমনি পেটের অস্ত্রোপচার — তার চামড়া টেনে টান করা এবং চামড়ার নিচ থেকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাড়তি অংশ টেনে বের করে ফেলা; তেমনি মুখমণ্ডলের কসমেটিক অস্ত্রোপচার — তার ভাঁজগুলো টেনে মসৃণ করা; তেমনি নিতম্বের সৌন্দর্যবর্ধন — বাড়তি চর্বি অপসারণ করে; তেমনি বাহুর কসমেটিক অস্ত্রোপচার, দুই হাতের কসমেটিক অস্ত্রোপচার, ভ্রুর কসমেটিক অস্ত্রোপচার এবং এ জাতীয় আরও তাহসীনি কসমেটিক অস্ত্রোপচার।

এই অস্ত্রোপচার তার সমস্ত প্রকারসহ ইসলামী শরীয়তে হারাম; এর কোনো কিছুই কখনোই জায়েয নয়। কারণ এতে কোনো অপরিহার্য তাড়নাও নেই, প্রয়োজনভিত্তিক তাড়নাও নেই; বরং এতে সর্বোচ্চ যা আছে তা হলো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকে বদলে দেওয়া এবং মানুষের খেয়ালখুশি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী তা নিয়ে ছেলেখেলা করা। এ সবই হারাম, এগুলো করা জায়েয নয়; যে করে সে গুনাহগার, আর যে এতে সন্তুষ্ট থাকে সে-ও গুনাহগার এবং এমন তাযীরি শাস্তির উপযুক্ত, যা তাকে ও তার মতো লোকদের এই ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত রাখবে।

এর নিষেধের দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী, যেখানে তিনি ইবলীস — আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করুন — এর কথা বর্ণনা করেছেন:—

و لآمرنهم فليغيرن خلق الله

> "আর অবশ্যই আমি তাদের নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।" — সূরা আন-নিসা: ১১৯

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেওয়া নিন্দনীয় এবং যে তা করে সে নিন্দিত; কারণ কথাটি নিন্দার প্রেক্ষাপটে এসেছে, আর নিন্দা হারাম চেনার অন্যতম পথ। আর তাহসীনি কসমেটিক অস্ত্রোপচারে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি বদলে দেওয়া এবং খেয়ালখুশি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী তা নিয়ে ছেলেখেলা করা নিহিত রয়েছে; সুতরাং তা শরীয়তে নিন্দিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর এই অস্ত্রোপচার সেই হারামসমূহের জাতভুক্ত, যেগুলো শয়তান আদম-সন্তানদের মধ্যে পাপাচারীদের কাছে সুশোভিত করে দেখায়।

এর হারাম হওয়ার আরেকটি দলিল:— আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস; তিনি বলেন:—

سمعت رسول الله ﷺ يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن

اللاتي يغيرن خلق الله

> "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অভিশাপ দিতে শুনেছি সেই নারীদের, যারা ভ্রু উপড়ায় এবং সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের ফাঁক তৈরি করে — যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেয়।"

আর তা সহীহ গ্রন্থে রয়েছে। এই হাদীস প্রমাণ করে যে, এসব কাজ যে করে সে অভিশপ্ত; আর তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এটি আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেওয়া। এই অর্থটি তাহসীনি কসমেটিক অস্ত্রোপচারেও বিদ্যমান, কারণ তা সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকে বদলে দেওয়া; সুতরাং তা এই কঠোর হুমকির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য এবং তা করা জায়েয নয়।

আরেকটি দলিল হলো বিশুদ্ধ কিয়াস। কেননা উল্কি আঁকা হারাম, দাঁত ঘষে ধারালো করা হারাম, ভ্রু উপড়ানোও হারাম; আর এ সবই হারাম করা হয়েছে এ কারণে যে, তা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকে বদলে দেওয়া এবং তা যে করে সে সৌন্দর্যের বৃদ্ধি চায় — অর্থাৎ সৃষ্টিকে বদলে দিয়ে সৌন্দর্য কামনা করা। আর যে ইল্লতের কারণে এগুলো হারাম করা

হয়েছে, সেই ইল্লত এ ধরনের অস্ত্রোপচারেও বিদ্যমান। উসূলে সাব্যস্ত আছে যে, শরীয়ত সদৃশ বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য করে না এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলোকে একত্র করে না। সুতরাং মূল (আসল) হলো উল্কি, ভ্রু উপড়ানো ও দাঁত ঘষা; শাখা (ফার') হলো এই তাহসীনি কসমেটিক অপারেশনগুলো; ইল্লত হলো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি বদলে দিয়ে সৌন্দর্য কামনা করা; আর হুকুম হলো:— যেমন এই ইল্লতের কারণে ঐ বিষয়গুলো হারাম, তেমনি তাহসীনি কসমেটিক অপারেশনও হারাম, কারণ তা একই ইল্লত বহন করে। আর বিশুদ্ধ কিয়াস শরঈ হুকুম উদ্ভাবনের অন্যতম উৎস।

এর হারাম হওয়ার আরেকটি দলিল:— এই অস্ত্রোপচার কিছু নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত না করে সম্পন্নই হয় না। সেই নিষিদ্ধ কাজগুলোর একটি হলো অজ্ঞান করা (অ্যানেস্থেসিয়া); কেননা রোগীকে সাধারণ বা স্থানীয়ভাবে অজ্ঞান না করে এসব অপারেশনের কোনোটিই করা সম্ভব নয়। অথচ জানা কথা যে, অজ্ঞান করার ব্যাপারে মূলনীতি হলো নিষেধ, আর হারাম কেবল অপরিহার্যতার কারণেই বৈধ হয়; অথচ এসব অপারেশন অপরিহার্যতার অন্তর্ভুক্তও নয়, দরূরতের স্থলাভিষিক্ত প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্তও নয়। কাজেই অজ্ঞান করায় অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়, কারণ এমন কোনো কারণ নেই যা তা অপরিহার্য করে।

আরও একটি কথা: এসব অপারেশনের অনেকগুলোই পুরুষেরা বেগানা নারীদের জন্য করে, আবার উল্টোটাও ঘটে। তখন বহু নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হয় — যেমন স্পর্শ করা, সতরের দিকে তাকানো এবং বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনতা। আর যদি পুরুষেরা পুরুষদের জন্য এবং নারীরা নারীদের জন্য তা করে, তবু আরেকটি নিষিদ্ধ কাজ ঘটে — তা হলো সতর উন্মোচিত হওয়া, যেমনটি নিতম্বের কসমেটিক অস্ত্রোপচারে হয়। আর এসব হারাম সংঘটিত হয় নিছক একটি তাহসীনি কসমেটিক অস্ত্রোপচারের জন্য! সুতরাং যে এ ধরনের অপারেশন বৈধ বলে, তার বিবেক কোথায়?

এর হারাম হওয়ার আরেকটি দলিল:— এই অস্ত্রোপচার সেসব ক্ষতি ও জটিলতা থেকে মুক্ত নয় যা তা থেকে জন্ম নেয়; সুতরাং তা কিছুকাল পরে হলেও অকল্যাণের দিকেই নিয়ে যায়।

এর ভিত্তিতে সকলের ওপর ওয়াজিব হলো তা বর্জন করা। আর কিছু অন্তররোগীর খেয়ালিপনা, তাদের অজুহাত ও এ ধরনের অপারেশনে পৌঁছার জন্য তাদের যুক্তির পেছনে ছোটা উচিত নয় — এই যুক্তি যে, তারা মানসিকভাবে কষ্ট পাচ্ছে, নিজ জাতির মানুষের মধ্যে বাস করতে পারছে না। কেননা কোনো কোনো আলিম এমন কথা শুনলে তা বৈধ বলার ব্যাপারে শিথিলতা দেখান। অথচ এই বিষয়টি দলিলগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে, যেমনটি আমি তোমার কাছে আগেই উল্লেখ করেছি। প্রকৃত সত্য হলো, এদের চিকিৎসার পথ ধরতে হবে অমূলক কল্পনা ও ওয়াসওয়াসা দূর করার মাধ্যমে — অর্থাৎ অন্তরে ঈমান রোপণ করে, তাকদীরে সন্তুষ্টি বপন করে এবং এই বোধ জাগিয়ে যে, বাহ্যিক রূপই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র উপায় নয়।

এই হলো কসমেটিক অস্ত্রোপচারের প্রথম প্রকারের হুকুম; আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তা তার সব প্রকার ও বিভিন্ন রূপসহ হারাম। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্বিতীয় প্রকার — হাজি (প্রয়োজনভিত্তিক) কসমেটিক অস্ত্রোপচার। এটি এমন অস্ত্রোপচার, যার প্রতি অনিবার্য প্রয়োজন তাড়িত করে — এমনভাবে যে, তা না করা হলে ব্যক্তির ওপর সংকীর্ণতা ও কষ্ট নেমে আসবে। এর দ্বারা সে বাড়তি সৌন্দর্য চায় না; বরং সে চায় ঐ সংকীর্ণতা বা কষ্টটুকু দূর করতে। যেমন — আগুনে পোড়া কিংবা গাড়ি দুর্ঘটনা ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট বিকৃতি দূর করা; কিংবা ষষ্ঠ আঙুল বা বাড়তি হাত অপসারণ করা; কিংবা এমন বাড়তি দাঁত অপসারণ করা যা মুখ ও চর্বণপ্রক্রিয়ার ক্ষতি করে; কিংবা এমন বাঁকা নাক সোজা করা যা শ্বাসপ্রক্রিয়ার ক্ষতি করে; কিংবা এমন ঝুলে পড়া চোখের পাতা টেনে তোলা যা দৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে; কিংবা স্থূলকায় ব্যক্তির শরীর থেকে চর্বি টেনে বের করা, যে চর্বি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে চর্বির আধিক্যের মতো বহু রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; কিংবা চোখের এমন ট্যারাভাব সংশোধন করা যা ক্ষতি ছাড়াই ঠিক করা সম্ভব; কিংবা এমন নারীর জন্য চুল প্রতিস্থাপনের অপারেশন যে সম্পূর্ণ টাক, তার মাথায় চুল নেই; কিংবা আঙুল সোজা করার অপারেশন — যদি তাতে জন্মগত বক্রতা থাকে যা তার কাজে ক্ষতি করে; কিংবা স্তন ছোট করার অপারেশন যদি সেগুলো এত বড় হয় যে সামনের দিকে বাড়তি ভার থাকার কারণে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়ে নারীর মেরুদণ্ডের ক্ষতি করে; কিংবা দুর্ঘটনা বা

অগ্নিদগ্ধতা ইত্যাদির কারণে ফেটে যাওয়া ঠোঁট জোড়া লাগানোর অপারেশন; এবং এ ছাড়া আরও যেসব অপারেশনের প্রতি প্রয়োজন তাড়িত করে।

এসব অপারেশনে শরীয়তে কোনো অসুবিধা নেই; কেননা এতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই এবং এগুলো নিষিদ্ধ "পরিবর্তন"-এর সীমার মধ্যে পড়ে না; বরং এগুলোর তাড়না হলো সেই প্রয়োজন যা অপরিহার্যতার স্থলাভিষিক্ত। আর শরীয়তে ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত যে, কষ্ট রহিত করা হয়েছে; কাজেই যেখানেই কষ্ট, সেখানেই শিথিলতা। এর দলিল হিসেবে আরফাজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসও পেশ করা হয়:—

أنه قطع أنفه يوم كلاب فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه فأمره

النبي ﷺ أن يتخذ أنفاً من ذهب

"কুলাবের দিন তাঁর নাক কেটে গিয়েছিল; তিনি রুপার একটি নাক বানিয়ে নিলেন, কিন্তু তা তাঁর জন্য দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেল। তখন নবী ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন।"

হাদীসটি সহীহ। এ থেকে দলিল গ্রহণের দিক হলো, নবী ﷺ তাঁকে ঐ নাক গ্রহণ করার এবং সেই ত্রুটি ঢেকে ফেলার অনুমতি দিয়েছেন — যা প্রমাণ করে যে, কোনো চিকিৎসাগত পদক্ষেপ যদি নতুন সৃষ্ট বা জন্মগত ত্রুটি ঢাকার জন্য হয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কাজেই চিকিৎসকের জন্য তাতে অগ্রসর হওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই এবং রোগীর জন্য তা চাওয়াতেও কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না।" — সূরা আল-বাকারা: ১৮৫

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন:—

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا

"আল্লাহ তোমাদের ভার হালকা করতে চান; আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে।" — সূরা আন-নিসা: ২৮

তিনি সুবহানাহু আরও বলেছেন:—

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ

"আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো কষ্ট চাপিয়ে দিতে চান না।" — সূরা আল-মায়িদা: ৬

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন:—

وما جعل عليكم في الدين من حرج

"আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।" — সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮

আর সহীহ হাদীসে এসেছে:—

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا،

"সহজ করো, কঠিন করো না।"

এসব নস প্রমাণ করে যে, প্রতিটি সংঘটিত কষ্টই শরীয়তপ্রদত্ত সহজীকরণের মাধ্যমে রহিত। আর ফকীহদের কাছে সাব্যস্ত যে, যে কাজে কষ্ট রয়েছে তার সঙ্গে সহজতা যুক্ত করা হয়। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই।

এর বৈধতার আরও একটি দলিল এই যে, শরীয়ত এসেছে কল্যাণ সাব্যস্ত ও পূর্ণ করতে; আর এসব অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বিরাট কল্যাণ অর্জিত হয় এবং বহু অকল্যাণ অচল হয়ে যায়। উপরের উদাহরণগুলোতে উল্লিখিত কারণগুলো রোগ-ব্যাধিরই অন্তর্ভুক্ত, আর দলিল এসেছে রোগের চিকিৎসা করার এবং আল্লাহ তাআলার শরীয়তসম্মত চিকিৎসাব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাধি দূর করার বৈধতা সম্পর্কে। যেমন হাদীসে এসেছে:—

ما أنزل الله من داءٍ إلا وأنزل له دواء

"আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি, যার জন্য তিনি ওষুধও অবতীর্ণ করেননি।"

আর তাঁর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বাণী:—

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

"প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে; সুতরাং রোগের ওষুধটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা গেলে আল্লাহর অনুমতিতে রোগী আরোগ্য লাভ করে।"

আর তাঁর বাণী:—

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

"তোমাদের মধ্যে যে নিজের ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে।"

আর তাঁর বাণী:—

عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام

"হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, তবে হারাম দিয়ে চিকিৎসা করো না।"

এ জাতীয় নসগুলো এ ধরনের অস্ত্রোপচারের বৈধতার দলিল; কারণ প্রকৃতপক্ষে এগুলো এসব ব্যাধিরই চিকিৎসা — সেই ব্যাধি নতুন সৃষ্ট হোক বা মূল সৃষ্টিগত হোক। আর উসূলে সাব্যস্ত যে, সাধারণ (আম) বাক্য মূলত তার সাধারণ অর্থেই বহাল থাকে, দলিল ছাড়া তা বিশেষায়িত করা যায় না। সুতরাং এসব অপারেশন এই ব্যাধিগুলোর এক ধরনের চিকিৎসা, কাজেই তা এসব হাদীসের সাধারণ অর্থের মধ্যেই পড়ে। মোটকথা, এই প্রকারের অপারেশন জায়েয, তাতে কোনো অসুবিধা নেই — উপরে বর্ণিত দলিলসমূহের কারণে। আল্লাহই ভালো জানেন।

কসমেটিক অস্ত্রোপচার: উদাহরণ

করুন	করবেন না
✓ আগুনে পোড়া বা দুর্ঘটনার বিকৃতি দূর করা	✗ তাশবীব (যৌবন ফিরিয়ে আনার অপারেশন)
✓ ষষ্ঠ আঙুল, বাড়তি হাত বা ক্ষতিকর বাড়তি দাঁত অপসারণ	✗ সৌন্দর্যের জন্য নাক, থুতনি, কান ও ভ্রুর অপারেশন
✓ শ্বাসের ক্ষতি করা বাঁকা নাক সোজা করা	✗ সৌন্দর্যের জন্য স্তন, পেট, নিতম্ব ও মুখমণ্ডলের অপারেশন
✓ দৃষ্টিতে বাধা দেওয়া ঝুলে পড়া চোখের পাতা তোলা	
✓ রোগের কারণ হওয়া স্থূলতার চর্বি টেনে বের করা	
✓ ফেটে যাওয়া ঠোঁট জোড়া লাগানো	

প্রথম ধরন হারাম; দ্বিতীয় ধরন লেখকের ভাষ্যে হাজি প্রয়োজনভিত্তিক ও জায়েয

তৃতীয় প্রকার — দরূরি (অপরিহার্যতাভিত্তিক) কসমেটিক অস্ত্রোপচার। এগুলো সেইসব অপারেশন, যেগুলোর প্রতি অনিবার্য দরূরত অর্থাৎ চূড়ান্ত অপরিহার্যতা তাড়িত করে। এ ধরনের অপারেশনের বৈধতায় কোনো সন্দেহ নেই; বরং হাজি (প্রয়োজনভিত্তিক) অপারেশনের নিছক বৈধতার চেয়ে এগুলোর বৈধতা আরও অগ্রাধিকারযোগ্য — কারণ দরূরত হাজতের চেয়ে উঁচু স্তরের অবস্থা। কাজেই হাজি অস্ত্রোপচার যখন জায়েয, তখন যা দরূরতের পর্যায়ভুক্ত তার বৈধতা তো অগ্রাধিকারক্রমেই সাব্যস্ত। লেখার সময় এই ধরনের অপারেশনের কোনো উদাহরণ আমার স্মরণে আসছে না, তবে এগুলোর শরঈ হুকুম হলো বৈধতা।

এই হলো এই প্রশ্নের উত্তর। এর সারকথা এই যে, কসমেটিক অস্ত্রোপচার তিন প্রকার:— তাহসীনি কসমেটিক অস্ত্রোপচার, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ; হাজি কসমেটিক অস্ত্রোপচার, যা জায়েয; এবং দরূরি কসমেটিক অস্ত্রোপচার, যা-ও জায়েয। এই হলো মূল হুকুমের কথা। তবে এসব অপারেশনের কোনো কোনোটিতে কিছু বিস্তারিত দিক বাকি থেকে যায়, এবং কোনো অপারেশন কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তা নিয়ে আলিমদের বা চিকিৎসাবিদদের মতভেদ থাকতে পারে; সুতরাং মতভেদটি শাখা-নির্ধারণে হতে পারে, মূল-নির্ধারণে নয়। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

কসমেটিক অস্ত্রোপচারের তিন প্রকার

প্রকার	হুকুম
তাহসীনি (সৌন্দর্যবর্ধক)	সব প্রকারে হারাম; যে করে ও যে সন্তুষ্ট থাকে — দুজনই গুনাহগার
হাজি (প্রয়োজনভিত্তিক)	জায়েয; কষ্ট দূর করতে, বাড়তি সৌন্দর্যের জন্য নয়
দরূরি (অপরিহার্যতাভিত্তিক)	জায়েয; হাজির চেয়েও অগ্রাধিকারযোগ্য

মতভেদ হতে পারে শাখা-নির্ধারণে, মূল-নির্ধারণে নয়

প্রশ্ন ১৬

মস্তিষ্কের মৃত্যু (ব্রেইন ডেথ) বলতে কী বোঝায়? মস্তিষ্ক মরে যাওয়ামাত্রই কি মানুষকে শরীয়তের দৃষ্টিতে মৃত গণ্য করা হবে — অথচ তার হৃৎপিণ্ড তখনো স্পন্দিত হচ্ছে? আর চিকিৎসকেরা যদি সিদ্ধান্ত দেন যে রোগীর মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটেছে, তবে তার ওপর থেকে জীবনরক্ষাকারী যন্ত্রপাতি সরিয়ে নেওয়া কি শরীয়তে জায়েয? দলিল ও কায়েদাসহ বিষয়টি স্পষ্ট করুন।

উত্তর: আমি বলি:— এটি একটি মহৎ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন; বিশেষত এ কারণে যে, এটি এমন একটি মাসআলা নিয়ে কথা বলছে যা নতুন মাসআলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য এবং যার সঙ্গে বহু শরঈ হুকুম জড়িত। কাজেই এতে অবশ্যই তাফসীল, বিশ্লেষণ এবং অগ্রগণ্য মতের পক্ষে বিস্তৃত দলিল-উপস্থাপন প্রয়োজন। সুতরাং আমি বলি:—

আলিমগণ রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা একমত যে, যার মস্তিষ্ক মরে গেছে এবং হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণরূপে স্পন্দন বন্ধ করে দিয়েছে, তার ওপর মৃত্যুর হুকুম দেওয়া হবে; কারণ এটিই মৃত্যুর প্রকৃত রূপ।

তাঁরা এ ব্যাপারেও একমত যে, যার মস্তিষ্কের ওপর এমন কিছু ঘটেছে যা তাকে তার কাজ সম্পাদনে বাধা দিচ্ছে, অথচ কারণটি জানা এবং জানা যাচ্ছে যে তা কিছুকাল পরে হলেও দূর হয়ে যাবে — তার ব্যাপারে জীবিত হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে, সুতরাং তার ওপর কোনোভাবে সীমালঙ্ঘন করা জায়েয নয়।

তাঁদের মধ্যে মতভেদ কেবল সেই অবস্থাতেই হয়েছে, যেখানে মস্তিষ্ক মরে গেছে কিন্তু হৃৎপিণ্ড তখনো স্পন্দিত হচ্ছে। তবে কি তার এই মস্তিষ্ক-মৃত্যুই তাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে মৃত সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট? অর্থাৎ মস্তিষ্কের মৃত্যুই কি মৃত্যুর শরঈ প্রকৃতি? এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে দীর্ঘ মতভেদ রয়েছে। অগ্রগণ্য — বরং এই মাসআলায় সত্য ও নির্ভরযোগ্য সঠিক মত — হলো এই যে, মস্তিষ্কের মৃত্যু রোগীকে মৃত বলে হুকুম দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং কেবল মস্তিষ্ক মরে যাওয়ায় মানুষকে মৃত গণ্য না করার মতটিই সেই মত, যার পক্ষে নকলি ও আকলি দলিল, শরীয়তের উসূল ও কায়েদা এবং বিশুদ্ধ বিবেচনা সাক্ষ্য দেয়।

মস্তিষ্ক-মৃত্যু: ঐকমত্য ও মতভেদ

অবস্থা	আলিমদের বক্তব্য
মস্তিষ্ক মৃত ও হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণ স্পন্দনহীন	মৃত্যুর হুকুম — সবাই একমত
মস্তিষ্ক বাধাপ্রাপ্ত, কারণ জানা ও পরে দূর হবে	জীবিত — সবাই একমত
মস্তিষ্ক মৃত, কিন্তু হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত	মতভেদ আছে
লেখকের অগ্রগণ্য মত	মস্তিষ্কের মৃত্যু মৃত বলে হুকুম দিতে যথেষ্ট নয়

দলিলসমূহের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার বাণী:—

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً, إذ أوى الفتية

إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً فضربنا

على آذانهم في الكهف سنين عدداً، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً

> "তুমি কি ধারণা করেছ যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিল, তখন তারা বলল: হে আমাদের রব, আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন এবং আমাদের কাজে আমাদের জন্য সঠিক পথ সহজ করে দিন। অতঃপর আমি গুহায় বহু বছর ধরে তাদের কানের ওপর আবরণ দিয়ে দিলাম। তারপর আমি তাদের জাগিয়ে তুললাম, যাতে জানতে পারি দুই দলের মধ্যে কারা তাদের অবস্থানকালের হিসাব ভালো রেখেছে।" — সূরা আল-কাহফ: ৯–১২

আল্লাহ তাআলার বাণী "بعثناهم"-এর অর্থ: আমি তাদের জাগিয়ে তুললাম। এই আয়াতগুলোতে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, নিছক অনুভূতি ও চেতনা হারিয়ে ফেলাই একজন মানুষকে মৃত বলে হুকুম দেওয়ার জন্য যথেষ্ট দলিল নয়; কেননা ঐ যুবকেরা অনুভূতি ও চেতনা হারিয়েছিলেন, অথচ এ কারণে তাঁদের মৃত গণ্য করা হয়নি। আর মস্তিষ্কের মৃত্যুকে মৃত্যু গণ্য করার হুকুমটি তো রোগীর অনুভূতি ও চেতনা হারানোর ওপরই ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে; অথচ কেবল এটিই মৃত্যুর হুকুম দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ এই মহান আয়াত প্রমাণ করেছে যে, গুহাবাসীদের ওপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তা মৃত্যু গণ্য হয়নি। কাজেই এত দীর্ঘ সময় ধরে অনুভূতি ও চেতনা হারানো যদি মৃত্যু গণ্য না হয়, তবে তার চেয়ে কম সময়ের অনুভূতি ও চেতনা হারানো যে মৃত্যু গণ্য হবে না, তা তো অগ্রাধিকারক্রমেই সাব্যস্ত।

আরও দলিলের মধ্যে রয়েছে:— আলিমগণ রহিমাহুমুল্লাহু তাআলার কাছে সাব্যস্ত যে, নিশ্চিত জ্ঞান সংশয় দ্বারা দূর হয় না; বরং নিশ্চিত জ্ঞান কেবল আরেকটি নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারাই দূর হয়, যা প্রথম নিশ্চিত জ্ঞানকে ভেঙে দেয়। এখানে নিশ্চিত বিষয়টি হলো জীবিত থাকা, আর মৃত্যু সন্দেহযুক্ত; কারণ কেউই নিশ্চিতভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে না যে, কেবল মস্তিষ্ক মরে যাওয়ায় এই ব্যক্তি মারা গেছে — এ কেবল ধারণা ও সংশয়। আর যেখানে নিশ্চিত জ্ঞান ও সংশয় পরস্পরবিরোধী হয়, সেখানে মূলনীতি হলো নিশ্চিত জ্ঞানের ওপরই বহাল থাকা; কারণ নিশ্চিত জ্ঞান সংশয় দ্বারা দূর হয় না, অর্থাৎ যে বিষয় সাব্যস্ত হওয়া বা না-হওয়ার দিক থেকে নিশ্চিত, তা আগন্তুক সংশয় দ্বারা ভাঙা যায় না।

আরও দলিলের মধ্যে রয়েছে:— আলিমগণ রহিমাহুমুল্লাহু তাআলার কাছে সাব্যস্ত যে, মূলনীতি হলো যা ছিল তা যেমন ছিল তেমনই বহাল থাকা। অর্থাৎ অতীতে যার মূল অবস্থা ছিল অনুপস্থিতি, তা এখনো অনুপস্থিত — যতক্ষণ না তার বিপরীত সাব্যস্ত হয়; আর অতীতে যার মূল অবস্থা ছিল সাব্যস্ততা, তা এখনো সাব্যস্ত — যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে তার বিপরীত প্রমাণিত হয়। এখন অতীতে তার জীবিত থাকাই সাব্যস্ত ছিল, সুতরাং এখনো সেই হুকুমই দেওয়া হবে যে তার জীবন সাব্যস্ত; কারণ মূলনীতি হলো যা ছিল তা তেমনই বহাল থাকা। যখন অতীতে তার জীবন সাব্যস্ত ছিল, তখন এখনো তা সাব্যস্ত। তখন বলা হবে:— মূলনীতি হলো রূহ বিদ্যমান থাকা এবং তার বের না হওয়া; সুতরাং আমরা এই মূলনীতির ওপরই বহাল থাকব এবং একে ধর্তব্য গণ্য করব। আর আলিমদের কাছে সাব্যস্ত যে, মূলনীতি হলো মূল অবস্থার ওপরই বহাল থাকা, যতক্ষণ না তা থেকে সরিয়ে আনার মতো দলিল আসে।

আরও দলিলের মধ্যে রয়েছে:— ইস্তিসহাব (পূর্বাবস্থার ধারাবাহিকতা)। কেননা রোগীর মস্তিষ্ক-মৃত্যুর আগের অবস্থাটিতে তাকে জীবিত গণ্য করার ব্যাপারে সবাই একমত; সুতরাং আমরা সেই অবস্থার বিদ্যমান হুকুমটিকেই এই মতভেদপূর্ণ অবস্থার ক্ষেত্রে টেনে আনব এবং বলব:— সে জীবিত, তার রূহ বিদ্যমান — কারণ তার স্পন্দন বিদ্যমান। আর উসূলে সাব্যস্ত যে, ইস্তিসহাব শরীয়তের গ্রহণযোগ্য উৎসগুলোর একটি, যদি না তার বিপরীতে কোনো দলিল দাঁড়ায়।

এর প্রমাণ আরও এই যে, প্রাণরক্ষা ইসলামী শরীয়তের সেই উদ্দেশ্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা "দরূরিয়্যাত" (অপরিহার্য বিষয়সমূহ)-এর স্তরে পৌঁছেছে এবং যেগুলো সব পথে ও সব উপায়ে সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। সন্দেহ নেই যে, এ অবস্থায় রোগীকে জীবিত বলে হুকুম দেওয়ার মধ্যেই প্রাণরক্ষা, তার হেফাজত ও সংরক্ষণ নিহিত; আর তা সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে শরীয়তের অসংখ্য দলিল সাক্ষ্য দিয়েছে।

আর বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে এই যে, মৃত্যুর প্রকৃত রূপ হলো দেহ থেকে রূহ বেরিয়ে যাওয়া; আর রূহ বেরিয়ে গেলে দেহের সব উপকারিতা অচল হয়ে যায়, তাতে কর্মক্ষম কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না, আর তা নিষ্প্রাণ দেহে পরিণত হয়। অথচ মস্তিষ্ক-মৃত্যুর অবস্থায় রোগীর হৃৎপিণ্ড তখনো স্পন্দিত হচ্ছে, অর্থাৎ রূহ তখনো তার মধ্যে রয়েছে — এই স্পন্দনের বিদ্যমানতাই তার দলিল। তাহলে কীভাবে বলা হবে:— সে মারা গেছে, অথচ তার রূহ তখনো তার মধ্যে? সুতরাং মস্তিষ্ক-মৃত ব্যক্তির মধ্যে মৃতের সঙ্গে অনেক বড় সাদৃশ্য থাকলেও তার ওপর সেই মৃত্যুর হুকুম দেওয়া হবে না — যে মৃত্যুর ওপর তার বিধানসমূহ নির্ভর করে — যতক্ষণ না হৃৎপিণ্ড স্পন্দন বন্ধ করে দেয়। কাজেই যতক্ষণ হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে, ততক্ষণ সে জীবিত — যদিও তার মস্তিষ্ক মরে গেছে; কারণ এই স্পন্দন তার দেহে রূহের বিদ্যমানতার আলামত। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা।

মস্তিষ্ক-মৃত্যু: লেখকের দলিল

মস্তিষ্ক-মৃত্যুই মৃত্যু নয়

গুহাবাসী (কাহফ ৯–১২) চেতনা হারানো মৃত্যু গণ্য হয়নি	নিশ্চিত ও সংশয় জীবিত থাকা নিশ্চিত; মৃত্যু সংশয়যুক্ত	মূল অবস্থায় বহাল যা ছিল তা তেমনই থাকে
ইস্তিসহাব আগের অবস্থার হুকুম টেনে আনা	প্রাণরক্ষা শরীয়তের অপরিহার্য উদ্দেশ্য	মৃত্যুর রূপ দেহ থেকে রূহ বেরিয়ে যাওয়া; স্পন্দন রূহের আলামত

প্রশ্ন ১৬ — আলোচনা পরের অধ্যায়ে চলেছে

এক নজরে

- ★ বিকৃতির আশঙ্কায় গর্ভপাত জায়েয নয়; ইবনু বায: ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব
- ★ অভ্যস্ত পথে পথের দিক, অনভ্যস্ত পথে পুষ্টির দিক প্রাধান্য পায়
- ★ রোজাদারের রক্তদান জায়েয নয়; পরীক্ষার অল্প রক্ত জায়েয
- ★ চিকিৎসাগত অস্ত্রোপচার জায়েয — সাত শর্ত সাপেক্ষে
- ★ কসমেটিক: তাহসীনি হারাম; হাজি ও দরূরি জায়েয
- ★ মস্তিষ্ক-মৃত্যুতে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত থাকলে মৃত বলার জন্য তা যথেষ্ট নয় — লেখকের অগ্রগণ্য মত

যাচাই করুন

1. বিকৃতি ধরা পড়া গর্ভ নষ্ট করা সম্পর্কে ইবনু বাযের ফতোয়া কী?

ক. জায়েয | খ. মাকরূহ | গ. জায়েয নয়; ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব

2. ডায়াবেটিসের কোন ইনজেকশন রোজা ভঙ্গকারী?

ক. যা সুগারের মাত্রা কমায় | খ. যা সুগারের মাত্রা বাড়ায় | গ. কোনোটিই নয়

3. রোজাদারের রক্তদান সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. সবসময় জায়েয | খ. জায়েয নয়; রোজা নষ্ট হয় | গ. কেবল মাকরূহ

4. তাহসীনি কসমেটিক অস্ত্রোপচারের হুকুম কী?

ক. জায়েয | খ. মুস্তাহাব | গ. সব প্রকারে হারাম

5. অস্ত্রোপচার বৈধ হওয়ার শর্তগুলোর একটি কোনটি?

ক. সফল হওয়ার প্রবল ধারণা | খ. কেবল রোগীর ইচ্ছা | গ. সার্জনের যোগ্যতা অপ্রাসঙ্গিক

6. মস্তিষ্ক মৃত কিন্তু হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত — লেখকের অগ্রগণ্য মত কী?

ক. মৃত গণ্য হবে | খ. চিকিৎসকের রিপোর্টই চূড়ান্ত | গ. মৃত বলে হুকুম দিতে মস্তিষ্ক-মৃত্যু যথেষ্ট নয়

উত্তর: ১–গ, ২–খ, ৩–খ, ৪–গ, ৫–ক, ৬–গ

অধ্যায় ৪ সমাপ্ত

মৃত্যু-নিশ্চিতিতে ফুকাহাদের সতর্কতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও রোযা-সংক্রান্ত মাসআলা

বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে আরেকটি দিক:— ফুকাহায়ে কিরাম রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা মৃত্যুর ব্যাপারে এবং মৃত্যুর হুকুম দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত বড় সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে সাহিবুল মুগনী (আল-মুগনী গ্রন্থের রচয়িতা) যা উল্লেখ করেছেন তা দেখো; তিনি বলেছেন:—

وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخساف صدغيه وإن مات فجأة كالمصعوق أو خائفاً من حرب أو سبع أو تردى من جبلٍ انتظر به هذه العلامات حتى يتيقن موته

"মৃত ব্যক্তির ব্যাপারটি যদি সন্দেহজনক হয়, তবে মৃত্যুর আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়া দিয়ে বিচার করা হবে — যেমন তার দুই পা ঢিলে হয়ে যাওয়া, দুই হাতের তালু শিথিল হয়ে ঝুলে পড়া, নাক বেঁকে যাওয়া, মুখমণ্ডলের চামড়া টান টান হয়ে যাওয়া এবং কপালের দুই পাশ (রগের জায়গা) দেবে যাওয়া। আর যদি সে হঠাৎ মারা যায় — যেমন বজ্রাহত ব্যক্তি, কিংবা যুদ্ধের ভয়ে বা হিংস্র জন্তুর ভয়ে মৃত ব্যক্তি, অথবা পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়া ব্যক্তি — তবে এই আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।" — উদ্ধৃতি শেষ।

এ প্রসঙ্গেই ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহু তাআলার উক্তিও রয়েছে; তিনি বলেছেন:—

فإن شك في موته بأن يكون به علة واحتمل أن يكون له سكتة أو ظهرت عليه علامات فزع أو غيره كأن يكون هناك احتمال إغماء أو خلافه أخر حتى اليقين بتغير الرائحة وغيره

> "যদি তার মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ হয় — যেমন তার কোনো রোগ ছিল এবং সম্ভাবনা রয়েছে যে তার হৃৎস্পন্দন সাময়িকভাবে থেমে গেছে (সাকতা), কিংবা তার ওপর আতঙ্ক প্রভৃতির আলামত প্রকাশ পেয়েছে, অথবা মূর্ছা যাওয়া বা এ জাতীয় কিছুর সম্ভাবনা রয়েছে — তবে দাফন পিছিয়ে দেবে, যতক্ষণ না গন্ধ পরিবর্তন হওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়।" — উদ্ধৃতি শেষ।

আর মস্তিষ্কের মৃত্যুর (brain death) অবস্থাটি সন্দেহযুক্ত অবস্থাগুলোরই একটি বলে গণ্য। কারণ হৃৎপিণ্ড তখনো স্পন্দিত থাকে, দেহ খাদ্য গ্রহণ করে এবং তার রং পরিবর্তিত হয় না। এটিই সন্দেহ সৃষ্টির কারণ। আর তখন উচিত হলো, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে আরেকটি দিক:— মস্তিষ্কের মৃত্যুর হুকুম কেবল রোগনির্ণয়ের (diagnosis) মাধ্যমেই জানা যায়, অথচ বহু চিকিৎসক স্বীকার করেন ও মেনে নেন যে কিছু কিছু রোগনির্ণয়ে ভুল হয়ে থাকে। এ কারণেই মস্তিষ্কের মৃত্যুর হুকুম দেওয়ার জন্য উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি চিকিৎসক-দল এবং সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন, আর তা বহু হাসপাতালেই মেলে না। সুতরাং এই আলামতটিকে মৃত্যুর হুকুম দেওয়ার জন্য যথেষ্ট গণ্য করার কথা বলে দরজা খুলে দিলে তা এক বিরাট বিপদের দিকে নিয়ে যাবে। তাই এ দরজা বন্ধ রাখাই ওয়াজিব — প্রাণ রক্ষার স্বার্থে, যে প্রাণ সংরক্ষণ ইসলামী শরীয়তের মাকাসিদগুলোর মধ্যে একটি অপরিহার্য উদ্দেশ্য (মাকসাদে দারূরী) বলে গণ্য।

বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে আরেকটি দিক:— এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যাদের ব্যাপারে চিকিৎসক-দল মস্তিষ্কের মৃত্যুর রায় দিয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের জন্য জীবন লিখে দিয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনায় এটি প্রমাণিত হয়েছে, যেগুলোর সমষ্টি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে মস্তিষ্কের মৃত্যু নিজে থেকেই মৃত্যুর অবধারিত কারণ নয়। ফযীলাতুশ শাইখ বকর ইবনু আবদিল্লাহ আবু যাইদ এর কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন:—

حكم جمع من الأطباء على شخصية مرموقة بالوفاة لموت جذع الدماغ لديه, وأوشكوا على انتزاع بعض الأعضاء منه, لكن ورثته منعوا من ذلك ثم كتب الله له الحياة وما زال حياً إلى تاريخه

> "একদল চিকিৎসক এক প্রখ্যাত ব্যক্তির ব্যাপারে মৃত্যুর রায় দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর মস্তিষ্ক-কাণ্ডের (brain stem) মৃত্যু ঘটেছিল। তাঁরা তাঁর দেহ থেকে কিছু অঙ্গ বের করে নেওয়ার উপক্রম করেছিলেন, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাতে বাধা দেন। এরপর আল্লাহ তাঁর জন্য জীবন লিখে দেন এবং তিনি আজ পর্যন্ত জীবিত আছেন।" — উদ্ধৃতি শেষ।

বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে আরেকটি দিক:— এমন কিছু সন্তান জন্ম নেয় যাদের মস্তিষ্ক (মগজ) মূলেই নেই, অথচ তাদের কেউ কেউ সে অবস্থাতেই দশ বছরেরও বেশি বেঁচে থেকেছে। এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে মস্তিষ্কের মৃত্যু মৃত্যুর হুকুম দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ যদি তা-ই হতো, তবে মগজ ছাড়া এরা এক মুহূর্তও বাঁচত না — অথচ সেই মগজের মৃত্যুকেই মস্তিষ্কের মৃত্যুর হুকুমের ভিত্তি গণ্য করা হয়। সুতরাং মগজ সম্পূর্ণরূপে না থাকা অবস্থাতেই যদি জীবন বিদ্যমান থাকে, তবে মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটেছে অথচ হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত রয়েছে — এমন অবস্থায় জীবন বিদ্যমান আছে বলে হুকুম দিতে কোনো বাধা নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আরও যা বিষয়টিকে স্পষ্ট করে:— ফুকাহায়ে কিরাম রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা শ্বাস-প্রশ্বাসকে জীবনের দলিল সাব্যস্ত করেছেন, যেমনটি মারদাওয়ী তাঁর "আল-ইনসাফ" গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে এটিই নির্ভরযোগ্য মাযহাব। বুক তো স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করে, আর এটিই সেই দেহের অধিকারীর জীবিত থাকার প্রমাণ। সব মিলিয়ে, এ মাসআলায় সঠিক ও দৃঢ়ভাবে গৃহীত মত হলো — মস্তিষ্ক-কাণ্ডের মৃত্যু কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর হুকুম দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না তার হৃৎপিণ্ড পুরোপুরি মরে যায়, তার স্পন্দন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং তার সমস্ত নড়াচড়া থেমে যায়। এ মাসআলায় আমরা আল্লাহর সামনে এ মতটিকেই দ্বীন হিসেবে ধারণ করি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

মস্তিষ্ক-মৃত্যু: আরও দলিল ও সিদ্ধান্ত

মস্তিষ্ক-কাণ্ডের মৃত্যু মৃত্যুর হুকুমের জন্য যথেষ্ট নয়

ফুকাহাদের সতর্কতা
মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা (আল-মুগনী, নববী)

সন্দেহযুক্ত অবস্থা
হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, দেহ খাদ্য গ্রহণ করে, রং বদলায় না

রোগনির্ণয়ে ভুল
কিছু রোগনির্ণয়ে ভুল হয়; এ দরজা বন্ধ রাখা ওয়াজিব

বর্ণিত ঘটনা
মস্তিষ্ক-কাণ্ডের মৃত্যুর রায়ের পরও একজন বেঁচে আছেন (বকর আবু যাইদ)

মগজহীন সন্তান
কেউ কেউ দশ বছরেরও বেশি বেঁচেছে

শ্বাস-প্রশ্বাস
ফকীহগণ একে জীবনের দলিল সাব্যস্ত করেছেন (আল-ইনসাফ)

সিদ্ধান্ত
হৃৎপিণ্ড মরে স্পন্দন ও নড়াচড়া সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর হুকুম নয়

প্রশ্ন ১৬-এর ধারাবাহিকতা

প্রশ্ন ১৭

গর্ভে যা আছে তা পুরুষ না নারী — এ বিষয়ে চিকিৎসকদের জানার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿ويعلم ما في الأرحام﴾ (এবং তিনিই জানেন গর্ভাশয়ে যা আছে) এবং হাদীস ((ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله)) (গর্ভাশয়ে যা আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না) — এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় কীভাবে করব?

উত্তর/ আমি বলি:— এ দুইয়ের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধই নেই, কেবল সেই ব্যক্তির কাছে ছাড়া যার বোধ সংকীর্ণ, যার আঙিনা সংকুচিত, এবং যে এ মাসআলাটিকে কেবল এক চোখেই দেখেছে। উত্তরের বিশদ বিবরণের আগে আমি বলি:— প্রথমে জেনে রাখো, কিতাব ও সুন্নাহর বাহ্যিক অর্থ কখনোই বিশুদ্ধ পথে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে না — এটি কখনোই সম্ভব নয়। কারণ যিনি নস (শরঈ পাঠ) নাযিল করেছেন, তিনিই এই সত্যগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলো আবিষ্কারের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তিনিই সর্বোত্তম বক্তা ও সর্বাধিক সত্যবাদী বর্ণনাকারী; সুতরাং তাঁর সংবাদে কোনোরূপ বৈপরীত্য বা অসংগতি প্রবেশ করতে পারে — এমনটি কল্পনাই করা যায় না। বরং তা-ই পরম সত্য ও পরম যথার্থতা।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে যদি এমন কিছু পাওয়া যায় যা কিতাব বা সুন্নাহর বাহ্যিক অর্থের সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ বলে ধারণা জন্মায়, তবে অবস্থা দুটি সম্ভাবনার বাইরে নয়:—

হয় এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি আদৌ বৈজ্ঞানিক সত্যই নয়, বরং তা মিথ্যা দাবি — যা শয়তানি বিভ্রান্তি ও ইবলিসি ধোঁকাবাজির ওপর গড়ে উঠেছে, যার বিশুদ্ধতার কোনো ভিত্তি নেই; বরং তা নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার অধিকতর নিকটবর্তী এবং সেদিকে সম্পৃক্ত করাই অধিকতর সত্য। তখন ওয়াজিব হলো এই কল্পকাহিনীটিকে ছুঁড়ে ফেলা, একে এবং এর সমস্ত কাগজপত্র আবর্জনার ঝুড়িতে নিক্ষেপ করা। এর প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করা হবে না, এর অনুসারীদের প্রতিও নয় — না কাছ থেকে, না দূর থেকে। আর তারা যদি শরঈ নসের বিরোধিতার কথা জানা সত্ত্বেও নিজেদের অবস্থানে অটল থাকে, তবে শাসকের ওপর ওয়াজিব হলো তাদেরকে কঠোর তাযীর-শাস্তি দেওয়া, যা তাদেরকে এবং তাদের মতো অন্যদেরকে এ ধরনের নির্বুদ্ধিতা থেকে বিরত রাখবে; এবং তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যাতে তারা এ ধরনের অসারতায় প্রবেশ না করে — এটি তাদের প্রতিই দয়া ও ইহসান। তাদেরকে শিক্ষাসংক্রান্ত কোনো দায়িত্বে বসানো যাবে না, এবং টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও বেতারের কোনো ঘর তাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে না — যাতে তারা সমাজে এই মারাত্মক বিষ ছড়াতে না পারে। শাসকের জন্য এ ব্যাপারে ত্রুটি করা জায়েয নয় — আকীদা সংরক্ষণের জন্য, কিতাব ও সুন্নাহর প্রতিরক্ষার জন্য এবং জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের দমন করার জন্য।

এ হলো সেই অবস্থার কথা যেখানে দাবিকৃত "সত্য"টি আসলে কিছুই নয়। আর যদি তা বিশুদ্ধ পথে প্রমাণিত হয় এবং অভিজ্ঞ ও অবগত ব্যক্তিরা তার সত্যতা সাব্যস্ত করেন, তবে দ্বিতীয় অবস্থায় চলে যাও — আর তা হলো, নসটি আদৌ না বোঝা কিংবা তা বোঝার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকা। অর্থাৎ নসটি যদি উত্তমরূপে ও পূর্ণরূপে বোঝা হতো, তবে মনে এই বিরোধের ধারণাটিই জাগত না; কিন্তু যেহেতু নসের দিকে দৃষ্টিদানকারী ব্যক্তি বুঝতে ত্রুটি করেছে, তাই তার মনে এই বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সুতরাং নসটিকে পূর্ণরূপে বোঝা অপরিহার্য, এবং তার দলালাত (অর্থবহতা) কেবল তার কিছু অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

সুতরাং যখন দুটি বিষয় নিশ্চিত হবে — অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্যটি প্রমাণিত হবে, এবং নসের বোঝাটি বিশুদ্ধ ও নিখুঁত হবে — তখন, সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এই বিরোধ কখনোই পাওয়া যেতে পারে না। আর মুসলিমের কাছে সর্বদা ও চিরকাল নির্ভরযোগ্য বিষয় হলো, আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূলের ﷺ কালামকে সমস্ত কালামের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া; এবং তাঁদের দুজন ছাড়া অন্য যে কারো কথাকে তাঁদের কথা দিয়ে ওজন করা — যদি তা মিলে যায় তবে গ্রহণ করা হবে, আর যদি বিরোধ করে তবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। সুতরাং আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে কোনো কথা বা কাজে অগ্রবর্তী হব না।

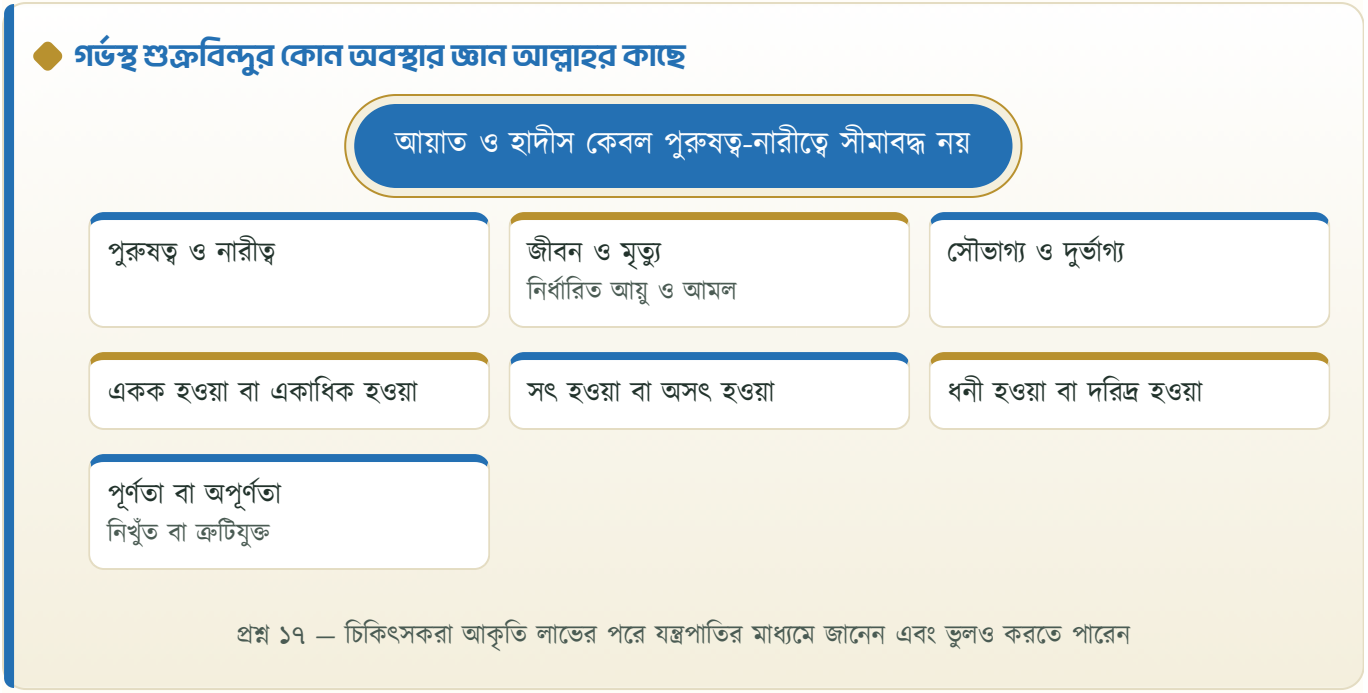
বিজ্ঞান ও নসের বাহ্যিক বিরোধ: দুই সম্ভাবনা

প্রথম সম্ভাবনা	দ্বিতীয় সম্ভাবনা
দাবিকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যটি আসলে সত্য নয়, মিথ্যা দাবি	সত্যটি বিশুদ্ধ পথে প্রমাণিত
এর বিশুদ্ধতার কোনো ভিত্তি নেই	নসটি না বোঝা বা বোঝায় ঘাটতি আছে
ওয়াজিব: কল্পকাহিনীটি ছুঁড়ে ফেলা	ওয়াজিব: নসটি পূর্ণরূপে বোঝা, অংশে সীমাবদ্ধ না করা

দুটি বিষয় নিশ্চিত হলে — সত্য প্রমাণিত ও নসের বোঝা বিশুদ্ধ — কোনো বিরোধ পাওয়া যায় না

এটি যখন জানলে, তখন জেনে রাখো — আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿ ويعلم ما في الأرحام ﴾ (সূরা লুকমান: ৩৪) এবং নবী ﷺ-এর বাণী ((ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله)) কেবল পুরুষত্ব ও নারীত্ব জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ বা আবদ্ধ নয়। এ ধরনের বোঝা এই নসগুলোর ব্যাপারে ঘাটতিপূর্ণ বোঝা। বরং উদ্দেশ্য হলো এই শুক্রবিন্দুর (নুতফা) সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান — পুরুষত্ব ও নারীত্ব, জীবন ও মৃত্যু, নির্ধারিত আয়ু ও আমল, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, একক হওয়া বা একাধিক হওয়া, সৎ হওয়া বা অসৎ হওয়া, ধনী হওয়া বা দরিদ্র হওয়া, পূর্ণতা বা অপূর্ণতা, নিখুঁত

হওয়া বা ত্রুটিযুক্ত হওয়া, কৃশ হওয়া বা স্থূল হওয়া, দীর্ঘ হওয়া বা খর্ব হওয়া — এভাবে এই শুক্রবিন্দুর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত অবস্থা পর্যন্ত। তবে এসবের কাছে চিকিৎসকরা কোথায়?



প্রশ্ন ১৭ — চিকিৎসকরা আকৃতি লাভের পরে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে জানেন এবং ভুলও করতে পারেন

আরও বলা হয়:— চিকিৎসকরা তো এটি জানেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যন্ত্রপাতির মাধ্যমে, যা গোপন জিনিসটিকে তাঁদের সামনে প্রকাশ করে দেয়, ফলে তা তাঁদের কাছে দৃশ্যমান হয়ে যায়। ভ্রূণের ওপর যখন এই রশ্মি নিক্ষেপ করা হয়, তখন তা তাকে অদৃশ্যের জগৎ থেকে বের করে দৃশ্যমানের জগতে নিয়ে আসে। সুতরাং বিষয়টি মোটেই গায়েবের জ্ঞানে হস্তক্ষেপ নয় যে তা নসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে।

আরও বলা হয়:— চিকিৎসকরা এই শুক্রবিন্দুর অবস্থা জানতে পারেন না, যতক্ষণ না তা আকৃতি লাভ করে এবং তা থেকে পুরুষের বৈশিষ্ট্য নারীর বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক হয়ে প্রকাশ পায়। আর যতক্ষণ তা নুতফা বা আলাকা অবস্থায় থাকে, তখন আল্লাহর কসম, দুনিয়ার সমস্ত চিকিৎসক একত্র হলেও তা পুরুষ না নারী তা জানতে পারবেন না। আকৃতি লাভের পরেই কেবল তাঁরা তা জানেন, এবং পরিচিত যন্ত্রপাতি ছাড়া তা জানার কোনো ক্ষমতা তাঁদের নেই; আর তা নির্ধারণে তাঁরা ভুলও করতে পারেন, যেমনটি সবারই জানা। সব মিলিয়ে, যে ব্যক্তি নসগুলোকে পূর্ণ ও বিশুদ্ধরূপে বুঝেছে তার কাছে এতে কোনো বিরোধ নেই। আল্লাহই সাহায্যকারী।

প্রশ্ন ১৮

জন্মনিয়ন্ত্রণের (তাহদীদুন নাসল) হুকুম কী — দলিলসহ তার ব্যাখ্যা দিন?

উত্তর/ আমি বলি:— পরিতাপের বিষয়, আমরা মুসলিমরা পশ্চিম থেকে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও আধুনিকতাবাদী মন্দ আহ্বায়কদের কাছ থেকে আমাদের ওপর যা-ই এসে পড়ে, সবই লুফে নিই — এর বিশুদ্ধ ও বাতিলের মধ্যে, গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাতের মধ্যে, এবং যা আমাদের শরীয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় — এসবের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করেই। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো কিছু মুসলিমের অবস্থা: উম্মাহকে আঘাত করে চলা এই ঘূর্ণিঝড়গুলোর মুখে আলিমগণ যখন দাঁড়িয়ে যান, তখন তারা তাঁকে গোঁড়ামি, পশ্চাৎপদতা ও অবোধগম্যতার অপবাদ দেয়।

এ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ওয়াজিব হলো শরীয়ত স্পষ্ট করা এবং সত্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা — যে রাগ করার সে রাগ করুক। কারণ ইলম স্পষ্ট করা ও মানুষকে নসীহত করা এমন এক আমানত, যা আল্লাহ আলিমদের

ওপর অর্পণ করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে তাঁরা মানুষের কাছে ইলম স্পষ্ট করবেন, তা গোপন করবেন না। এবং তাঁরা যেন বাস্তবতা দেখে হতাশ না হন, কারণ মুক্তি নিকটেই এবং কল্যাণের সুসংবাদ অনেক — সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই।

আর যে জিনিসটি আমাকে এ কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে তা হলো, এ মাসআলাটি বহু আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রের দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে; তাদের সংবিধানে এটি গৃহীত হয়েছে, এই নিয়মকানুনের বিরোধিতাকারীর জন্য অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে, এবং জনগণের ওপর তা অবশ্যপালনীয়রূপে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে — পর্দা ও আড়ালের পেছনে লুকিয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। এ ব্যাপারে সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে, দাওয়াতি কার্যক্রম সাজানো হয়েছে, গণমাধ্যম এর জন্য নিজেদের দরজা খুলে দিয়েছে, বিপদ ব্যাপক হয়ে পড়েছে, এর স্ফুলিঙ্গ চারদিকে ছিটকে পড়ছে এবং এর ধোঁয়া নাকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ওয়াজিব হলো সত্য স্পষ্ট করা, মানুষকে দিকনির্দেশনা ও পথপ্রদর্শনের হিদায়াত দেওয়া, এবং মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাতে প্রচেষ্টা ও মূল্যবান-বহুমূল্য সবকিছু ব্যয় করা। একমাত্র আল্লাহই সাহায্যকারী, হিদায়াতদাতা এবং সঠিক পথের দিকে তাওফীকদাতা।

এরপর আমি বলি:— জন্মনিয়ন্ত্রণ হারাম, তা জায়েয নয়; এবং এর দিকে আহ্বান হারামের দিকেই আহ্বান। সুতরাং এর দিকে আহ্বানকারী গুনাহগার, এর আহ্বানের উপায়-উপকরণ সহজ করে দেওয়া ব্যক্তি গুনাহগার, এর আহ্বানে সন্তুষ্ট ব্যক্তি গুনাহগার, এবং কথায় বা কাজে যেকোনো ধরনের সাহায্য দিয়ে যে তাকে সহযোগিতা করে সে-ও গুনাহগার। এই আহ্বানের মুখে ইসলামী জাতিসমূহ ও তাদের শাসকদের ওপর ওয়াজিব হলো, আল্লাহ তাদেরকে যত শক্তি দিয়েছেন তার সবটুকু দিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া; এর জন্য কোনো হৃদয়ও না খোলা, কোনো কানও না দেওয়া; একে পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা ও পূর্ণরূপে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা; এবং এর দিকে আহ্বানকারীদের মুখের ওপর সর্বোচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে তাদের প্রতি অস্বীকৃতি জানানো।

এটি নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল কয়েকটি বিষয়:—

এর অন্যতম:— এটি জাহিলিয়াতের রীতিগুলোর একটি রীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা। কারণ তাদের রীতিগুলোর একটি ছিল দারিদ্র্যের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তান হত্যা করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ

> "দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিই।" (সূরা আল-আনআম: ১৫১)

আর তিনি সূরা আল-ইসরায় বলেছেন:—

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ

> "দারিদ্র্যের আশঙ্কায় তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; আমিই তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দিই।" (সূরা আল-ইসরা: ৩১)

আর "ইমলাক" অর্থ দারিদ্র্য। এই আহ্বানের সূচনাবিন্দু হলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, অধিক সন্তান জন্মদানের ফলে জনগণ যেন দরিদ্র না হয়ে পড়ে, এবং এই দাবি যে জনগণের বিদ্যমান সম্পদ বিদ্যমান লোকদেরই চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট নয় — তাহলে এদের মতো আরও লোক এলে কী হবে? এবং এই দাবি যে অধিক বংশবৃদ্ধিতে অর্থনীতির উৎসগুলোর জন্য এক ভয়ংকর ও বিরাট বিপদ রয়েছে। এটিই তাদের সেই বুলি, যা আমরা তাদের কাছ থেকে সর্বদা শুনে থাকি — অথচ এটি হুবহু সেই যুক্তিই, যা মুশরিকরা তাদের সন্তান হত্যার পক্ষে দিত। আর এটি নির্বুদ্ধিতা এবং আল্লাহ তাআলার রিযিকের কোনো কিছুকে হারাম করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علمٍ وحرموا ما رزقهم

الله افتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين

"নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নির্বুদ্ধিতাবশত ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটনা করে হারাম করে নিয়েছে। তারা তো পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না।" (সূরা আল-আনআম: ১৪০)

সুতরাং পিতাদের ও সন্তানদের রিযিক আল্লাহরই দায়িত্বে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ

"আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিই।" (সূরা আল-আনআম: ১৫১)

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها

ومستودعها كل في كتابٍ مبين

"যমীনে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নয়; এবং তিনি জানেন তার স্থিতিস্থল ও তার সংরক্ষণস্থল। সবকিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে।" (সূরা হূদ: ৬)

সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণের দিকে আহ্বানে জাহিলিয়াতের এই কুৎসিত রীতিটিকে পুনরুজ্জীবিত করা রয়েছে। আর আমরা তো আদিষ্ট হয়েছি জাহিলিয়াতের পথগুলো নিভিয়ে দিতে ও সেসবে তাদের বিরোধিতা করতে, এবং নিষিদ্ধ হয়েছি তাদের ইবাদত ও অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে। আর সেই নিচু-স্তরের ফিরিঙ্গি-অনুসারী পাশ্চাত্য-অনুরাগীদের কথার কোনো মূল্য নেই — যারা কাফিরদের কোলে লালিত-পালিত হয়েছে, তাদের নর্দমা ও তাদের পচা-দুর্গন্ধময় চিন্তাধারা থেকে দুধ পান করেছে, এবং এসেছে মুসলিমদের দেশে এসব চিন্তা ছড়িয়ে দিতে। মূল্য কেবল সেটিরই, যা শরীয়ত নির্ধারণ করেছে এবং আলিমগণ বলেছেন। কারণ কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং মুমিনদের পথ অনুসরণ করা ছাড়া কোনো নাজাত নেই, কোনো সাফল্য নেই, কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং এই আহ্বানটি জাহিলিয়াতের আহ্বানগুলোরই একটি; তাই এর বিরোধিতা করা ও একে ছুঁড়ে ফেলা অপরিহার্য। আল্লাহই সাহায্যকারী।

এর অন্যতম:— এটি শরীয়তপ্রণেতার একটি উদ্দেশ্যের (মাকসাদ) বিপরীত। কারণ শরীয়তের মাকাসিদগুলোর একটি হলো বংশবৃদ্ধি, বংশনিয়ন্ত্রণ নয়। যেমন তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন:—

تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

> "তোমরা অধিক ভালোবাসাময় ও অধিক সন্তানধারিণী নারীদের বিয়ে করো; কারণ আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করব।"

সুতরাং শরঈভাবে কাম্য হলো বংশবৃদ্ধি; আর এই আহ্বান এই শরঈ দাবির বিপরীত ও এর সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ। আর যা-ই শরঈ দাবির বিপরীত হয় বা তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তা-ই নিষিদ্ধ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

এর অন্যতম:— এই আহ্বানে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কুধারণা পোষণ রয়েছে। এর ওপর আল্লাহ তাআলার এই বাণী প্রযোজ্য হয়:—

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية

> "তারা আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য ধারণা পোষণ করে — জাহিলিয়াতের ধারণা।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৪)

এবং তাঁর এই বাণী:—

الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء

> "যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে; মন্দের চক্র তাদের ওপরই।" (সূরা আল-ফাতহ: ৬)

কারণ এই আহ্বানের প্রকৃত বক্তব্য হলো:— তোমরা সন্তান জন্ম দিয়ো না, কেননা তোমরা যদি সন্তান আনো এবং তাদের সংখ্যা বাড়াও, তবে তারা তোমাদের জীবিকার ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তাদের কোনো রিযিকদাতা নেই। আর এটি আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা সম্পর্কে কুধারণা; কেননা তিনিই রিযিকদাতা, প্রবল শক্তির অধিকারী; সেই রব, যিনি তাঁর বান্দাদের রিযিক ছাড়া অবহেলায় ছেড়ে দেন না — যে রিযিক দিয়ে তাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং বান্দাদের রিযিক তাঁরই দায়িত্বে:—

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

> "যমীনে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নয়।" (সূরা হূদ: ৬)

আর শর্ত, না-বাচক ও নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গে অনির্দিষ্ট (নাকিরা) শব্দ ব্যাপকতা বোঝায়; ফলে এতে প্রতিটি বিচরণশীল প্রাণী অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং যে ধারণা করল যে সন্তানরা রিযিক ছাড়া জন্মায়, কিংবা তারা এলে জীবিকা সংকুচিত হয়ে যাবে এবং তারা বা তাদের পিতারা খাওয়ার মতো কিছু পাবে না — সে আল্লাহর ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করল। সুতরাং এই আহ্বানটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কুধারণার ওপর নির্মিত। আর তা হারামের দিকে নিয়ে যায়; উসূলে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যা হারামের দিকে নিয়ে যায় তা হারাম। আর যরীআ (মাধ্যমের পথ) বন্ধ করা শরীয়তের বড় দাবিগুলোর একটি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

এর অন্যতম:— এই আহ্বান তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যগুলোর একটি লক্ষ্য এবং তাদের উদ্দেশ্যগুলোর একটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে — আর তা হলো, বিশেষভাবে আরব ও ইসলামী উম্মাহকে সংখ্যায় কমিয়ে আনা, যাতে তারা তাদেরকে দাস বানাতে পারে, লাঞ্ছিত করতে পারে, তাদের ওপর বিজয়ী হতে পারে, তাদের অপমান করতে পারে এবং তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে পারে। কারণ ইসলামী উম্মাহই তাদের পথের একমাত্র বাধা এবং তাদের একমাত্র শত্রু। তাই তারা যথাসাধ্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা কমিয়ে আনার — যেন তাদের সংখ্যা কমে যায়, তাদের ভীতি-শ্রদ্ধা চলে যায়, আর তখন তারা সামরিক শক্তি দিয়ে তাদের ওপর চেপে বসতে পারে; ফলে তারা তাদের সামনে এমন কোনো শক্তি পাবে না যা তাদের আগ্রাসন ঠেকাতে পারে, আর এমন কোনো সক্ষম হাত পাবে না যা তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে। তখন তারা অস্ত্র দিয়ে তাদের পরাভূত করবে, তাদের দ্বীন থেকে ফিতনায় ফেলবে, এবং অপমান ও লাঞ্ছনার বিপর্যয় তাদেরকে আস্বাদন করাবে।

সুতরাং এই আহ্বান — যার জন্য বহু অজ্ঞ আরব ও মুসলিম করতালি দেয় — প্রকৃতপক্ষে একটি ষড়যন্ত্রমূলক আহ্বান, যার সূচনাবিন্দু ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষ। এটি মুসলিমদের ধ্বংস করা, তাদের দেশ দখল করা, তাদের দ্বীন থেকে ফিতনায় ফেলা এবং সংখ্যায় ও সরঞ্জামে তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার এক পরিকল্পনার সূচনা — যাতে তারা সর্বদা একটি নিচু, লাঞ্ছিত ও পরাভূত জাতি হয়ে থাকে, যাকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না এবং যার দিকে কখনো ফিরেও তাকায় না; বরং তারা থাকবে জাতিসমূহের প্রান্তসীমায় এবং সভ্যতাগুলোর সর্বপশ্চাতে। কারণ কোনো উম্মাহর সংখ্যা কমে গেলে সম্মান ও মর্যাদা থেকে তার অংশ চলে যায়, তখন সেই নিচু-স্তরের লোকেরাও তার ওপর দুঃসাহস দেখায় যাদের কোনো ওজন নেই, আর তাকে নিলামের বাজারে বেচা-কেনা করা হয়।

আর এটিই সেই জিনিস, যার জন্য এই আহ্বানের লোকেরা পরিকল্পনা করে এবং যেদিকে তারা লক্ষ্য স্থির করে। কিন্তু তারা এটিকে জনগণের প্রতি করুণা ও দয়ার পোশাক পরিয়ে দেয়, যাতে এর আসল রূপ ফাঁস না হয়ে যায় এবং এর ত্রুটি উন্মোচিত না হয়। সুতরাং এটি ছড়ানো, প্রচার করা, উৎসাহ দেওয়া ও অনুমোদন করার ক্ষেত্রে যে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে, সে উম্মাহর কাঠামো ধ্বংস করার জন্য প্রয়াসী, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্যকারী, এই ষড়যন্ত্রে তাদের বন্ধু ও তা বাস্তবায়নে অংশীদার, এবং উম্মাহর ইজ্জতের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। তার জন্য দুর্ভোগ, যদি সে এ

অবস্থায় অটল থেকে মারা যায় ও পুনরুত্থিত হয় — রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে দুর্ভোগ! কারণ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তিনিই হবেন তার প্রতিপক্ষ, যেহেতু সে উম্মাহকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়াসী ছিল এবং তার বন্ধনগুলো ছিন্ন করতে আগ্রহী ছিল। আর আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে এই আহ্বান থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি এবং এর অনুসারীদের থেকেও আল্লাহ তাআলার কাছে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তাআলাই রিযিকদাতা এবং সমস্ত বিষয়ের লাগাম তাঁরই দুই হাতে, জাল্লা ওয়া আলা। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

জন্মনিয়ন্ত্রণ: লেখকের দলিল

জন্মনিয়ন্ত্রণ হারাম, জায়েয নয়; এর দিকে আহ্বান হারামের দিকে আহ্বান

- **জাহিলিয়াতের রীতি**
  দারিদ্র্যের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা (আন'আম ১৫১, ইসরা ৩১)
- **রিযিক আল্লাহর দায়িত্বে**
  হূদ ৬ — যমীনে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণীর রিযিক
- **শরীয়তের মাকসাদের বিপরীত**
  বংশবৃদ্ধি কাম্য, বংশনিয়ন্ত্রণ নয়
- **আল্লাহর ব্যাপারে কুধারণা**
  আলে ইমরান ১৫৪; ফাতহ ৬
- **উম্মাহর সংখ্যা ও শক্তি কমার আশঙ্কা**
  লেখকের বিশ্লেষণ
- **আহ্বানকারী ও সহযোগী**
  প্রত্যেকে গুনাহগার

প্রশ্ন ১৮ — লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী

প্রশ্ন ১৯

সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বেসরকারি ডিসপেনসারি ও স্কুলের স্বাস্থ্য-ইউনিট থেকে যেসব অসুস্থতাজনিত ছুটি (মেডিকেল লিভ) দেওয়া হয়, সেসবের ব্যাপারে বক্তব্য কী?

উত্তর/ আমি বলি:— এসব স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান থেকে ইস্যু হওয়া এই ছুটির ব্যাপারে বক্তব্য দুটি অবস্থার বাইরে নয়:—

হয় যে কর্মচারী ছুটি চেয়েছে সে তার অভিযোগে সত্যবাদী এবং যে রোগে সে ভুগছে তার প্রকৃত অবস্থা জানানোর ক্ষেত্রে সত্যবাদী, আর চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখলেন যে এই রোগ থাকা অবস্থায় কর্মচারীর জন্য কাজ করা কষ্টকর, তাই তিনি এ কারণে তাকে অসুস্থতাজনিত ছুটি দিলেন — এটি জায়েয। এই ছুটি তার যথাস্থানে পড়েছে এবং এ অবস্থায় এর বৈধতায় কোনো সন্দেহ নেই।

আর যদি কর্মচারী রোগের দাবিতে মিথ্যা বলে, বাস্তবে সে অসুস্থ নয় বরং কেবল অসুস্থতার ভান করছে; অথবা সে এমন রোগে অসুস্থ যা তাকে কাজ ও দায়িত্ব পালন থেকে বাধা দেয় না, কারণ তা এমন সামান্য রোগ যা উল্লেখযোগ্যই নয়; অথবা চিকিৎসক তাকে এই ছুটি দিয়ে পক্ষপাত করলেন পূর্বপরিচয়ের কারণে, কিংবা চিকিৎসকের প্রতি তার আগে থেকে করা কোনো ইহসানের কারণে; অথবা সে তা বেসরকারি ডিসপেনসারি থেকে কিনে নিয়েছে — তবে এসব বিবেচনায় এই ছুটি জায়েয নয়; বরং তা হারাম। আর এই ছুটির কারণে ওই দিনের বেতন কর্মচারীর প্রাপ্য নয়; বরং তা সুহত (হারাম উপার্জন), যা সে হারামভাবেই ভক্ষণ করছে। আর তা হতে পারে তার ওপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের কারণ, তার দুআ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ এবং তার রিযিক ও সন্তানদের মধ্যে বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। কারণ হারাম ভক্ষণের রয়েছে তিক্ত প্রভাব ও অসুস্থ পরিণাম।

আর বিষয়টি আরও খারাপ হয় যদি এর সঙ্গে যুক্ত হয় পাপাচারী কসম এবং রোগের দাবিতে মিথ্যা শপথ — অন্ধকারের ওপর অন্ধকার। বিষয়টিকে তুচ্ছ মনে করো না; কারণ ছোট ছোট গুনাহ একজন মানুষের ওপর জমা হতে হতে তাকে

ধ্বংস করে দেয়। এক নারী তো জাহান্নামে প্রবেশ করেছিল একটি বিড়ালের কারণে, যাকে সে আটকে রেখেছিল — না নিজে তাকে খাওয়াল, না তাকে ছেড়ে দিল যাতে সে জমিনের পোকামাকড় খেতে পারে।

আর যে চিকিৎসক এই ছুটিতে স্বাক্ষর করলেন তিনিও গুনাহগার এবং এই কর্মচারীর সঙ্গে শাস্তিতে অংশীদার — যদি না তিনি শর্তসমূহ পূর্ণকারী খাঁটি তাওবা (তাওবাতুন নাসূহ) করেন। সুতরাং সবার প্রতি ওসিয়ত হলো: আল্লাহ তাআলার তাকওয়া অবলম্বন করা, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁর নজরদারির কথা স্মরণ রাখা, এবং আমরা যেন স্থায়ীর বিনিময়ে ধ্বংসশীলকে না কিনি, আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে না কিনি। কারণ আল্লাহ গোপন ও তার চেয়েও গোপন বিষয় জানেন, তিনি জানেন চোখের চোরা চাহনি এবং বক্ষসমূহ যা গোপন রাখে। তুমি যে দপ্তরে কাজ করো সেখানে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যা তুমি গোপন করেছ, তা আল্লাহ তাআলার কাছে গোপন থাকে না। আর তুমি আল্লাহর জন্য যা ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় দেবেন। ইজ্জত ও মহিমার অধিকারীর ক্রোধ নিয়ে সম্পদ টিকে থাকায় আনন্দিত হয়ো না। সত্য বলো, কারণ সত্য মুক্তির পথ আর মিথ্যা পতনের গহ্বর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

অসুস্থতাজনিত ছুটি

জায়েয	জায়েয নয়, হারাম
কর্মচারী অভিযোগে সত্যবাদী; রোগে কাজ করা কষ্টকর	রোগের দাবিতে মিথ্যা, অসুস্থতার ভান
চিকিৎসক নিজ অভিজ্ঞতায় তা দেখে ছুটি দেন	কাজে বাধা নয় এমন সামান্য রোগ
ছুটি তার যথাস্থানে পড়েছে	পূর্বপরিচয় বা ইহসানের কারণে পক্ষপাত
—	বেসরকারি ডিসপেনসারি থেকে কিনে নেওয়া ছুটি
—	ওই দিনের বেতন প্রাপ্য নয়; তা সুহত (হারাম উপার্জন)

স্বাক্ষরকারী চিকিৎসকও গুনাহগার ও শাস্তিতে অংশীদার, খাঁটি তাওবা না করলে

প্রশ্ন ২০

কিছু নারী রোগী চিকিৎসকের সামনে অপ্রয়োজনেই মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করে — তাদের প্রতি আপনার নসীহত কী?

উত্তর/ আমি বলি:— তার প্রতি আমার নসীহত হলো, সে যেন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। কারণ দৃষ্টির অধ্যায়ে মুখমণ্ডল আওরাত; সুতরাং স্বামী বা মাহরাম ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের জন্য তা দেখা জায়েয নয়। এবং সে যেন তার সেই রবের নজরদারির কথা স্মরণ রাখে, যিনি তাকে তা ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছেন। আর সে যেন জানে, এই উন্মোচনের মাধ্যমে সে শয়তানের ফাঁদগুলোর একটিতে পরিণত হয় — এই উন্মোচনের ফলে যে ফিতনা সৃষ্টি হয় তার কারণে। সুতরাং এটি হারাম, এবং যে নারী তা করে সে তার গুনাহ নিয়ে ফিরে যায়। আর তার জন্য সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দুর্ভোগ, যাঁর বিরুদ্ধে সে এই নাফরমানি দিয়ে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا

لبعولتهن... الآية

"আর তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে তাদের বক্ষদেশ ঢেকে রাখে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তাদের স্বামীদের ছাড়া... (আয়াতের বাকি অংশ)।" (সূরা আন-নূর: ৩১)

আর এতে চিকিৎসকের কোনো উল্লেখ নেই, তিনি স্বামী বা মাহরাম হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ তাআলা উম্মুল মুমিনীনদের ব্যাপারে সাহাবীদের উদ্দেশে বলেছেন:—

وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر

ج

لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"আর যখন তোমরা তাঁদের কাছে কোনো সামগ্রী চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটি তোমাদের অন্তরের ও তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।" (সূরা আল-আহযাব: ৫৩)

সুতরাং সেই পবিত্র প্রজন্মের ব্যাপারেই যদি এই বিধান হয়, তবে এই যুগে আমাদের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত? আর নারীর মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা আল্লাহ তাআলার হকসমূহের অন্তর্ভুক্ত; এটি এমন কোনো হক নয় যা নারীর ইচ্ছাধীন এবং তার আগ্রহের অধীন; বরং এটি এক অবশ্যপালনীয় হক ও দৃঢ়ভাবে ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

وما كان المؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم

الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে নিজেদের কোনো এখতিয়ার থাকার অবকাশ নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, সে তো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হলো।" (সূরা আল-আহযাব: ৩৬)

আর নারী অবশ্যপালনীয় আদেশ পেয়েছে তার নূপুরকে শব্দে ও রূপে উভয়ভাবেই ঢেকে রাখার — অর্থাৎ তার জন্য জায়েয নয় তা রূপে প্রকাশ করা, আর জায়েয নয় পা ঠুকে চলা যাতে পুরুষরা জানতে পারে সে তার সৌন্দর্য থেকে কী গোপন করছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

> "আর তারা যেন তাদের পা ঠুকে না চলে, যাতে তারা তাদের যে সৌন্দর্য গোপন রাখে তা জানা যায়।" (সূরা আন-নূর: ৩১)

সুতরাং নারীকে যখন তার পা ও নূপুর ঢেকে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন আল্লাহর কসম দিয়ে বলো তো — তার মুখমণ্ডল উন্মোচন করা কীভাবে জায়েয হবে, অথচ মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও রূপের সমাবেশস্থল, পুরুষদের বাসনার প্রথম লক্ষ্য, এবং সেটিই পুরুষদের চোখে নারীকে উঁচু করে ও নামিয়ে দেয়? না, আল্লাহর কসম, এটি কখনোই হতে পারে না। বরং তাকে যখন তার পা ও নূপুর ঢেকে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন তার মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার আদেশ তো আরও অগ্রগণ্যভাবেই প্রযোজ্য। আর এটি কিয়াসে আওলাবী (অগ্রগণ্যতার কিয়াস)। উসূলে সাব্যস্ত হয়েছে যে মাফহূমুল মুওয়াফাকা আল-আওলাবী (অগ্রগণ্যতাসূচক সম্মতিগত অর্থ) দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য — যেমন আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে:—

ولا تقل لهما أف

> "আর তুমি তাদের দুজনকে 'উফ' বলো না।" (সূরা আল-ইসরা: ২৩)

সুতরাং এই একটি শব্দ যদি সন্তানের জন্য তার পিতা-মাতাকে বলা জায়েয না হয়, তবে তাদের দুজনকে প্রহার করা এবং তাদের প্রতি গালাগালি ও কটূক্তি দিয়ে জিহ্বার ধারালো ব্যবহার — তা তো আরও অগ্রগণ্যভাবেই হারাম। এখানেও ঠিক তা-ই।

আর নারীর জন্য পুরুষদের থেকে তার মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার ব্যাপারে এই একটি দলিলই যথেষ্ট — যদি এতে দৃষ্টিদানকারী ব্যক্তি সেই গোপন শয়তানি প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকে, যা হলো: প্রবৃত্তির অনুসরণ; আল্লাহর কাছেই এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুতরাং চিকিৎসকও সেসব বেগানা পুরুষেরই অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে নারীর জন্য তার দেহের কোনো কিছু দেখানো জায়েয নয় — না মুখমণ্ডল, না দুই হাতের তালু, না দুই পা — কেবল সেটুকু ছাড়া যা উন্মোচন করার জন্য অনিবার্য চিকিৎসাগত প্রয়োজন (দারূরাত) দাবি করে। কারণ দারূরাত তার পরিমাণ অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়; সুতরাং সে যেন দারূরাত যতটুকু দাবি করে ততটুকু উন্মোচনেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আর নারী চিকিৎসকের কাছে প্রবেশ করামাত্রই নিজের মুখ থেকে ওড়না ফেলে দেবে — যেন তিনি তার স্বামী বা তার পিতা বা তার ভাই বা তার মাহরামদের কেউ — এটি হারাম, জায়েয নয়। আর প্রত্যেকেই তার আমল দেখবে এমন এক দিনে, যেদিন কোনো বংশ, কোনো পদমর্যাদা, কোনো প্রতিপত্তি, কোনো সম্পদ ও কোনো সন্তান কাজে আসবে না — কেবল সে ছাড়া, যে আল্লাহর কাছে সুস্থ অন্তর নিয়ে আসবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

নারী রোগী ও চিকিৎসক

করুন	করবেন না
✓ আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর নজরদারি স্মরণ রাখা, যিনি তা ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছেন	✗ অপ্রয়োজনে চিকিৎসকের সামনে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা — হারাম
✓ দারুরাত যতটুকু দাবি করে ততটুকু উন্মোচনেই সীমাবদ্ধ থাকা	✗ ঢুকেই ওড়না ফেলে দেওয়া, যেন চিকিৎসক স্বামী বা মাহরাম

প্রশ্ন ২০ — চিকিৎসক স্বামী বা মাহরাম হলে ভিন্ন কথা

প্রশ্ন ২১

নিম্নলিখিত অবস্থাগুলোর ফিকহি হুকুম কী:— যে রোগীর আরোগ্যের আশা নেই তার রোযার হুকুম কী? যে চিকিৎসক অপারেশন-কক্ষ থেকে বের হতে পারেন না, তাঁর জন্য সালাত তার ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেওয়ার হুকুম কী? কিডনি-রোগী রোযা অবস্থায় তার রক্ত পরিবর্তন করলে তার রোযার হুকুম কী? রমযানের দিনে দাঁত তোলার হুকুম কী? দাঁত তোলার জন্য মুখে অবশকরণ ইনজেকশন (চেতনানাশক) কি রোযা নষ্ট করে? নারীর জন্য কি জায়েয রোযা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মাসিক বন্ধ করার বড়ি সেবন করা? ক্যান্সার রোগকে "খবীস (নিকৃষ্ট) রোগ" নামে অভিহিত করার হুকুম কী? বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি প্রলাপ বকে, তবে তার ওপর কি রোযা বা খাদ্য দান (ইতআম) আছে? কোনো রোগীকে চিকিৎসকের ইফতার করার নির্দেশ দেওয়াই কি রোযা ভাঙার বৈধতার জন্য যথেষ্ট? আর রোগী যদি মারা যায় এবং যেসব রোযা ছুটে গিয়েছিল তা কাযা না করে থাকে, তবে হুকুম কী?

উত্তর/ আমি বলি:— সহজ করার ও সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, এবং যাতে উত্তরগুলো মিশে না যায়, সেজন্য আমি তোমার জন্য উত্তরটি কয়েকটি মাসআলায় বিভক্ত করে দিচ্ছি। তাই আমি বলি:—

মাসআলা এক:— যে রোগীর আরোগ্যের আশা নেই, কিংবা যে বৃদ্ধ রোযা রাখতে সক্ষম নন অথচ তাঁর বোধশক্তি অবশিষ্ট আছে — তাঁদের ওপর থেকে রোযা রহিত হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলার বাণী:—

وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر

> "আর তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো, তবে অন্য দিনগুলোতে সেই সংখ্যা পূরণ করবে।"

আর আহলে ইলম এ ব্যাপারে একমত যে, অক্ষমতার কারণে ওয়াজিবসমূহ রহিত হয়ে যায়। তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন:—

وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

"আর আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ের আদেশ দিয়েছি, তার মধ্য থেকে তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখো ততটুকু করো।"

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

"আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না।" (সূরা আল-বাকারা: ২৮৬)

এ ব্যাপারে আহলে ইলম রহিমাহুমুল্লাহু তাআলার মধ্যে আমরা কোনো মতভেদ জানি না। সুতরাং তাঁদের জন্য রোযা ভাঙা জায়েয; তবে তাঁদের ওপর ওয়াজিব হলো প্রতিটি দিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়ানো — প্রতিদিনের জন্য একজন ফকীরকে দেড় কিলোগ্রাম পরিমাণ খাদ্য, খেজুর বা গম বা চাল বা এ জাতীয় কিছু থেকে। এর দলিল আল্লাহ তাআলার বাণী:—

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

"আর যারা তা কষ্টসহকারে সামর্থ্য রাখে, তাদের ওপর ফিদইয়া — একজন মিসকীনকে খাদ্য দান।" (সূরা আল-বাকারা: ১৮৪)

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন:— এটি বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা নারীর ব্যাপারে রুখসত হিসেবে নাযিল হয়েছে, যাঁরা রোযা রাখার সামর্থ্য রাখেন না — তাঁরা রোযা ভাঙবেন এবং প্রতিটি দিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন।

আর যে রোগীর রোগ আরোগ্যের আশা নেই, সে বৃদ্ধ ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত। আর স্বাভাবিকভাবেই তা তখন, যখন রোগটি তাকে রোযা রাখা থেকে বাধা দেয়। সুতরাং মূল বিধান হলো রোযা, আর তার বিকল্প হলো খাদ্য দান; আর যখন মূল বিধানটি অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন বিকল্পের দিকে ফেরা হয়। এই হলো প্রথম মাসআলার উত্তর।

মাসআলা দুই:— মূল বিধান হলো, চিকিৎসকের ওপর ওয়াজিব — যদি বিষয়টি তাঁর নিজের নির্ধারণের অধীনে থাকে — যে তিনি এ ধরনের অপারেশনের জন্য দীর্ঘ সময়গুলো বেছে নেবেন, যেমন ইশার সালাতের পর বা ফজরের সালাতের পর। আর তাঁর জন্য জায়েয নয় ইচ্ছাকৃতভাবে অপারেশনের সময় এমন সময়ে নির্ধারণ করা, যার কারণে সালাত তার ওয়াক্ত থেকে ছুটে যায়। কারণ ওয়াক্ত সালাতের শর্তগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ়; সুতরাং তা রক্ষা করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً

> "নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয করা হয়েছে।" (সূরা আন-নিসা: ১০৩)

এই হলো মূল বিধান। কিন্তু বিষয়টি যদি তাঁর পছন্দ ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে না থাকে, তবে তিনি লক্ষ্য করবেন:— অপারেশনের সময় যদি এমন ওয়াক্তে পড়ে যেখানে অন্য সালাতের সঙ্গে জমা (একত্র) করা জায়েয, তবে এ অবস্থায় তাঁর জন্য জমা করা জায়েয — যদি তিনি জানেন যে অপারেশনের সময় দুটি ওয়াক্তই গ্রাস করে ফেলবে। তখন তিনি জমউ তাকদীম (আগেভাগে একত্র) করে সালাত আদায় করবেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করবেন। আর তাঁর জন্য জায়েয নয় জমাকৃত দুই সালাতকে তাদের ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেওয়া; কারণ এটি কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর এর দিকে ঠেলে দেওয়ার মতো কোনো দারূরাতও নেই, বিষয়টি তো তাঁরই হাতে; আর জমা করার বৈধতা তো এর চেয়েও কম কারণেই শরীয়তসম্মত, সুতরাং এ অবস্থায় তার বৈধতা আরও অগ্রগণ্যভাবেই প্রযোজ্য।

সুতরাং অপারেশন যদি যোহরের কিছু পরে নির্ধারিত হয় এবং তা মাগরিবের পরের আগে শেষ না হয় — উদাহরণস্বরূপ — তবে তিনি যোহর ও আসর জমউ তাকদীম করে আদায় করবেন। আর যদি তাঁর জন্য সহজতর এবং রোগীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয় জমউ তাখীর (পিছিয়ে একত্র) করা, তবে তা-ও তাঁর জন্য বৈধ — যেমন ধরো, অপারেশন শুরু হবে মাগরিবের এক ঘণ্টা আগে এবং রাত দশটার পরের আগে শেষ হবে না; তখন তিনি মাগরিবের সালাত পিছিয়ে দিয়ে ইশার সঙ্গে জমউ তাখীর করে আদায় করবেন। এসবই জায়েয, এতে কোনো সংকীর্ণতা নেই। আহলে ইলম রহিমাহুমুল্লাহু তাআলার কাছে সাব্যস্ত হয়েছে যে জমা করা একটি আকস্মিক-কারণজনিত রুখসত, আর মানুষ থেকে সংকীর্ণতা দূর করা তার কারণগুলোর একটি। এই শরীয়তে কোনো সংকীর্ণতা নেই — সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই।

আর যদি সার্জন চিকিৎসককে হঠাৎ ডাকা হয় এমন একটি তাৎক্ষণিক অপারেশনের জন্য যা বিলম্ব সহ্য করে না, এবং তা দ্রুত সম্পন্ন করার সঙ্গে প্রাণ বা অঙ্গ রক্ষা জড়িত — তবে তাঁকে আমরা বলি:— এখনই উঠুন এবং তা সম্পন্ন করুন; আপনার জন্য বিলম্ব করা জায়েয নয়, যদিও আপনার পূর্ণ একদিনের সালাতও ছুটে যায়। আর সেই অপারেশন শেষ হলে ছুটে যাওয়া সমস্ত সালাত ধারাবাহিকভাবে কাযা করুন — প্রথমটির জন্য আযান দেবেন এবং তার প্রতিটি সালাতের জন্য ইকামত দেবেন।

আর তা এ কারণে যে, প্রাণ ও অঙ্গ রক্ষার মাসলাহাত সালাতকে তার ওয়াক্তে আদায় করার মাসলাহাতের ওপর অগ্রগণ্য। উসূলে সাব্যস্ত হয়েছে যে, দুটি মাসলাহাত সংঘর্ষে লিপ্ত হলে নিম্নতরটিকে হারিয়ে উচ্চতরটির প্রতি লক্ষ রাখা হয়। আর প্রাণ রক্ষা শরীয়তের মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত; এটি সেই পাঁচটি অপরিহার্য বিষয়ের (দারূরিয়্যাতে খমসা) একটি, যেগুলো রক্ষা করা ওয়াজিব বলে সমস্ত শরীয়ত এসেছে। প্রাণ নষ্ট হওয়া একটি মাফসাদা (অনিষ্ট), আর সালাতকে ওয়াক্তের বাইরে বের করে দেওয়াও একটি মাফসাদা — কিন্তু তা প্রথমটির চেয়ে কম। কাওয়াইদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, দুটি মাফসাদা সংঘর্ষে লিপ্ত হলে হালকাটি গ্রহণ করে কঠিনতরটির প্রতি লক্ষ রাখা হয়।

আর জানা কথা যে, এই অপারেশন দ্রুত সম্পন্ন করার মধ্যে রয়েছে একটি মাফসাদা দূর করা, আর সালাতকে তার ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে রয়েছে একটি মাসলাহাত অর্জন করা। কাওয়াইদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, মাফসাদা দূর করা মাসলাহাত অর্জনের ওপর অগ্রগণ্য। আরও জানা কথা যে, প্রাণ যদি চলে যায় তবে তার কোনো বিকল্প নেই; আর সালাত যদি ওজরের কারণে ছুটে যায় তবে তার একটি বিকল্প আছে — তা হলো ওজর দূর হওয়ামাত্র তা কাযা করা। সুতরাং এ দুটি এমন বিষয়, যার একটি বিকল্প ছাড়াই চলে যায় এবং দ্বিতীয়টি বিকল্পসহ চলে যায়। কাওয়াইদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যা বিকল্প ছাড়া চলে যায় তার প্রতি লক্ষ রাখা, যা বিকল্পসহ চলে যায় তার চেয়ে অগ্রগণ্য। এটি ফুকাহায়ে কিরাম রহিমাহুমুল্লাহু তাআলার কাছে সাব্যস্ত।

আর এখনই অপারেশন না করার ফলে যে ক্ষতি হয় তা বিরাট বড় ক্ষতি, আর ওজরের কারণে সালাত ওয়াক্ত থেকে ছুটে যাওয়ায় যে ক্ষতি হয় তা এর চেয়ে হালকা। কাওয়াইদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, দুটি ক্ষতি সংঘর্ষে লিপ্ত হলে হালকাটি গ্রহণ করে কঠিনতরটির প্রতি লক্ষ রাখা হয়। সুতরাং কাওয়াইদ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে, চিকিৎসকের ওপর

ওয়াজিব এই জরুরি অপারেশনটি সম্পন্ন করা এবং অবসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে যাওয়া সালাতগুলো কাযা করা। আল্লাহই তাওফীকদাতা ও সঠিক পথের দিকে হিদায়াতদাতা।

সার্জন ও সালাতের ওয়াক্ত

অবস্থা	হুকুম
সময় সার্জনের নিজের নিয়ন্ত্রণে	ওয়াক্ত ছুটে যায় না এমন সময় বেছে নেওয়া ওয়াজিব
নিয়ন্ত্রণে নেই, দুই ওয়াক্ত গ্রাস করবে	জমউ তাকদীম বা জমউ তাখীর করে সালাত জায়েয
জমাকৃত দুই সালাত ওয়াক্ত থেকে পিছানো	জায়েয নয়; কবীরা গুনাহ
বিলম্ব সহ্য করে না এমন প্রাণরক্ষার তাৎক্ষণিক অপারেশন	অপারেশন করবেন; পরে ধারাবাহিক কাযা — প্রথমটির আযান, প্রতিটির ইকামত

প্রশ্ন ২১, মাসআলা দুই

মাসআলা তিন:— কিডনি-রোগীর ব্যাপারে বলা যায়, তার জন্য জায়েয নয় রোযার দিনে তার রক্ত পরিবর্তন ও পরিশোধন (ডায়ালাইসিস) করা, যতক্ষণ না সেখানে এর জন্য কোনো দারূরাত থাকে। কারণ রক্ত তার দেহ থেকে বের হয়, এবং এই বের হওয়াটি তার নিজের ইচ্ছায়; আর তা সর্বসম্মতিক্রমে অত্যন্ত বেশি পরিমাণ রক্ত। এটি রোযা নষ্টকারী, এবং হিজামা (রক্তমোক্ষণ)-এর চেয়েও এই হুকুমের অধিক উপযুক্ত। কারণ হিজামা যদি রাজিহ (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) মত অনুযায়ী রোযা নষ্ট করে, অথচ তার রক্তের পরিমাণ জানা — তবে পরিশোধন প্রক্রিয়ায় সমস্ত রক্ত বের হয়ে যাওয়ার অবস্থা কেমন হবে? সুতরাং এটি আরও অগ্রগণ্যভাবেই নষ্টকারী। এই হলো প্রথম নষ্টকারী দিক।

আর সেখানে আরেকটি নষ্টকারী দিক রয়েছে — তা হলো, রক্ত পরিশোধন ও পরিচ্ছন্ন করার পর তা আবার শিরাপথে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর জানা কথা যে, এটি এমন জিনিস যা দিয়ে দেহ পুষ্টি লাভ করে, শক্তি অর্জন করে এবং সতেজ হয়। আর যা এমন হয় তা রোযা নষ্ট করে; কারণ কোনো জিনিস যদি অস্বাভাবিক পথ দিয়ে প্রবেশ করে এবং তা এমন হয় যা দিয়ে দেহ শক্তি ও পুষ্টি লাভ করে, তবে তা রোযা নষ্ট করে — কেননা তা খাওয়া-দাওয়ার অর্থেই পড়ে।

আর আমি তোমার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যাতে বিষয়টি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়:— তুমি কী বলো, যদি কোনো রোযাদারের রক্তের প্রয়োজন হয় এবং তাকে রক্ত দেওয়া হয় — তবে কি তার রোযা নষ্ট হবে? অবশ্যই হ্যাঁ। এখানেও ঠিক তা-ই, বরং আরও অগ্রগণ্যভাবে — কারণ যে রক্ত তার দেহে প্রবেশ করে তা অত্যন্ত বেশি পরিমাণের রক্ত। সুতরাং এখানে দুটি নষ্টকারী দিক রয়েছে।

এর ভিত্তিতে তার জন্য জায়েয নয় রোযার দিনে এই প্রক্রিয়াটি করা — কেবল তখন ছাড়া, যখন সেখানে এমন তাৎক্ষণিক দারূরাত থাকে যা পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ দারূরাতের হুকুম ভিন্ন। তখন সে তা করবে, এবং তার রোযা নষ্ট হয়েছে বলে হুকুম দেওয়া হবে, আর তার ওপর অন্য দিনগুলোতে তা কাযা করা ওয়াজিব হবে। আমি তাঁর মহত্তম নামের অসীলায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, জাল্লা ওয়া আলা, তিনি যেন আমাদের সমস্ত রোগীকে দ্রুত আরোগ্য দান করেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা চার:— রমযানের দিনে দাঁত তোলার ব্যাপারে রাজিহ মত হলো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ দাঁতগুলো মুখের ভেতরে, আর মুখের হুকুম বাহ্যিক অংশের হুকুম; আর এ থেকে বাধা দেওয়ার মতো কোনো দলিল নেই। বস্তুসমূহের মূল বিধান হলো হালাল ও মুবাহ হওয়া, আর শরঈ হুকুমগুলো সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট দলিলের মুখাপেক্ষী। সুতরাং মূল বিধান হলো বৈধতা। কাওয়াইদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, মূল বিধান হলো মূলের ওপরই

থেকে যাওয়া, যতক্ষণ না তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার মতো কোনো দলিল আসে। আর সমসাময়িক আলিমদের একটি বড় দল এ ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন।

তুমি যদি বলো:— দাঁত তোলার কারণে তো তার থেকে রক্ত বের হতে পারে? তবে আমি বলি:— দাঁত তোলার কারণে যে রক্ত বের হয় তা প্রথাগতভাবে সামান্য, তাই তার কোনো হুকুম নেই। আর হয়তো আদৌ কোনো রক্তই বের হবে না; তবে যদি বের হয়ও, তা অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ, যা কোনো প্রভাব ফেলে না। তবে তার ওপর ওয়াজিব হলো তা মুখ থেকে ফেলে দেওয়া এবং তার কিছুই গিলে না ফেলা। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ও ইচ্ছাকৃত নয় এমনভাবে তার কিছু পেটে চলে যায়, তবে তার ওপর কিছুই বর্তাবে না — আল্লাহ তাআলার এই ব্যাপক বাণীর কারণে:—

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ

> "আর তোমরা যে বিষয়ে ভুল করেছ তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে (তাতে গুনাহ আছে)।" (সূরা আল-আহযাব: ৫)

এবং এ কারণেও যে, দাঁত তোলার সময় সে রক্ত বের করার ইচ্ছাও করেনি, উদ্দেশ্যও করেনি; বরং সে কেবল দাঁত তোলারই ইচ্ছা করেছিল। সুতরাং রক্ত বের হয়েছে ইচ্ছা ছাড়াই, তাই এতে তার ওপর কোনো সংকীর্ণতা নেই। যেমন সেই ব্যক্তি, যে তার নখ কাটছিল, অতঃপর যন্ত্রটি তার চামড়ার কিছু অংশে গিয়ে লেগে তা কেটে ফেলল এবং রক্ত বের হলো — এতে তার ওপর কিছুই বর্তাবে না। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা পাঁচ:— দাঁত অপসারণের জন্য অবশকরণ ইনজেকশনের ব্যাপারে বলা যায় — জানা কথা যে মুখের ভেতরের অংশ পেটের (জাওফ) অন্তর্ভুক্ত নয়; এ কারণেই কুলি করায় রোযা নষ্ট হয় না। আর এই ইনজেকশনটি মুখের ভেতরে, যে দাঁতটি অপসারণ করা হবে তার কাছাকাছি জায়গায় দেওয়া হয়, যাতে মাড়ি অবশ হয়ে যায় এবং রোগী দাঁত তোলার ব্যথা অনুভব না করে। আর এই ইনজেকশন থেকে যে উপাদান বের হয়, তার স্থান হলো মাড়ি; সেখান থেকে পেটে কিছুই চুইয়ে যায় না। এর ভিত্তিতে এই ইনজেকশন রোযা নষ্ট করে না এবং তাতে কোনো প্রভাব ফেলে না; বরং তা কুলি করার মর্যাদায়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন ২১: মাসআলা এক থেকে পাঁচ

মাসআলা	হুকুম
১. আরোগ্যের আশাহীন রোগী; রোযায় সক্ষম নন অথচ বোধশক্তি অবশিষ্ট এমন বৃদ্ধ	রোযা রহিত; প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়ানো
২. সার্জনের সালাত ও ওয়াক্ত	নিয়ন্ত্রণে থাকলে ওয়াক্ত রক্ষা; নইলে জমা; জরুরি অপারেশনে পরে কাযা
৩. কিডনি-রোগীর ডায়ালাইসিস	রোযার দিনে জায়েয নয়, দারুরাত ছাড়া; করলে রোযা নষ্ট, কাযা ওয়াজিব
৪. রমযানে দাঁত তোলা	রাজিহ মতে অসুবিধা নেই; রক্ত ফেলে দেবে, গিলবে না
৫. দাঁতের অবশকরণ ইনজেকশন	রোযা নষ্ট করে না; কুলির মর্যাদায়

লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী

মাসআলা ছয়:— নারী যাতে তার রোযা পূর্ণ করতে পারে সেজন্য হায়েযের রক্ত নামা বন্ধ করার বড়ি সেবনের ব্যাপারে আহলে ইলমের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; আর রাজিহ মত হলো তা জায়েয — এই শর্তে যে ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা রয়েছে। আর তা হবে এমন কোনো মুসলিম নারী চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার মাধ্যমে, যাঁর ইলম, অভিজ্ঞতা ও আমানতদারিতা নির্ভরযোগ্য। সুতরাং এই নারী চিকিৎসক যদি সিদ্ধান্ত দেন যে এতে শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, তবে এই বড়ি সেবন করা জায়েয। কারণ এতে কোনো বাধা নেই, আর মূল বিধান হলো নিষেধাজ্ঞা থেকে দায়মুক্তি; নিষেধাজ্ঞা তো একটি শরঈ হুকুম, আর সাব্যস্ত হয়েছে যে শরঈ হুকুমগুলো সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট দলিলের মুখাপেক্ষী; আর বস্তুসমূহের মূল বিধান হলো হালাল ও মুবাহ হওয়া; আর মূল বিধান হলো মূলের ওপরই থেকে যাওয়া, যতক্ষণ না তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার মতো কোনো দলিল আসে।

কিন্তু বৈধতার কথা বলার পরেও আমি আমার বোনদের নসীহত করছি যে তাঁরা যেন তা পরিহার করেন। কারণ হায়েয তার নির্দিষ্ট সময়ে নামা নারীর মধ্যে একটি সহজাত ও স্বাভাবিক বিষয়; আর যা সহজাত ও স্বাভাবিক তা বন্ধ করার মধ্যে এই প্রকৃতির বিরোধিতার যে দিকটি রয়েছে তা রয়েছেই। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন — আর তা হলো অন্য দিনগুলোতে তার কাযা করা। তবে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে তার জন্য এই বড়ি সেবন করা জায়েয। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা সাত:— ক্যান্সারকে "খবীস (নিকৃষ্ট) রোগ" নামে অভিহিত করার ব্যাপারে বলা যায়, তা উচিত নয়। কারণ রোগ সাধারণভাবে গুনাহ ও পাপ ঝরিয়ে দেওয়ার উপকরণগুলোর একটি উপকরণ; সুতরাং তা রহমত, কোনো অভিশাপ নয়। মুমিন যখন রোগে আক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তার থেকে তার গুনাহ ও পাপ ঝরিয়ে দেন। সুতরাং ক্যান্সারকে "খবীস রোগ" নামে অভিহিত করা চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে একটি সীমালঙ্ঘন; এটি আলিম ও তালিবুল ইলমদের জিহ্বায় ঘোরা উচিত নয়। তাঁরা যদি একে "মারাত্মক রোগ" নামে অভিহিত করতেন, তবে তা অধিকতর উত্তম ও অধিকতর যথাযথ হতো।

শাইখ মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু তাআলা ক্যান্সারকে "খবীস রোগ" নামে অভিহিত করাকে অস্বীকার করতেন; আর তিনি এ রোগেই ইন্তিকাল করেছেন, রহিমাহুল্লাহু তাআলা। আল্লাহ তাঁকে প্রচুর প্রতিদান ও পুরস্কার দিন, একজন আলিমকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে যে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হয় আল্লাহ তাআলা তাঁকে সেই প্রতিদান দিন, এবং সর্বশক্তিমান অধিপতির নিকট সত্যের আসনে জান্নাত ও নহরসমূহে আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে একত্র করুন। সুতরাং এই নামকরণ

উচিত নয় এবং তা বদলে ফেলা ওয়াজিব — বলা হবে না "খবীস রোগ" বা "খবীস টিউমার"; বরং বলা হবে "মারাত্মক রোগ" ও "মারাত্মক টিউমার"। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা আট:— এই বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি তার বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে, প্রলাপ বকতে শুরু করে এবং বিকারগ্রস্ততার (তাখরীফ) স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে সে তার নিকটজনদেরও চিনতে পারে না — তবে তার ওপর থেকে রোযার ওয়াজিব হওয়াই মূলত রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তার ওপর রোযাও নেই, কাফফারাও নেই; কারণ যে বোধশক্তির ওপর তাকলীফ (শরঈ দায়বদ্ধতা) নির্ভরশীল, তা সে হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং তার থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে — এই হাদীসের কারণে:—

رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق

> "তিনজন থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ... পাগলের থেকে, যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।"

আর কাওয়াইদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, বোধশক্তি, সম্বোধন বোঝার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার ছাড়া কোনো তাকলীফ নেই। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা নয়:— চিকিৎসক যদি তাকে রোযা ভাঙার নির্দেশ দেন, তবে কি সে রোযা ভাঙবে? আমি বলি:— এই চিকিৎসক যদি তাঁর এই নির্দেশটি কোনো প্রকাশ্য কারণের ওপর ভিত্তি করে দেন — অর্থাৎ বিদ্যমান কোনো রোগের ওপর — এবং তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেন যে রোগীর রোযা রাখা তার রোগ বাড়িয়ে দেবে বা তার আরোগ্য বিলম্বিত করবে, তবে তার রোযা ভেঙে অন্য দিনগুলোতে কাযা করতে কোনো অসুবিধা নেই — যদিও রোগী নিজে মনে করে যে সে রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে রোযা ভাঙা জায়েয — আল্লাহ তাআলার এই ব্যাপক বাণীর কারণে:—

فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيامٍ أخر

> "সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে বা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনগুলোতে সেই সংখ্যা পূরণ করবে।" (সূরা আল-বাকারা: ১৮৪)

সুতরাং যে রোগী রোগ অনুভব করে ও রোযায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসক তাকে রোযা ভাঙার নসীহত করেন, তার রোযা ভাঙায় কোনো সংকীর্ণতা নেই। কাওয়াইদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, কষ্ট সহজতা আকর্ষণ করে — অর্থাৎ যে কাজের প্রয়োগে কাঠিন্য রয়েছে, তার সঙ্গে সহজতা যুক্ত করা হয়। আর রোগীর উচিত নয় এই কষ্ট থাকা সত্ত্বেও রোযা রেখে নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করা। কারণ রোযা ভাঙা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি রুখসত ও প্রশস্ততা; আর আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন যে তাঁর দেওয়া রুখসতগুলো গ্রহণ করা হোক, যেমন তিনি অপছন্দ করেন যে তাঁর নাফরমানি করা হোক। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না।" (সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

وما جعل عليكم في الدين من حرج

"আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।" (সূরা আল-হজ্জ: ৭৮)

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

"আর তিনি তাদের থেকে তাদের বোঝা এবং সেই শৃঙ্খলগুলো নামিয়ে দেন, যা তাদের ওপর ছিল।" (সূরা আল-আরাফ: ১৫৭)

সুতরাং রোযা ভাঙা জায়েয, যদিও নির্দেশদাতা চিকিৎসক মুসলিম না হন। গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাঁর নির্দেশটি এমন কোনো প্রকাশ্য কারণের ওপর ভিত্তিশীল হবে যার সঙ্গে রোযা রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

মাসআলা দশ:— আর রোগী যদি মারা যায় এবং তার অসুস্থতার দিনগুলোতে যা ছুটে গিয়েছিল তা কাযা না করে থাকে, তবে অবস্থা দুটির বাইরে নয়:— হয় সে তা কাযা করার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু অবহেলা ও আলস্যবশত কাযার ব্যাপারে ত্রুটি করেছে। যদি এমন হয়, তবে সে গুনাহগার অবস্থায় মারা যাচ্ছে; কারণ সে ওয়াজিব আদায় করার সুযোগ পেয়েও তা আদায় করেনি। আর যদি সে তার অসুস্থতার মধ্যেই এবং আদায় করার সুযোগ পাওয়ার আগেই মারা যায়, তবে তার ওপর কিছুই বর্তাবে না; কারণ সে কাযা করতে সক্ষম হয়নি, আর সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হয়েছে যে অক্ষমতার সঙ্গে ওয়াজিবসমূহ রহিত হয়ে যায়। সুতরাং কাযা ওয়াজিব ছিল, কিন্তু সে তাতে অক্ষম হয়েছে, তাই তা তার থেকে রহিত হয়ে যাবে।

আর তার অভিভাবক যদি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখেন, তবে তিনি ভালো কাজই করলেন; আর তার অভিভাবকের তার পক্ষ থেকে রোযা রাখা মুস্তাহাবের অধ্যায়ভুক্ত, ওয়াজিবের অধ্যায়ভুক্ত নয় — যেমনটি যাহিরিয়্যাগণ বলেন — আল্লাহ তাআলার এই ব্যাপক বাণীর কারণে:—

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"আর কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।" (সূরা আল-আনআম: ১৬৪; ফাতির: ১৮ প্রভৃতি)

এই হলো এই দশটি মাসআলার সংক্ষিপ্ত উত্তর। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন ২১: মাসআলা ছয় থেকে দশ

মাসআলা	হুকুম
৬. হায়েয বন্ধের বড়ি	মতভেদ আছে; রাজিহ মতে জায়েয, ক্ষতির নিরাপত্তা ও মুসলিম নারী চিকিৎসকের পরামর্শসহ; তবু পরিহারের নসীহত
৭. ক্যান্সারকে খবীস রোগ বলা	উচিত নয়; বলা হবে মারাত্মক রোগ
৮. বোধশক্তি হারানো বিকারগ্রস্ত বৃদ্ধ	রোযা নেই, কাফফারাও নেই
৯. চিকিৎসকের রোযা ভাঙার নির্দেশ	প্রকাশ্য কারণে রোগ বাড়বে বা আরোগ্য বিলম্বিত হলে ভাঙা জায়েয, পরে কাযা
১০. কাযা না করে মারা গেলে	সুযোগ পেয়ে অবহেলা করলে গুনাহগার; সুযোগ না পেলে কিছুই বর্তায় না; অভিভাবকের রোযা মুস্তাহাব

লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী

প্রশ্ন ২২

রোযাদারের জন্য কি জায়েয মুখ দিয়ে প্রবেশ করানো হয় এমন চিকিৎসা-এন্ডোস্কোপ (মিনযার) দিয়ে নিজের পরীক্ষা করানো?

উত্তর/ আমি বলি:— যদি বিষয়টি দারূরাত হয়, তবে তা জায়েয; কারণ কায়িদা বলে:— দারূরাতসমূহ নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে বৈধ করে দেয়। আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে, অক্ষমতার সঙ্গে কোনো ওয়াজিব নেই এবং দারূরাতের সঙ্গে কোনো হারাম নেই।

আর যদি বিষয়টিতে কোনো দারূরাত না থাকে এবং তা রোযার রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তবে এ অবস্থায় তার জন্য চিকিৎসা-এন্ডোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করানো জায়েয নয়। কারণ এই এন্ডোস্কোপটি মুখ দিয়ে পেটে প্রবেশ করে, এবং সাধারণত এর ওপর এমন একটি উপাদান লাগানো হয় যা পেটে তার প্রবেশ সহজ করে দেয়; আর মুখ একটি স্বাভাবিক প্রবেশপথ, আর এই এন্ডোস্কোপ পেট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর যা এমন হয়, তা প্রবেশপথের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে রোযা নষ্ট করে। ফুকাহায়ে কিরাম রহিমাহুমুল্লাহু তাআলার কাছে সিয়ামের অধ্যায়ে একটি অত্যন্ত উপকারী কায়িদা সাব্যস্ত হয়েছে, যা বলে:— (يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره) অর্থাৎ "স্বাভাবিক প্রবেশপথের ক্ষেত্রে প্রবেশপথের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আর অন্য ক্ষেত্রে পুষ্টির দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।"

এই হলো মুখ দিয়ে প্রবেশ করানো চিকিৎসা-এন্ডোস্কোপের ব্যাপারে কথা। আর যে অন্য এন্ডোস্কোপটি পায়ুপথ দিয়ে প্রবেশ করানো হয়, রোযা অবস্থায় তা ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ পায়ুপথ একটি অস্বাভাবিক প্রবেশপথ, আর এন্ডোস্কোপ কোনো পুষ্টিদায়ক বস্তু নয়; বরং তা কেবল একটি পরীক্ষা-যন্ত্র। সুতরাং তাতে রোযা নষ্ট হওয়ার কোনো অর্থ নেই; কেননা অস্বাভাবিক প্রবেশপথ দিয়ে যা প্রবেশ করে, তা দিয়ে রোযা নষ্ট হওয়ার জন্য আমরা শর্ত করি যে তা পুষ্টিদায়ক হতে হবে — আর এই এন্ডোস্কোপ পুষ্টিদায়ক বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সারকথা হলো, এই এন্ডোস্কোপগুলো দুই প্রকার:— একটি এন্ডোস্কোপ যা মুখ দিয়ে প্রবেশ করে — তা রোযা নষ্ট করে; সুতরাং রোযাদারের জন্য চিকিৎসককে তা করতে দেওয়া জায়েয নয়, যদি না সেখানে কোনো দারূরাত থাকে। আর একটি এন্ডোস্কোপ পায়ুপথ দিয়ে — তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

রোযাদার ও এন্ডোস্কোপ

মুখ দিয়ে প্রবেশ করানো	পায়ুপথ দিয়ে প্রবেশ করানো
স্বাভাবিক প্রবেশপথ; রোযা নষ্ট করে	অস্বাভাবিক পথ; পুষ্টিদায়ক নয়
দারুরাত না থাকলে জায়েয নয়	কোনো অসুবিধা নেই

প্রশ্ন ২২

এক নজরে

- ★ হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত থাকলে মস্তিষ্ক-মৃত্যু মৃত্যুর হুকুমের জন্য যথেষ্ট নয়
- ★ আয়াত ও হাদীসের জ্ঞান শুধু পুরুষত্ব-নারীত্বে সীমাবদ্ধ নয়
- ★ জন্মনিয়ন্ত্রণ হারাম; এর দিকে আহ্বানও হারাম
- ★ মিথ্যা বা অযথা মেডিকেল ছুটি হারাম; তার বেতন সুহত
- ★ অপ্রয়োজনে চিকিৎসকের সামনে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা হারাম
- ★ জরুরি অপারেশনে সালাত ছুটলে অপারেশন শেষে ধারাবাহিক কাযা
- ★ ডায়ালাইসিস ও মুখ দিয়ে এন্ডোস্কোপ রোযা নষ্ট করে; দারুরাতে ভিন্ন হুকুম

যাচাই করুন

1. মস্তিষ্ক-কাণ্ডের মৃত্যু সম্পর্কে লেখকের গৃহীত মত কী?

ক. মৃত্যুর হুকুমের জন্য যথেষ্ট

খ. হৃৎপিণ্ড পুরোপুরি থেমে না গেলে মৃত্যুর হুকুম দেওয়া যাবে না

গ. চিকিৎসকের রিপোর্টই যথেষ্ট

2. জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে লেখকের হুকুম কী?

ক. জায়েয

খ. মুবাহ

গ. হারাম, জায়েয নয়

3. অসুস্থতার মিথ্যা দাবিতে নেওয়া ছুটির বেতন কী?

ক. প্রাপ্য

খ. প্রাপ্য নয়; সুহত (হারাম উপার্জন)

গ. আংশিক প্রাপ্য

4. আরোগ্যের আশাহীন রোগী রোযা সম্পর্কে কী করবেন?

ক. রোযা রাখবেনই

খ. শুধু কাযা করবেন

গ. রোযা ভাঙতে পারবেন; প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন

5. দাঁতের অবশকরণ ইনজেকশন রোযা সম্পর্কে কী?

ক. রোযা নষ্ট করে

খ. রোযা নষ্ট করে না

গ. রাতে ছাড়া জায়েয নয়

6. মুখ দিয়ে প্রবেশ করানো চিকিৎসা-এন্ডোস্কোপ রোযাদারের জন্য কী?

ক. সবসময় জায়েয

খ. রোযা নষ্ট করে; দারুরাত ছাড়া জায়েয নয়

গ. রোযা নষ্ট করে না

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-খ, ৪-গ, ৫-খ, ৬-খ

প্রশ্ন ২৩

রোগীর ওপর রুকইয়াহতে ব্যবহৃত হয় এমন প্রমাণিত শরঈ আয়াত, যিকির ও তাবীযসমূহ (তাআবীয) কোনগুলো?

উত্তর ২৩/ আমি বলি:— পুরো কুরআনই আদ্যোপান্ত শিফা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين

إلا خسارا

"আর আমি কুরআনের মধ্য থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত; আর তা যালিমদের ক্ষতিই কেবল বাড়িয়ে দেয়।" (সূরা আল-ইসরা: ৮২)

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

قل هو للذين آمنوا هدىً وشفاء

"বলো, তা মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও শিফা।" (সূরা ফুসসিলাত: ৪৪)

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

وهدىً ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا

هو خير مما يجمعون

"হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশ, এবং অন্তরসমূহে যা আছে তার জন্য শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। বলো, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতে — সুতরাং এ নিয়েই তারা আনন্দিত হোক; তা তাদের সঞ্চিত সবকিছুর চেয়ে উত্তম।" (সূরা ইউনুস: ৫৭-৫৮)

সুতরাং পুরো কুরআনই আদ্যোপান্ত রুকইয়াহ ও শিফা। তবে এই আয়াতগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত:—

রুকইয়াহর আয়াত ও দুআসমূহ, রাকীদের সতর্কতা এবং চিকিৎসায় জিন ব্যবহারের হুকুম

প্রথম:— সূরা ফাতিহা। কেননা তা-ই শিফা, তা-ই রুকইয়াহ, তা-ই উম্মুল কিতাব ও কুরআনুল আযীম, যা আমাদের নবী ﷺ-কে দান করা হয়েছে। সুতরাং পাঠক যেন তা বেশি বেশি পড়েন এবং তদাব্বুর (গভীর অনুধাবন) ও হৃদয়ের উপস্থিতি নিয়ে বারবার পুনরাবৃত্তি করেন। কেননা তা বিপদের উপর নেমে আসে আরোগ্যদায়ী মলম হয়ে এবং সুমিষ্ট, যথেষ্ট সালসাবীল-ধারা হয়ে। কোনো বিপদই তার মোকাবিলা করতে পারে না — বিশেষত তা যখন এমন এক মুমিন ও অনুধাবনকারী হৃদয়ের সঙ্গে, এবং তার প্রভাব গ্রহণের উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে মিলে যায়। কেননা তা সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র; কিন্তু অস্ত্র তো নির্ভর করে যে আঘাত হানে তার উপর।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহু তাআলার সহীহতে আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

عن أبي سعيدٍ الخدري أن أناساً من أصحاب النبي أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم, فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواءٍ أو راقٍ؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً, فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء, فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي فسألوه, فضحك, وقال: وما أدراك أنها رقية, خذوها واضربوا لي بسهم

নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের একদল আরবের কোনো এক গোত্রের কাছে এলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করল না। তাঁরা এ অবস্থায় থাকতেই ঐ গোত্রের সরদারকে (বিষাক্ত প্রাণী) দংশন করল। তখন তারা বলল:— তোমাদের সঙ্গে কি কোনো ওষুধ আছে, কিংবা কোনো রাকী আছে? তাঁরা বললেন:— তোমরা তো আমাদের মেহমানদারি করোনি; আমরা কিছুই করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করো। তারা তাঁদের জন্য একপাল ছাগল নির্ধারণ করল। অতঃপর তিনি উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন, নিজের থুতু জমা করে ফুঁ দিতে লাগলেন — ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। তারা ছাগলগুলো নিয়ে এল। তাঁরা বললেন:— নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আমরা তা নেব না। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন; তিনি হাসলেন এবং বললেন: "তুমি কী করে জানলে যে তা রুকইয়াহ? তোমরা তা নিয়ে নাও, আর আমার জন্যও একটি অংশ রাখো।"

দ্বিতীয়:— সূরা ইখলাস এবং «قل أعوذ برب الفلق» ও «قل أعوذ برب الناس» — এ দুই সূরা পাঠ করা। পাঠকের উচিত এই সূরাগুলোর প্রতিও মনোনিবেশ করা এবং তদাব্বুর, হৃদয়ের উপস্থিতি ও উপকারের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সেগুলো বারবার পুনরাবৃত্তি করা। বুখারী ও মুসলিম নিজ নিজ সহীহতে মা'মার থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন:

أن النبي ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه

بالمعوذات, فلما ثقل, كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه

لبركتها

নবী ﷺ যে রোগে ইন্তিকাল করেন, সে রোগে তিনি মুআওবিযাত (আশ্রয়প্রার্থনার সূরাসমূহ) পড়ে নিজের উপর ফুঁ দিতেন। তারপর যখন তাঁর অসুস্থতা ভারী হয়ে গেল, তখন আমি সেগুলো পড়ে তাঁর উপর ফুঁ দিতাম এবং তাঁরই হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতাম — তাঁর হাতের বরকতের কারণে।

আর ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানে বলেছেন: আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হিলাল ইবনুল আলা, তিনি বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু সুলাইমান, তিনি বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আব্বাদ, তিনি জুরাইরী থেকে, তিনি আবূ নাদরা থেকে, তিনি আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে; তিনি বলেছেন:

كان رسول الله يتعوذ من عين الجان وعين الإنس فلما نزلت

المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিনের নজর ও মানুষের নজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অতঃপর যখন মুআওবিযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) নাযিল হলো, তখন তিনি সে দুটি গ্রহণ করলেন এবং তা ছাড়া অন্য সবকিছু ছেড়ে দিলেন। — "হাদীসটি হাসান"

তৃতীয়:— আয়াতুল কুরসী, যা কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। জিনের আসরগ্রস্ত ব্যক্তির উপর এর প্রভাব অত্যন্ত বিস্ময়কর; আমি এ ব্যাপারে বিস্ময়কর জিনিস দেখেছি। আসরকারী জিন এটি শোনার সময় ধৈর্য ধরতে পারে না বললেই চলে; আপনি দেখবেন সে যন্ত্রণায় ও যে দহন সে অনুভব করছে তার কারণে সর্বোচ্চ স্বরে চিৎকার করছে। উচ্চ স্বরে, ধীরস্থিরভাবে, হৃদয়ের উপস্থিতি ও পূর্ণ তদাব্বুরসহ এটি বারবার পড়লে সে দ্রুতই পরাজয়ের পতাকা উড়িয়ে দেয়।

বুখারী তাঁর সহীহতে নিজ সনদে আওফ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনু সীরীন থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন:

وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال: فخليت عنه, فأصبحت فقال النبي يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله فقال: دعني فإني محتاج وعلي عيال, لا أعود, فرحمته فخليت سبيله فقال لي رسول الله يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله, قال إما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة, فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله , وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود, قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها, قلت: وما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح, فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ما فعل أسيرك البارحة قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات

ينفعني الله بها فخليت سبيله, قال ما هي قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية, فلن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح, فقال النبي أما إنه قد صدقك وهو كذوب, تعلم من تخطاب منذ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة قال: لا, قال ذاك شيطان

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। তখন এক আগন্তুক এসে খাদ্যদ্রব্য থেকে আঁজলা ভরে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম:— আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল:— আমি অভাবগ্রস্ত, আমার পরিবার-পরিজন আছে, আমার তীব্র প্রয়োজন। তিনি বলেন:— তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নবী ﷺ বললেন: "হে আবূ হুরাইরা, গত রাতে তোমার বন্দী কী করল?" আমি বললাম:— হে আল্লাহর রাসূল, সে তীব্র প্রয়োজন ও পরিবার-পরিজনের অভিযোগ করল; আমি তার প্রতি দয়া করলাম এবং তার পথ ছেড়ে দিলাম। তিনি বললেন: "জেনে রাখো, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর "সে আবার আসবে" কথাটির কারণে আমি বুঝলাম যে সে আসবেই। তাই আমি ওত পেতে রইলাম। সে এসে খাদ্যদ্রব্য থেকে আঁজলা ভরে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম:— আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল:— আমাকে ছেড়ে দাও, আমি অভাবগ্রস্ত, আমার পরিবার-পরিজন আছে, আর আসব না। আমি তার প্রতি দয়া করে তার পথ ছেড়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন: "হে আবূ হুরাইরা, তোমার বন্দী কী করল?" আমি বললাম:— হে আল্লাহর রাসূল, সে তীব্র প্রয়োজন ও পরিবার-পরিজনের অভিযোগ করল; আমি তার প্রতি দয়া করে তার পথ ছেড়ে দিলাম। তিনি বললেন: "জেনে রাখো, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।" আমি তৃতীয়বার ওত পেতে রইলাম। সে এসে খাদ্যদ্রব্য থেকে আঁজলা ভরে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম:— আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব; এই নিয়ে তিনবারের শেষবার — তুমি দাবি করো যে আর আসবে না, তারপর আবার আসো। সে বলল:— আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিই যা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম:— সেটা কী? সে বলল:— তুমি যখন বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে — «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» — আয়াতটি শেষ করা পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর সর্বদা একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান তোমার নিকটবর্তী হবে না। আমি তার পথ ছেড়ে দিলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন: "গত রাতে তোমার বন্দী কী করল?" আমি বললাম:— হে আল্লাহর রাসূল, সে দাবি করল যে সে আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেবে যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন; তাই আমি তার পথ ছেড়ে দিলাম। তিনি বললেন: "সেগুলো কী?" আমি বললাম:— সে আমাকে বলেছে: তুমি যখন বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে; তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর সর্বদা একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান তোমার নিকটবর্তী হবে না। তখন নবী ﷺ বললেন: "জেনে রাখো, সে তোমার কাছে সত্য বলেছে, অথচ সে চরম মিথ্যাবাদী। হে আবূ হুরাইরা, তুমি কি জানো তিন রাত ধরে তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে?" আমি বললাম: — না। তিনি বললেন: "সে ছিল শয়তান।"

চতুর্থ:— সূরা বাকারার শেষাংশ; আমি বোঝাতে চাইছি আল্লাহ তাআলার বাণী «آمن الرسول» থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত (সূরা আল-বাকারা: ২৮৫-২৮৬)। কেননা হিফাযত ও যথেষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিস্ময়কর। ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

যে ব্যক্তি কোনো রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, সে দুটি তার জন্য যথেষ্ট হবে। — "মুত্তাফাকুন আলাইহি"

আর তাঁর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন:

لما أسري برسول الله انتهى به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثاً:

أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا

يشرك بالله من أمته شيئاً المقحمات

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইসরার রাতে নেওয়া হলো, তখন তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছানো হলো এবং তাঁকে তিনটি জিনিস দেওয়া হলো:— তাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত দেওয়া হলো, তাঁকে সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো দেওয়া হলো, এবং তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করে না তাদের ধ্বংসে নিক্ষেপকারী কবীরা গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হলো। — "মুসলিম বর্ণনা করেছেন"

আর ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

بينما جبريل عليه السلام قاعد عن النبي سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم, لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك, فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم, فسلم فقال:

أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته

জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি উপর থেকে একটি কড়কড় শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি মাথা তুলে বললেন:— এ হলো আসমানের একটি দরজা, যা আজ খোলা হলো; আজকের আগে তা কখনোই খোলা হয়নি। তা থেকে একজন ফেরেশতা নেমে এলেন। জিবরীল বললেন:— ইনি এমন একজন ফেরেশতা যিনি পৃথিবীতে নেমে এলেন; আজকের আগে তিনি কখনোই নামেননি। তিনি সালাম দিলেন এবং বললেন:— আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন এমন দুটি নূরের, যা আপনাকে দেওয়া হয়েছে এবং আপনার আগে কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি: সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো। এ দুটির একটি হরফও আপনি পড়বেন না, বরং তা আপনাকে দেওয়া হবেই। — "মুসলিম বর্ণনা করেছেন"

পঞ্চম:— সম্ভব হলে সম্পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ করা, বিশেষত ঘরের ভেতরে। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

))لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ((

তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিয়ো না। নিশ্চয়ই যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। — "মুসলিম বর্ণনা করেছেন"

আর আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوافٍ تحاجان عن أصحابهما, اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيلها البطلة

তোমরা কুরআন পাঠ করো; কেননা কিয়ামতের দিন তা তার সঙ্গীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে। তোমরা দুই আলোকোজ্জ্বল সূরা — বাকারা ও আলে ইমরান — পাঠ করো; কেননা কিয়ামতের দিন সে দুটি এমনভাবে আসবে যেন দুটি মেঘখণ্ড, কিংবা দুটি ছায়াদানকারী, কিংবা সারিবদ্ধ পাখির দুটি ঝাঁক — সে দুটি তাদের সঙ্গীদের পক্ষে ওকালতি করবে। তোমরা সূরা বাকারা পাঠ করো; কেননা তা গ্রহণ করা বরকত এবং তা ছেড়ে দেওয়া আক্ষেপ, আর বাতিলপন্থীরা (জাদুকরেরা) তার নাগাল পায় না। — "মুসলিম বর্ণনা করেছেন"

ষষ্ঠ:— রাকী যেন রোগীকে সেই রুকইয়াহ দিয়ে ঝাড়েন, যা জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী ﷺ-কে করেছিলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كان النبي إذا اشتكى رقاه جبريل قال: باسم الله يبريك ومن

كل داءٍ يشفيك ومن شر حاسدٍ إذا حسد وشر كل ذي عين

নবী ﷺ যখন অসুস্থ হতেন, তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে রুকইয়াহ করতেন। তিনি বলতেন:— আল্লাহর নামে, তিনি আপনাকে সুস্থ করুন, প্রতিটি রোগ থেকে আপনাকে আরোগ্য দান করুন, এবং হিংসুক যখন হিংসা করে তার অনিষ্ট থেকে ও প্রত্যেক বদনজরদাতার অনিষ্ট থেকে (আপনাকে রক্ষা করুন)। — "মুসলিম বর্ণনা করেছেন"

আর আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, জিবরীল নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে বললেন:— হে মুহাম্মদ, আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন:— হ্যাঁ। তখন জিবরীল বললেন:

باسم الله أرقيك من كل شرٍ يؤذيك من شر كل نفسٍ أو عين

حاسدٍ الله يشفيك باسم الله أرقيك

আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ছি — প্রতিটি অনিষ্ট থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক নফসের অনিষ্ট থেকে কিংবা হিংসুকের বদনজর থেকে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন; আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ছি। — "মুসলিম বর্ণনা করেছেন"

সপ্তম:— রাকী যেন বলেন: হে আল্লাহ, মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূরকারী, আরোগ্য দান করুন; আপনিই আরোগ্যদাতা, আপনি ছাড়া কোনো আরোগ্যদাতা নেই — এমন আরোগ্য যা কোনো ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না। সাবিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:— হে আবূ হামযা, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তখন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:— আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুকইয়াহ দিয়ে ঝেড়ে দেব না? তিনি বললেন:— অবশ্যই। তখন আনাস বললেন:

اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا

أنت شفاءً لا يغادر سقماً

হে আল্লাহ, মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূরকারী; আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদাতা, আপনি ছাড়া কোনো আরোগ্যদাতা নেই — এমন আরোগ্য যা কোনো ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না। — "বুখারী বর্ণনা করেছেন"

আর আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই রুকইয়াহ দিয়ে ঝাড়তেন:

أذهب الباس رب الناس, بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت

কষ্ট দূর করে দিন, হে মানুষের প্রতিপালক; আরোগ্য আপনারই হাতে, আপনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই। — "মুসলিম বর্ণনা করেছেন"

অষ্টম:— রাকী যেন তাঁর শাহাদাত আঙুল মাটিতে রাখেন, তারপর তা তুলে বলেন: «باسم الله ربنا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا»। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর কাছে যখন কোনো মানুষ তার কোনো কষ্টের অভিযোগ করত, কিংবা তার কোনো ফোড়া বা ক্ষত থাকত, তখন নবী ﷺ তাঁর আঙুল দিয়ে এভাবে করতেন — সুফইয়ান তাঁর শাহাদাত আঙুল মাটিতে রাখলেন, তারপর তা তুললেন — এবং বললেন:

بسم الله ربنا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن

ربنا

আল্লাহর নামে; আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ভূমির মাটি ও আমাদের কারও মুখের লালা — এর দ্বারা আমাদের রোগীকে আরোগ্য দেওয়া হোক, আমাদের প্রতিপালকের অনুমতিতে। — "মুত্তাফাকুন আলাইহি, শব্দ মুসলিমের"

নবম:— রাকী যেন রোগীকে সেই তাবীয-দুআ দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করান, যা নবী ﷺ হাসান ও হুসাইনের জন্য পড়তেন। সহীহ বুখারীতে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন: নবী ﷺ হাসান ও হুসাইনকে আশ্রয় প্রার্থনার দুআ পড়ে দিতেন এবং বলতেন:

إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق, أعوذ بكلمات الله

التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

নিশ্চয়ই তোমাদের পিতা (ইবরাহীম আলাইহিস সালাম) এ দুটি দিয়ে ইসমাঈল ও ইসহাকের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের দ্বারা আশ্রয় চাই প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বদনজর থেকে।

দশম:— রোগী যেন তার শরীরের যে অংশে ব্যথা অনুভব করছে সেখানে হাত রাখে এবং মুসলিম তাঁর সহীহতে উসমান ইবনু আবিল আস সাকাফীর হাদীসে যা বর্ণনা করেছেন তা বলে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি নিজের শরীরে এক ব্যথা অনুভব করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন:

ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثاً

وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

তোমার শরীরের যেখানে ব্যথা অনুভব করছ সেখানে হাত রাখো এবং বলো:— «بسم الله» — তিনবার; আর সাতবার বলো:— «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» (আমি আল্লাহর ইজ্জত ও কুদরতের দ্বারা আশ্রয় চাই, আমি যা অনুভব করছি ও যা থেকে সতর্ক থাকছি তার অনিষ্ট থেকে)।

সার্বিকভাবে বলা যায়, রোগীর উপর কুরআন পাঠ এমন এক জিনিস যা তার হৃদয়ে প্রশান্তি আনে, তার দুশ্চিন্তা দূর করে, তার অন্তরে সাকীনা নাযিল করে, তার নফসকে স্বস্তি দেয় এবং তার বক্ষ প্রশস্ত করে। বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:— এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করছিল, তার পাশে দুটি রশি দিয়ে বাঁধা একটি ঘোড়া ছিল। তখন একটি মেঘ তাকে ঢেকে ফেলল এবং তা তার দিকে নিকটবর্তী হতে লাগল, আর তার ঘোড়াটি চমকে উঠতে লাগল। সকাল হলে সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করল। তিনি বললেন:

تلك السكينة تنزلت بالقرآن

সেটি ছিল সাকীনা (প্রশান্তি), যা কুরআনের কারণে নেমে এসেছিল। — "মুত্তাফাকুন আলাইহি"

রুকইয়াহর দশ প্রমাণিত উপকরণ

- [ ] প্রথম: সূরা ফাতিহা — শিফা, রুকইয়াহ, উম্মুল কিতাব
- [ ] দ্বিতীয়: সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস
- [ ] তৃতীয়: আয়াতুল কুরসী
- [ ] চতুর্থ: সূরা বাকারার শেষাংশ (২৮৫-২৮৬)
- [ ] পঞ্চম: সম্ভব হলে সম্পূর্ণ সূরা বাকারা, বিশেষত ঘরের ভেতরে
- [ ] ষষ্ঠ: জিবরীলের রুকইয়াহ — আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ছি
- [ ] সপ্তম: হে আল্লাহ, মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূরকারী — আরোগ্য দিন
- [ ] অষ্টম: শাহাদাত আঙুল মাটিতে রেখে বর্ণিত বাক্য
- [ ] নবম: হাসান ও হুসাইনের জন্য পঠিত আশ্রয়-দুআ
- [ ] দশম: ব্যথার স্থানে হাত রেখে বর্ণিত বাক্য

লেখকের ক্রমানুসারে; পাঠক যেন তদাব্বুর ও হৃদয়ের উপস্থিতি নিয়ে বারবার পড়েন

রুকইয়াহর সময় ফুঁ দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহতে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় বেঁধেছেন; তিনি বলেছেন:— "রুকইয়াহতে ফুঁ দেওয়া" অধ্যায়। তারপর বলেছেন:— আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন খালিদ ইবনু মাখলাদ, তিনি বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন সুলাইমান, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে; তিনি বলেছেন: আমি আবূ সালামাকে বলতে শুনেছি: আমি আবূ কাতাদাকে বলতে শুনেছি: আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

((الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا

يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ بالله من شرها

فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ))

ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তবে সে যেন জেগে ওঠার সময় তিনবার ফুঁ দেয় এবং তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে; তাহলে তা তার কোনো ক্ষতি করবে না।

বুখারী আরও বলেছেন:— আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবদুল আযীয ইবনু আবদুল্লাহ আল-উওয়াইসী, তিনি বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন সুলাইমান, তিনি ইউনুস থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি উরওয়া ইবনুয যুবাইর থেকে, তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে; তিনি বলেন:

كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ قل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعاً ثم يمسح بهما وجهه, وما بلغت يداه من جسده

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় যেতেন, তখন «قل هو الله أحد» ও মুআওবিযাতাইন — সবগুলো একসঙ্গে পড়ে নিজের দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিতেন, তারপর সে দুটি দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল এবং শরীরের যতটুকু নাগাল পেতেন ততটুকু মুছে দিতেন।

আর আগেই আবূ সাঈদের হাদীসে দংশিত ব্যক্তির ঘটনায় থুতু ছিটানোর উল্লেখ এসেছে; তাতে আছে: «فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الفاتحة» — অর্থাৎ তিনি রওনা হলেন এবং থুতু ছিটাতে ও সূরা ফাতিহা পড়তে লাগলেন। ব্যথা যদি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে হয় — যেমন মাথা, হাত, পা, পেট, পিঠ বা অনুরূপ কিছু — তবে পাঠক যেন সেই স্থানের উপর মনোনিবেশ করেন। আর রোগী যদি তার সমগ্র শরীরের অভিযোগ করে, তবে তিনি যেন তার সমস্ত শরীরে ফুঁ দেন।

পাঠক তাঁর রোগীকে হাত দিয়ে মুছে দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহতে বলেছেন:— "রাকীর ডান হাত দিয়ে ব্যথার স্থান মুছে দেওয়া" অধ্যায়। তারপর তিনি বলেছেন:— আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনু আবী শাইবা, তিনি বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি মুসলিম থেকে, তিনি মাসরূক থেকে, তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে; তিনি বলেন:— নবী ﷺ তাঁদের কাউকে আশ্রয়ের দুআ পড়ে দিতেন এবং তাঁর ডান হাত দিয়ে তাকে মুছে দিতেন: «اذهب الباس رب الناس...» — হাদীসের বাকি অংশ। এটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে; এখানে কেবল দলিলের জায়গাটুকুর জন্য উল্লেখ করলাম।

আর কোনো নারী কোনো পুরুষকে রুকইয়াহ করলে তাতেও অসুবিধা নেই, যদি সে তার মাহরাম হয়। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহতে বলেছেন:— "নারীর পুরুষকে রুকইয়াহ করা" অধ্যায়। তারপর তিনি বলেছেন: আমাকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ আল-জু'ফী, তিনি বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন হিশাম, তিনি বলেছেন: আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন মা'মার, তিনি যুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে:

أن النبي كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها...

নবী ﷺ যে রোগে ইন্তিকাল করেন, সে রোগে তিনি মুআওবিযাত পড়ে নিজের উপর ফুঁ দিতেন। তারপর যখন তাঁর অসুস্থতা ভারী হয়ে গেল, তখন আমিই সেগুলো পড়ে তাঁর উপর ফুঁ দিতাম এবং তাঁরই হাত দিয়ে মুছে দিতাম — তার বরকতের কারণে...

আর যার রুকইয়াহর প্রয়োজন নেই তার জন্য রুকইয়াহ না চাওয়াই উত্তম — তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। এটি কেবল রুকইয়াহ চাওয়া ও দাগানোর ক্ষেত্রে, অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নয়। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন নবী ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন:

عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي وليس معه أحد ورأيت سواداً كثيراً في الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل: هذا موسى وقومه, ثم قيل لي: انظر فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب

আমার সামনে উম্মতগুলো পেশ করা হলো। আমি দেখলাম, কোনো নবী যাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে একজন লোক, কোনো নবী যাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে দুজন লোক, কোনো নবীর সঙ্গে একটি ছোট দল, আর কোনো নবীর সঙ্গে কেউই নেই। আমি দিগন্তে এক বিশাল কালো জনসমষ্টি দেখলাম এবং আশা করলাম যে এরাই আমার উম্মত। তখন বলা হলো:— ইনি মূসা ও তাঁর কওম। তারপর আমাকে বলা হলো:— দেখো। আমি দেখলাম এক বিশাল কালো জনসমষ্টি দিগন্ত ঢেকে ফেলেছে। আমাকে বলা হলো:— এরা তোমার উম্মত, আর এদের মধ্যে সত্তর হাজার আছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এরপর লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং তিনি তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করলেন না। তখন নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ পরস্পরে আলোচনা করে বললেন:— আমরা তো জন্মেছি শিরকের মধ্যে, তবে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি

ঈমান এনেছি; কিন্তু এরা তো আমাদের সন্তানেরা। কথাটি নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি বললেন:

هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون...

তারা হলো তারাই, যারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, রুকইয়াহ চেয়ে বেড়ায় না, দাগায় না এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করে... — "মুত্তাফাকুন আলাইহি, শব্দ বুখারীর"

রুকইয়াহর পদ্ধতি-সংক্রান্ত বর্ণনা

করুন	করবেন না
✓ রুকইয়াহর সময় ফুঁ দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই	
✓ রাকীর ডান হাত দিয়ে ব্যথার স্থান মুছে দেওয়া যায়	
✓ নারী মাহরাম পুরুষকে রুকইয়াহ করলে অসুবিধা নেই	
✓ যার রুকইয়াহর প্রয়োজন নেই, তার না চাওয়াই উত্তম — তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার জন্য	

সহীহ বুখারীর অধ্যায়ভিত্তিক দলিলসহ

আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ২৪

রাকীগণ যেসব ভুলে পড়ে যান এবং যেগুলো থেকে তাঁদের দূরে থাকা উচিত, সেগুলো কী কী?

উত্তর: আমি বলি:— সন্দেহ নেই যে রাকীগণ — আল্লাহ তাআলা তাঁদের সব কল্যাণের তাওফীক দিন — এক মহান কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন, যার রয়েছে উঁচু লক্ষ্য ও মহৎ উদ্দেশ্য। তাঁরা এই ওয়াজিব কাজটি সম্পাদন করে আমাদের দায়মুক্ত করেছেন। তাঁরা শয়তানের সঙ্গে এক ধরনের জিহাদে রত — জাদু, বদনজর, ইশক (আসক্তি) ও কষ্টদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে তার প্রভাব তাঁরা বাতিল করে দেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে তাঁরা এ জন্য ধন্যবাদার্হ; আর আমরা তাঁদের জন্য তাওফীক ও সাহায্যের দুআ করি।

কিন্তু তাঁরা মানুষ, ফেরেশতা নন। তাই অনিবার্যভাবে তাঁদের থেকে কিছু ভুল প্রকাশ পাবে, যা তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে করেন না এবং যার প্রকৃত অবস্থা তাঁরা জানেনও না। আমরা তাঁদের কারও ব্যাপারে এমন ধারণা করি না যে তিনি ইচ্ছা করে বিরোধিতা করছেন। সুতরাং তাঁদের প্রতি তিরস্কার কম করা চাই। আমরা বলি, যেমন এক কবি বলেছেন:—

أقلوا عليهم لا أباً لأبيكموا من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا

> তাদের প্রতি তিরস্কার কমাও — তোমাদের পিতার কোনো পিতা না থাকুক! — নয়তো তারা যে শূন্যস্থান পূরণ করেছে, তোমরা সেই স্থান পূরণ করো।

তবে পারস্পরিক কল্যাণকামিতা এবং হকের ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দেওয়ার দিক থেকে এটাও উচিত যে, আমরা যেসব ভুলে পড়ে যাচ্ছি আমাদের কেউ যেন সেগুলো স্পষ্ট করে দেন — যাতে আমরা সেগুলো এড়িয়ে চলতে পারি এবং সমালোচকদের সামনে সেই ধ্বংসাত্মক সমালোচনার দরজাগুলো বন্ধ করে দিতে পারি, যা কেবল উড়িয়ে দেয় কিন্তু গড়ে না, ভেঙে ফেলে কিন্তু আবাদ করে না। আর ভুল স্পষ্ট করার সময় আমাদের যেন পাপের অহংকার পেয়ে না বসে; বরং ওয়াজিব হলো নসীহত গ্রহণ করা ও তার উপর নির্ভর করা, যদি তা কিতাব ও সুন্নাহর অনুকূল হয়।

তারপর আমি বলি:— এমন কিছু সতর্কতা ও ভুল আছে, যেগুলো রাকীগণের পক্ষ থেকে অবশ্যই এড়ানো দরকার — আল্লাহ তাআলা তাঁদের তাওফীক দিন, তাঁদের সঠিক পথে রাখুন, উম্মতের জন্য তাঁদের হিফাযত করুন, এবং একজন রাকীকে তার উম্মতের পক্ষ থেকে যে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হয় আল্লাহ তাঁদের সেই প্রতিদান দিন। সেগুলো নিম্নরূপ: —

প্রথম:— রুকইয়াহর স্থানে আসার সময় নারীদেরকে পূর্ণ শালীনতার আদেশ না দেওয়া। কিছু রাকী এ বিষয়ে কোনো না কোনো অজুহাতে ছাড় দিয়ে থাকেন, অথচ এটি এমন এক ব্যাপার যা জায়েয নয়। বরং সমস্ত রাকীর উপর — বিশেষত যাঁরা সমষ্টিগত কিরাআত করেন এবং নারীদের জন্য কোনো একটি দিন নির্দিষ্ট করেন তাঁদের উপর — ওয়াজিব হলো নারীদেরকে পূর্ণ শালীনতা ও পরিপূর্ণ হিজাবের আদেশ দেওয়ার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া; আর তাদের মধ্যে যে এর বিরোধিতা করবে তাকে স্থান থেকে বের করে দেওয়া হবে। কেননা রাকী তার জন্য গাইরে মাহরাম; সুতরাং তার জন্য জায়েয নয় যে সে তার নখ দেখবে, না চুল, না চোখ, না তার শরীরের কোনো কিছুই — কখনোই নয়। আর জানা কথা যে, রুকইয়াহর স্থান যত বেশি গুনাহ থেকে দূরে থাকবে, প্রভাব তত বেশি পূর্ণ হবে। তাই বোরকার অনুমতি দেওয়া হবে না, না সেই নিকাবের — যা দিয়ে দুই চোখ ও নাকের উপরিভাগ প্রকাশ পায়; আর হাতমোজা ও পায়ের মোজা ছাড়া তাকে মূলত প্রবেশেরই অনুমতি দেওয়া হবে না। কেননা নারী পুরোটাই আওরাত, আর রাকী অন্য সব পুরুষের মতোই একজন পুরুষ। সুতরাং সে যেন নিজ দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় না পড়ে, সে জন্য তার এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। যে রাকী এ ধরনের বিষয়ে শিথিলতা করে, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

দ্বিতীয়:— প্রবেশমূল্য, পানি, তেল ইত্যাদির দামে বাড়াবাড়ি করা। পারিশ্রমিকের মূল বিধান জায়েয হলেও রাকীগণের উচিত মানুষের জন্য বিষয়টি সহজ করা। কিছুসংখ্যক রাকী তাঁদের রোগীদের অর্থ নিঃশেষ করার ভুলে পড়ে গেছেন — এমনকি কোনো কোনো রোগী এই রাকীর কাছে চিকিৎসার খরচ মেটাতে ঋণ করতে বাধ্য হয়। এটি জায়েয নয়, এবং এটি ইখলাসের একটি ত্রুটি। নবী ﷺ বলেছেন:

((يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا))

> তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করো না।

রাকীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই রোগীর কষ্ট দূর করা; আর সব বিষয়েই মধ্যপন্থা কাম্য। যদি বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করে, তবে শাসকের অধিকার আছে হস্তক্ষেপ করার এবং আল্লাহ তাঁকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা দিয়ে এসব জিনিসের নির্দিষ্ট মূল্য বেঁধে দেওয়ার; যে তা মানবে না, তাকে রুকইয়াহ থেকে দূরে রাখা হবে এবং তাতে বাধা দেওয়া হবে। আমরা উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণে যেতে চাই না, কারণ উদ্দেশ্য ভুলের পিছু নেওয়া নয়, ছবি কালিমালিপ্ত করাও নয়; উদ্দেশ্য কেবল নসীহত। আল্লাহই উদ্দেশ্যের তত্ত্বাবধায়ক। আমার রাকী ভাইদের প্রতি অসিয়ত — তাঁরা যেন এ ধরনের বিষয়ে সহজ করেন, তাঁদের রোগীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করেন এবং তাদের দিকে দয়া, স্নেহ ও করুণার দৃষ্টিতে তাকান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তৃতীয়:— আসরকারী জিনের সঙ্গে কথাবার্তায় দীর্ঘসূত্রতা করা। এ ব্যাপারটির কোনো ভিত্তি নেই; কারণ উদ্দেশ্য হলো এই শরীর থেকে তার বেরিয়ে যাওয়া। সুতরাং একান্ত অপরিহার্য বিষয় ছাড়া তার সঙ্গে কথা বলা যাবে না — যেমন তার প্রবেশের কারণ, কিংবা তার ধর্ম ইত্যাদি। আর তার সঙ্গে কথার ডালপালা মেলে ধরা — তার নাম, তার খাবার-পানীয়ের ধরন, তার উচ্চতা-খর্বতা, তার বয়স, তার গোত্রের নাম, তার ভাইদের সংখ্যা, সে বিবাহিত না অবিবাহিত — এসব জিজ্ঞেস করা অনর্থক বিষয়ে হস্তক্ষেপ। এটি পাঠকের উপর আসরকারী জিনের দুঃসাহস বেড়ে যাওয়ার একটি কারণ। আর এতে পাঠকের নিজের ব্যাপারে আত্মপ্রবঞ্চনায় পড়ার আশঙ্কাও থাকে — এই ভেবে যে সে এই জিনের কাছ থেকে এসব তথ্য বের করতে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি জিনেরা তো মূলতই মিথ্যা বলে; সুতরাং তাদের সংবাদে আস্থা রাখা যায় না। বিষয়টি আরও খারাপ হয় যখন পাঠক ইচ্ছা করে এসব প্রশ্ন করে জিনের কথা ক্যাসেটে রেকর্ড করেন এবং তা মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন। এমন কাজ কেবল নির্বোধ, বোকা ও আত্মপ্রবঞ্চিত ব্যক্তিই করে। এ ধরনের পাঠকদের বাধা দেওয়াই যথার্থ, কারণ তারা সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা উসকে দেয়। হাদীসে এসেছে:

((مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ))

> মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত হলো অনর্থক বিষয় বর্জন করা।

চতুর্থ:— রোগের প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ব-বোঝাপড়া ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই রোগাবস্থা নির্ণয়ে অনুমাননির্ভর কথা বলা। এটি আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কথা বলার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً

> আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় — এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা আল-ইসরা: ৩৬)

এটি একটি বিস্তৃত দরজা, যা বহু রোগীর জন্য মানসিক ওয়াসওয়াসা এবং শয়তানি কল্পনার শিকড় গেড়ে বসার কারণ হয়েছে। কেননা রোগীর মন সাধারণত পাঠকদের কথার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকে। সুতরাং পাঠক যেন আল্লাহকে ভয়

করেন এবং এ ধরনের অবস্থার ব্যাপারে পূর্ব-অভিজ্ঞতাভিত্তিক অধ্যয়ন ছাড়া রোগের প্রকৃতি নির্ধারণ না করেন। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও বারবার কিরাআত ছাড়া তিনি যেন রায় দিতে তাড়াহুড়া না করেন। তাঁর প্রথম ও শেষ চিন্তা হওয়া উচিত রোগীর কাছ থেকে এই অনুভূত উপসর্গগুলো দূর হওয়া; সেগুলো দূর হয়ে গেলেই আলহামদুলিল্লাহ। তিনি যেন তাঁর রোগীকে ওয়াসওয়াসা ও ভয়ের ঘূর্ণিপাকে না ফেলেন। তদুপরি এসব রোগের উপসর্গের মধ্যে বিরাট সাদৃশ্য রয়েছে, যার কারণে হয়তো এই রোগের প্রকৃতি আলাদা করে চেনাই যায় না; আর এগুলো গোপন গায়েবের অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত নয়। আপনার কর্তব্য আপনার রোগীর হৃদয়ে ও আত্মায় সুলক্ষণের বীজ বপন করা। রোগী তার রোগের প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভীষণ আগ্রহী থাকে; কিন্তু সফল পাঠক তিনি নন যিনি রোগী যা কামনা করে ও যাতে সন্তুষ্ট হয় তা-ই উচ্চারণ করেন, বরং তিনিই — যা কিয়ামতের দিন দেখে তিনি খুশি হবেন তা-ই বলেন। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

পঞ্চম:— বিদ্যুৎ দিয়ে চিকিৎসা। আমি নিজ চোখে কিছু পাঠককে এমনটি করতে দেখেছি। এটি বিরাট অপরাধ ও মহা বিপদ; কোনো অবস্থাতেই এটি জায়েয নয়। শাসকদের উপর ওয়াজিব হলো যে এর দ্বারা চিকিৎসা করে তাকে ধমকে থামানো; সে যদি বিরত হয় ভালো, নতুবা ওয়াজিব হলো তাকে থামিয়ে দেওয়া। কেননা রোগীদের শরীর এই দলটির খেলার মাঠ নয়, যারা এমনটি করে। তদুপরি আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে; হাদীসে এসেছে:

لا يعذب بالنار إلا ربها

> আগুন দিয়ে শাস্তি দেন না তার প্রতিপালক ছাড়া কেউ। — কিংবা তিনি ﷺ যেমন বলেছেন

এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে শরীর ও মনের উপর। এমনকি যদি প্রমাণিতও হয় যে এই রোগীর মধ্যে জিনের আসর আছে, তবুও এর দ্বারা জিনকে শাস্তি দেওয়া জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ন্যায়বিচারের আদেশ দিয়েছেন। আর আয়াতসমূহের বজ্রপাত, তার দহন ও তার শাস্তির চেয়ে কঠিন ও শক্তিশালী কিছু নেই।

এর অনুরূপ হলো প্রহার করাও; কিছু পাঠক এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছেন। এর ব্যাপারে মূল বিধান হলো নিষেধাজ্ঞা, কারণ এটি এমন সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত যার কোনো বৈধ কারণ নেই; আর এর রয়েছে ভয়ংকর নেতিবাচক প্রভাব, যা এমন পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে যার শেষ প্রশংসনীয় নয়। সুতরাং এই বৃত্তটি সংকুচিত করা, নয়তো পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া অপরিহার্য। কোনো কোনো আলিমের কাজ সাধারণ বিধান নয়। আর যখন এ ধরনের অবস্থার ব্যাপারে অজ্ঞতা শিকড় গেড়ে বসেছে, তখন এসব সীমালঙ্ঘনের মুখোমুখি দাঁড়ানো আমাদের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শাসককে অবশ্যই এ থেকে বাধা দিতে হবে। প্রহারের কারণে রোগীর মধ্যে যে কোনো ক্ষতচিহ্ন দেখা দেবে, তা তার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে; সে তার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে, কিংবা বিচারকগণ যা উপযুক্ত মনে করেন সে অনুযায়ী কিসাস দাবি করতে পারবে।

রোগীদের প্রহারের কারণে বহু বিপর্যয় ও বিরাট বিপদ ঘটেছে। আর জানা ও প্রতিষ্ঠিত কথা হলো, কোনো জিনিস জায়েয হলেও যদি তা বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায় তবে তা নিষিদ্ধ করা হয় — সাদ্দুয যারীআ (উপায় বন্ধকরণ) হিসেবে; তাহলে যা মূলতই নিষিদ্ধ তার অবস্থা কেমন হবে! আপনার দায়িত্ব কেবল তার উপর কিরাআত করা; আল্লাহ যদি তাকে আরোগ্য দেন তবে সেটাই কাম্য, নতুবা তার উপর পুনরায় পড়ুন। আসরকারী শয়তানের উপর কুরআনের বজ্রপাত এবং আয়াতসমূহের আঘাত — যা আল্লাহ তাআলার কালাম — এর চেয়ে কঠিন কিছু নেই।

আমি এমন এক রোগীকে চিনি, যাকে কিছু পাঠক এত প্রহার করেছেন যে তার প্রহারের তীব্রতায় তার দুই পায়ে পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। আর আমি এমন এক নারীকে চিনি, যিনি কিছু পাঠকের প্রহারের কারণে এক মাস বিছানায় পড়ে

ছিলেন, হাঁটতে পারতেন না। অন্যের শরীরে হস্তক্ষেপের ব্যাপারে মূল বিধান হলো হারাম — কেবল সেসব নির্ভরযোগ্য শরঈ কারণ ছাড়া, যা তাকে বৈধ করে।

আর তাঁদের এই কথা যে "প্রহার তো জিনের উপর পড়ে" — আমি জানি না এর দলিল কী। আমরা তো বাহ্যিক অবস্থা গ্রহণ করার আদেশপ্রাপ্ত, আর বাহ্যিকভাবে এই চাবুক ও ঘুষিগুলো রোগীরই শরীরে পড়ে, সে তা অনুভব করে এবং ব্যথা পায়। আমি এমন একটি দলকে চিনি, যারা এক ব্যক্তির উপর কিরাআত করার জন্য একত্র হয়েছিল, তাদের সঙ্গে ছিল রশি ও লাঠি। রোগী যেন তাদের সঙ্গে সামান্য গোঁয়ার্তুমি করল; তখন তারা তার উপর প্রহার বর্ষণ করতে লাগল এবং তাকে এই রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল। যতই প্রহার বাড়ছিল ততই তার চিৎকার বাড়ছিল, আর তারা বলছিল:— আরও বাড়াও, এই জিন তার জিহ্বায় কথা বলছে! — শেষ পর্যন্ত তার দুই পা ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

সুতরাং শাসকের কাছে আশা, তিনি যেন এই দরজা বন্ধ করে দেন এবং প্রহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেন। তদুপরি আমি আজ পর্যন্ত এমন কোনো সহীহ ও স্পষ্ট শরঈ দলিল জানি না যা এর বৈধতা প্রমাণ করে। আর যদি আমরা তেমন কিছু পেয়েও যাই, তবু দৃষ্টি যাবে যে তা প্রয়োগ করছে তার দিকে — কেননা কিছু পাঠক নিজের কনুই থেকে হাঁটু আলাদা করতে জানেন না; তাঁরা জানেন না কখন প্রহার করতে হবে, কোথায় প্রহার করতে হবে, কিংবা তাঁর এই প্রহারের কী পরিণাম দাঁড়াবে। সুতরাং ওয়াজিব হলো এই দরজা বন্ধ করা এবং যে এটি চর্চা করে তাকে রুকইয়াহর পথ থেকে দূরে সরানো ও তাতে বাধা দেওয়া।

উদ্দেশ্য হলো, বিদ্যুৎ দিয়ে চিকিৎসা এবং প্রহার — এ দুটি সেই ভুলের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো থেকে প্রিয় পাঠক ভাইদের দূরে থাকা উচিত। রুকইয়াহর এসব কিছুর প্রয়োজন নেই। তাঁরা যেন কিতাব (কুরআন), সহীহ দুআসমূহ, তীব্র মুখাপেক্ষিতা এবং আল্লাহ তাআলার দিকে আশ্রয়প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন — যেন তিনি তাঁদের রোগীদের আরোগ্য দেন; কেননা তিনিই আরোগ্যদাতা, তিনি মহান ও সুউচ্চ। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

ষষ্ঠ:— নারীর উপর রুকইয়াহ করার সময় তার গায়ে হাত রাখা। কেউ কেউ এটি করেন — তাঁরা সংখ্যায় কম, আলহামদুলিল্লাহ। এটি হারাম বিষয়, জায়েয নয়। যে ব্যক্তি রোগিণীকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ফেলে, তার কোনো যুক্তি নেই; কেননা এর কোনো গুরুত্বই নেই — আমরা তা অভিজ্ঞতা থেকে জানি। বরং এই হাত রাখা তার (রাকীর) হৃদয়ে কিংবা তার (রোগিণীর) হৃদয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। নারী পুরোটাই আওরাত, আর মানুষ তাদের সম্ভ্রমের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ রাখে; প্রয়োজন না থাকলে তারা আপনার কাছে আসতই না। সুতরাং এই প্রয়োজনকে সম্ভ্রমের পর্দা লঙ্ঘনের কাজে ব্যবহার করবেন না — আল্লাহকে ভয় করুন। বরং রুকইয়াহর সময় তার দিকে অবিরত তাকিয়ে থাকাও আপনার জন্য জায়েয নয়, কারণ ওয়াজিব হলো দৃষ্টি অবনত রাখা।

আপনার দ্বীন ও আমানতদারি যতই হোক, আপনি একজন পুরুষ এবং সে একজন নারী; আর শয়তান তোমাদের দুজনের হৃদয়ে এ ব্যাপারে অন্তরঙ্গতা ঢেলে দিতে অত্যন্ত আগ্রহী। আল্লাহর কসম দিয়ে আমাকে বলুন — কোথায় সেই শরঈ কারণ, যা আপনার জন্য এই হাত রাখা বৈধ করে? কোথায় সেই দলিল, যার উপর ভিত্তি করে আপনি এটি করছেন? তা কি কিতাব, নাকি সুন্নাহ, নাকি উম্মতের পূর্বসূরিদের ও ইমামগণের কারও আমল? আমরা তো একটি হরফও জানি না যা এটি বৈধ করে; বরং দলিলসমূহ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে যে, পুরুষদের নারীদের থেকে দূরে রাখা ওয়াজিব। আর প্রয়োজন তার পরিমাণ অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়; নারীর মাথায় হাত রাখার ক্ষেত্রে কখনোই কোনো প্রয়োজন নেই।

আর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধকারী সংস্থাগুলোর উচিত এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া এবং পাঠকদেরকে ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য কমিটিগুলো থেকে জারি হওয়া শরঈ ফতোয়া সরবরাহ করা, যাতে এর বিধান স্পষ্ট থাকে। আর শাসকদের উচিত, যে এ ব্যাপারে হালকা মনে করে ও বিরোধিতা করে তার উপর লৌহকঠিন হাতে আঘাত হানা। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

সপ্তম:— চিকিৎসকগণ রোগীদের জন্য যেসব চিকিৎসা লিখে দিয়েছেন, সেগুলো বন্ধ করার আদেশ দেওয়া। এ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই সতর্ক করা দরকার; এটি এমন হস্তক্ষেপ যা উচিত নয়। কেননা চিকিৎসকগণ এই চিকিৎসাগুলো তো

তখনই লিখেছেন যখন তাঁরা রোগীর অবস্থা নির্ণয় করেছেন এবং দেখেছেন যে তার এই নির্দিষ্ট চিকিৎসাটি প্রয়োজন। সুতরাং পাঠকের জন্য জায়েয নয় যে তিনি রোগীকে এই নির্দিষ্ট চিকিৎসা বন্ধ করার আদেশ দেবেন — এই অজুহাতে যে সে যা অনুভব করছে তা আসরকারী শয়তানের কারণেই। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

অষ্টম:— আসরকারী শয়তানের পক্ষ থেকে আসা এই অভিযোগগুলোর পিছনে কোনো কোনো রাকীর গা ভাসিয়ে দেওয়া যে, রোগীর অমুক আত্মীয় বা অমুক আত্মীয়াই তার উপর জাদু বা বদনজরের কারণ ঘটিয়েছে। এর কারণে কত আত্মীয়তা ছিন্ন হয়েছে, আর এর কারণে আত্মীয়দের মধ্যে কত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে! সুতরাং পাঠকের উপর ওয়াজিব হলো, আসরকারী শয়তানকে এসব অভিযোগের সুযোগ না দেওয়া, এসব ব্যাপারে তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা, এবং রোগীকে এ কথা বোঝানো যে শয়তান মিথ্যা বলে এবং এসব অভিযোগ দিয়ে সে ফাসাদ ছড়ানো ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্য রাখে। কেননা উসকানি দিয়ে বিবাদ বাধানো শয়তানের অন্যতম উদ্দেশ্য, যেমন নবী ﷺ বলেছেন:

إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن

في التحريش بينهم

> নিশ্চয়ই শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে সালাত আদায়কারীরা তার ইবাদত করবে; কিন্তু (সে আশা রাখে) তাদের মধ্যে পারস্পরিক উসকানি ও বিবাদ বাধানোর ব্যাপারে। — "মুসলিম জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন"

সুতরাং ওয়াজিব হলো এই দরজা বন্ধ করা এবং আসরকারী শয়তানকে এসব অভিযোগের সুযোগ না দেওয়া। মূল বিধান হলো দায়মুক্তি (কাউকে নির্দোষ ধরা), আর জিনদের সংবাদ সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় না। হায়, রাকীগণ যদি এই দরজাটি বন্ধ করে দিতেন! কেননা এটি অনিষ্ট ও ফিতনার দরজা; এর কারণে বহু অনিষ্ট ঘটেছে। আমরা বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

নবম:— রোগীকে কিছু তাবীজ, তাবীয-দুআ ও তামীমা ঝোলানোর আদেশ দেওয়া। এর বিপদ তো জানাই হয়ে গেছে এবং মুসলিমদের মধ্যে এর হারাম হওয়াও প্রসিদ্ধ। আমরা তামীমার বিষয়টি আমাদের আকীদাবিষয়ক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি।

দশম:— বিপুলসংখ্যক মানুষের উপর সমষ্টিগত কিরাআত করা। এতে সবকিছু গুলিয়ে যায়, যা গোপন ছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং যা ঢাকা ছিল তা ফাঁস হয়ে যায়। এতে পাঠক রোগীর অবস্থা অনুসরণ করতেও পারেন না। আর সালাফ রহিমাহুমুল্লাহ থেকে এর কোনো ভিত্তি জানা যায় না। রুকইয়াহতে পূর্ণ গোপনীয়তা কাম্য। আমরা সমষ্টিগত কিরাআত পরখ করে দেখেছি, তাতে বড় কোনো উপকার পাইনি; বরং উপকার পেয়েছি কেবল একক কিরাআতেই। আর কিছু মানুষ কেবল কৌতূহল মেটাতেই সমষ্টিগত রুকইয়াহর মজলিসে হাজির হয়, তারপর যা দেখেছে তা ফাঁস করে বেরিয়ে যায়। সুতরাং আমাদের পাঠক ভাইদের কাছে আশা, তাঁরা যতটুকু সম্ভব সমষ্টিগত কিরাআত পরিহার করবেন।

আরও একটি ক্ষতি রয়েছে: কোনো কোনো রোগী আসে যার মধ্যে সামান্য কিছু ছাড়া কিছুই নেই; সে সাধারণ রুকইয়াহর মজলিসে উপস্থিত হয় এবং দেখে — এই একজন মূর্ছা যাচ্ছে, ওই একজন চিৎকার করছে, আরেকজন মাটিতে ছটফট করছে, আরেকজন বমি করছে, আরেকজন এমন শব্দ বিড়বিড় করছে যা বোঝা যায় না। ফলে সে

নিজেই ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত হতে পারে। কত পুরুষ ও নারী রুকইয়াহর মজলিস থেকে নিকৃষ্ট কল্পনা নিয়ে বেরিয়েছে, এবং সে কারণে তারা আগের চেয়েও বড় রোগে আক্রান্ত হয়েছে!

সুতরাং আমি তাঁর কাছে — যিনি মহান ও সুউচ্চ — প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার পাঠক ভাইদের এটি ছেড়ে দেওয়ার তাওফীক দেন। এই হলো সেই কয়েকটি বিষয়, যা লক্ষ করা যেতে পারে; আর তাঁদের বিপুল নেকির তুলনায় এগুলো সামান্যই। ইনসাফের দাবি হলো, মানুষের বিপুল সঠিকতার মধ্যে তার সামান্য ভুল ক্ষমা করে দেওয়া। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

রাকীদের এড়ানোর মতো দশটি ভুল

করুন

করবেন না

- ✕ নারীদের পূর্ণ শালীনতা ও হিজাবের আদেশ না দেওয়া
- ✕ প্রবেশমূল্য, পানি ও তেলের দামে বাড়াবাড়ি করা
- ✕ আসরকারী জিনের সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তা চালানো
- ✕ অভিজ্ঞতা ছাড়া রোগের প্রকৃতি নিয়ে অনুমাননির্ভর কথা বলা
- ✕ বিদ্যুৎ দিয়ে চিকিৎসা এবং প্রহার করা
- ✕ নারীর রুকইয়াহর সময় তার গায়ে হাত রাখা
- ✕ চিকিৎসকের লিখে দেওয়া চিকিৎসা বন্ধ করার আদেশ দেওয়া
- ✕ জিনের অভিযোগে কোনো আত্মীয়কে জাদু বা বদনজরের কারণ বলে ধরে নেওয়া
- ✕ তাবীজ ও তামীমা ঝোলানোর আদেশ দেওয়া
- ✕ বিপুলসংখ্যক মানুষের ওপর সমষ্টিগত কিরাআত করা

প্রশ্ন ২৪ — তবে মানুষের বিপুল সঠিকতার মধ্যে সামান্য ভুল ক্ষমা করাই ইনসাফ

প্রশ্ন ২৫

যেসব রোগ থেকে আরোগ্যের আশা নেই — যেমন এইডস রোগী, সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়া ক্যানসার, প্লেগ ইত্যাদি — সেসব রোগীর তাওবা কি কবুল হয়? দলিলসহ তা স্পষ্ট করুন।

উত্তর: আমি বলি:— আলিমগণের কাছে রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা এটি প্রতিষ্ঠিত যে, কবুলযোগ্য তাওবা তা-ই, যার মধ্যে পাঁচটি শর্ত পূর্ণ হয়:—

প্রথম:— ইখলাস; এর দলিলসমূহ সুবিদিত।

দ্বিতীয়:— গুনাহ থেকে অবিলম্বে বিরত হওয়া।

তৃতীয়:— আর ফিরে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা।

চতুর্থ:— যা ঘটে গেছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

পঞ্চম:— তা সম্ভাবনার সময়ের মধ্যে হওয়া। জীবনের সমস্ত সময়ই তাওবা সংঘটিত করার উপযুক্ত সময় — কেবল দুটি আলামত প্রকাশ পেলে ছাড়া: প্রথমটি:— সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া। দ্বিতীয়টি:— রূহের গড়গড়ানি শুরু হওয়া, অর্থাৎ মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হওয়া ও রূহ কণ্ঠনালিতে পৌঁছে যাওয়া। এ ব্যাপারে দলিলসমূহ প্রসিদ্ধ।

আর একটি ষষ্ঠ শর্ত আছে, যা কেবল তার জন্যই খাস যার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য: হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

সুতরাং আরোগ্যের আশা নেই এমন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তাওবা করে এবং তার তাওবায় এই শর্তগুলো পূর্ণ হয়, তবে তার তাওবা কবুল ও বিশুদ্ধ — ইনশাআল্লাহু তাআলা। কিন্তু রোগ যদি তাকে গড়গড়ানির অবস্থায় পৌঁছে দেয়, তবে তার তাওবা বিশুদ্ধ নয়; কারণ মূলনীতি বলে: (কোনো ইবাদত বিশুদ্ধ হয় না যতক্ষণ না তার শর্তগুলো পূর্ণ হয় এবং তার প্রতিবন্ধকগুলো দূর হয়)। তাওবা একটি ইবাদত, আর তার বিশুদ্ধতার শর্ত হলো — যেমনটি আগে গেছে — তা সম্ভাবনার সময়ের মধ্যে হওয়া। অথচ এই রোগী তা বিলম্বিত করেছে এই রোগের কারণে মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত; সুতরাং তার তাওবা বাতিল, তার কোনো প্রভাব নেই, তার থাকা না-থাকার সমান। আর যদি সে এর আগেই তাওবা করে — অর্থাৎ তার উপর মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হয়নি এবং তার গড়গড়ানি শুরু হয়নি — তবে বাকি শর্তগুলো পূর্ণ হলে তাওবা বিশুদ্ধ।

কবুলযোগ্য তাওবার শর্ত

- [ ] প্রথম: ইখলাস
- [ ] দ্বিতীয়: গুনাহ থেকে অবিলম্বে বিরত হওয়া
- [ ] তৃতীয়: আর ফিরে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প
- [ ] চতুর্থ: যা ঘটে গেছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া
- [ ] পঞ্চম: সম্ভাবনার সময়ের মধ্যে — সূর্য পশ্চিমে উদিত হওয়ার আগে, রূহের গড়গড়ানির আগে
- [ ] ষষ্ঠ (প্রযোজ্য হলে): হকদারদের হক পৌঁছে দেওয়া

আরোগ্যের আশাহীন রোগীর তাওবা শর্ত পূর্ণ হলে কবুল; গড়গড়ানি শুরু হলে আর নয়

এর দলিল হলো, নবী ﷺ এক ইহুদি কিশোরকে দেখতে গেলেন, সে অসুস্থ ছিল। তিনি তার কাছে প্রবেশ করলেন এবং তাকে ইসলামের আদেশ দিলেন। কিশোরটি তার পিতার দিকে তাকাল যেন তার পরামর্শ চাইছে; তার পিতা তাকে বলল:— আবুল কাসিমের আনুগত্য করো। তখন এই কিশোর সত্যের সাক্ষ্য দিল, এরপর কিছুক্ষণ পরেই মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

الحمد لله الذي أنقذه بي من النار

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মাধ্যমে তাকে আগুন থেকে উদ্ধার করলেন।

এটি দলিল যে, এ অবস্থায় শিরক থেকে তার তাওবা কবুল হয়েছে, কারণ তা সম্ভাবনার সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।

আর আরেকটি দলিল সহীহাইনে রয়েছে:

أنه لما حضرت أبا طالبٍ الوفاة جاء رسول الله فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أمية بن المغيرة, فقال له رسول الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبدالله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب فلم يزل رسول الله يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالبٍ آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب...الحديث

আবূ তালিবের মৃত্যু উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন এবং তাঁর কাছে আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়া ইবনুল মুগীরাকে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন: "হে চাচা, আপনি বলুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' — একটি কালিমা, যার দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেব।" তখন আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়া বলল:— হে আবূ তালিব, আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সামনে তা পেশ করতে থাকলেন এবং সেই কথাটি তাঁর কাছে পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত আবূ তালিব তাদের সঙ্গে সর্বশেষ যে কথা বললেন তা হলো:— তিনি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরেই আছেন... — হাদীসের বাকি অংশ

এখান থেকে দলিলের দিকটি হলো, আবূ তালিব অসুস্থ ছিলেন এবং নবী ﷺ তাঁকে এই কালিমা দ্বারা কুফর থেকে তাওবা করার আদেশ দিয়েছেন — যা প্রমাণ করে যে, তিনি যদি তা বলতেন তবে তা তাঁর উপকারে আসত এবং তাঁর কাছ থেকে কবুল করা হতো।

আর এই বিধানটি — অর্থাৎ রোগাবস্থায় তাওবা কবুল হওয়া — ঐ কিশোর ও আবূ তালিবের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। উসূলশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত যে, উম্মতের কোনো একজনের ক্ষেত্রে যে বিধান প্রমাণিত হয়, তা অনুসরণক্রমে সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয় — কেবল বিশেষায়নের দলিল থাকলে ভিন্ন কথা। আর নবী ﷺ বলেছেন:

إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বান্দার তাওবা কবুল করেন, যতক্ষণ না তার গড়গড়ানি শুরু হয়। — "তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান"

সুতরাং রোগ যদি তাকে গড়গড়ানির সীমা পর্যন্ত না পৌঁছায়, তবে তার তাওবা কবুল — রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নসের ভিত্তিতে। আর যদি তার উপর মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হয়ে যায় এবং তার রূহ গড়গড়াতে থাকে, তবে আর কোনো তাওবা নেই। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ ও সর্বোচ্চ।

প্রশ্ন ২৬

রোগের প্রকৃতি নির্ণয়, জাদুর স্থান জানা কিংবা উপযুক্ত চিকিৎসা নির্ধারণ ইত্যাদি চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়ে জিন ব্যবহারের হুকুম কী? বিস্তারিত বিবরণ, দলিল ও মূলনীতিসহ বলুন।

উত্তর: আমি বলি:— এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম প্রশ্ন; এর উত্তরে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা অপরিহার্য। তাই আমি বলি — আর তাওফীক আল্লাহরই কাছে, তাঁর কাছ থেকেই আমি অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রার্থনা করি — এই প্রশ্নের উত্তর কয়েকটি মাসআলার মাধ্যমে স্পষ্ট হবে:—

(মাসআলা এক) মানুষ কর্তৃক জিন ব্যবহার তিন প্রকারের বাইরে নয়:— হয় শয়তানি ব্যবহার, নয়তো সুলাইমানি ব্যবহার, নয়তো রাহমানি ব্যবহার।

শয়তানি ব্যবহার বলতে আমরা বোঝাই জাদুকর, গণক, ভেলকিবাজ, ভবিষ্যদ্বক্তা এবং কোনো কোনো সূফী তরিকার অনুসারীদের জিন ব্যবহার। এ ধরনের ব্যবহারের হারাম হওয়ায় কোনো সন্দেহ নেই; বরং এর হারাম হওয়া এমন বিষয় যাতে ইসলামের আলিমগণ একমত, বরং তা দ্বীনের অপরিহার্য জ্ঞাত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এই ব্যবহার পুরোটাই বিপর্যয় — হয় নির্ভেজাল বিপর্যয়, নয়তো প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিপর্যয়। আর শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত যে, শরীয়ত এসেছে কল্যাণকে সাব্যস্ত ও পূর্ণ করতে এবং বিপর্যয়কে অকার্যকর ও হ্রাস করতে।

এই ব্যবহার তার কর্তাকে অনেক অবস্থাতেই এমন বড় শিরকের দিকে নিয়ে যায়, যা তাকে পুরোপুরি মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। কেননা জিনেরা এদেরকে এদের চোখের কালোর জন্য কিংবা এদের প্রতি ভালোবাসার কারণে সাহায্য করে না; বরং এরা যা চায় তার কিছু ক্ষেত্রে সাহায্য করে এদের তাওহীদের বিনিময়ে — অর্থাৎ এরা তাদের উদ্দেশে যবেহ করা, তাদের কাছে ফরিয়াদ করা ইত্যাদির মাধ্যমে যে নৈকট্য অর্জন করে তার বিনিময়ে।

এর দলিল আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

> আর এই যে, মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোকের আশ্রয় নিত; ফলে তারা তাদের অবাধ্যতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। (সূরা আল-জিন: ৬)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন:

ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا, قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم

> আর যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন: হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা তো মানুষের অনেককেই বশে এনেছ। আর মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে: হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং আমরা আমাদের সেই নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়েছি যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলবেন: আগুনই তোমাদের আবাস, তাতে তোমরা চিরকাল থাকবে — আল্লাহ যা চান তা ছাড়া। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা আল-আনআম: ১২৮)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন:

وما يعلمان من أحد يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

> আর তারা দুজন কাউকে শেখাত না যতক্ষণ না বলত: আমরা তো কেবল একটি পরীক্ষা, সুতরাং তুমি কুফরি করো না। অতঃপর তারা তাদের দুজনের কাছ থেকে এমন জিনিস শিখত যা দিয়ে তারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তারা তা দিয়ে কারও ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা এমন জিনিস শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, উপকার করত না। তারা তো নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে ব্যক্তি এটি ক্রয় করবে আখিরাতে তার কোনো অংশ নেই। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই জিনিস, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে — যদি তারা জানত! (সূরা আল-বাকারা: ১০২)

সার্বিকভাবে, যে প্রতিটি দলিল জাদুকে হারাম করে এবং গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে যাওয়াকে হারাম করে, তা-ই এই প্রকারটি হারাম হওয়ার দলিল। সুতরাং যে ব্যক্তি এই পন্থায় জিন ব্যবহার করে, সে পাপী, কবীরা গুনাহসমূহের একটি কবীরা গুনাহে লিপ্ত এবং শিরকের দরজাগুলোতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; আমরা এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

সুতরাং এই প্রকারের ব্যবহার তার সব রূপ ও আকারে হারাম; কোনো অবস্থাতেই তা জায়েয নয়। বরং যে কেউ জানে যে অমুক ব্যক্তি এমনটি করে, তার উপর ওয়াজিব হলো — তাকে নসীহত করা ও তার উপর প্রতিবাদ জানানোর পর — তার হাত ধরে ফেলার জন্য বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে তোলা। এই বিপথগামী দল এবং এই বাতিল, নিচ ও তুচ্ছ

গোষ্ঠীর আমাদের মাঝে টিকে থাকার কোনো অধিকার নেই। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ধ্বংস তার জন্য, যে এদের স্বীকৃতি দেয়, এদের সঙ্গে আপস করে কিংবা এদেরকে আড়াল করে।

সুতরাং ইসলামী সমাজের উপর — বাদশাহ থেকে শুরু করে সমাজের সর্বনিম্ন ব্যক্তি পর্যন্ত সব শ্রেণির উপর — ওয়াজিব হলো এই বিপথগামী ও পথভ্রষ্টকারী দলের বিরুদ্ধে এক কাতারে দাঁড়ানো, তাদের সঙ্গে শিথিলতা না করা এবং তাদের উপর কঠোরতম শাস্তি প্রয়োগ করা। কেননা তারা এক ঘুণপোকা, যা উম্মতের কাঠামোকে কুরে কুরে খায়; তারা আবর্জনা, যা আকীদার স্বচ্ছতা ঘোলা করে, বরং তা পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। তারা আমাদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু, কারণ তারা সরাসরি সংযোগ রাখে আমাদের সবচেয়ে কঠিন শত্রুদের সঙ্গে — আর তারা হলো শয়তানেরা।

হে আল্লাহ, আমরা তাদের থেকে আপনার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে আপনার মহত্তম নামের অসীলায় প্রার্থনা করি — আপনি তাদের শয়তানদেরকেই তাদের উপর চাপিয়ে দিন। প্রকৃতপক্ষে বান্দা এদের অপরাধের মাত্রা তখনই বোঝে, যখন সে এদের কোনো শিকারের দিকে তাকায়। সুতরাং আল্লাহ এদের অভিশপ্ত করুন, লাঞ্ছিত করুন, ধ্বংস করুন, দূরে সরিয়ে দিন এবং উম্মতকে এদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(মাসআলা দুই) সুলাইমানি ব্যবহার বলতে আমরা বোঝাই মুজিযাভিত্তিক, রাজকীয়, বলপ্রয়োগমূলক ও কর্তৃত্বমূলক ব্যবহার। এ ধরনের ব্যবহার ছিল আল্লাহর নবী সুলাইমান আলাইহি ওয়া আলা নাবিয়্যিনা আফদালুস সালাতি ওয়া আযকাত তাসলীম-এর একটি মুজিযা; তাঁর পরে আর কারও পক্ষে কখনোই তা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

قال رب اغفرلي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهاب

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب والشياطين كل بناءٍ

وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير

حساب

> তিনি বললেন: হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন যা আমার পরে আর কারও জন্য শোভনীয় হবে না। নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা। অতঃপর আমি তাঁর অধীন করে দিলাম বাতাসকে — তা তাঁর আদেশে মৃদুমন্দভাবে চলত যেদিকে তিনি চাইতেন; আর শয়তানদেরকেও — প্রত্যেক নির্মাতা ও ডুবুরিকে; এবং আরও কিছুকে যারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। এই আমার দান; সুতরাং তুমি অনুগ্রহ করো কিংবা আটকে রাখো — কোনো হিসাব নেই। (সূরা সোয়াদ: ৩৫-৩৯)

আর এ কারণেই আমরা বলেছি (মুজিযাভিত্তিক) — অর্থাৎ এটি ছিল একটি মুজিযা, যা আল্লাহ তাঁর নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাতে চালু করেছিলেন এবং তা শেষ হয়ে গেছে — যেমন বাতাসকে তাঁর অধীন করে দেওয়া, যা তাঁর আদেশে মৃদুমন্দভাবে চলত যেদিকে তিনি চাইতেন। সেটি শেষ হয়ে গেছে; তাঁর পরে আর কেউ কখনোই তা করতে সক্ষম নয়। এটি তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আর আমাদের কথা (রাজকীয়) — এতে এই ব্যবহারের ধরন স্পষ্ট হয় যে, তা রাজাদের কর্তৃক তাদের অধীনস্থদের ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। আর তা আরও স্পষ্ট করে আমাদের কথা (বলপ্রয়োগমূলক) — অর্থাৎ শয়তানদের কোনো ইচ্ছা

ছাড়াই; বরং তারা এতে বাধ্য ছিল আল্লাহ তাআলার আদেশে, তাঁর নির্ধারণে এবং তাঁর ভয়ে — তিনি মহান ও সুউচ্চ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

> আর তাদের মধ্যে যে আমার আদেশ থেকে বিচ্যুত হবে, আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব। (সূরা সাবা: ১২)

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وكنا لهم حافظين

> আর আমিই ছিলাম তাদের সংরক্ষণকারী। (সূরা আল-আম্বিয়া: ৮২)

আল্লাহ তাআলা এই ব্যবহারের কথা স্পষ্ট করেছেন তাঁর বাণীতে:

وآخرين مقرنين في الأصفاد

> এবং আরও কিছুকে, যারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। (সূরা সোয়াদ: ৩৮)

আর এই ব্যবহার হতো মুবাহ (বৈধ) বিষয়গুলোতে, যার উপকার ফিরে আসত আল্লাহর নবী সুলাইমান ও তাঁর রাজ্যের অধিবাসীদের উপর। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفانٍ كالجواب وقدور راسيات

> তারা তাঁর জন্য তৈরি করত তিনি যা চাইতেন — প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউজের মতো বিশাল পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগসমূহ। (সূরা সাবা: ১৩)

আর তাঁর বাণী:

ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك

আর শয়তানদের মধ্যে কিছু ছিল যারা তাঁর জন্য ডুব দিত এবং এ ছাড়াও অন্যান্য কাজ করত। (সূরা আল-আম্বিয়া: ৮২)

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

والشياطين كل بناءٍ وغواص

আর শয়তানদেরকেও — প্রত্যেক নির্মাতা ও ডুবুরিকে। (সূরা সোয়াদ: ৩৭)

এই বিষয়টি সেই মুজিযাসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب

এই আমার দান; সুতরাং তুমি অনুগ্রহ করো কিংবা আটকে রাখো — কোনো হিসাব নেই। (সূরা সোয়াদ: ৩৯)

আর এ কারণেই নবী ﷺ যখন সেই শয়তানকে বেঁধে ফেলার ইচ্ছা করলেন — যে তাঁর উপর ছুটে এসেছিল এবং তাঁর সালাত নষ্ট করতে চেয়েছিল — তখন তিনি বললেন:

فذكرت دعوة أخي سليمان...الحديث

তখন আমার ভাই সুলাইমানের দুআর কথা আমার মনে পড়ল... — হাদীসের বাকি অংশ

কেননা শয়তানকে বাঁধা, তাকে লাঞ্ছিত করা এবং শৃঙ্খল ও কারাবন্দিত্ব দিয়ে তাকে অপমানিত করা — এ তো সেই রাজকীয়, বলপ্রয়োগমূলক ও কর্তৃত্বমূলক ব্যবহারেরই অন্তর্ভুক্ত, যা সুলাইমান আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর ভাই সুলাইমানের দুআকে বাস্তবায়িত করার জন্যই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন, মুক্ত করে দিলেন এবং যে ইচ্ছা করেছিলেন তা করলেন না।

আর বর্ণিত আছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে যখন এই দুটির মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হলো — তিনি বান্দা-রাসূল হবেন, নাকি এমন নবী-রাসূল হবেন যিনি যাকে ইচ্ছা দেবেন ও যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করবেন, কোনো হিসাব ও কোনো দোষ ছাড়াই — তখন তিনি জিবরীল আলাইহিস সালামের সঙ্গে পরামর্শ করার পর প্রথম মর্যাদাটিই বেছে নিলেন। জিবরীল তাঁকে বলেছিলেন:— বিনয় অবলম্বন করুন। তাই তিনি প্রথম মর্যাদাটিই বেছে নিলেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদের মুসনাদে আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে বর্ণিত।

আর এই প্রকারের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা বলেছি যে, তা আল্লাহর নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর কিছু অংশ হয়তো সংকীর্ণ পরিসরে এবং কেবল কিছু শয়তানের ক্ষেত্রে কিছু মানুষের সঙ্গে ঘটতে পারে; কিন্তু সাধারণভাবে নয় — যেমনটি সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ক্ষেত্রে ছিল।

সার্বিকভাবে, মানুষের জন্য জায়েয নয় যে সে ইচ্ছা করে এই ব্যবহারের দিকে অগ্রসর হবে; কারণ এর পিছনে রয়েছে বিপদ ও বিপর্যয়ের যা কিছু আছে তা — কেননা জিনেরা এদেরকে বিনিময় ছাড়া সেবা দিতে পারে না, তা আগে হোক বা পরে। সুতরাং মুমিনের উপর ওয়াজিব হলো এই বিশ্বাস রাখা যে, এটি সুলাইমান আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য, এবং এ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

মানুষ কর্তৃক জিন ব্যবহার: প্রথম দুই প্রকার

শয়তানি ব্যবহার	সুলাইমানি ব্যবহার
জাদুকর, গণক, ভেলকিবাজ, ভবিষ্যদ্বক্তা ও কিছু সূফী তরিকার অনুসারীদের ব্যবহার	মুজিযাভিত্তিক, রাজকীয়, বলপ্রয়োগমূলক ও কর্তৃত্বমূলক ব্যবহার
হারাম; আলিমদের ঐকমত্য; দ্বীনের অপরিহার্য জ্ঞাত বিষয়	সুলাইমান আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য; তাঁর পরে কারও পক্ষে নয়
অনেক অবস্থাতেই বড় শিরকের দিকে নিয়ে যায়, যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয়	ইচ্ছা করে এদিকে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়
কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়	মুমিনের ওয়াজিব বিশ্বাস রাখা যে এটি সুলাইমানের বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন ২৬ — তৃতীয় প্রকার (রাহমানি) পরের অধ্যায়ে

এক নজরে

- ★ ফাতিহা, ইখলাস-ফালাক-নাস, আয়াতুল কুরসী ও বাকারার শেষাংশ: বর্ণিত রুকইয়াহ
- ★ ফুঁ দেওয়া ও ডান হাতে মোছা বৈধ; যার প্রয়োজন নেই তার রুকইয়াহ না চাওয়া উত্তম
- ★ বিদ্যুৎ দিয়ে চিকিৎসা ও প্রহার জায়েয নয়; রুকইয়াহর এসবের প্রয়োজন নেই
- ★ নারীর রুকইয়াহর সময় তার গায়ে হাত রাখা হারাম
- ★ জিনের কথা সত্য বলে মানা হয় না; আত্মীয়দের দোষারোপ থেকে সতর্কতা
- ★ কবুলযোগ্য তাওবার পাঁচ শর্ত; গড়গড়ানির আগে পর্যন্ত কবুল
- ★ শয়তানি জিন-ব্যবহার হারাম; সুলাইমানি ব্যবহার সুলাইমান আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য

যাচাই করুন

1. নারীর রুকইয়াহর সময় রাকীর তার গায়ে হাত রাখা সম্পর্কে হুকুম কী?

ক. জায়েয | খ. মাকরূহ

গ. হারাম; এর কোনো প্রয়োজন নেই

2. বিদ্যুৎ দিয়ে চিকিৎসা সম্পর্কে লেখকের হুকুম কী?

ক. কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয় | খ. প্রয়োজনে জায়েয

গ. জিনের আসর প্রমাণিত হলে জায়েয

3. আসরকারী জিনের সঙ্গে কথাবার্তা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. যত বেশি প্রশ্ন তত ভালো | খ. জিনের সংবাদ নির্ভরযোগ্য

গ. একান্ত অপরিহার্য বিষয় ছাড়া কথা বলা যাবে না

4. কখন তাওবা আর কবুল হয় না?

ক. রোগ কঠিন হলেই | খ. রূহের গড়গড়ানি শুরু হলে

গ. যেকোনো সময় কবুল হয়

5. সুলাইমানি জিন-ব্যবহার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. যে-কেউ করতে পারে | খ. মুস্তাহাব

গ. সুলাইমানের বৈশিষ্ট্য; ইচ্ছা করে এদিকে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়

6. শয়তানি জিন-ব্যবহারের হুকুম কী?

ক. মুবাহ | খ. মাকরূহ

গ. হারাম; আলিমগণ একমত

উত্তর: ১-গ, ২-ক, ৩-গ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-গ

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

জিন-ব্যবহারের প্রকারভেদ, রোগীর কাছে বাস্তবতা গোপন, এবং চিকিৎসাসংক্রান্ত জাল ও দুর্বল হাদীসসমূহ

(মাসআলা তিন) "রহমানী ব্যবহার" বলতে আমরা বোঝাচ্ছি — তাদেরকে এমন কাজে ব্যবহার করা, যা তাৎক্ষণিক ও ভবিষ্যতের শরঈ কল্যাণ (মাসলাহাত) বাস্তবায়ন করে। সুতরাং তাদের ব্যবহারে যদি বিশুদ্ধ কল্যাণ থাকে কিংবা প্রাধান্যপ্রাপ্ত কল্যাণ থাকে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই; বরং এ অবস্থায় তা মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এটিই ব্যবহারের সর্বোচ্চ প্রকার — যেমন তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার আদেশ দেওয়া, তারা যেন নিজেদের জাতির প্রতি সতর্ককারী হয় সেই আদেশ দেওয়া, তাদেরকে মুনকার থেকে নিষেধ করা এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই — তিনি ছাড়া অন্য কাউকে নয় — ইবাদতে একক করার আদেশ দেওয়া। আর এটিই ছিল নবী ﷺ-এর অবস্থা: তিনি কিছু জিনকে শিক্ষা দিতেন, তারপর তাদেরকে নিজেদের জাতির প্রতি সতর্ককারী দূত ও দাঈ বানিয়ে দিতেন। কেননা আল্লাহ তাআলা জিনদের উপরও রাসূলগণের আনুগত্য ওয়াজিব করেছেন, যেমন তা মানুষের উপর ওয়াজিব করেছেন। সুতরাং রাসূল ﷺ-এর অনুসারী আল্লাহর ওলীগণ জিনদেরকে ঠিক সেভাবেই কাজে লাগান, যেভাবে তাঁরা মানুষকে কাজে লাগান — অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর আনুগত্যের কাজে; যেমন মুহাম্মদ ﷺ মানুষকে কাজে লাগাতেন — নিজের কোনো স্বার্থে নয়, বরং এমন কাজে যার উপকার দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের নিজেদের দিকেই ফিরে আসে।

সুতরাং রাকী যখন মাস-আক্রান্ত (জিন-স্পৃষ্ট) রোগীর উপর পড়েন এবং জিন কথা বলে ওঠে, আর সে যদি কাফির হয়, তবে তিনি তাকে আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত দেবেন, তাকে ভালো কাজের আদেশ দেবেন ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবেন। এরপর সে যদি তাঁর ডাকে সাড়া দেয়, তবে রাকীর জন্য আরোহী (রোগীর দেহে অবস্থানকারী) জিনকে এ কথা বলায় কোনো অসুবিধা নেই যে: তুমি তোমার জাতির কাছে যাও, তাদেরকে ইসলামের আদেশ দাও এবং শিরক থেকে সতর্ক করো। এর মধ্যে কত বিরাট শরঈ কল্যাণ বাস্তবায়িত হয়, যার বিপরীতে কোনো ক্ষতিই দাঁড়ায় না! আর যদি আমরা মেনেও নিই যে এর বিপরীতে কিছু ক্ষতি আছে, তবু তা এই বিরাট কল্যাণগুলোর পাশে ডুবে যাবে।

আর আরোহী জিনটি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার মধ্যে বিশুদ্ধ তাওবার (তাওবাতুন নাসূহ) লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে রাকীর জন্য তাকে এ কথা বলায় মোটেই কোনো অসুবিধা নেই যে:— তোমার তাওবা পূর্ণ হওয়ার একটি দিক হলো, তুমি আমাদেরকে জাদুর জায়গাটি দেখিয়ে দেবে এবং জাদুকরের নাম আমাদের বলে দেবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই; এটি তার সঙ্গে কথা দীর্ঘ করার অন্তর্ভুক্ত নয়, তার কাছে আশ্রয় চাওয়া বা তার মাধ্যমে অসীলা গ্রহণের অন্তর্ভুক্তও নয়; বরং এটি তাকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করারই পূর্ণতা, তাকে কল্যাণের পথ দেখানো ও সৎকাজ করার অন্তর্ভুক্ত, এবং নেকী ও তাকওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে নিষেধ করার অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যবহারের উপর হারাম বা মাকরূহ কোনোটিই এসে পড়ে না। তবে এটি কিছু রাকীর প্রতি আল্লাহ তাআলার তাওফীক — তাঁদের ঈমানের পূর্ণতা, তাঁদের আকীদার নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা এবং অন্যের উপকার করার প্রতি তাঁদের ভালোবাসার কারণে।

আর জেনে রাখুন — আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন — মানুষের সঙ্গে জিনের সম্পর্ক নিজে নিজেই হারাম নয়; বরং তা তখনই হারাম হয়, যখন তার ফলে নিষিদ্ধ কিছুতে পতিত হতে হয়, কিংবা তা নিষিদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয়। কেননা তাদেরকে আমাদের ব্যবহার করা একটি মাধ্যম (ওসীলা) হওয়ার বাইরে কিছু নয়; আর মূলনীতিতে প্রতিষ্ঠিত যে, মাধ্যমসমূহের হুকুম উদ্দেশ্যের হুকুমের মতোই। সুতরাং এই সম্পর্ক যদি কোনো ওয়াজিব বা মুস্তাহাব কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যম হয়, তবে সে অনুযায়ীই তার হুকুম দেওয়া হবে; আর যদি তা হারাম বা মাকরূহ সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়, তবে তার হুকুমও সেরকমই।

এর দ্বারা আপনার কাছে স্পষ্ট হলো যে, প্রকারগুলো তিনটি:— শয়তানী ব্যবহার, এটি নিরঙ্কুশভাবে হারাম। দ্বিতীয়: সুলাইমানী ব্যবহার; আপনি তো জেনেই গেছেন যে, এটি ছিল আল্লাহর নবী সুলাইমান — তাঁর ও আমাদের নবীর উপর সালাত ও সালাম — এর মুজিযা। তৃতীয়: মুহাম্মদী তথা রহমানী ব্যবহার; এটি আদিষ্ট বিষয়ের সীমার ভেতরেই পড়ে — কখনো ওয়াজিব হিসেবে, যদি শরঈ ওয়াজিব কেবল এর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়; আর কখনো মুস্তাহাব হিসেবে, যদি মুস্তাহাব কেবল এর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

জিন-ব্যবহারের তিন প্রকার

মানুষ কর্তৃক জিন ব্যবহার

শয়তানী নিরঙ্কুশভাবে হারাম	**সুলাইমানী** সুলাইমান আলাইহিস সালামের মুজিযা	**রহমানী (মুহাম্মদী)** আদিষ্ট বিষয়ের সীমায়; কখনো ওয়াজিব, কখনো মুস্তাহাব
রহমানীর দৃষ্টান্ত জিনকে ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ, মুনকার থেকে নিষেধ, জাতির কাছে সতর্ককারী করা	**ইসলাম গ্রহণ ও খাঁটি তাওবা প্রকাশ পেলে** রাকী জাদুর স্থান ও জাদুকরের নাম জিজ্ঞাসা করলে অসুবিধা নেই	**মাধ্যমের হুকুম** মাধ্যমের হুকুম উদ্দেশ্যের হুকুমের মতোই; নিষিদ্ধে নিলে হারাম

প্রশ্ন ২৬, মাসআলা তিন

(মাসআলা চার) জেনে রাখুন — আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন — রুকইয়াহর মাসআলাটি ইলমের মাসআলার মতোই। আল্লাহ কখনো কখনো রুকইয়াহর অধ্যায়ে কিছু মানুষের উপর জ্ঞানগত কিছু দ্বার খুলে দেন; তখন আল্লাহ তাআলা তাকে দিকনির্দেশনা ও পথপ্রদর্শনের হিদায়াত এবং তাওফীক ও ইলহামের হিদায়াত দান করেন — যার ফলে সে জানতে পারে জিন-জনিত রোগগুলোর বৈশিষ্ট্য, সেগুলোর আলামত ও বিস্তারিত রূপ, দেহে জিনের চলাচল এবং রোগীর দেহে আরোহী জিনের অবস্থান। এটি হয় জ্ঞানগত বিশেষায়নের (তাখাসসুস) অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কারও জন্য জায়েয নয় যে, নিজ বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই লোকটির শ্রেষ্ঠত্ব এবং এসব রোগের অবস্থা সম্পর্কে তার পূর্ণ জ্ঞান দেখে তাকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করবে যে, সে জিন ব্যবহার করে, জিনই তাকে এসব বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়, এবং জিন ব্যবহার ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া তার এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়নি। এটি কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। কেননা মুসলিমের ব্যাপারে মূল বিধান হলো নিরাপত্তা, এবং মূল বিধান হলো তার ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করা — বিশেষত সে যদি সেই পরিচিত ইলমপিপাসুদের একজন হয়, যারা সততা ও তাকওয়ার জন্য পরিচিত এবং যারা এ ধরনের কাজ থেকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দূরে।

আর এসব মাসআলা সম্পর্কে আপনার অজ্ঞতাকে অন্যের জ্ঞানের উপর বিচারক বানাবেন না; এসব অবস্থা জানার ক্ষেত্রে আপনার ব্যর্থতাকে সেগুলোতে অন্যের সফলতার মাপকাঠি বানাবেন না। বরং তা আল্লাহর তাওফীক ও তাঁর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন; আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। স্বপ্ন ও রূয়ার ব্যাখ্যাকারীদের কেউ কেউ এ অধ্যায়ে এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, তার বিস্ময় শেষ হওয়ার নয় — এটি এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে খুলে দেওয়া দ্বার। শিল্পীদের কেউ কেউ নিজেদের শিল্পে এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা প্রায় বিশ্বাসযোগ্যই হতো না, যদি না আমরা এসব শিল্পের ফল স্বচক্ষে দেখতাম — এটিও তাঁদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে খুলে দেওয়া দ্বার। বিচারকদের কেউ কেউ বিচারের ক্ষেত্রে এমন সব ফয়সালা দিয়েছেন যা প্রবাদে পরিণত হয়েছে ও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে — যেমন শুরাইহ ও অন্যরা; এটিও আল্লাহর পক্ষ থেকে খুলে দেওয়া দ্বার। ইলমপিপাসুদের কেউ

কেউ ইলম অর্জন, গ্রন্থরচনা ও পাঠদানের ক্ষেত্রে এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, তার সবটুকু তো দূরে থাক, কিছু অংশ উল্লেখ করতেও কলম অক্ষম। বরং আমরা যদি সব ক্ষেত্রেই তাকাই, তবে দেখব প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁদেরকে আল্লাহ এমন কিছু উদ্‌ঘাটন দিয়ে সম্মানিত করেছেন যা অন্যের জন্য খোলেননি। এ সবই আল্লাহ তাআলার এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত:

ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

> এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন; আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। (সূরা আল-জুমুআ: ৪)

রুকইয়াহর বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে আচরণ (মাসআলা চার)

করুন

- ✓ মুসলিমের ব্যাপারে মূল বিধান নিরাপত্তা ও ভালো ধারণা পোষণ

করবেন না

- ✗ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে জিন ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা
- ✗ নিজের অজ্ঞতাকে অন্যের জ্ঞানের বিচারক বানানো
- ✗ হিংসা বা অনুমানের ভিত্তিতে ভাইদের সমালোচনা করা

রুকইয়াহর জ্ঞান ইলমের মতোই — আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সে দ্বার খুলে দেন

আর রুকইয়াহর ক্ষেত্রটিও তেমনই; এটি তো উপকার করার অধ্যায়গুলোরই একটি অধ্যায় হওয়ার বাইরে কিছু নয়। তাহলে আমরা কেন দূরের কথা মনে করব যে, আল্লাহ কিছু মানুষের উপর এ ক্ষেত্রে এমন দ্বার খুলে দেবেন, যার দ্বারা সে এ বিষয়ে অগ্রগামী হবে? সুতরাং আমরা যেন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

> নাকি তারা মানুষের প্রতি হিংসা করে সেই অনুগ্রহের কারণে, যা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন? (সূরা আন-নিসা: ৫৪)

আর আমরা যেন আমাদের ভাইদের প্রতি অভিযোগ আরোপ ও অন্যায়ভাবে তাঁদের সমালোচনা থেকে নিজেদের জিহ্বা সংযত রাখি — সেসব মিথ্যা, নষ্ট, অচল ও অসার ধারণার ভিত্তিতে, যেগুলোতে প্রমাণের ঘ্রাণটুকুও নেই; বরং তা কেবল অনুমান, প্রবৃত্তি ও হিংসা। কেননা জিহ্বার ব্যাপারটি অতি গুরুতর, আর তাকে হিফাযত না করার বিপদ ভয়ানক। আমি

এমন একজনকে বলতে শুনেছি — যিনি এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন ও যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন, তাঁকে (কাজ থেকে) বন্ধ করে দেওয়ার পর — তিনি বলছিলেন:— আমাকে বন্ধ করে দেওয়ার কারণ হলো সেই গোপন প্রতিবেদনগুলো, যেগুলো শাসকদের কাছে লেখা হয় এবং যেগুলোতে লেখকরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, আমরা জিনের সঙ্গে যোগাযোগ করি ও তাদের ব্যবহার করি। আমি বলি:— এটি এদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার ফল, আর তাদের বুকের ভেতরের বিদ্বেষ, হিংসা ও অহংকারের ফল — ইনশাআল্লাহ তারা যা চায় তা তারা পাবে না। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

(মাসআলা পাঁচ) জেনে রাখুন — আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন — জিনের জগৎ মানুষের জগতের মতোই। তাদের মধ্যে মুসলিমও আছে, কাফিরও আছে; সৎও আছে, অসৎও আছে; ইলমপিপাসুও আছে, মূর্খও আছে; মুত্তাকীও আছে, হতভাগাও আছে; নেককারও আছে, পাপাচারীও আছে। যেমন আল্লাহ তাআলা তাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন:

وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا

আর আমাদের মধ্যে কেউ সৎকর্মশীল, আর কেউ তার চেয়ে নিম্নমানের; আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। (সূরা আল-জিন: ১১)

وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

وَأَمَّا ٱلْقَٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

আর আমাদের মধ্যে কেউ আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম), আর কেউ সীমালঙ্ঘনকারী। সুতরাং যারা আত্মসমর্পণ করেছে, তারাই সঠিক পথ অনুসন্ধান করেছে। আর যারা সীমালঙ্ঘনকারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন হয়েছে। (সূরা আল-জিন: ১৪-১৫)

আর নবী ﷺ তাদের একটি দলের প্রশংসা করেছেন এই বলে:

أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن هم

আমার কাছে নাসীবীনের জিনদের একটি প্রতিনিধিদল এসেছিল; তারা কতই না উত্তম জিন! — যেমনটি সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে

তাদের মধ্যকার সৎকর্মশীল ও আলিমদের সঙ্গে যোগাযোগ করায় কোনো অসুবিধা নেই — যাঁর জন্য আল্লাহ তাআলা সেই দ্বার খুলে দিয়েছেন তাঁর জন্য; কেননা তাদের দিক থেকে নিরাপত্তা রয়েছে। সুতরাং মুফতীর উচিত নয় যে, এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নিরঙ্কুশভাবে তা নিষেধ করে দেবেন, এবং যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কেবল যোগাযোগ করার কারণেই তার সমালোচনা করবেন — যদি এই যোগাযোগের উপর শরঈ নিষিদ্ধ কিছু এসে না পড়ে।

আমি অনুসন্ধানসহ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নিষেধকারী দলিলগুলোতে দৃষ্টি দিয়েছি এবং দেখেছি যে, সেগুলো সেই যোগাযোগ সম্পর্কে, যার উপর কোনো শরঈ ক্ষতি এসে পড়ে — যেমন জাদুকরদের তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, গণকদের তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, ভেলকিবাজদের তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, সূফী তরীকাপন্থীদের তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, এবং ইসলামের পূর্বে জাহিলি যুগের লোকদের তাদের সঙ্গে যোগাযোগ। কেননা তাদের কেউ যখন কোনো উপত্যকায় নামত এবং তাদের আধিপত্যের ভয় করত, তখন বলত:— আমি এই উপত্যকার সরদার বা বড়জনের কাছে তার জাতির নির্বোধদের থেকে আশ্রয় চাই — এবং এ ধরনের কথা। আর যে যোগাযোগের উপর কোনো ক্ষতি এসে পড়ে না, আল্লাহর কসম, এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তা নিষেধ করে এমন কোনো দলিল জানি না — সেই যোগাযোগের কথা তো দূরে থাক, যার উপর ওয়াজিব বা মুস্তাহাব পর্যায়ের শরঈ কল্যাণ এসে পড়ে। মূল বিধান হলো জায়েয হওয়া, আর নিষেধকারীর উপরই দলিল পেশের দায়।

মূলনীতিতে প্রতিষ্ঠিত যে, হুকুম তার কারণের (ইল্লাত) সঙ্গেই আবর্তিত হয় — কারণ থাকলে হুকুম থাকে, কারণ না থাকলে হুকুমও থাকে না। আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নিষেধকারী দলিলগুলোর কারণ হলো শরঈ ক্ষতির উপস্থিতি। কিন্তু যে যোগাযোগে এর কিছুই নেই, সেখানে কি এই কারণ বাস্তবায়িত হয়? বরং যে যোগাযোগে শরঈ কল্যাণ রয়েছে, সেখানে? উত্তর:— অবশ্যই না। সুতরাং নিষেধের কারণটি যেখানে পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে হুকুমটিও পাওয়া যাবে না; কেননা তা তার কারণের সঙ্গেই আবর্তিত হয় — কারণ পাওয়া গেলে যোগাযোগ নিষেধ, আর কারণ না থাকলে নিষেধও নেই।

এ মাসআলায় আমি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি, এবং আবুল আব্বাস ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহও এদিকেই ঝুঁকেছেন; যে ব্যক্তি এ মাসআলায় তাঁর বক্তব্য পড়বে, সে এ ফলাফল ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে বের হবে না। দলিল ও আলিমদের বক্তব্যের উপর তাদের ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি বোঝা চাপানো উচিত নয়। মাসআলাটি বিবেচনা ও গবেষণার অধীন। সুতরাং যা নস (শরঈ বক্তব্য) নিষেধ করেছে, তা নিষিদ্ধ; আর নস যেটির নিষেধ সম্পর্কে কিছু বলেনি, তাতে মূল বিধান জায়েয হওয়া। আমার উল্লিখিত এই বিভাজন ও বিস্তারিত বিবরণের দ্বারা দলিলগুলো পরস্পর মিলে যায় এবং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে — ইনশাআল্লাহ।

জিনদের সঙ্গে যোগাযোগ: লেখকের মত

নিষিদ্ধ যোগাযোগ	যেখানে নিষেধের কারণ নেই
জাদুকর, গণক, ভেলকিবাজ, সূফী তরীকাপন্থী ও জাহিলি যুগের লোকদের যোগাযোগ	যে যোগাযোগে শরঈ ক্ষতি আসে না
নিষেধের কারণ: শরঈ ক্ষতির উপস্থিতি	হুকুম কারণের সঙ্গে আবর্তিত; কারণ না থাকলে নিষেধও নেই
যা নস নিষেধ করেছে, তা নিষিদ্ধ	নস যার নিষেধ বলেনি, তাতে মূল বিধান জায়েয; নিষেধকারীর ওপর দলিলের দায়

এটি লেখকের ইজতিহাদ; মাসআলাটি বিবেচনা ও গবেষণার অধীন

আর কর্তৃত্বের জোরে ইলমপিপাসুদেরকে এমন কিছু নিষেধ করতে বাধ্য করা জায়েয নয়, যা নিষেধ হওয়ার পক্ষে কোনো দলিল নেই; কোনো মুফতী বা আলিমের বক্তব্যের প্রতি গোঁড়ামি যেন আমাদেরকে ইলমপিপাসুদের জোর করে

সেই বক্তব্যের উপর বাঁকিয়ে দিতে না ঠেলে দেয় — কেননা এটি সীমালঙ্ঘন, জুলুম ও অজ্ঞতা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَلَا تَعْتَدُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

> আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। (সূরা আল-বাকারা: ১৯০)

এই উত্তরে আমি যা লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম, এটিই তার শেষ। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং স্খলন, ভুল ও ঘাটতি থেকে তাঁর দিকে তাওবা করি। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ২৭

চিকিৎসকের জন্য কি রোগীর কাছে তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা বলা জায়েয?

উত্তর: আমি বলি:— মূল বিধান হলো মিথ্যা হারাম হওয়া; এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দলিল এসেছে। কিন্তু চিকিৎসক যদি এ ব্যাপারে নিরুপায় হয়ে পড়েন এবং সত্য বলার কোনো অবকাশ না পান, আর তিনি জানেন কিংবা তাঁর প্রবল ধারণা হয় যে, এই রোগীকে তার রোগের প্রকৃত অবস্থা জানালে তার স্বাস্থ্যগত অবস্থার অবনতি ঘটবে, কিংবা তার রোগ বেড়ে যাবে ও তার ব্যাধি প্রকট ও বড় হয়ে উঠবে — তবে এ অবস্থায় চিকিৎসকের জন্য ততটুকু মিথ্যা বলায় কোনো দোষ বা অসুবিধা নেই, যতটুকুতে তিনি নিরুপায়। তবে তিনি যেন শুরুতেই মিথ্যা না বলেন।

আর চিকিৎসকের সর্বদা কর্তব্য হলো, তিনি তাঁর রোগীদেরকে ধৈর্য ধারণের ও সওয়াবের আশা রাখার আবশ্যকতা শেখাবেন, তাদেরকে তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দেবেন, এবং শেখাবেন যে — তোমার উপর যা এসেছে তা তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার ছিল না, আর যা তোমাকে ছেড়ে গেছে তা তোমার উপর আসার ছিল না। তিনি যেন দৈহিক চিকিৎসার আগে তাদের রূহানী চিকিৎসা করেন এবং তাদের অন্তরে ঈমান শুদ্ধ করে ও বাড়িয়ে দিয়ে সুস্থতা জাগিয়ে তোলেন — যতটুকু তার সাধ্যে কুলায়। চিকিৎসক যদি এসবের কিছু না জানেন, তবে তিনি যেন এমন আলিমদের সাহায্য নেন, যাঁরা তাঁদের ইলম, আমানতদারি ও এ ধরনের মাসআলায় অভিজ্ঞতার জন্য নির্ভরযোগ্য — এমনকি তাঁদের বাড়িতে ফোন করে হলেও। আর কত ভালো হয় যদি কিছু আলিমের ফোন নম্বর চিকিৎসকদের কাছে সংরক্ষিত থাকে, যাতে এ ধরনের অবস্থায় তাঁদের সাহায্য নেওয়া যায়।

সুতরাং মিথ্যা যদি রোগীর উপকার করে এবং তার বা অন্য কারও ক্ষতি না করে, তবে অনিবার্য প্রয়োজন ও বিদ্যমান দরকারের কারণে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে আরও একটি শর্ত অপরিহার্য — তা হলো তাওরিয়া (ইঙ্গিতপূর্ণ, দ্ব্যর্থবোধক কথা) কাজে না আসা। কিন্তু তাওরিয়া যদি কাজে আসে, তবে সেটির আশ্রয় নেওয়াই অধিক সতর্ক ও উত্তম; কেননা তাওরিয়ার মধ্যে মিথ্যা এড়ানোর অবকাশ রয়েছে।

আর এটি যেন চিকিৎসকের স্থায়ী অভ্যাস না হয়; কেননা রোগীরা যদি তাঁর এই স্বভাব জেনে ফেলে, তবে এই চিকিৎসকের উপর ও তাঁর দেওয়া খবরের উপর আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। মিথ্যা কিংবা তাওরিয়া সব রোগীর সঙ্গেই জায়েয নয়, বরং কেবল তাদের কারও কারও সঙ্গে। কেননা রোগীদের মধ্যে এমনও আছেন, যিনি দৃঢ়চিত্ত, পূর্ণ ঈমানের অধিকারী, প্রচুর ধৈর্যশীল, সদা আশাবাদী, আল্লাহ তাআলার উপর দৃঢ় ভরসাকারী এবং তার রোগের প্রকৃত অবস্থা জানানোর ভার বহনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত। এ ধরনের ব্যক্তির কাছে মিথ্যা বলা জায়েয নয়, কেননা এখানে দারূরাত (অনিবার্য প্রয়োজন) নেই, দারূরাতের স্থলাভিষিক্ত হাজতও (প্রয়োজন) নেই।

মোটকথা, রোগীকে তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা বলা কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে জায়েয:—

প্রথম:— তাওরিয়া কাজে না আসা।

দ্বিতীয়:— রোগী এমন রোগীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যাদের ইবাদত, তাওয়াক্কুল ও ধৈর্যের দিকটিতে দুর্বলতা রয়েছে।

তৃতীয়:— চিকিৎসক জানেন বা তাঁর প্রবল ধারণা হয় যে, রোগী সত্য কথা সহ্য করতে পারবে না।

চতুর্থ:— চিকিৎসকের সামনে রোগীকে তা জানানো ছাড়া উপায় না থাকা — রোগীর কঠোর পীড়াপীড়ির কারণে, অর্থাৎ সে বারবার চিকিৎসককে তার অবস্থা ও রোগের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। কিন্তু রোগী যদি তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাই না করে, কিংবা চিকিৎসক উত্তর পিছিয়ে দিতে সক্ষম হন এবং এই বিলম্বে রোগীর কোনো ক্ষতি না থাকে, তবে তখন তাঁর জন্য মিথ্যা বলা জায়েয নয়।

রোগীকে স্বাস্থ্য নিয়ে মিথ্যা: চার শর্ত

- [ ] ১. তাওরিয়া (ইঙ্গিতপূর্ণ কথা) কাজে না আসা
- [ ] ২. রোগী ইবাদত, তাওয়াক্কুল ও ধৈর্যে দুর্বল হওয়া
- [ ] ৩. চিকিৎসকের জানা বা প্রবল ধারণা যে রোগী সত্য সহ্য করতে পারবে না
- [ ] ৪. রোগীর কঠোর পীড়াপীড়িতে জানানো ছাড়া উপায় না থাকা

মূল বিধান মিথ্যা হারাম; শর্তসাপেক্ষে ততটুকুই জায়েয, যতটুকুতে নিরুপায়; স্থায়ী অভ্যাস নয়

এর দলিল হলো সেই মূলনীতি, যা প্রতিষ্ঠিত: অক্ষমতার সঙ্গে কোনো ওয়াজিব থাকে না, আর দারূরাতের সঙ্গে কোনো হারাম থাকে না। কেননা মিথ্যা মূলত হারাম, কিন্তু এখানে দারূরাত ততটুকুই অনুমোদন করেছে, যতটুকু দিয়ে এই দারূরাত দূর হয়। এটি আরও একটি মূলনীতির শাখা হিসেবেও বের করা যায় — "অগ্রাধিকারভিত্তিক কিয়াস (কিয়াসে আওলাবী) দলিল"; এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে, এবং এতে যে মতভেদ আছে তা বিরল ও অগ্রহণযোগ্য। শরীয়তে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার কাছে মিথ্যা বলা জায়েয, এবং দুই বিবাদমান পক্ষের কারও কাছে তাদের মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা জায়েয। সুতরাং তা যদি শরীয়তে জায়েয হয়, তবে সেই অবস্থায় রোগীর কাছে মিথ্যা বলা আরও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই জায়েয হবে, যেখানে তাকে সত্য জানালে তা তার প্রাণনাশ, তার বিবেক নষ্ট হওয়া, তার রোগ বৃদ্ধি বা আরোগ্য বিলম্বিত হওয়ার দিকে নিয়ে যেত। এটি একটি শক্তিশালী দিক ও সুন্দর দলিল-উপস্থাপন।

এটি "প্রাণ রক্ষা" মূলনীতির শাখা হিসেবেও বের করা যায়; এর উপর ভিত্তি করে শাখা-নির্ণয়ের দিকটি সুস্পষ্ট। বরং কখনো কখনো মিথ্যা বলা ওয়াজিবও হয়ে যায়, যদি সত্য জানানোর মধ্যে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত প্রাণের বিনাশ থাকে — বিশেষত যখন এর বিপরীতে কোনো ক্ষতি নেই, যেমন এখানকার অবস্থা। এটিই উত্তরের বিস্তারিত রূপ। আল্লাহ আমাদের ও আপনার তত্ত্বাবধায়ক হোন। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ২৮

কিছু ফার্মেসিতে পাওয়া যায় এমন তামার বালা (ব্রেসলেট) দিয়ে চিকিৎসা করার হুকুম কী — যেগুলোর বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয় যে তা (বাত/রিউমাটিজম) প্রতিরোধ করে? দলিল ও মূলনীতিসহ হুকুমের দিকটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর: আমি বলি:— এ ব্যাপারে সম্মানিত পিতৃতুল্য শাইখ আবদুল আযীয ইবনু বায রহিমাহুল্লাহকে — আল্লাহ তাঁকে সর্বোচ্চ ফিরদাউসে উন্নীত করুন এবং তাঁকে ও সমস্ত মুসলিম আলিমকে ক্ষমা করুন — জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি যা উত্তর দিয়েছেন তার হুবহু রূপ এই:

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতঃপর:—

আপনার সম্মানিত চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে — আল্লাহ আপনাকে তাঁর সন্তুষ্টির সঙ্গে যুক্ত করুন — এবং সংযুক্ত কাগজপত্রগুলো আমি দেখেছি, যেগুলোতে সম্প্রতি বাত প্রতিরোধের জন্য প্রচলিত তামার বালার বৈশিষ্ট্যের বিবরণ রয়েছে। আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি এর বিষয়টি বহুবার অধ্যয়ন করেছি এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষকদের একটি বড় দলের সামনে উপস্থাপন করেছি; আমরা সবাই এর হুকুম নিয়ে মতবিনিময় করেছি। মত ভিন্ন হয়েছে: কেউ কেউ একে জায়েয মনে করেছেন, কেননা এতে বাতরোগীদের জন্য প্রতিরোধক বৈশিষ্ট্য রয়েছে; আর কেউ কেউ মত দিয়েছেন এটি বর্জন করার, কেননা তা ঝুলিয়ে রাখা জাহিলি যুগের লোকেদের সেই কাজের সদৃশ, যেখানে তারা ঝিনুক, তাবীজ ও তামা-পিতলের আংটি এবং এ ধরনের ঝুলন্ত বস্তু ব্যবহার করত এবং বিশ্বাস করত যে সেগুলো বহু রোগের চিকিৎসা এবং যার গলায় তা ঝুলানো হয়েছে তার বদনজর থেকে নিরাপদ থাকার উপকরণসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এরই অন্তর্ভুক্ত উকবা ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটি; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له

যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলাল, আল্লাহ যেন তার কাজ পূর্ণ না করেন; আর যে ব্যক্তি ঝিনুক ঝুলাল, আল্লাহ যেন তাকে স্বস্তি না দেন।

আরেক বর্ণনায় এসেছে:

من تعلق تميمة فقد أشرك

যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলাল, সে শিরক করল।

আর ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার হাতে পিতলের একটি আংটি ছিল। তিনি বললেন:

ما هذا؟

এটি কী?

সে বলল:— দুর্বলতাজনিত ব্যথার (আল-ওয়াহিনাহ) কারণে। তখন তিনি বললেন:

أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً

এটি খুলে ফেলো; কেননা এটি তোমার দুর্বলতাই কেবল বাড়াবে। আর তুমি যদি মারা যাও এই অবস্থায় যে তা তোমার উপর রয়েছে, তবে তুমি কখনোই সফল হবে না।

আরেকটি হাদীসে নবী ﷺ সম্পর্কে এসেছে যে, তিনি তাঁর কোনো এক সফরে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন কাফেলার উটগুলো পরীক্ষা করে দেখতে, এবং ধনুকের ছিলার যে মালাগুলো ঝুলানো ছিল সেগুলোর সবই কেটে ফেলতে — যেগুলো সম্পর্কে জাহিলি যুগের লোকেরা মনে করত যে সেগুলো তাদের উটের উপকার করে ও সেগুলোকে রক্ষা করে।

এই হাদীসগুলো ও এ ধরনের হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, বিপদ প্রতিরোধ বা দূর করার জন্য তাবীজ, ঝিনুক, আংটি, ছিলা কিংবা এ ধরনের রক্ষাকবচ — যেমন হাড়, পুঁতি ইত্যাদি — কিছুই ঝুলানো উচিত নয়। এই মাসআলায় আমার মত হলো, উল্লিখিত বালাটি বর্জন করা ও তা ব্যবহার না করা — শিরকের পথ বন্ধ করার জন্য, এর দ্বারা ফিতনার উপাদান ও তার প্রতি ঝোঁক এবং মানুষের তাতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়া নির্মূল করার জন্য, এবং মুসলিম যেন অন্তর দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকেই মুখ ফেরায় — তাঁর উপর আস্থা রেখে, তাঁরই উপর নির্ভর করে এবং সেই শরীয়তসম্মত উপকরণগুলোতে সন্তুষ্ট থেকে, যেগুলোর বৈধতা নিঃসন্দেহে জানা — সেই আকাঙ্ক্ষায়। আর আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন ও বান্দাদের জন্য সহজ করেছেন, তাতেই সেসব থেকে অমুখাপেক্ষিতা রয়েছে যা তিনি তাদের উপর হারাম করেছেন এবং যেসবের ব্যাপারটি সন্দেহজনক।

নবী ﷺ থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন:

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه

যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকল, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে নিষ্কলুষ রাখল। আর যে সন্দেহজনক বিষয়ে পড়ল, সে হারামে পড়ল — সেই রাখালের মতো, যে সংরক্ষিত চারণভূমির চারপাশে পশু চরায়; অচিরেই সে তার ভেতরে ঢুকে পড়বে।

আর তিনি — সালাত ও সালাম তাঁর উপর — বলেছেন:

دع ما يريبك إلى مالا يريبك

যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা ছেড়ে দাও এবং যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না তা গ্রহণ করো।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উল্লিখিত বালাটি ঝুলানো অতীতকালে জাহিলিয়্যাত যা করত তারই সদৃশ। সুতরাং তা হয় শিরকী হারাম বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, নয়তো সেগুলোর মাধ্যমসমূহের অন্তর্ভুক্ত; আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে কম যা বলা যায় তা হলো:— এটি সন্দেহজনক বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মুসলিমের জন্য উত্তম ও অধিক সতর্ক হলো, নিজেকে এ থেকে উঁচুতে রাখা এবং সেই চিকিৎসাতেই সন্তুষ্ট থাকা যার বৈধতা স্পষ্ট ও যা সন্দেহ থেকে দূরে। আমার ও শাইখ-শিক্ষকদের একটি দলের কাছে এটিই স্পষ্ট হয়েছে। আমি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির কাজের তাওফীক দেন এবং আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের ফিকহ ও তাঁর শরীয়তবিরোধী বিষয় থেকে নিরাপত্তা দান করেন; নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ আপনাদের হিফাযত করুন। ওয়াস-সালাম। — উদ্ধৃতি শেষ (ا.هـ)। এটি তাঁর — রহিমাহুল্লাহ — বক্তব্য।

তামার বালা: ইবনু বাযের বর্ণনা

এক দলের মত	অপর দলের মত
জায়েয — বাতরোগীদের জন্য প্রতিরোধক বৈশিষ্ট্য আছে	বর্জন করা — ঝুলিয়ে রাখা জাহিলি যুগের কাজের সদৃশ
—	ইবনু বাযের নিজের মত: বর্জন করা ও ব্যবহার না করা
—	কারণ: শিরকের পথ বন্ধ করা এবং সন্দেহজনক বিষয় থেকে বাঁচা

ইবনু বায রহিমাহুল্লাহর জবাব থেকে

শাইখ — আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিন — মনে যা কিছু ছিল তার সবই নিয়ে এসেছেন। আলিমদের কথা কতই না সুন্দর, আর অন্তরের জন্য কতই না শীতল! আল্লাহ তাঁদের অবস্থান সর্বোচ্চ ফিরদাউসে উন্নীত করুন, তাঁদের মৃতদের ক্ষমা করুন ও জীবিতদের অবিচল রাখুন, এবং আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সেই উত্তম প্রতিদান দিন যা কোনো আলিমকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ২৯

ওষুধ ও রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত জাল ও দুর্বল হাদীসগুলোর কিছু অংশ আমাদের বলুন, সেগুলোর উপর আলিমদের কিছু বক্তব্যসহ।

উত্তর: আমি বলি:— সাদরে গ্রহণ করছি। এগুলোর কিছু হলো:—

১ম:— হাদীস:

من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه

যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমাল এবং তার বিবেক ছিনিয়ে নেওয়া হলো, সে যেন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ না করে।

এটি জাল (মাওদূ) হাদীস; এর জন্য অভিযুক্ত খালিদ ইবনুল কাসিম। আলিমগণ তার সম্পর্কে বলেছেন: মিথ্যুক।

২য়:— হাদীস:

كان يكتمل كل ليلة ويحتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة

> নবী ﷺ প্রতি রাতে সুরমা লাগাতেন, প্রতি মাসে শিঙা লাগাতেন এবং প্রতি বছর ওষুধ পান করতেন।

জাল; এর জন্য অভিযুক্ত সাইফ ইবনু মুহাম্মদ আস-সাওরী, আর সে মিথ্যুক।

৩য়:— হাদীস:

نهى النبي عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء وقال: من فعل ذلك فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه

> নবী ﷺ শনিবার ও বুধবার শিঙা লাগাতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন:— যে এটি করল এবং তার শ্বেতী হলো, সে যেন নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষারোপ না করে।

এটি জাল।

৪র্থ:— হাদীস:

في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل يحتجم إلا مات

> জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যে মুহূর্তে কোনো ব্যক্তি শিঙা লাগালে সে মারা যাবেই।

এতে রয়েছে ইয়াহইয়া ইবনুল আলা, আর সে অভিযুক্ত; সুতরাং হাদীসটি জাল।

৫ম:— হাদীস:

لا تحتجموا يوم الثلاثاء فإن سورة الحديد نزلت علي يوم الثلاثاء وفيه ساعة لا يرقأ فيها دم

> তোমরা মঙ্গলবার শিঙা লাগিয়ো না; কেননা সূরা আল-হাদীদ আমার উপর মঙ্গলবার নাযিল হয়েছে, আর তাতে এমন একটি মুহূর্ত আছে যাতে রক্ত বন্ধ হয় না।

জাল হাদীস। আর এ ব্যাপারে সুয়ূতীর আপত্তির কোনো মূল্য নেই; কেননা তিনি অত্যন্ত শিথিল ছিলেন — আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন ও তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

৬ষ্ঠ:— হাদীস:

من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم بلاء

যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনটি সকালে মধু চেটে খাবে, তার উপর বড় কোনো বিপদ আসবে না।

জাল, কিংবা অত্যন্ত মারাত্মকভাবে দুর্বল। আর মধু সম্পর্কে যে সহীহ বর্ণনাগুলো এসেছে, তাতেই যথেষ্টতা রয়েছে — সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

৭ম:— হাদীস:

النظر إلى الخضرة يزيد البصر، النظر إلى المرأة الحسناء يزيد في البصر

সবুজের দিকে তাকানো দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়; সুন্দরী নারীর দিকে তাকানো দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়।

জাল হাদীস, এর জাল হওয়ায় কোনো সন্দেহ নেই। সানআনী বলেছেন:— জাল।

৮ম:— হাদীস:

لا تمارضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا

তোমরা রোগের ভান করো না, তাহলে সত্যিই রোগগ্রস্ত হবে; আর নিজেদের কবর খুঁড়ো না, তাহলে মারা যাবে।

আবু হাতিম বলেছেন:— মুনকার। আমি বলি:— এটি অত্যন্ত মারাত্মকভাবে দুর্বল হাদীস।

৯ম:— হাদীস:

المرض ينزل جملة واحدة والبرء ينزل قليلاً قليلاً

রোগ নামে একবারে পুরোটা, আর আরোগ্য নামে অল্প অল্প করে।

আল-মাকাসিদ-এ বলা হয়েছে:— বাতিল।

১০ম:— হাদীস:

المريض أنينه تسبيح وصياحه تكبير ونفسه صدقة ونومه

عبادة وتقلبه من جنب إلى جنبٍ جهاد في سبيل الله

রোগীর কাতরানো তাসবীহ, তার চিৎকার তাকবীর, তার নিঃশ্বাস সদকা, তার ঘুম ইবাদত, আর তার এক পাশ থেকে অন্য পাশে ফেরা আল্লাহর পথে জিহাদ।

ইবনু হাজার বলেছেন:— এটি প্রমাণিত নয়। আমি বলি:— মুসলিমের উপর যা কিছু আপতিত হয় — এমনকি একটি কাঁটা বিঁধলেও — তা তার গুনাহের কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাপারে যেসব সহীহ বর্ণনা এসেছে, তাতেই অমুখাপেক্ষিতা ও যথেষ্টতা রয়েছে।

১১তম:— হাদীস:

الأمراض هدايا من الله، فأحب العباد إلى الله أكثرهم هدية

রোগ-ব্যাধি আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার; সুতরাং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা সেই, যার উপহার সবচেয়ে বেশি।

জাল হাদীস।

১২তম:— হাদীস:

البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل بدن ما اعتاده

ঠেসে খাওয়া রোগের মূল, আর পথ্য মেনে চলা ওষুধের মূল; আর প্রত্যেক শরীরকে সে যাতে অভ্যস্ত তাতেই অভ্যস্ত রাখো।

আল-মুখতাসার-এ বলা হয়েছে:— পাওয়া যায়নি। আর আল-মাকাসিদ-এ বলা হয়েছে:— নবী ﷺ পর্যন্ত এর সনদ পৌঁছানো শুদ্ধ নয়।

১৩তম:— হাদীস:

لا تكرهوا أربعة فإنها لأربعة: الرمد فإنه يقطع عرق العمى ولا تكرهوا الزكام فإنه يقطع عرق الجذام, ولا تكرهوا السعال فإنه يقطع عرق الفالج ولا تكرهوا الدماميل فإنها تقطع عرق البرص

চারটি জিনিসকে অপছন্দ করো না, কেননা সেগুলো চারটি জিনিসের প্রতিষেধক:— চোখ ওঠা, কেননা তা অন্ধত্বের শিরা কেটে দেয়; আর সর্দিকে অপছন্দ করো না, কেননা তা কুষ্ঠের শিরা কেটে দেয়; আর কাশিকে অপছন্দ করো না, কেননা তা পক্ষাঘাতের শিরা কেটে দেয়; আর ফোড়াগুলোকে অপছন্দ করো না, কেননা সেগুলো শ্বেতকুষ্ঠের শিরা কেটে দেয়।

জাল হাদীস; অভিযুক্ত এক ব্যক্তি, যাকে বলা হয়:— ইয়াহইয়া ইবনু আদম, আর সে জালকারী।

১৪তম:— হাদীস:

الحجامة في نقرة الرأس تورث النسيان

মাথার পেছনের গর্তে শিঙা লাগানো ভুলে যাওয়ার রোগ সৃষ্টি করে।

এর সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছে, যাকে হাদীস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়; সুতরাং এটি জাল।

১৫তম:— হাদীস:

الشرب من فضل وضوء المؤمن فيه شفاء من سبعين داء

মুমিনের অজুর উদ্বৃত্ত পানি পান করায় সত্তরটি রোগের আরোগ্য রয়েছে।

এর জাল হওয়ায় কোনো সন্দেহ নেই।

১৬তম:— হাদীস:

من خلط دواءً فنفع به الناس أعطاه الله عزوجل ما أنفق الدنيا وأعطاه نعيم الجنة

যে ব্যক্তি ওষুধ প্রস্তুত করল এবং তা দিয়ে মানুষের উপকার করল, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে দুনিয়ায় সে যা ব্যয় করেছে তা দিয়ে দেবেন এবং তাকে জান্নাতের নিয়ামত দান করবেন।

জাল হাদীস, এর সনদে একজন মিথ্যুক রয়েছে।

১৭তম:— হাদীস:

من كنوز البر إخفاء الصدقة وكتمان الشكوى وكتمان المصيبة

নেকীর ভাণ্ডারসমূহের অন্তর্ভুক্ত: সদকা গোপন করা, অভিযোগ গোপন রাখা এবং বিপদ গোপন রাখা।

জাল হাদীস। তবে এর অর্থ শুদ্ধ; কেননা সদকা গোপন করা ইখলাসের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم

> আর যদি তোমরা তা গোপন রাখো এবং ফকিরদের দাও, তবে তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম। (সূরা আল-বাকারা: ২৭১)

আর অভিযোগ গোপন রাখা ও বিপদ গোপন রাখা তাওয়াক্কুল ও ধৈর্যের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই শব্দে হাদীসটি কিছুতেই শুদ্ধ নয়।

১৮তম:— হাদীস:

إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى

> নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি গাছ আছে, যাকে বলা হয় "বিপদের গাছ"।

এই হাদীসটি শুদ্ধ নয়; কেননা এর সনদে দুজন পরিত্যক্ত (মাতরূক) বর্ণনাকারী রয়েছে; সুতরাং এটি জাল।

১৯তম:— হাদীস:

يود أهل العافية أن لحومهم قطعت...الخ

> সুস্থতাপ্রাপ্ত লোকেরা কামনা করবে যে, তাদের গোশত যদি কেটে ফেলা হতো... (হাদীসের বাকি অংশ)

এর সনদে রয়েছে আবদুর রহমান ইবনু মিফরা, আর সে কিছুই নয়; সুতরাং এটি অত্যন্ত মারাত্মকভাবে দুর্বল হাদীস। তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন:— গরীব হাদীস, আমরা কেবল এই সূত্র ছাড়া একে চিনি না।

২০তম:— হাদীস:

لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث

> তিন দিনের আগে রোগী দেখতে যাওয়া হবে না।

এটি মূল থেকেই শুদ্ধ নয়; কেননা এর সনদে একজন পরিত্যক্ত (মাতরূক) বর্ণনাকারী রয়েছে।

২১তম:— হাদীস:

هل يكون مع الشهداء غيرهم يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم من ذكر الموت كل يومٍ عشرين مرة

কিয়ামতের দিন কি শহীদদের সঙ্গে অন্য কেউ থাকবে? তখন তিনি — সালাত ও সালাম তাঁর উপর — বললেন: — হ্যাঁ, যে প্রতিদিন বিশবার মৃত্যুর স্মরণ করে।

আর এই হাদীসটি নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থগুলোর কোনোটিতেই পাওয়া যায় না; এ কারণেই আল-মুখতাসার-এ বলা হয়েছে:— পাওয়া যায়নি।

২২তম:— হাদীস:

لو أن قطرة من ألم قطرة وضعت على جبال الأرض كلها لذابت

যদি এক ফোঁটা যন্ত্রণা পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়ের উপর রাখা হতো, তবে সেগুলো গলে যেত।

এটি জাল হাদীস, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলোতে এর কোনো ভিত্তি নেই; এ কারণেই আল-মুখতাসার-এ বলা হয়েছে:— পাওয়া যায় না।

২৩তম:— হাদীস:

من قص أظفاره مخالفاً لم ير في عينيه رمداً

যে ব্যক্তি এলোমেলো ক্রমে (আঙুলের ধারাবাহিকতা ভেঙে) নখ কাটল, সে তার দুই চোখে চোখ ওঠা দেখবে না।

জাল, এর জাল হওয়ায় কোনো সন্দেহ নেই। বরং ইবনুল কাইয়িম আল-মানার-এ বলেছেন:— এটি নিকৃষ্টতম জাল বর্ণনাগুলোর একটি। — উদ্ধৃতি শেষ (ا.هـ)।

২৪তম:— হাদীস:

النظر في المصحف من الشفاء

মুসহাফের দিকে তাকানো আরোগ্যের অন্তর্ভুক্ত।

জাল হাদীস।

২৫তম:— হাদীস:

لو يعلم الناس ما في الحلبة لا شتروها بوزنها ذهباً

মানুষ যদি জানত মেথিতে কী রয়েছে, তবে তারা তা ওজনে সোনার বিনিময়ে কিনে নিত।

জাল হাদীস।

২৬তম:— হাদীস:

بئست البقلة الجرجير من أكل منها ليلاً بات ونفسه تنازعه

ويضرب عرق الجذام في أنفه, كلوها نهاراً وكفوا عنها ليلاً

নিকৃষ্ট শাক হলো জারজীর (রকেট/সরিষাজাতীয় শাক); যে তা রাতে খেল, সে এমন অবস্থায় রাত কাটাবে যে তার প্রাণ তার সঙ্গে টানাটানি করবে এবং তার নাকে কুষ্ঠের শিরা আঘাত করবে। তোমরা তা দিনে খাও এবং রাতে তা থেকে বিরত থাকো।

জাল হাদীস।

২৭তম:— হাদীস:

صوموا تصحوا

তোমরা রোযা রাখো, সুস্থ থাকবে।

এটি দুর্বল হাদীস। ইরাকী তাখরীজুল ইহইয়া-তে বলেছেন:— তাবারানী আল-আওসাত-এ এবং আবু নুআইম আত-তিব্বুন নববী-তে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে দুর্বল সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

২৮তম:— হাদীস:

سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا

তোমরা সফর করো, সুস্থ থাকবে; আর জিহাদ করো, অভাবমুক্ত হবে।

এটি দুর্বল হাদীস; দুর্বলতার কারণ ইবনু লাহীআ, আর এর সনদে দাররাজও রয়েছে, যে মুনকার বর্ণনার অধিকারী। এর অনুরূপ আরেকটি হাদীস:

سافروا تصحوا وتغنموا

তোমরা সফর করো, সুস্থ থাকবে ও গনীমত পাবে।

এটি মুনকার হাদীস।

২৯তম:— হাদীস:

استشفوا بما حمد الله به نفسه قبل أن يحمده خلقه وبما

مدح الله به نفسه: الحمد لله و قل هو الله أحد

فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله

তোমরা আরোগ্য অন্বেষণ করো সেই বাক্য দিয়ে, যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রশংসা করার আগেই নিজের প্রশংসা করেছেন, এবং যা দ্বারা আল্লাহ নিজের প্রশংসা করেছেন:— «আলহামদু লিল্লাহ» ও «কুল হুয়াল্লাহু আহাদ»। সুতরাং কুরআন যাকে আরোগ্য দেয় না, আল্লাহ যেন তাকে আরোগ্য না দেন।

আর এটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীস।

৩০তম:— হাদীস:

أكل الشمر أمان من القولنج

মৌরি খাওয়া কোলিক (পেটের মোচড়ানো ব্যথা) থেকে নিরাপত্তা।

আর এটি জাল হাদীস; এর ত্রুটি ইবরাহীম ইবনু আবী ইয়াহইয়া, অর্থাৎ আল-আসলামী, আর সে মিথ্যুক।

৩১তম:— হাদীস:

غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع

গোসলখানা থেকে বের হওয়ার পর ঠান্ডা পানি দিয়ে দুই পা ধোয়া মাথাব্যথা থেকে নিরাপত্তা।

আর এটি জাল হাদীস।

৩২তম:— হাদীস:

إياكم والحبوس في الشمس فإنها تبلي الثوب وتنتن الريح وتظهر الداء الدفين

রোদে বসে থাকা থেকে বেঁচে থাকো; কেননা তা কাপড় জীর্ণ করে, গায়ের গন্ধ দুর্গন্ধময় করে এবং লুকানো রোগ প্রকাশ করে দেয়।

আর এটিও জাল হাদীস।

৩৩তম:— হাদীস:

ما من أحدٍ إلا وفي رأسه عرق من الجذام فإذا هاج سلط الله عليه الزكام فلا تداووا له

এমন কেউ নেই যার মাথায় কুষ্ঠের একটি শিরা নেই; সেটি যখন উত্তেজিত হয়, তখন আল্লাহ তার উপর সর্দি চাপিয়ে দেন; সুতরাং তোমরা তার চিকিৎসা করো না।

আর এটি জাল হাদীস; এর ত্রুটি মুহাম্মদ ইবনু ইউনুস, তিনিই আল-কুদাইমী, আর সে হাদীস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত। এটির উপর জাল হওয়ার হুকুম দিয়েছেন যাহাবী, ইবনুল জাওযী ও আলবানী — আল্লাহ সকলের উপর ব্যাপক রহমত করুন।

৩৪তম:— হাদীস:

تنكبوا الغبار فإنه منه تكون السمنة

ধুলাবালি এড়িয়ে চলো; কেননা তা থেকেই স্থূলতা হয়।

আর এটি এমন হাদীস যার কোনো ভিত্তি নেই, অর্থাৎ এর এমন কোনো সনদ জানা যায় না যা পর্যালোচনা করা সম্ভব।

৩৫তম:— হাদীস:

ثلاث لا يعاد صاحبهن: الرمد وصاحب الضرس وصاحب الدملة

তিন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া হয় না:— চোখ ওঠা রোগী, দাঁতব্যথার রোগী এবং ফোড়ার রোগী।

আর এটি জাল হাদীস; এর ত্রুটি মাসলামা ইবনু আলী আল-খুশানী, কেননা সে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সূত্রে জাল বর্ণনা বর্ণনা করে।

৩৬তম:— হাদীস:

ثلاث يفرح بهن البدن ويربو عليها: الطيب, والثوب اللين,

وشرب العسل

> তিনটি জিনিস দ্বারা শরীর প্রফুল্ল হয় ও পুষ্ট হয়:— সুগন্ধি, নরম কাপড় এবং মধু পান।

আর এটি জাল হাদীস; এটি জাল করার জন্য অভিযুক্ত মুহাম্মদ ইবনু ইউনুস আল-কুতাইরী।

৩৭তম:— হাদীস:

سؤر المؤمن شفاء

> মুমিনের উচ্ছিষ্ট (পানীয়ের অবশিষ্ট) আরোগ্য।

আর এটি মূলত হাদীসই নয়, অর্থাৎ এর কোনো ভিত্তি নেই।

৩৮তম:— হাদীস:

عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداووا به فإنه

مصحة من الباسور

> তোমরা এই বরকতময় গাছটিকে — যায়তুনের তেলকে — আঁকড়ে ধরো এবং তা দিয়ে চিকিৎসা করো; কেননা তা অর্শ থেকে সুস্থতাদায়ক।

আর এটি জাল হাদীস।

৩৯তম:— হাদীস:

إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى

তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রী বা দাসীর সঙ্গে সহবাস করে, সে যেন তার লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়; কেননা তা অন্ধত্ব সৃষ্টি করে।

আর এটি জাল হাদীস। এর অনুরূপ হাদীস:

إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس

তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে, সে যেন লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়, কেননা তা অন্ধত্ব সৃষ্টি করে; আর যেন বেশি কথা না বলে, কেননা তা বোবা হওয়া সৃষ্টি করে।

এটিও জাল।

৪০তম:— হাদীস:

ما للنفساء عندي شفاء مثل الرطب ولا للمريض مثل العسل

আমার কাছে নিফাসগ্রস্তা নারীর জন্য তাজা খেজুরের মতো আরোগ্য নেই, আর রোগীর জন্য মধুর মতো নেই।

আর এটি জাল হাদীস; এর জন্য অভিযুক্ত আলী ইবনু উরওয়া, কেননা সে মিথ্যুক, হাদীস জাল করে।

৪১তম:— হাদীস:

ما استشفى بغير القرآن فلا شفاه الله

যে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে আরোগ্য অন্বেষণ করল, আল্লাহ যেন তাকে আরোগ্য না দেন।

আর এটি জাল হাদীস।

৪২তম:— হাদীস:

ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً أو تعلقت تميمة أو قلت

الشعر من قبل نفسي

আমি যদি তিরইয়াক (বিষনাশক ওষুধ) পান করি, কিংবা তাবীজ ঝুলাই, কিংবা নিজের পক্ষ থেকে কবিতা বলি — তবে আমি যা-ই করি তার পরোয়া করি না।

আর এটি দুর্বল হাদীস।

৪৩তম:— হাদীস:

إن الله عزوجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داءٍ دواءً فتداووا

ولا تتداووا بحرام

নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা রোগ ও ওষুধ উভয়ই নাযিল করেছেন এবং প্রত্যেক রোগের জন্য ওষুধ রেখেছেন; সুতরাং তোমরা চিকিৎসা করো, কিন্তু হারাম দিয়ে চিকিৎসা করো না।

আর এটি দুর্বল হাদীস, তবে এর অর্থ শুদ্ধ।

৪৪তম:— হাদীস:

لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه

তোমরা গোপনে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; কেননা গীলা (দুধপান করানো অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে মিলন) অশ্বারোহীকে ধরে ফেলে এবং তাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়।

আর এটি দুর্বল হাদীস।

৪৫তম:— হাদীস:

ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك...الخ

আমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানে আছেন; পবিত্র হোক আপনার নাম... (হাদীসের বাকি অংশ)

আর এটি সনদের দিক থেকে দুর্বল হাদীস।

৪৬তম:— হাদীস:

العيافة والطيرة والطرق من الجبت

পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ণয় (ইয়াফা), অশুভ লক্ষণ গ্রহণ (তিয়ারা) এবং রেখা টেনে ভাগ্যগণনা (তারক) — এগুলো জিব্‌ত-এর অন্তর্ভুক্ত।

আর এটি এমন হাদীস যার সনদ দুর্বল।

৪৭তম:— হাদীস:

اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت...الخ

হে আল্লাহ, আপনি ছাড়া কেউ কল্যাণ আনতে পারে না... (হাদীসের বাকি অংশ)

আর এটি দুর্বল হাদীস।

৪৮তম:— হাদীস:

كان يستعط بدهن الجلجان إذا وجع رأسه, يعني دهن السمسم

তাঁর মাথা ব্যথা করলে তিনি জুলজুলান তেল নাকে দিতেন, অর্থাৎ তিলের তেল।

আর এই হাদীসটি শুদ্ধ নয়।

৪৯তম:— হাদীস:

إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً فليطعمه

তোমাদের কারও রোগী যদি কোনো কিছু খেতে চায়, তবে সে যেন তাকে তা খাওয়ায়।

আর এটি দুর্বল হাদীস। এর অনুরূপ হাদীস:

اتشتهي كعكاً , فقال نعم, فطلبوه له

"তুমি কি কেক খেতে চাও?" সে বলল: হ্যাঁ। তখন তারা তার জন্য তা খুঁজল।

এটিও দুর্বল হাদীস।

৫০তম:— হাসা (গমের নরম ঝোল-খাবার) খাওয়ার আদেশসংক্রান্ত হাদীস, যাতে রয়েছে:

إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسر وعن فؤاد السقيم

নিশ্চয়ই তা দুঃখিত ব্যক্তির হৃদয়কে শক্ত করে এবং রুগ্‌ণ ব্যক্তির হৃদয় থেকে (কষ্ট) দূর করে।

আর এটি দুর্বল হাদীস।

৫১তম:— হাদীস:

العجوة والصخرة من الجنة

আজওয়া খেজুর ও (বাইতুল মাকদিসের) পাথর জান্নাত থেকে এসেছে।

আর এটি দুর্বল হাদীস।

৫২তম:— হাদীস:

قم فصل فإن في الصلاة شفاء

ওঠো, সালাত আদায় করো; কেননা সালাতে আরোগ্য রয়েছে।

আর এটি দুর্বল হাদীস।

৫৩তম:— হাদীস:

لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا والسنا شفاء من الموت

মৃত্যু থেকে আরোগ্য দেওয়ার মতো কিছু যদি থাকত, তবে তা হতো সানা (সেন্না); আর সানা মৃত্যু থেকে আরোগ্য।

আর এটিও দুর্বল হাদীস।

৫৪তম:— হাদীস:

نعت رسول الله من ذات الجنب ورأساً وقسطاً وزيتاً يلد به

রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁজরের ব্যথার (যাতুল জান্‌ব) জন্য ওয়ারস, কুস্ত ও যায়তুনের তেলের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন, যা মুখের একপাশ দিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়।

আর এটি দুর্বল।

৫৫তম:— হাদীস:

من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج

যে সুরমা লাগায় সে যেন বেজোড় সংখ্যায় লাগায়; যে তা করল সে ভালো করল, আর যে করল না তার উপর কোনো দোষ নেই।

আর এটি দুর্বল হাদীস।

৫৬তম:— হাদীস:

بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر عرق نَعَّار ومن شر حر النار

মহান আল্লাহর নামে; আমি আশ্রয় চাই মহিমাময় আল্লাহর কাছে উচ্ছ্বসিত রক্তক্ষরণকারী শিরার অনিষ্ট থেকে এবং আগুনের উত্তাপের অনিষ্ট থেকে।

আর এটি দুর্বল হাদীস।

৫৭তম:— হাদীস:

خير الدواء القرآن

সর্বোত্তম ওষুধ কুরআন।

আর এটি গঠনের দিক থেকে দুর্বল, কিন্তু অর্থের দিক থেকে শুদ্ধ।

চিকিৎসা-অধ্যায়ে জাল ও দুর্বল বর্ণনাগুলোর কিছু অংশ এই। এটি সবটুকু গণনা করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং কোনো জিনিসের কিছু অংশ উল্লেখ করে সেটির প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে সব ধরনের রোগ থেকে এবং প্রকাশ্য ও গোপন সব ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

চিকিৎসা-অধ্যায়ের জাল ও দুর্বল বর্ণনা: নমুনা

হুকুম	বর্ণনা (লেখকের তালিকা থেকে)
জাল	আসরের পর ঘুমালে বিবেক ছিনিয়ে নেওয়ার কথা
জাল	শনি ও বুধবারে শিঙা লাগানো নিষেধ; জুমা ও মঙ্গলবারে শিঙা-সংক্রান্ত কথা
জাল	সবুজ বা সুন্দরী নারীর দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে
জাল	নখ কাটার ক্রমে চোখ ওঠা না হওয়ার কথা
জাল	মুসহাফের দিকে তাকানো আরোগ্যের অন্তর্ভুক্ত
জাল	যে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে আরোগ্য খুঁজল, আল্লাহ যেন তাকে আরোগ্য না দেন
দুর্বল	তোমরা রোযা রাখো, সুস্থ থাকবে
দুর্বল	তোমরা সফর করো, সুস্থ থাকবে
দুর্বল, তবে অর্থ শুদ্ধ	রোগ ও ওষুধ নাযিল; হারাম দিয়ে চিকিৎসা নয়
গঠনে দুর্বল, অর্থে শুদ্ধ	সর্বোত্তম ওষুধ কুরআন

লেখক জানিয়েছেন, এটি সবটুকু গণনা নয়; কিছু অংশের ইঙ্গিত মাত্র

আর এই প্রশ্নের উত্তর শেষ করার মাধ্যমে «আল-ইফাদাতুশ শারইয়্যাহ ফী বাদিল মাসাইলিত তিব্বিয়্যাহ» (চিকিৎসাসংক্রান্ত কিছু মাসআলায় শরঈ দিকনির্দেশনা)-এর প্রশ্নসমূহের প্রথম অংশ সমাপ্ত হলো। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ। আর আল্লাহ সালাত বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর এবং তাঁদের উপর প্রচুর সালাম বর্ষণ করুন। আর আমাদের শেষ কথা হলো — সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক; আর মহান ও সুউচ্চ আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।

প্রশ্ন ৩০

হজের সময় হাজীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাসংক্রান্ত বিধানগুলো কী কী — যেগুলোর সঙ্গে হজের আনুষ্ঠানিকতা আদায় করা বা রোগের কারণে তা ছুটে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে? দলিল ও মূলনীতিসহ তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর: আমি বলি:— এটি একটি বিস্তৃত প্রশ্ন এবং এর জন্য বড় ধরনের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। তবে আমরা আপনার জন্য তা কয়েকটি মাসআলায় সংক্ষেপ করছি:—

মাসআলা এক:— জেনে রাখুন — আল্লাহ আপনাকে তাঁর আনুগত্যের পথ দেখান — হাজী যদি রোগী হয় এবং ভয় করে যে এই রোগ তার হজের আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ করা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কারণ হবে, তবে এ অবস্থায় তার

জন্য শর্তারোপ করা (ইশতিরাত) জায়েয। এটি আল্লাহ তাআলার সেই প্রশস্ততার অন্তর্ভুক্ত যার কোনো সীমা নেই, এবং তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর বিরাট নিয়ামত ও বিশাল অনুগ্রহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক — প্রথমে ও শেষে, প্রকাশ্যে ও গোপনে।

সুতরাং হাজীর উপর যদি কোনো রোগ এসে পড়ে, তবে তার জন্য শর্তারোপ করা জায়েয — অর্থাৎ সে বলবে: "আমার ইহরাম খোলার স্থান সেখানেই, যেখানে আপনি আমাকে আটকে দেবেন।" এই শর্তারোপের ফল হলো: রোগ যদি তার ও তার আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ করার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে সে বিনা ফিদইয়ায় মুক্তভাবেই ইহরাম খুলে ফেলতে পারবে। এর দলিল হলো সহীহ গ্রন্থে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস; তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইরের কন্যা দুবাআর কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন:

((لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟))

সম্ভবত তুমি হজের ইচ্ছা করেছ?

তিনি বললেন:— আল্লাহর কসম, আমি নিজেকে অসুস্থ ছাড়া পাচ্ছি না। তখন তিনি তাকে বললেন:

حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني

তুমি হজ করো এবং শর্তারোপ করো; বলো: হে আল্লাহ, আমার ইহরাম খোলার স্থান সেখানেই যেখানে আপনি আমাকে আটকে দেবেন।

আর তিনি ছিলেন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদের স্ত্রী। মুসলিম তাঁর সহীহ-তে, আহমদ এবং সুনানের চার গ্রন্থকার ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুবাইরের কন্যা দুবাআ বলেছিলেন:— হে আল্লাহর রাসূল, আমি একজন ভারী শরীরের নারী, আর আমি হজের ইচ্ছা করছি; আপনি আমাকে কী আদেশ করেন, আমি কি ইহরাম বাঁধব? তিনি বললেন:

أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني

তুমি ইহরাম বাঁধো এবং শর্তারোপ করো যে, আমার ইহরাম খোলার স্থান সেখানেই যেখানে আপনি আমাকে আটকে দেবেন।

বর্ণনাকারী বলেন:— অতঃপর তিনি (হজ) পেয়ে গেলেন। আর নাসাঈর এক বর্ণনায় রয়েছে:

فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ

> কেননা তুমি যে শর্ত করেছ, তা তোমার রবের কাছে তোমার জন্য বহাল।

আর জানা কথা যে, মূলনীতিতে প্রতিষ্ঠিত: উম্মতের কোনো একজনের ক্ষেত্রে যে হুকুম প্রমাণিত হয়, তা অনুসরণ হিসেবে গোটা উম্মতের ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয় — যদি না তার বিশেষত্বের দলিল থাকে। সুতরাং এই হুকুমটি কেবল দুবাআর সঙ্গেই বিশেষায়িত নয়, কেননা মূল বিধান হলো বিশেষায়িত না হওয়া। তবে আমরা যে বলছি অন্যরাও তাঁর সঙ্গে এই হুকুমে প্রবেশ করবে, তবু সেই অবস্থাটির প্রতি লক্ষ রাখা অপরিহার্য, যে অবস্থায় হুকুমটি বলা হয়েছিল — আর তা হলো এমন রোগ, যার বাধা হয়ে দাঁড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণেই যে বাধার আশঙ্কা করে না, তার ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা যাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে হজ করেছেন তাঁদের কারও সম্পর্কেই এটি প্রমাণিত নয় যে, তিনি তাঁকে শর্তারোপের আদেশ দিয়েছেন। এটি যদি করণীয় হতো, তবে তিনি তাঁদেরকে তার আদেশ দিতেন, কিংবা সেদিকে পথ দেখাতেন ও তাতে উৎসাহিত করতেন। যেহেতু তা হয়নি, তাই বোঝা গেল যে এটি সেই ব্যক্তির সঙ্গেই খাস, যে বাধার আশঙ্কা করে। আবুল আব্বাস ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, যে রোগী আশঙ্কা করে যে রোগ তাকে তার আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ করা থেকে বাধা দেবে, তার শর্তারোপের অধিকার রয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

রোগাক্রান্ত হাজীর শর্তারোপ

১ **অবস্থা**
রোগের কারণে হজ পূর্ণ করতে বাধার আশঙ্কা

২ **শর্তারোপ**
আমার ইহরাম খোলার স্থান সেখানেই, যেখানে আপনি আমাকে আটকে দেবেন

৩ **বাধা এলে**
বিনা ফিদইয়ায় ইহরাম খুলে ফেলা

যে বাধার আশঙ্কা করে না, তার জন্য শর্তারোপ সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়

মাসআলা দুই:— আলিমগণ রহিমাহুমুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যদি এমন রোগে আক্রান্ত হয় যে অবস্থায় সে হজ করতে সক্ষম নয়, অথচ সে তার সম্পদ দিয়ে হজ করতে সক্ষম, তবে সে তার সম্পদ থেকে এমন কাউকে নিযুক্ত করবে যে তার পক্ষ থেকে হজ ও উমরা করবে। এটিও প্রশস্ততারই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

> আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, তোমাদের জন্য কঠিন চান না। (সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)

সুতরাং যে রোগী নিজে হজ করতে অক্ষম, তার পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি হজ করবে; শরঈ দলিলসমূহ এর প্রমাণ বহন করে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো জন্মগত ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তিরা — যেমন অত্যন্ত ক্ষীণকায় ব্যক্তি, যে বাহনের উপর স্থির থাকতে পারে না; ফকীহগণ যাকে (আন-নিদ্‌উ) বলে অভিহিত করেন; এবং যে দীর্ঘ সময় ধরে অচেতন অবস্থায় আছে মস্তিষ্কের কিছু কোষ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে, আর চিকিৎসকগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে সে আর জ্ঞান ফিরে পাবে না; এবং সেই এইডস-রোগী, যাকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা থেকে বিরত রাখতে অবরুদ্ধ করা হয়েছে এবং যার রোগ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা তাকে হজের সামর্থ্য থেকে অক্ষম করে দিয়েছে; এবং সেই ক্যান্সার-রোগী, যে এমন কোমায় চলে গেছে যার পরে সাধারণত মৃত্যুই ঘটে — এবং এ ধরনের রোগসমূহ। সুতরাং তাদের প্রতি প্রশস্ততার দিক থেকেই তাদের জন্য বিধান দেওয়া হয়েছে যে, তারা এমন কাউকে নিযুক্ত করবে যে তাদের পক্ষ থেকে হজ করবে।

যাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হজ করবে

- [ ] শর্ত: নিজে অক্ষম, অথচ সম্পদ দিয়ে হজে সক্ষম
- [ ] অতি ক্ষীণকায়, যে বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারে না
- [ ] দীর্ঘ অচেতন, চিকিৎসকগণের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ফেরার আশা নেই
- [ ] এইডস-রোগী, যার রোগ হজের সামর্থ্য থেকে অক্ষম করেছে
- [ ] ক্যান্সার-রোগী, যে এমন কোমায় গেছে যার পরে সাধারণত মৃত্যুই ঘটে

লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী

আবু রাযীন আল-উকাইলী থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ; তিনি হজ, উমরা কিংবা সফর — কোনোটিরই সামর্থ্য রাখেন না। তখন তিনি বললেন:

((حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ))

> তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ করো এবং উমরা করো। — তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ

আর ফাদল ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সওয়ারিতে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা অত্যন্ত বৃদ্ধা; আমি যদি তাঁকে বহন করি তবে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, আর যদি তাঁকে বেঁধে রাখি তবে আমি আশঙ্কা করি যে তাঁকে মেরে ফেলব। তখন তিনি — সালাত ও সালাম তাঁর উপর — বললেন:

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟

তুমি কি মনে করো, তোমার মায়ের উপর যদি ঋণ থাকত, তবে তুমি কি তা পরিশোধ করতে?

সে বলল:— হ্যাঁ। তিনি বললেন:

فحج عن أمك

তবে তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ করো। — নাসাঈ বর্ণনা করেছেন

আর ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ফাদল ইবনু আব্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সওয়ারিতে ছিলেন। তখন খাসআম গোত্রের এক নারী তাঁর কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতে এলো। ফাদল তার দিকে তাকাতে লাগল, আর সেও তার দিকে তাকাতে লাগল; তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাদলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। নারীটি বলল: হে আল্লাহর রাসূল, হজের ব্যাপারে তাঁর বান্দাদের উপর আল্লাহর যে ফরয রয়েছে, তা আমি আমার পিতাকে এমন বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছি যে তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না; আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করব? তিনি বললেন:

نعم

হ্যাঁ।

আর তা ছিল বিদায় হজের সময়। — মুত্তাফাকুন আলাইহি

এক নজরে

- ★ জিন-ব্যবহারের তিন প্রকার: শয়তানী হারাম, সুলাইমানী মুজিযা, রহমানী আদিষ্ট সীমায়
- ★ যে যোগাযোগে শরঈ ক্ষতি নেই, তা নিষেধের দলিল নেই — লেখকের ইজতিহাদ
- ★ বিশেষজ্ঞ রাকীকে জিন ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা জায়েয নয়
- ★ রোগীকে মিথ্যা বলার মূল বিধান হারাম; চার শর্তে ততটুকু জায়েয, যতটুকু নিরুপায়
- ★ তামার বালা: ইবনু বাযের মত বর্জন করা
- ★ চিকিৎসা-অধ্যায়ের বহু বর্ণনা জাল বা দুর্বল; সহীহ ও অর্থ-শুদ্ধ কথায় যথেষ্টতা
- ★ বাধার আশঙ্কাকারী রোগীর জন্য হজে শর্তারোপ জায়েয; অক্ষম ও সম্পদশালী প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে

যাচাই করুন

1. রোগীকে স্বাস্থ্য নিয়ে মিথ্যা বলার মূল বিধান কী?

ক. জায়েয

খ. সবসময় ওয়াজিব

গ. মূল বিধান হারাম; শর্তসাপেক্ষে ততটুকু জায়েয, যতটুকু নিরুপায়

2. তামার বালা সম্পর্কে ইবনু বাযের নিজের মত কী?

ক. বর্জন করা ও ব্যবহার না করা

খ. ব্যবহার করা উত্তম

গ. ওয়াজিব

3. রহমানী জিন-ব্যবহার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. হারাম

খ. মাকরূহ

গ. আদিষ্ট বিষয়ের সীমায়; কখনো ওয়াজিব, কখনো মুস্তাহাব

4. রুকইয়াহ-বিশেষজ্ঞকে জিন ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. জায়েয

খ. জায়েয নয়; মূল বিধান নিরাপত্তা ও ভালো ধারণা

গ. ওয়াজিব

5. আসরের পর ঘুমালে বিবেক ছিনিয়ে নেওয়ার হাদীসটির হুকুম কী?

ক. সহীহ

খ. হাসান

গ. জাল

6. হজে শর্তারোপ কার সঙ্গে খাস বলা হয়েছে?

ক. প্রত্যেক হাজীর

খ. যে রোগের কারণে বাধার আশঙ্কা করে

গ. কেবল দুবাআর

উত্তর: ১-গ, ২-ক, ৩-গ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-খ

আর জানা কথা যে, প্রতিনিধি নিয়োগ জায়েয হওয়ার কারণ (ইল্লাত) হলো নিজে হজ করতে অক্ষম হওয়া; আর এই অক্ষমতার কতগুলো কারণ রয়েছে, যার একটি হলো রোগ — যা নিয়ে আমরা কথা বলছি। সুতরাং যে রোগী নিজে হজ করতে অক্ষম, সে সুস্পষ্ট কিয়াসের (কিয়াসে জালী) মাধ্যমে এই দলিলগুলোর অর্থের ভেতরে প্রবেশ করবে; কেননা প্রতিষ্ঠিত যে, শরীয়ত দুটি সদৃশ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং দুটি ভিন্ন বিষয়কে একত্র করে না। এখানে মূল (আসল) হলো অক্ষম বৃদ্ধ, শাখা (ফার) হলো অক্ষম রোগী, আর সংযোজক কারণ হলো উভয় ক্ষেত্রেই অক্ষমতা; আর হুকুম:— বৃদ্ধের সঙ্গে কারণে ঐক্যের ভিত্তিতে রোগীর জন্যও প্রতিনিধি নিয়োগ জায়েয। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

রোগীর তাওয়াফ-সাঈ ও হজের অবশিষ্ট মাসআলা এবং সুন্নাহয় বর্ণিত স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাসমূহ

তৃতীয় মাসআলা:— ফকীহগণ — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, তাওয়াফ ও সাঈর ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো মানুষ হেঁটে, অর্থাৎ নিজের দুই পায়ে ভর করে তা সম্পন্ন করবে। কারণ নবী ﷺ নিজের পায়ে হেঁটে তাওয়াফ ও সাঈ করেছেন এবং বলেছেন:

خذوا عني مناسككم

> "আমার কাছ থেকে তোমাদের হজের বিধি-পদ্ধতি গ্রহণ করো।"

এর ভিত্তিতে বলা যায়, হাজী কিংবা উমরাকারীর জন্য বাহনে চড়ে তাওয়াফ বা সাঈ করা সমীচীন নয়, প্রয়োজন ছাড়া। আর প্রয়োজনের রূপ অনেক। এসব রূপের একটি হলো, মানুষটি পক্ষাঘাত (শল্প/প্যারালাইসিস) কিংবা মাথা ঘোরা (দাওয়ার/ভার্টিগো) অথবা এমন অন্য কোনো রোগে অসুস্থ, যা তাকে হেঁটে তাওয়াফ ও সাঈ করা থেকে বাধা দেয়। তার মধ্যে যদি এটি বাস্তবে প্রমাণিত হয়, তবে সে বাহনে চড়ে তাওয়াফ করবে এবং এ অবস্থায় তার উপর কোনো দোষ নেই। কেননা উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলেন যে তিনি অসুস্থতায় ভুগছেন। তখন তিনি ﷺ বললেন:

طوفي من وراء الناس وأنتي راكبة

> "তুমি লোকজনের পেছন দিক থেকে বাহনে আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করো।"

তিনি বলেন:— তখন আমি তাওয়াফ করলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বাইতুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং পাঠ করছিলেন:

والطور وكتابٍ مسطور

> "শপথ তূর পর্বতের, এবং লিখিত কিতাবের।" (সূরা আত-তূর: ১-২)

(মুত্তাফাকুন আলাইহি) আর নাসাঈর এক শব্দরূপে এসেছে, তিনি মক্কায় এলেন অসুস্থ অবস্থায়, তাই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি ﷺ বললেন:

طوفي وراء المصلين وأنت راكبة...الحديث

"তুমি সালাত আদায়কারীদের পেছন দিক থেকে বাহনে আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করো... (হাদীসের বাকি অংশ)।"

এতে দলিল রয়েছে যে, বাহনে চড়ে তাওয়াফ করা কেবল ওজরের কারণেই হয় — যেমন রোগ, বার্ধক্য ও এ ধরনের অবস্থা। আর ওজর ছাড়া হলে তার জন্য উত্তম হলো হেঁটেই তাওয়াফ ও সাঈ করা। আর যেহেতু এ যুগে হারামের ভেতরে চতুষ্পদ বাহন ঢোকানো নিষিদ্ধ, তাই আরোহণ হবে এ কাজের জন্য পরিচিত লোকদের পিঠে (অর্থাৎ যারা বহন করার কাজ করে থাকে) — সুতরাং রোগীর জন্য তা জায়েয, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার উপর প্রশস্ততা হিসেবে। আর হাদীসটি যদিও উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে এসেছে, তবু শরঈ বিধান যখন উম্মতের কোনো একজনের ব্যাপারে প্রমাণিত হয়, তখন তা অনুবর্তিতার সূত্রে গোটা উম্মতের ব্যাপারেই প্রমাণিত হয় — যদি না বিশেষত্বের দলিল থাকে। আর কারণ শরীয়ত দুটি সদৃশ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং দুটি ভিন্ন বিষয়কে একত্র করে না। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

চতুর্থ মাসআলা:— ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলোর ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো সেগুলোতে লিপ্ত না হওয়া। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে, ইচ্ছাকৃতভাবে ও স্বেচ্ছায় এগুলোর কোনোটিতে লিপ্ত হলো, তার উপর সেগুলোর ফলাফল বর্তায় — গুনাহ ও ফিদইয়া। কিন্তু মানুষ যদি মাথায় থাকা উকুন বা এ ধরনের এমন কিছুর কারণে কষ্ট পায় যা মাথার জন্য কষ্টদায়ক, তবে এ অবস্থায় তার জন্য মাথা মুণ্ডন করা জায়েয; তবে তার উপর কেবল সেটির ফিদইয়া দিতে হবে। অর্থাৎ কোনো গুনাহ নেই, কোনো শাস্তিও নেই — কেবল ফিদইয়াটুকুই। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির জন্য শিথিলতা, যার মাথায় কষ্ট রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيامٍ أو
ج
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা যার মাথায় কষ্ট রয়েছে, তবে (তার উপর) ফিদইয়া — রোযা, সদকা কিংবা কুরবানীর মাধ্যমে।" (সূরা আল-বাকারা: ১৯৬)

আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফালের হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন:— আমি কাব ইবনে আমরার কাছে বসলাম এবং তাঁকে ফিদইয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন:— এটি বিশেষভাবে আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, আর তা তোমাদের জন্য সাধারণ। আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বহন করে নেওয়া হয়েছিল, আর উকুন আমার মুখমণ্ডলের উপর ঝরে পড়ছিল। তখন তিনি ﷺ বললেন:

ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟

"আমি ভাবিনি যে ব্যথা তোমাকে এতটা কাবু করেছে যতটা আমি দেখছি — অথবা: আমি ভাবিনি যে কষ্ট তোমার থেকে এতটা নিয়ে নিয়েছে যতটা আমি দেখছি। তুমি কি একটি বকরি জোগাড় করতে পারবে?"

আমি বললাম:— না। তিনি বললেন:

فصم ثلاثة أيامٍ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

"তবে তিন দিন রোযা রাখো, অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাওয়াও — প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা করে।"

আর এক বর্ণনায় এসেছে:

أمره رسول الله أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين أو يهدي شاة أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.))

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি ছয়জন মিসকীনের মধ্যে এক ফারাক (পরিমাপবিশেষ) খাদ্য বণ্টন করেন, অথবা একটি বকরি হাদী হিসেবে দেন, অথবা তিন দিন রোযা রাখেন।"

সুতরাং আয়াত ও হাদীস — উভয়টি এ কথার দলিল যে, ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করা জায়েয নয়, যদি না সেখানে মুণ্ডন করার কোনো অপরিহার্য প্রয়োজন থাকে — রোগের কারণে, কিংবা মাথায় কীটপতঙ্গ বা মাথাব্যথা ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট কষ্টের কারণে। আর উসূলশাস্ত্রে সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, ধর্তব্য হলো শব্দের ব্যাপকতা, নাযিল হওয়ার কারণের বিশেষত্ব নয় — যেমন কাব এখানে বলেছেন: (نزلت في خاصته وهي لكم عامة) "এটি বিশেষভাবে তাঁর ব্যাপারে নাযিল

হয়েছে, আর তা তোমাদের জন্য সাধারণ।" এর উপর কিয়াস করা হবে সে ক্ষেত্রেও, যখন মাশাআরে (হজের স্থানসমূহে) প্রচণ্ড শীত পড়ে এবং মানুষ আশঙ্কা করে যে মাথা খোলা রাখলে তার ক্ষতি হবে — তখন তার জন্য মাথা ঢেকে রাখা জায়েয, তবে তার উপর ফিদইয়া থাকবে; কারণ এটিও কষ্টের একটি প্রকার। আর এ সবই আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর রহমত এবং তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর শিথিলতা। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর — প্রথমে ও শেষে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পঞ্চম মাসআলা:— অজ্ঞান ব্যক্তির (আরাফায়) অবস্থান করা প্রসঙ্গে আহলুল ইলম — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — কয়েকটি মতে মতভেদ করেছেন:—

ইমাম শাফিঈ, হাম্বলীগণ, ইবনুল মুনযির, ইসহাক ও আবু সাওর গিয়েছেন এ মতে যে, তা শুদ্ধ হবে না। আর মালিকীগণ, হানাফীগণ এবং কিছু মুহাক্কিক গিয়েছেন এর শুদ্ধতার দিকে — এবং ইনশাআল্লাহ এটিই সঠিক মত। কারণ আরাফায় অবস্থানের জন্য আলাদা কোনো নিয়ত শর্ত নয়; সুতরাং অজ্ঞান ব্যক্তির অবস্থানকে বাতিল করার কোনো ভিত্তি নেই। আর কারণ এটি বাতিল হওয়ার কোনো দলিল নেই, অথচ শরঈ বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সহীহ ও স্পষ্ট দলিলের মুখাপেক্ষী। যেহেতু শুদ্ধতা ঠেকানোর মতো কোনো দলিল নেই, তাই তার অবস্থান শুদ্ধ বলাটাই মূলনীতির সঙ্গে এবং বান্দাদের উপর আল্লাহর সহজীকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; কেননা তিনি আমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন নয়; শিথিলতা চান, ভার চাপানো নয়। সুতরাং এ মাসআলায় প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো অজ্ঞান ব্যক্তির অবস্থান শুদ্ধ হওয়া। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অজ্ঞান ব্যক্তির আরাফায় অবস্থান

শুদ্ধ হবে না	শুদ্ধ হবে
ইমাম শাফিঈ, হাম্বলীগণ, ইবনুল মুনযির, ইসহাক ও আবু সাওর	মালিকীগণ, হানাফীগণ ও কিছু মুহাক্কিক
—	লেখকের মত: ইনশাআল্লাহ এটিই সঠিক; আলাদা নিয়ত শর্ত নয়, বাতিলের দলিল নেই

আহলুল ইলমের মতভেদ; লেখকের তারজীহ

ষষ্ঠ মাসআলা:— আহলুল ইলম — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, দুর্বল ও রোগীদের জন্য জায়েয যে তারা ফজর উদয় হওয়ার আগেই জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে চলে যাবে — এটি তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে; কারণ এরা সকালবেলা মানুষের ভিড় ঠেলাঠেলি করতে পারে না। বিশেষত এই যুগে, যেখানে বলিষ্ঠ পুরুষরাই মানুষের ভিড় ঠেলতে দুর্বল হয়ে পড়ে — তাহলে নারী, দুর্বল, রোগী ও শিশুদের কথা তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং রোগীর জন্য ফজরের আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয। আর এটি এই শরীয়তের সহজতা ও উদারতারই ফল — আল্লাহ একে আরও সম্মান ও উচ্চতা দান করুন, এবং আমরা মহান ও সুউচ্চ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি এই শরীয়তের উপরই আমাদের জীবন শেষ করেন। এর দলিল হলো তাঁর এ বাণীর ব্যাপকতা:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, তোমাদের জন্য কঠিন চান না।" (সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)

আর এই বিধানে আমি কোনো মতভেদকারীর কথা জানি না। ইবনে কুদামা আল-মুগনীতে বলেছেন:— "এতে আমরা কোনো মতভেদকারীর কথা জানি না।"

ইমাম বুখারী — আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন — তাঁর সহীহতে বলেছেন:— অধ্যায়: যে ব্যক্তি নিজের পরিবারের দুর্বলদের রাতেই আগে পাঠিয়ে দেয়, ফলে তারা মুযদালিফায় অবস্থান করে ও দুআ করে, আর চাঁদ ডুবে গেলে সে অগ্রসর হয়। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন লাইস, ইউসুফ থেকে, ইবনে শিহাব থেকে; সালিম বলেন: ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর পরিবারের দুর্বলদের আগে পাঠিয়ে দিতেন, ফলে তারা রাতেই মুযদালিফায় মাশআরুল হারামের কাছে অবস্থান করত, যতক্ষণ মনে চাইত ততক্ষণ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর যিকির করত, তারপর ইমাম অবস্থান করার আগে এবং তাঁর রওনা হওয়ার আগেই ফিরে আসত। তাদের কেউ ফজরের সালাতের জন্য পৌঁছে যেত, আর কেউ পৌঁছত তার পরে। তারা পৌঁছে গেলে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করত। আর ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন:— রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য এ ছাড় দিয়েছেন।

আর বুখারী আরও বলেছেন:— আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সুলাইমান ইবনে হারব, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ, আইয়ূব থেকে, ইকরিমা থেকে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে; তিনি বলেন:

بعثني رسول الله من جمعٍ بليل

> "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জাম' (মুযদালিফা) থেকে রাতেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

আর তিনি আরও বলেছেন:— আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আলী, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান; তিনি বলেন:— আমাকে সংবাদ দিয়েছেন উবাইদুল্লাহ ইবনে আবী ইয়াযীদ যে, তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছেন:— নবী ﷺ মুযদালিফার রাতে তাঁর পরিবারের দুর্বলদের মধ্যে যাদের আগে পাঠিয়েছিলেন, আমি তাদেরই একজন।

আর তিনি আরও বলেছেন:— আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ, ইয়াহইয়া থেকে, ইবনে জুরাইজ থেকে; তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আসমার আযাদকৃত গোলাম উবাইদুল্লাহ, আসমা থেকে যে, তিনি জাম'-এর রাতে মুযদালিফার কাছে অবতরণ করলেন, তারপর দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ সালাত পড়লেন, তারপর বললেন:— হে বৎস, চাঁদ কি ডুবে গেছে? আমি বললাম:— না। তিনি আরও কিছুক্ষণ সালাত পড়লেন, তারপর বললেন: — চাঁদ কি ডুবে গেছে? আমি বললাম:— হ্যাঁ। তিনি বললেন:— তবে রওনা হও। তখন আমরা রওনা হলাম এবং চলতে থাকলাম, শেষে তিনি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন, তারপর ফিরে এসে নিজের অবস্থানস্থলে ফজরের সালাত আদায় করলেন। আমি বললাম:— ওহে, আমার তো মনে হচ্ছে আমরা অন্ধকার থাকতেই (আগেভাগে) কাজটা সেরে ফেলেছি! তিনি বললেন:— হে বৎস,

إن رسول الله أذن للظعن

> "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ হাওদাজে আরোহী নারীদের এর অনুমতি দিয়েছেন।"

আর তিনি আরও বলেছেন:— আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে কাসীর, আমাদের কাছে সংবাদ দিয়েছেন সুফিয়ান, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুর রহমান — তিনি ইবনুল কাসিম — কাসিম থেকে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে; তিনি বলেন:

استأذنت سودة رسول الله ليلة جمع وكانت ثبطة, أي ثقيلة, فأذن لها

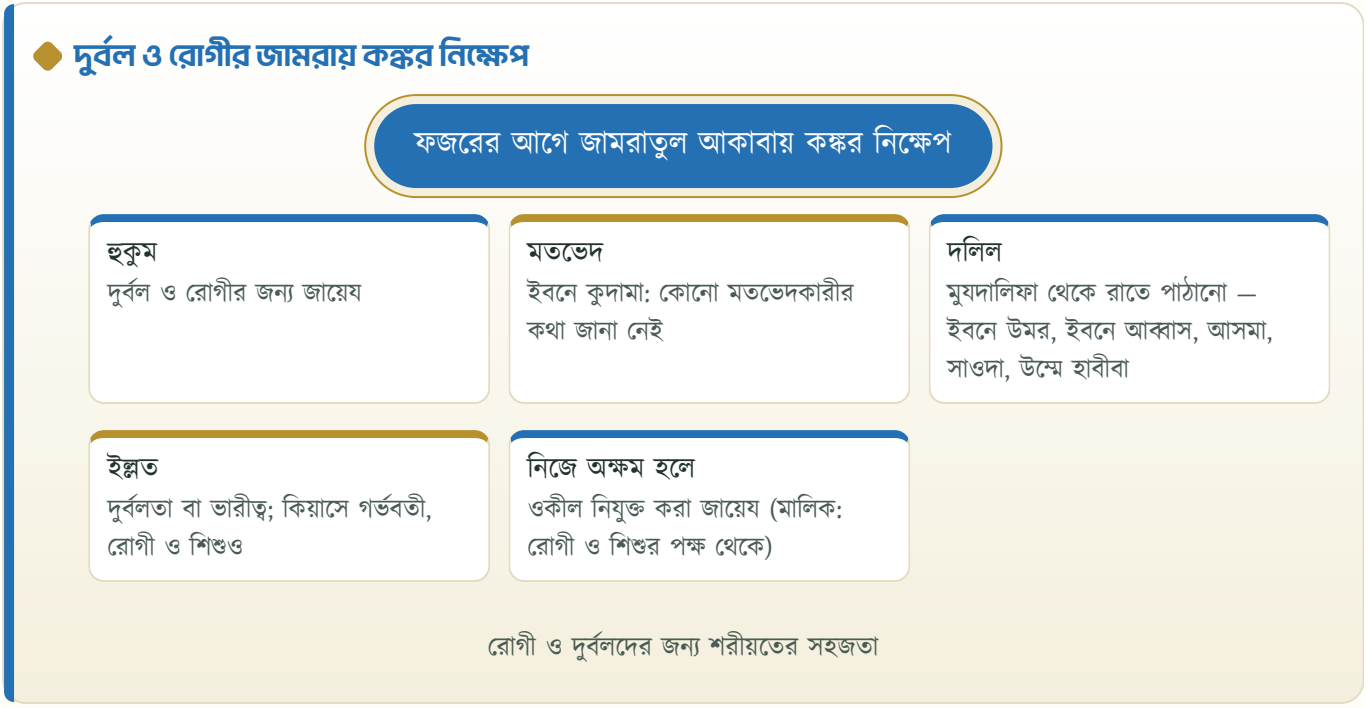
"সাওদা জাম'-এর রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন — তিনি ছিলেন 'সাবিতাহ', অর্থাৎ ভারী দেহের; তাই তিনি ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন।"

আর তিনি আরও বলেছেন:— আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু নুআইম, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আফলাহ ইবনে হুমাইদ, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে; তিনি বলেন:— আমরা মুযদালিফায় অবতরণ করলাম, তখন সাওদা নবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন যেন মানুষের ভিড়-ঠেলাঠেলির আগেই রওনা হতে পারেন; তিনি ছিলেন ধীরগতির নারী। তাই তিনি ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন, আর তিনি মানুষের ভিড়-ঠেলাঠেলির আগেই রওনা হলেন। আর আমরা থেকে গেলাম, শেষে সকাল হলো, তারপর আমরা তাঁর ﷺ রওনা হওয়ার সঙ্গেই রওনা হলাম। সাওদা যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন, আমিও যদি সেভাবে অনুমতি চাইতাম — তা আমার কাছে যেকোনো আনন্দের বস্তুর চেয়েও বেশি প্রিয় হতো। আর মুসলিম তাঁর সহীহতে উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন:

أن النبي بعث بها من جمع بليل

"নবী ﷺ তাঁকে জাম' থেকে রাতেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

সুতরাং এই সহীহ ও সুস্পষ্ট নসগুলো এ কথার সুফল দেয় যে, জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য দুর্বল ও রোগীদের জাম' থেকে রাতেই, ফজরের আগে, আগে পাঠিয়ে দেওয়া জায়েয। আর কায়িদাসমূহে সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, কষ্ট সহজতা টেনে আনে; আরও সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, বিষয় সংকীর্ণ হলে তা প্রশস্ত হয়ে যায়; আরও সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, দায়িত্ব সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত; আরও সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, বিধান তার কারণের (ইল্লত) সঙ্গে আবর্তিত হয় — কারণ থাকলে বিধান থাকে, না থাকলে থাকে না। এখানে তাদের আগে পাঠানোর ইল্লত হলো দুর্বলতা কিংবা ভারীত্ব; সুতরাং এর উপর কিয়াস করা হবে এমন প্রত্যেককে, যার মধ্যে এই ইল্লত বাস্তবে বিদ্যমান — যেমন গর্ভবতী নারী, রোগী, ছোট শিশু ও এ ধরনের অন্যরা। আর এটি আল্লাহ তাআলার রহমত এবং তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর শিথিলতার ফল। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।



রোগী ও দুর্বলদের জন্য শরীয়তের সহজতা

সপ্তম মাসআলা:— ফকীহগণ — আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন — সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যে রোগী নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে সক্ষম নয়, তার জন্য জায়েয যে সে এমন কাউকে ওকীল নিযুক্ত করবে যে তার পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে; বহু আহলুল ইলম এ কথাই বলেছেন। আর নিঃসন্দেহে এ মাসআলায় এটিই সত্য, কারণ কায়িদাসমূহে সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, ওয়াজিবসমূহ সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং হাজী যদি নিজে কঙ্কর নিক্ষেপে সক্ষম না হয়, তবে সে অন্যের মাধ্যমে নিক্ষেপ করাবে; আর সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, মূল বিষয়টি অসম্ভব হয়ে পড়লে বিকল্পের দিকে যাওয়া হয়। মুয়াত্তায় রয়েছে, ইয়াহইয়া বলেন:— মালিককে জিজ্ঞেস করা হলো, রোগী ও শিশুর পক্ষ থেকে কি কঙ্কর নিক্ষেপ করা যাবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আর জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان, فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

> "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ করলাম, আর আমাদের সঙ্গে ছিল নারী ও শিশুরা। তাই আমরা শিশুদের পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ করেছি এবং তাদের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছি।"

("হাদীসটি হাসান সহীহ") আর এটি জানা কথা যে, শিশুদের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা কেবল তাদের নিজে নিক্ষেপ করতে অক্ষমতার কারণেই ছিল; সুতরাং এর উপর কিয়াস করা হবে সেই ব্যক্তিকে, যে নিজে নিক্ষেপ করতে অক্ষম — কারণ শরীয়তে সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, শরীয়ত সদৃশ বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য করে না এবং ভিন্ন বিষয়গুলোকে একত্র করে না। আর আল্লাহ তাআলার এ বাণীর ব্যাপকতার কারণেও:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ

> "সুতরাং তোমরা যতটা সাধ্য আল্লাহকে ভয় করো।" (সূরা আত-তাগাবুন: ১৬)

এবং তাঁর ﷺ এ বাণীর কারণে:

إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم

> "আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ের আদেশ দিই, তখন তা থেকে যতটা পারো ততটা সম্পাদন করো।"

আর কারণ, যে রোগী নিজে হজ করতে অক্ষম, তার জন্য যদি এমন কাউকে ওকীল নিযুক্ত করা জায়েয হয় যে তার পক্ষ থেকে হজ করবে — তাহলে হজের কোনো কোনো একক কাজে ওকীল নিযুক্ত করা জায়েয হওয়া তো আরও অগ্রাধিকারযোগ্য। আর উসূলশাস্ত্রে সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, কিয়াসে আওলাবী (অগ্রাধিকারভিত্তিক কিয়াস) দলিলযোগ্য। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

অষ্টম মাসআলা:— শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম — আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন — কে হজসংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল; প্রশ্নটির পাঠ এই:— হজের সময় (الشرنقة) নামে পরিচিত ইনজেকশন ব্যবহারের বিধান কী? এতে কি হাজীর উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হবে, যেহেতু এর কারণে তার শরীর থেকে রক্ত বের হয়?

তিনি উত্তরে বললেন: (মুহরিমের জন্য উক্ত ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা নেওয়া জায়েয, আর তা ব্যবহারের কারণে রক্ত বের হওয়ায় তার উপর কিছুই ওয়াজিব হয় না। কারণ বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন:

أن النبي احتجم وهو محرم

> "নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা (হিজামা) লাগিয়েছেন।"

আর বুখারী তাঁর সহীহর "মুহরিমের জন্য হিজামা" অধ্যায়ে ইবনে বুহাইনা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

احتجم النبي وهو محرم بلحي جمل اسم موضع في وسط رأسه

"নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় 'লাহয়ে জামাল' — একটি স্থানের নাম — এ তাঁর মাথার মাঝখানে হিজামা লাগিয়েছেন।"

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন:— এ হাদীস দিয়ে দলিল নেওয়া হয়েছে যে, ফাসদ (শিরা কেটে রক্তমোক্ষণ), ক্ষত ও ফোড়া চিরে দেওয়া, শিরা কাটা, দাঁত তোলা এবং এ ধরনের অন্যান্য চিকিৎসা-পদ্ধতি জায়েয — যদি তাতে মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ কাজ, অর্থাৎ সুগন্ধি ব্যবহার ও চুল কাটা, সংঘটিত না হয়; আর এর কোনোটিতেই তার উপর ফিদইয়া নেই। — উদ্ধৃতি শেষ।

আর ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ কিতাবুল উম্ম-এর "মুহরিম যা করতে পারে" অধ্যায়ে বলেছেন: আমাদের কাছে সংবাদ দিয়েছেন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আমর ইবনে দীনার থেকে, আতা ও তাউস থেকে — তাঁদের একজন কিংবা উভয়ে — ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে:

أن النبي احتجم وهو محرم

"নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় হিজামা লাগিয়েছেন।"

তারপর শাফিঈ বলেছেন:— মুহরিম প্রয়োজনে কিংবা প্রয়োজন ছাড়াও হিজামা লাগাতে পারে, এতে কোনো দোষ নেই; তবে সে চুল কামাবে না। একইভাবে সে শিরা খুলতে পারে, ক্ষত চিরতে পারে এবং চিকিৎসার জন্য অঙ্গ কেটে ফেলতে পারে; এর কোনোটিতেই তার উপর কিছু নেই। তবে যে অঙ্গে চুল/লোম আছে সেটি কাটার সময় যদি সে সতর্কতাবশত ফিদইয়া দেয়, তা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়; কিন্তু তা তার উপর ওয়াজিব নয়, কারণ সে চুল কাটেনি, বরং সেই অঙ্গটি কেটেছে যা কাটার অধিকার তার আছে। আর মুহরিম খতনা করাতে পারে এবং তাতে ওষুধ লাগাতে পারে, এতে কিছুই নেই। — উদ্ধৃতি শেষ।

আর সারকথা হলো, হজে শিরনিকাহ ব্যবহার করা জায়েয এবং এতে ফিদইয়া বর্তায় না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।) — উদ্ধৃতি শেষ; এটি তাঁর সমাসীন মর্যাদাবান শাইখের বক্তব্য, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, আর মুসলিমদের অবশিষ্ট আলিমগণের প্রতিও রহম করুন, তাঁদের ক্ষমা করুন, জান্নাতে তাঁদের অবস্থান উঁচু করুন এবং আমাদের তাঁদের দলভুক্ত করেই পুনরুত্থিত করুন।

আর এ থেকে উপকার নেওয়া যায় যে, হাজীর জন্য ইহরাম অবস্থায় ইনজেকশন (হুকনা) ব্যবহার করা বৈধ; এতে কোনো দোষ নেই এবং ফিদইয়াও নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

নবম মাসআলা:— "আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল-বুহূসিল ইলমিয়্যা ওয়াল-ইফতা" (স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া পরিষদ) ফতোয়া দিয়েছেন যে, নারীর জন্য হজের সময় ঋতুস্রাব আসার আশঙ্কায় ঋতু-প্রতিরোধক বড়ি ব্যবহার করা জায়েয; আর তা হবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পর, নারীর সুস্থতা-নিরাপত্তা রক্ষা করে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

দশম মাসআলা:— আল-লাজনাতুদ দায়িমা এ ব্যাপারেও ফতোয়া দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এমন রোগের কারণে হজ থেকে বাধাপ্রাপ্ত (মুহসার) হলো যে রোগসহ সে হজ আদায় করতে পারছে না — সে যদি ইহরামের শুরুতে শর্ত করে থাকে যে "আমার ইহরাম খোলার স্থান সেখানেই, যেখানে আপনি আমাকে আটকে দেবেন", তবে তার জন্য নিঃশর্তভাবে ইহরাম খুলে ফেলা জায়েয এবং তার উপর কিছুই নেই। আর যদি সে শর্ত না করে থাকে, তবু আহলুল ইলমের দুই বক্তব্যের মধ্যে সহীহ মত অনুযায়ী তার জন্য ইহরাম খোলা জায়েয; কিন্তু ইহরাম খোলার আগে তার উপর আবশ্যক হলো হারামে একটি হাদী (কুরবানীর পশু) যবাই করা। সে যদি তাতে অক্ষম হয়, তবে দশ দিন রোযা রাখবে — কারণ সে মুহসার গণ্য। আর সে যদি তার ইহরামকে উমরায় পরিণত করতে সক্ষম হয় — অর্থাৎ তাওয়াফ করে, সাঈ করে, চুল ছোট করে, তারপর ইহরাম খোলে — তবে তা তার উপর ওয়াজিব; এবং ভবিষ্যতে সামর্থ্য হলে হজ কাযা করা তার উপর আবশ্যক, আর সে কুরবানীতে যা যথেষ্ট হয় এমন একটি যবাইকৃত পশু হাদী হিসেবে দেবে। — উদ্ধৃতি শেষ; এটি তাঁদের বক্তব্য। আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সেই উত্তম প্রতিদান দিন, যা কোনো আলিমকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

রোগী ও হাজী: মাসআলাগুলো

বিষয়	হুকুম
তাওয়াফ-সাঈ	মূল হেঁটে; রোগের ওজরে বাহনে চড়ে জায়েয, দোষ নেই
উকুন বা মাথার কষ্টে মুণ্ডন	জায়েয; ফিদইয়া — রোযা, সদকা বা কুরবানী
অজ্ঞান ব্যক্তির আরাফা	লেখকের প্রাধান্যে শুদ্ধ
দুর্বল-রোগীর ফজরের আগে কঙ্কর নিক্ষেপ	জায়েয
ইহরামে হিজামা বা ইনজেকশন	জায়েয; ফিদইয়া নেই
হজে ঋতু-প্রতিরোধক বড়ি	জায়েয, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে, নারীর নিরাপত্তা রক্ষা করে
রোগে বাধাপ্রাপ্ত, শর্ত করেছিল	নিঃশর্তভাবে ইহরাম খুলতে পারবে
রোগে বাধাপ্রাপ্ত, শর্ত করেনি	স্থায়ী কমিটি: দুই বক্তব্যের সহীহ মতে খোলা জায়েয; আগে হাদী, না পারলে দশ দিন রোযা; উমরায় পরিণত করতে পারলে তা ওয়াজিব

মাসআলা তিন থেকে দশ

প্রশ্ন ৩১

শরীয়তে যেসব ব্যবস্থা নির্ধারিত রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এবং নিরাপত্তা অর্জিত হয় — দলিলসহ সেগুলোর কিছু আমাদের বলুন।

উত্তর: আমি বলি:— এই ব্যবস্থাগুলো অত্যন্ত বেশি, আর আমি মনে করি না যে আমি এগুলোর সবই তুলে ধরতে পারব। তবে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি আপনাকে এগুলোর অধিকাংশই উল্লেখ করব।

এগুলোর অন্তর্ভুক্ত:— পাত্র ঢেকে রাখা ও মশক-পানপাত্রের মুখ বেঁধে দেওয়ার নির্দেশনা; আর তা খাদ্যকে সেই দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য, যা মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। আবু হুমাইদ আস-সাঈদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:— আমি নবী ﷺ-এর কাছে "নাকী" থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে এলাম, যা ঢাকা ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

ألا خمرته؟ ولو تعرض عليه عوداً

> "তুমি কি এটি ঢেকে দিলে না? যদিও এর উপর একটি কাঠি আড়াআড়ি রেখে দিতে!"

আবু হুমাইদ বলেন:— তিনি তো কেবল এ নির্দেশই দিতেন যে, রাতে পানপাত্রের মুখ বেঁধে দেওয়া হয় এবং রাতে দরজাগুলো বন্ধ করা হয়। ("বর্ণনা করেছেন মুসলিম")

আর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاءً ولا يفتح باباً ولا يكشف إناءً فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله فليفعل

> "তোমরা পাত্র ঢেকে রাখো, মশকের মুখ বেঁধে দাও, দরজাগুলো বন্ধ করো এবং বাতি নিভিয়ে দাও। কারণ শয়তান বাঁধা মশক খুলতে পারে না, বন্ধ দরজা খুলতে পারে না এবং ঢাকা পাত্রের ঢাকনা সরাতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি নিজের পাত্রের উপর একটি কাঠি আড়াআড়ি রেখে দেওয়া ছাড়া আর কিছু না পায় এবং আল্লাহর নাম নেয়, তবে সে যেন তা-ই করে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

আর এক বর্ণনায় এসেছে:

فأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء

> "তোমরা পাত্র উপুড় করে রাখো, অথবা পাত্র ঢেকে রাখো।"

আর এক শব্দরূপে:

((وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ))

"আর তোমরা খাদ্য ও পানীয় ঢেকে রাখো।"

আর অন্যান্য সূত্রে:

((وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله ولو أن تعرضوا عليها شيئاً

"তোমরা তোমাদের মশকের মুখ বেঁধে দাও এবং আল্লাহর নাম নাও; তোমাদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখো এবং আল্লাহর নাম নাও — যদিও তার উপর কোনো কিছু আড়াআড়ি রেখে দাও।"

আর এক বর্ণনায়:

غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناءٍ ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء

"তোমরা পাত্র ঢেকে রাখো এবং মশকের মুখ বেঁধে দাও। কারণ বছরের মধ্যে এমন একটি রাত আছে, যাতে মহামারি নেমে আসে; সেটি এমন কোনো পাত্রের পাশ দিয়ে যায় না যার উপর বাঁধন নেই, বরং সেই মহামারি থেকে কিছু তাতে নেমে পড়ে।"

আর এসব হাদীসে তাঁর ﷺ বাণী ((غطوا)) "ঢেকে রাখো" এবং ((أوكوا)) "মুখ বেঁধে দাও" ও এ ধরনের শব্দগুলো — আপনার কাছে অস্পষ্ট নয় যে, এগুলো আদেশসূচক রূপ। আর উসূলশাস্ত্রে সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, আদেশ ওয়াজিব বোঝায়, যদি না কোনো সারিফ (অর্থ-পরিবর্তনকারী দলিল) বা করীনা থাকে; আর আমি এমন কিছু জানি না যা ওয়াজিব থেকে মুস্তাহাবের দিকে অর্থ সরিয়ে নিতে বাধ্য করে। হ্যাঁ, অধিকাংশ আহলুল ইলম মুস্তাহাব হওয়ার মত পোষণ করেছেন; কিন্তু আপনি ভালোভাবেই জানেন যে, অধিকাংশের মাযহাব সারিফসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর ভিত্তিতে, ঢেকে রাখা ও মুখ বেঁধে দেওয়ার বিধানে সঠিক মত হলো এটি ওয়াজিব; আর যিনি মুস্তাহাব বলবেন, তিনি যেন সারিফটি উল্লেখ করেন। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

পাত্র ঢেকে রাখা ও মুখ বাঁধার হুকুম

অধিকাংশ আহলুল ইলম	লেখকের মত
মুস্তাহাব	সঠিক মত ওয়াজিব
—	আদেশ ওয়াজিব বোঝায়; মুস্তাহাবে সরানোর সারিফ জানা নেই
—	অধিকাংশের মাযহাব সারিফসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়

আহলুল ইলমের মতভেদ; লেখকের তারজীহ

এগুলোর অন্তর্ভুক্ত:— কয়েক শ্বাসে পান করার বিধান — অর্থাৎ এক নিঃশ্বাসে ঢকঢক করে পানি না গেলা। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

أن النبي كان يتنفس في الإناء ثلاثاً

"নবী ﷺ পাত্রে (পান করার সময়) তিনবার শ্বাস নিতেন।"

("বর্ণনা করেছেন মুসলিম") আর এক বর্ণনায়:

في الشراب ثلاثاً ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ

"পানীয়ে তিনবার (শ্বাস নিতেন) এবং বলতেন:— এটি অধিক পিপাসা-নিবারক, অধিক আরোগ্যদায়ক এবং অধিক স্বাস্থ্যকর।"

আর নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন:

لا تشربوا نفساً واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى

وثلاث, وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم فرغتم

"তোমরা উটের পান করার মতো এক নিঃশ্বাসে পান কোরো না; বরং দুই-তিন শ্বাসে পান করো। আর পান করার সময় বিসমিল্লাহ বলো এবং শেষ করলে আলহামদুলিল্লাহ বলো।"

("বর্ণনা করেছেন তিরমিযী") আর ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كان رسول الله إذا شرب تنفس على الإناء ثلاثة أنفاس, يحمد الله على كل نفسٍ ويشكره عند آخرهن

> "রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পান করতেন, তখন পাত্রের উপর তিন শ্বাসে শ্বাস নিতেন; প্রতিটি শ্বাসে আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং শেষটিতে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতেন।"

("বর্ণনা করেছেন তাবারানী আল-কাবীরে হাসান সনদে") সুতরাং পান করার এই পদ্ধতিটিই নিরঙ্কুশভাবে সর্বোত্তম পদ্ধতি। কারণ এটি অধিকতর পিপাসা-নিবারক, খাদ্যনালিতে অধিকতর সহজে প্রবাহিত হয় এবং ক্ষতি থেকে অধিকতর নিরাপদ; কেননা একবারে পানি ঠেলে দিলে তাতে ক্ষতি হতে পারে, তেমনি তা বিষম লাগারও কারণ হতে পারে।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: (এই পান-পদ্ধতিতে বহু হিকমত ও গুরুত্বপূর্ণ উপকার রয়েছে, আর নবী ﷺ সেগুলোর মূল-সংগ্রহের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এ কথা বলে ((إنه أروى وأمرأ وأبرأ)) "এটি অধিক পিপাসা-নিবারক, অধিক স্বাস্থ্যকর ও অধিক আরোগ্যদায়ক") — তারপর তিনি এর হিকমতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, উত্তপ্ত পাকস্থলীতে কয়েক দফায় পানি পৌঁছানোর ফলে দ্বিতীয় দফা সেই উত্তাপকে প্রশমিত করে, যা প্রথম দফা প্রশমিত করতে পারেনি; আর তৃতীয় দফা তা প্রশমিত করে যা দ্বিতীয় দফা পারেনি। আরও, এটি পাকস্থলীর উত্তাপের জন্য অধিক নিরাপদ এবং পাকস্থলীকে অধিক রক্ষা করে — এর তুলনায় যে ঠান্ডা পানি একবারে ও এক ঢোকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেননা সে অবস্থায় তা পিপাসাও মেটায় না; কারণ তা মুহূর্তের জন্য পিপাসার উত্তাপের মুখোমুখি হয়, তারপর তার তীব্রতা ও ধার ভাঙার আগেই তা থেকে সরে যায়; আর যদি ভাঙেও, তবে পুরোপুরি নিঃশেষ করে না — ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে তা ভাঙার বিপরীতে। আরও, একবারে পিপাসা-নিবারক পরিমাণ গ্রহণ করার তুলনায় এটি পরিণামে অধিক নিরাপদ ও অনিষ্ট থেকে অধিক নিরাপদ।) — উদ্ধৃতি শেষ; এটি তাঁর বক্তব্য, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন।

আর এতে আরেকটি হিকমত রয়েছে, তা হলো: সে যদি পাত্রের বাইরে শ্বাস ফেলে, তবে তাতে পানি দূষণ থেকে রক্ষা পায়। চিকিৎসকগণ বলেছেন:— নিঃশ্বাস নিজের সঙ্গে কিছু জীবাণু (মাইক্রোব) বহন করে, যা তার সংস্পর্শে আসা বস্তুতে লেগে যায়। সেটি যদি পানি হয় বা অন্য কিছু হয় এবং তার কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে জীবাণু সেই ব্যক্তির দিকে স্থানান্তরিত হয় যে তা পান করে। আর যদি সেখানে পানি না-ও থাকে, তবু পাত্রটি দূষণের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় থাকে। কতই না মহান এই শরীয়ত!

আর আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء

"তোমাদের কেউ যখন পান করে, সে যেন পাত্রের ভেতরে শ্বাস না ফেলে।"

আর মুসলিমের বর্ণনায়:

أن النبي نهى أن يتنفس في الإناء

"নবী ﷺ পাত্রের ভেতরে শ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।"

আবু দাউদ এর সঙ্গে যোগ করেছেন:

((أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ))

"কিংবা তাতে ফুঁ দিতে।"

আর আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি বলল:— হে আল্লাহর রাসূল, এক নিঃশ্বাসে তো আমার পিপাসা মেটে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

فأبن القدح من فيك ثم تنفس

"তবে পেয়ালাটি তোমার মুখ থেকে সরিয়ে নাও, তারপর শ্বাস নাও।"

("হাদীসটি সহীহ") আর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন:

إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود

فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد

"তোমাদের কেউ যখন পান করে, সে যেন পাত্রের ভেতরে শ্বাস না ফেলে। তারপর সে যদি আবার পান করতে চায়, তবে পাত্রটি সরিয়ে নেবে, তারপর ইচ্ছা করলে আবার পান করবে।"

("বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ ও হাকিম হাসান সনদে") সুতরাং কয়েক শ্বাসে পান করা এবং তাতে ফুঁ দেওয়া থেকে বিরত থাকা সেসব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা করা হয়।

এগুলোর অন্তর্ভুক্ত:— পানীয়ে মাছি পড়লে তা ডুবিয়ে দেওয়ার নির্দেশ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في

إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء

> "তোমাদের কারও পানীয়ে যখন মাছি পড়ে, তখন সে যেন তা (পুরোপুরি) ডুবিয়ে দেয়, তারপর ফেলে দেয়। কারণ তার এক ডানায় রোগ এবং অন্য ডানায় আরোগ্য রয়েছে।"

("বর্ণনা করেছেন বুখারী ও আবু দাউদ") আর তিনি যোগ করেছেন:

وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء

> "আর সেটি যে ডানায় রোগ রয়েছে তা দিয়েই আত্মরক্ষা করে (আগে বাড়িয়ে দেয়)।"

আর আহমাদ মুসনাদে আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে এ শব্দে বের করেছেন:

إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام

فاملقوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء

> "মাছির এক ডানায় বিষ এবং অন্যটিতে আরোগ্য। সুতরাং তা যখন খাবারে পড়ে, তখন তোমরা তা ডুবিয়ে দাও; কেননা সে বিষটিকে আগে বাড়ায় এবং আরোগ্যটিকে পিছিয়ে রাখে।"

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: (জেনে রাখো, তাঁদের (চিকিৎসকদের) মতে মাছির মধ্যে একটি বিষক্রিয়া-শক্তি রয়েছে, যার প্রমাণ হলো তার দংশনের ফলে সৃষ্ট ফোলা ও চুলকানি। তাই নবী ﷺ নির্দেশ দিলেন যে, সেই বিষক্রিয়াকে মোকাবিলা করা হবে সেই জিনিস দিয়ে, যা আল্লাহ সুবহানাহু তার অন্য ডানায় নিহিত রেখেছেন। সুতরাং তাকে

পুরোপুরি খাবারে ডুবিয়ে দেওয়া হবে, ফলে বিষাক্ত উপাদান উপকারী উপাদানের মুখোমুখি হবে এবং তার ক্ষতি দূর হয়ে যাবে। বড় বড় চিকিৎসক ও তাঁদের ইমামগণও এ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন না; বরং এটি নবুয়তের কুলুঙ্গি থেকেই নির্গত। আর এতদসত্ত্বেও জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও তাওফীকপ্রাপ্ত চিকিৎসক এই চিকিৎসার কাছে নতি স্বীকার করেন এবং যিনি তা নিয়ে এসেছেন তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি নিরঙ্কুশভাবে সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ এবং তিনি এমন ঐশী ওহী দ্বারা সমর্থিত যা মানুষের শক্তির ঊর্ধ্বে।) — উদ্ধৃতি শেষ; এটি তাঁর বক্তব্য, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন।

আমি বলি:— নস প্রমাণিত হওয়ার পর কারও কথা বা কারও অস্বীকারের কোনো ধর্তব্যতা নেই। বরং যে কথাই শারিয়ের (বিধানদাতার) কথার বিরোধী, তা তার বক্তার দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তার মুখে ছুঁড়ে মারা হয়; তার কোনো মর্যাদা নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এগুলোর অন্তর্ভুক্ত:— কুকুর যে পাত্রে মুখ দিয়েছে তা সাতবার ধোয়ার নির্দেশ, যার একবার মাটি দিয়ে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً

"তোমাদের কারও পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয়, তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে নেয়।"

(মুত্তাফাকুন আলাইহি) আর মুসলিম যোগ করেছেন:

أولاهن بالتراب

"এগুলোর প্রথমটি মাটি দিয়ে।"

আর তাঁর (মুসলিমের) কাছে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب

"কুকুর যখন পাত্রে মুখ দেয়, তখন তোমরা তা সাতবার ধুয়ে নাও এবং অষ্টমবার মাটি দিয়ে ঘষে নাও।"

আর ধোয়া ও মাটি ব্যবহারের এ নির্দেশটি সঠিক মত অনুযায়ী ওয়াজিব হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর তা এ কারণে যে, কুকুরের লালা এমন জীবাণু বহন করে যা কিছু রোগের কারণ হয়, আর তা ধুয়ে ফেলার মধ্যে সেগুলো থেকে প্রতিরোধ রয়েছে। এটি আধুনিক প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার (প্রিভেন্টিভ মেডিসিন) একটি উপায়। আর এ বিধানটি সব ধরনের কুকুরের ক্ষেত্রেই সাধারণ — অনুমোদিত (পালনযোগ্য) কুকুর হোক বা নিষিদ্ধ কুকুর হোক।

এগুলোর অন্তর্ভুক্ত:— খাদ্যের পরিমাণে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ এবং পেটপুরে খাওয়াকে অভ্যাস বানানোর নিন্দা — যদিও শরীয়ত তা নিরঙ্কুশভাবে হারাম করেনি। আর এটি সবচেয়ে বড় ধরনের প্রতিরোধ ও সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত; পবিত্র ও পরিপূর্ণ শরীয়ত এটি নিয়ে এসেছে সর্বোত্তম পন্থায় ও সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ অবস্থায়। মিকদাদ ইবনে মাদীকারিব থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন:

ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه، حسب ابن آدم أكلاتٍ يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنفسه

> "আদম-সন্তান পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করেনি। আদম-সন্তানের জন্য কয়েক গ্রাস খাবারই যথেষ্ট, যা তার মেরুদণ্ড সোজা রাখে। তবু যদি (বেশি খাওয়া) অনিবার্যই হয়, তবে এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ তার শ্বাসের জন্য।"

আর এক শব্দরূপে:

وما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبة الآدمي نفسه, فثلث للطعام وثلث للشراب، وثلث للنفس

> "কোনো মানুষ পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করেনি। মানুষের জন্য কয়েক লোকমাই যথেষ্ট, যা তার মেরুদণ্ড সোজা রাখে। তবে মানুষ যদি নিজের প্রবৃত্তির কাছে পরাভূত হয়, তবে এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য,

> এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাসের জন্য।"

("বর্ণনা করেছেন আহমাদ, তিরমিযী ও অন্যরা হাসান সহীহ সনদে") ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: (খাদ্যের স্তর তিনটি:— এক. প্রয়োজনের স্তর; দুই. পর্যাপ্ততার স্তর; তিন. বাড়তির স্তর। নবী ﷺ সংবাদ দিলেন যে, তার জন্য কয়েক লোকমাই যথেষ্ট, যা তার মেরুদণ্ড সোজা রাখে — ফলে তার শক্তি পড়ে যায় না এবং সেগুলোর সঙ্গে দুর্বলও হয় না। সে যদি তা অতিক্রম করে, তবে যেন নিজের পেটের এক-তৃতীয়াংশে খায় এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য ছেড়ে দেয়, আর তৃতীয়টি শ্বাসের জন্য। আর এটি শরীর ও অন্তরের জন্য সবচেয়ে উপকারী জিনিসগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কেননা পেট যখন খাদ্যে ভরে যায়, তখন তা পানীয়ের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে; তারপর তাতে পানীয় এলে তা শ্বাসের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, এবং সেই বোঝা বহনের কারণে তার উপর কষ্ট ও ক্লান্তি নেমে আসে — যেন সে ভারী বোঝা বহনকারী।) — উদ্ধৃতি শেষ; এটি তাঁর বক্তব্য, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন।

আর চিকিৎসকগণ উল্লেখ করেছেন যে, পাকস্থলী যদি খাদ্যে ভরে যায়, তবে পাচক রসগুলো নিজেদের কাজ করার জায়গা পায় না; এরপর মানুষ অজীর্ণতা ও হজমের কষ্ট অনুভব করে, ফলে পাকস্থলী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর কম খাওয়া সাধারণভাবে মুমিনের রীতি, যেমন বুখারী তাঁর সহীহতে নিজের সনদে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:— আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء

> "মুমিন এক পাকস্থলীতে খায়, আর কাফির খায় সাত পাকস্থলীতে।"

সুতরাং খাদ্য ও পানীয় কমানো স্বাস্থ্য রক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলোর কার্যক্রম সুশৃঙ্খল হওয়ার কারণ — যাতে প্রতিটি যন্ত্র নিজের কাজ কাঙ্ক্ষিতভাবে সম্পাদন করতে পারে। আর প্রাচীনকালে বলা হয়েছে:— "পেটপুরে খাওয়া রোগের মূল, আর পথ্য (খাদ্যনিয়ন্ত্রণ) ওষুধের শিরোমণি।" আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এগুলোর অন্তর্ভুক্ত:— ঘুমাতে যাওয়ার ইচ্ছা করলে আগুন নিভিয়ে দেওয়ার নির্দেশ। আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم

> "নিশ্চয়ই এই আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন ঘুমাও, তখন তা নিভিয়ে দাও।"

(মুত্তাফাকুন আলাইহি) আর এটি একটি আদেশ এবং তা ওয়াজিব বোঝায়; একে তার মূল অর্থ থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো কোনো সারিফ নেই। আর ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন:

لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون

> "তোমরা যখন ঘুমাও, তখন তোমাদের ঘরে আগুন রেখে যেয়ো না।"

(মুত্তাফাকুন আলাইহি) আর এটি একটি নিষেধ, আর নিষেধের মূল অর্থ হলো হারাম হওয়া; একে তার মূল অর্থ থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো কোনো সারিফ নেই। আর পূর্বে জাবিরের হাদীসে গিয়েছে যে, তিনি ﷺ বলেছেন ((أطفئوا السراج... الحديث)) "তোমরা বাতি নিভিয়ে দাও... (হাদীসের বাকি অংশ)" — আর এটিও ওয়াজিবসূচক আদেশ। আর এক শব্দরূপে:

وأطفئوا مصابيحكم

> "আর তোমরা তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দাও।"

আর এক শব্দরূপে:

فأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت

الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ((

> "তোমরা ঘুমানোর সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। কেননা ছোট্ট ফাসিক প্রাণীটি (ইঁদুর) কখনো কখনো সলতে টেনে নেয় এবং ঘরের বাসিন্দাদের পুড়িয়ে ফেলে।"

আর এতে রয়েছে প্রাণকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা এবং এমন সব কিছু থেকে রক্ষা করা যাতে তার বিনাশ রয়েছে। আর এটি জানা কথা যে, প্রাণ রক্ষা করা শরীয়তের বড় বড় উদ্দেশ্যের (মাকাসিদ) অন্তর্ভুক্ত। আমরা বহু ঘটনা জানি, যেগুলোতে এসব চুলা-উনুনের কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে যেগুলোর পাশে তাদের বাসিন্দারা ঘুমিয়েছিল; ফলে সেগুলো তাদের পুড়িয়ে দিয়েছে এবং প্রচুর ধোঁয়ার কারণে তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। আর নিঃসন্দেহে এর অন্তর্ভুক্ত হবে এ যুগে (الدفايات) "হিটার" নামে পরিচিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলোও। আর এই লেখা লেখার কিছু আগেই আমার বাড়িতে কিছু তারের উত্তাপের কারণে বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট ঘটেছিল, যার ফলে তার গলে গিয়ে পুড়ে যায় এবং কিছু আসবাব পুড়িয়ে দেয়। তবে আল্লাহ কেবল তাঁর অনুগ্রহ, দানশীলতা, রহমত ও উদারতায় আমাদের এ থেকে রক্ষা করেছেন — সুতরাং এই মহান নিয়ামতের জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর এটি জানা কথা যে, এই আগুন সেই উপাদান খেয়ে ফেলে যা দিয়ে আমরা শ্বাস নিই। ফলে হয়তো আপনি যে জায়গায় ঘুমিয়ে আছেন সেখান থেকে এই উপাদান নিঃশেষ হয়ে যাবে, অথচ আপনি তা টেরও পাবেন না; ফলে আপনার শ্বাসরোধ হবে, যা আপনার মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের ও আপনাকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এগুলোর অন্তর্ভুক্ত:— দরজা বন্ধ করা এবং শিশুদের ধরে রাখার নির্দেশ। পূর্বোল্লিখিত জাবিরের হাদীসে রয়েছে:

و أغلقوا الأبواب فإن الشيطان لا يفتح باباً

"আর তোমরা দরজাগুলো বন্ধ করো; কেননা শয়তান দরজা খুলতে পারে না।"

আর সেটিতেই অন্য এক সূত্রে রয়েছে:

إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذٍ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً

"রাতের অন্ধকার নেমে এলে কিংবা তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলে তোমাদের শিশুদের ধরে রাখো, কেননা তখন শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তারপর রাতের কিছু অংশ চলে গেলে তাদের ছেড়ে দাও, আর দরজাগুলো বন্ধ করো এবং আল্লাহর নাম নাও; কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না।"

আর এক বর্ণনায়:

لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء

"সূর্য ডুবে গেলে তোমরা তোমাদের গবাদিপশু ও শিশুদের ছেড়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না রাতের প্রথম প্রহরের গাঢ় অন্ধকার কেটে যায়।"

আর বুখারীর এক বর্ণনায়:

))إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشياطين تنتشر حينئذٍ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق الباب واذكر اسم الله

"রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে কিংবা রাতের অন্ধকার নেমে এলে তোমাদের শিশুদের ধরে রাখো, কেননা তখন শয়তানগুলো ছড়িয়ে পড়ে। তারপর রাতের কিছু অংশ চলে গেলে তাদের ছেড়ে দাও, আর দরজা বন্ধ করো এবং আল্লাহর নাম নাও।"

আর এক বর্ণনায়:

أجيفوا الأبواب واكفئوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشاراً وخطفة

"তোমরা এশার সময় দরজাগুলো ভিড়িয়ে দাও এবং তোমাদের শিশুদের ধরে রাখো; কেননা জিনদের রয়েছে ছড়িয়ে পড়া ও ছোঁ মেরে নেওয়া।"

সুতরাং এই নববী আদবগুলোর মধ্যে রয়েছে শয়তানদের অনিষ্ট ও তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে প্রতিরোধ; কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না, এবং হাদীসে নির্দেশিত সময়ে অভিভাবকরা শিশুদের ধরে রাখলে সে শিশুদের ক্ষতি করতে পারে না। আর এটি স্বাস্থ্যগত প্রতিরোধেরই অন্তর্ভুক্ত, যা কেবল সে-ই লাভ করে যে নবুয়তের পথনির্দেশে পরিচালিত হয় — সেই পথনির্দেশের অধিকারীর উপর সর্বোত্তম সালাত ও সর্বাধিক পবিত্র সালাম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

স্বাস্থ্যরক্ষার নববী ব্যবস্থা (১)

সুন্নাহর স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা

- **কয়েক শ্বাসে পান**
  পাত্রের ভেতরে শ্বাস ফেলা ও ফুঁ দেওয়া নিষেধ
- **পানীয়ে মাছি পড়লে**
  পুরোপুরি ডুবিয়ে তারপর ফেলে দেওয়া
- **কুকুর পাত্রে মুখ দিলে**
  সাতবার ধোয়া, একবার মাটি দিয়ে; সঠিক মতে ওয়াজিব
- **খাদ্যে মধ্যপন্থা**
  কয়েক লোকমা; এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, পানীয় ও শ্বাসের জন্য
- **ঘুমের আগে আগুন ও বাতি নেভানো**
  আদেশ ও নিষেধ; লেখকের মতে সারিফ নেই
- **দরজা বন্ধ ও শিশুদের ধরে রাখা**
  রাতের অন্ধকার নামলে হাদীসের নির্দেশ

প্রশ্ন ৩১

এগুলোর অন্তর্ভুক্ত:— পায়খানার কিছু আদবের উপর প্রতিষ্ঠিত হিকমতসমূহ। কেননা পায়খানার আদবের মধ্যে এমন কিছু আছে, যার হিকমতের অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য রক্ষা করা — যেমন পেশাব করার সময় ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা কিংবা তা দিয়ে ইস্তিনজা করার নিষেধাজ্ঞা। সহীহাইনে আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه هو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء

"তোমাদের কেউ যেন পেশাবরত অবস্থায় নিজের লজ্জাস্থান ডান হাত দিয়ে না ধরে, আর ডান হাত দিয়ে যেন পায়খানার পর পরিষ্কার না করে, আর যেন পাত্রের ভেতরে শ্বাস না ফেলে।"

আর সহীহ মুসলিমে সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন:

نهانا يعني النبي أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم

> "তিনি — অর্থাৎ নবী ﷺ — আমাদের নিষেধ করেছেন যে, আমরা যেন পায়খানা বা পেশাবের সময় কিবলামুখী না হই, কিংবা ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা না করি, কিংবা গোবর বা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা না করি।"

আর এর হিকমতের অন্তর্ভুক্ত হলো, যে হাত সরাসরি পায়খানার কাজ সম্পাদন করে সেটি ময়লা ও কষ্টদায়ক জিনিসের কিছু বহন করে নিতে পারে; আর ডান হাত সেটিই, যা দিয়ে বান্দা খাওয়া-দাওয়া করে, সালাম দেয়, নেয় ও দেয়। সুতরাং ময়লা দূর করতে সেটি ব্যবহার করলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আরও তীব্র হয়। তাই শরীয়ত তা নিষেধ করেছে; আর সত্য হলো এই নিষেধাজ্ঞাটি হারাম বোঝায়, কারণ এর জন্য কোনো সারিফ আসেনি।

আর এগুলোর অন্তর্ভুক্ত: মানুষের সমাগমস্থল নোংরা করার নিষেধাজ্ঞা, যেমন সহীহতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اتقوا اللَّعَّانَيْنِ

> "তোমরা দুই অভিশাপ-আনয়নকারী কাজ থেকে বেঁচে থাকো।"

তাঁরা বললেন:— হে আল্লাহর রাসূল, সেই দুই অভিশাপ-আনয়নকারী কাজ কী? তিনি বললেন:

الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم

> "যে ব্যক্তি মানুষের চলার পথে কিংবা তাদের ছায়ায় মলত্যাগ করে।"

আর এক বর্ণনায় — যাতে কিছু সমালোচনা রয়েছে —:

اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل

> "তোমরা তিনটি অভিশাপ-আনয়নকারী কাজ থেকে বেঁচে থাকো:— পানির উৎসস্থলে, চলাচলের পথে এবং ছায়ায় মলত্যাগ করা।"

আর এর হিকমতের অন্তর্ভুক্ত হলো, এমন জায়গায় প্রয়োজন সারা — যেসব জায়গা থেকে সাধারণ মুসলিমরা উপকৃত হয় — তাদের কষ্ট দেওয়ার শামিল। আর এই কষ্ট হয় তাদের গায়ে নাপাকি লাগার মাধ্যমে, নয়তো কষ্টদায়ক দুর্গন্ধের মাধ্যমে, কিংবা তাদের দিকে রোগ স্থানান্তরের মাধ্যমে — বিশেষত পানির উৎসস্থলের ক্ষেত্রে। কেননা চিকিৎসকদের

কাছে এটি সুবিদিত যে, বাতাস মলের কণা বহন করে, যেগুলো সাধারণত জীবাণুতে দূষিত থাকে, এবং সেগুলো উন্মুক্ত পানিতে ফেলে দেয়; যার ফলে সেই পানি পানকারী মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় পড়তে পারে। সুতরাং এটি স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার একটি উপায়, যা শরীয়ত স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মজবুতভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

আর এগুলোর অন্তর্ভুক্ত আরও:— ফিতরাতের কিছু বৈশিষ্ট্যের বিধান। কেননা এই বিধানের হিকমতের অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য রক্ষা করা — যেমন পুরুষের খতনার বিধান। কারণ আহলুল ইলম উল্লেখ করেছেন যে, পুরুষের খতনা বিধিবদ্ধ করার হিকমতের অন্তর্ভুক্ত হলো এই অগ্রচর্মটি (কুলফা) অপসারণ করা; যা অপসারিত না হলে তাতে কিছু পেশাব আটকে থাকত, আর তা সেই জায়গাটির প্রদাহ ও পচনের দিকে নিয়ে যেত, অতঃপর কিছু রোগে আক্রান্ত হওয়ার দিকে নিয়ে যেত। এ কারণেই বহু কাফির চিকিৎসক যখন খতনার মধ্যে নিহিত হিকমত ও রহস্যগুলো সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তাঁরা এর দিকে আহ্বান করতে ও এর নির্দেশ দিতে শুরু করলেন — একে স্বাস্থ্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় গণ্য করে; আর কারণ এটি অগ্রচর্মের চামড়ার নিচে জমে থাকা স্মেগমা-নিঃসরণ থেকে রক্ষা করে, যা প্রায়ই জীবাণুর চারণভূমি হয়ে ওঠে। আর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের চিকিৎসকগণ একমত হয়েছেন যে, খতনা আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার হওয়া থেকে প্রতিরোধকারী একটি কারণ। তেমনি নারীর খতনা — তা জরায়ু-ক্যান্সার হওয়া থেকে রক্ষা করে, আর তাতে রয়েছে এই স্থানটিকে পরিচ্ছন্ন ও সর্বপ্রকার দোষমুক্ত রাখার ব্যবস্থা। আর খতনার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে মূত্রনালির অসংখ্য প্রদাহ থেকে সুরক্ষা। বরং আমি কিছু চিকিৎসকের লেখায় পড়েছি যে, খতনার উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত হলো, এটি আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা-হ্রাসজনিত রোগ (এইডস) থেকে রক্ষা করে। সুতরাং আল্লাহরই প্রশংসা ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের মুসলিম বানিয়েছেন; আর আমরা মহান ও সুউচ্চ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের দ্বীন আমাদের জন্য রক্ষা করেন এবং এর উপরই আমাদের জীবন শেষ করেন।

আর এগুলোর অন্তর্ভুক্ত আরও: ইস্তিহদাদের (নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা) বিধান, যেমন সহীহাইনে আবু হুরায়রার হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ((خمس من الفطرة)) "পাঁচটি জিনিস ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত" — এবং তার মধ্যে উল্লেখ করেছেন ((الاستحداد)) "ইস্তিহদাদ"। আর সহীহতে — অর্থাৎ সহীহ মুসলিমে — আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ((عشر من الفطرة)) "দশটি জিনিস ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত" — এবং তার মধ্যে উল্লেখ করেছেন ((وحلق العانة)) "এবং নাভির নিচের লোম কামানো"। আর এতে এমন হিকমত ও রহস্য রয়েছে, যা বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। আর চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত দিক হলো: লোম বেড়ে গেলে তখন তার জায়গাটি পরিষ্কার করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং তা ময়লার সমাবেশস্থল ও উকুন ইত্যাদির মতো ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধির জায়গা হয়ে ওঠে; আর এসব লোমের নিচে ঘাম জমে ও তা বেড়ে যাওয়ার কারণে সেখান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত পচা গন্ধ বের হয়, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

আর এগুলোর অন্তর্ভুক্ত আরও: নখ কাটার বিধান, যেমন পূর্বোক্ত দুই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে দুটিতে রয়েছে ((وقص الأظفار)) "এবং নখ কাটা"। তা এ কারণে যে, নখ লম্বা হয়ে গেলে তার নিচে ময়লা-আবর্জনা জমে, যা খাবারে গিয়ে পড়ে — বিশেষত খাবার গরম হলে; আর সম্ভবত এর কিছু হাত ধোয়ার সঙ্গেও নামে না, তারপর তা মানুষের পেটে ঢুকে যায়, আর এতে সুস্পষ্ট ক্ষতি রয়েছে। আর সাম্প্রতিককালে চিকিৎসকদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, নখ লম্বা রাখা সংক্রামক রোগ ছড়ানোর একটি উপায়। এর ব্যাখ্যা হলো: হাত বহু জিনিসের সঙ্গে বারবার সরাসরি লাগে — ধুলাবালি ও নানা রকম বস্তু, এমনকি পশুপাখি ও এ ধরনের জিনিসের সঙ্গেও। আর অভ্যাস হলো, মানুষ তার কাজ শেষ করার পর এবং খাবার গ্রহণের আগে দুই হাত ধুয়ে নেয়। কিন্তু যা ঘটে তা হলো: কাজের সময় হাতে স্থানান্তরিত হওয়া এসব অণুজীবের কিছু নখের নিচে লুকিয়ে থাকে, ফলে পানি ও জীবাণুনাশক সেগুলোর নাগাল পায় না — তদুপরি এসব জীবের কিছু পরিষ্কারক দ্রব্য সহ্য করে নেওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেগুলো গরম খাবারে ঢোকানো হলে ময়লার সঙ্গে নেমে আসে, যা তার পালাক্রমে খাবারে নেমে যায়; তারপর খাদক তা খেয়ে ফেলে, ফলে

সেগুলো তার পেটে ঢুকে যায় এবং এর ফলে এমন সব রোগ ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং শরীয়ত এসব উপায় বন্ধ করে দিয়েছে এবং ইস্তিহদাদ, খতনা ও নখ কাটার নির্দেশ দিয়েছে। এটি সেসব ব্যবস্থার সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে বহু রোগ থেকে রক্ষা করে।

আর এগুলোর অন্তর্ভুক্ত আরও: মিসওয়াকের বিধান; এ ব্যাপারে দলিল অত্যন্ত বেশি। আর সাম্প্রতিককালে চিকিৎসকদের কাছে মিসওয়াকের গুরুত্ব ও তার স্বাস্থ্যগত প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে, দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার বের করার জন্য মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করায় অবহেলা করলে দাঁতের ফাঁকের সেই অবশিষ্টাংশ পচে যায় এবং ক্ষতিকর জীবাণু বংশবৃদ্ধি করে, যেগুলো দাঁত ও মাড়ি আক্রমণ করে। এর ফলে মাড়ি ক্ষতিকর প্রদাহ ও পুঁজভরা কেন্দ্রে আক্রান্ত হয়, যা দ্রুত দাঁতের গোড়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সেগুলোতে ক্ষয়রোগ ধরায়। তারপর এসব জীবাণু মুখ থেকে পাকস্থলীতে, তারপর রক্তে স্থানান্তরিত হয়, যা পরিপাকতন্ত্রের রোগ, গ্রন্থির রোগ, গাঁটের রোগ ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে। সুতরাং দাঁতের পরিচ্ছন্নতা ও সেগুলোর যত্ন নেওয়া আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে মানুষকে বিরক্তিকর রোগ থেকে বাঁচায় — যেমন চোখের রেটিনার প্রদাহ, নাকের সাইনাসের প্রদাহ, পাকস্থলীর প্রাচীরের প্রদাহ ও অন্যান্য রোগ; আর এ সবই চিকিৎসকদের কাছে স্বীকৃত। সুতরাং পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এই শরীয়তে এসব হিকমত ও রহস্য নিহিত রেখেছেন — যা আমাদের সর্বোচ্চ কণ্ঠে বলতে বাধ্য করে: এই শরীয়ত ছাড়া এই বিশ্বের কোনো সংশোধন নেই, কোনো সাফল্য নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এই ব্যবস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্ত আরও:— নাপাক বস্তু খাওয়া হারাম হওয়া; আর এটি সর্বসম্মত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

> "আর তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেন এবং তাদের উপর অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেন।" (সূরা আল-আরাফ: ১৫৭)

আর নাপাক বস্তুগুলো হলো শরীয়তের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য বস্তুসমূহ; সুতরাং সেগুলো ইন্দ্রিয়গতভাবে ও অর্থগতভাবে — উভয় দিক থেকেই — "খাবাইস"-এর অন্তর্ভুক্ত। আর সহীহাইনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন:— খাইবারের দিন যখন হলো, নবী ﷺ আবু তালহাকে নির্দেশ দিলেন, ফলে তিনি ঘোষণা দিলেন:

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের গৃহপালিত গাধার গোশত থেকে নিষেধ করছেন; কেননা তা অপবিত্র।"

আর সহীহাইনে আবু সা'লাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসেও রয়েছে, তিনি বলেন:

حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية

"রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম করেছেন।"

আর যাহির আল-আসলামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:— আমি গাধার গোশতসহ ডেকচির নিচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা দিল:

إن رسول الله ينهاكم عن لحوم الحمر

"নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের গাধার গোশত থেকে নিষেধ করছেন।"

("বর্ণনা করেছেন বুখারী") আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير...الآية

"তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী ও শূকরের গোশত... (আয়াতের বাকি অংশ)।" (সূরা আল-মায়িদা: ৩)

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون

ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أُهل

لغير الله به

"বলুন, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে আমি কোনো ভক্ষণকারীর জন্য সে যা ভক্ষণ করে তাতে হারাম কিছু পাই না — তবে যদি তা হয় মৃত প্রাণী, কিংবা প্রবাহিত রক্ত, কিংবা শূকরের গোশত — কেননা তা

> অপবিত্র — অথবা অবাধ্যতা, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।" (সূরা আল-আনআম: ১৪৫)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এই ব্যবস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্ত আরও:— সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলা এবং তাদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا عدوى, وفر من المجذوم فرارك من الأسد

> "কোনো সংক্রমণ নেই; আর কুষ্ঠরোগী থেকে পালিয়ে যাও যেভাবে তুমি সিংহ থেকে পালাও।"

("বর্ণনা করেছেন বুখারী") আর মুসলিম তাঁর সহীহতে নিজের সনদে আমর ইবনুশ শারীদের হাদীসে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:— সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদলে একজন কুষ্ঠরোগী ছিল। তখন নবী ﷺ তার কাছে বার্তা পাঠালেন:

))إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ((

> "আমরা তোমার বাইআত গ্রহণ করেছি, সুতরাং তুমি ফিরে যাও।"

আর আহমাদের মুসনাদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন:

لا تديموا النظر إلى المجذومين

> "তোমরা কুষ্ঠরোগীদের দিকে একটানা তাকিয়ে থেকো না।"

আর ইবনে মাজাহও এটি বর্ণনা করেছেন, এবং এটি তার সমস্ত সূত্র ও সমর্থক বর্ণনার সমষ্টিতে সহীহ হাদীস। আর তাঁর ﷺ থেকে একাধিক হাদীসে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন:

إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها

> "তোমরা যখন কোনো ভূখণ্ডে প্লেগের কথা শোনো, তখন সেখানে প্রবেশ কোরো না।"

আর তা একাধিক হাদীসে এসেছে। সুতরাং শরীয়ত সুস্থ ব্যক্তিকে অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করা থেকে বিরত রেখে স্বাস্থ্য রক্ষা করেছে — যদি তার অসুস্থতা সংক্রামক ধরনের হয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সুতরাং এগুলো রোগ থেকে প্রতিরোধমূলক কিছু ব্যবস্থা। আর এটি পূর্ণ গণনার উদ্দেশ্যে নয়, বরং কেবল উদাহরণ দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক — তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

স্বাস্থ্যরক্ষার নববী ব্যবস্থা (২)

সুন্নাহর স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা (অবশিষ্ট)

পায়খানার আদব ডান হাতে লজ্জাস্থান ধরা ও ইস্তিনজা নিষেধ; লেখকের মতে হারাম	**জনসমাগমস্থল নোংরা করা** পথে, ছায়ায় ও পানির উৎসে মলত্যাগ নিষেধ	**ফিতরাতের বৈশিষ্ট্য** খতনা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার, নখ কাটা
মিসওয়াক এ ব্যাপারে দলিল অত্যন্ত বেশি	**নাপাক বস্তু খাওয়া** হারাম; সর্বসম্মত	**সংক্রামক রোগীর থেকে দূরে থাকা** কুষ্ঠরোগীকে বাইআত নিয়ে ফেরানো; প্লেগের ভূখণ্ডে প্রবেশ নয়

লেখকের জানানো: এটি পূর্ণ গণনা নয়, উদাহরণ মাত্র

প্রশ্ন ৩২

যেসব হাদীস সংক্রমণের প্রভাব সাব্যস্ত করে এবং যেসব হাদীস তার প্রভাব অস্বীকার করে — এ দুইয়ের মধ্যে আমরা কীভাবে সমন্বয় করব?

উত্তর: আমি বলি:— প্রথমত, আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, দুটি সহীহ নসের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা কখনোই, কোনোভাবেই সম্ভব নয়; আর আমরা এ ব্যাপারে মুবাহালা করতেও প্রস্তুত। সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই — শরীয়তের সহীহ দলিলগুলোর মধ্যে কোনো মতপার্থক্য, কোনো বিশৃঙ্খলা বা কোনো স্ববিরোধ নেই। বরং সেগুলোর সবই — তাদের স্পষ্ট অর্থে, উহ্য অর্থে ও অনিবার্য দাবিতে — হক, সত্য ও ন্যায়। তার সামনে থেকেও বাতিল আসে না, পেছন থেকেও না; কেননা তা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আর দুই দলিলের মধ্যে বিরোধ থাকার যত দাবিই করা হোক, তা কেবল পর্যবেক্ষকের মনে জেগে ওঠা একটি বিষয়মাত্র — দলিলের সত্তায় নয়, কখনোই নয়। বরং গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও তাহকীকে আমরাই ত্রুটিকারী; ঘাটতি আমাদের মধ্যে, দলিলের মধ্যে নয়; আর দোষ আমাদের মধ্যে, দলিলের মধ্যে নয়। আল্লাহ এর মিনার উঁচু করুন এবং আমাদের ও আপনাকে এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

আর প্রশ্নে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা এই বরকতময় মূলনীতিরই একটি শাখা; আর এ বিষয়ে আমাদের একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে, যাতে আমরা সেসব দলিলের একটি বড় অংশ উল্লেখ করেছি, যেগুলোর মধ্যে গবেষণায় ত্রুটিকারী কেউ কেউ পরস্পরবিরোধিতার দাবি করে; আর আমরা আহলুল ইলম — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — এর কাছে সিদ্ধান্তকৃত কায়িদাসমূহ দিয়ে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের পন্থা স্পষ্ট করেছি। আর এ প্রশ্নের উত্তরের ব্যাখ্যা হলো, বলা হবে:—

"লা আদওয়া" ((لا عدوى)) হাদীসটি কেবল সংক্রমণের সূচনাগত (ইবতিদাঈ) প্রভাব অস্বীকার করে, আর "ফিররা মিনাল মাজযূম" ((فر من المجذوم)) হাদীসটি সংক্রমণের স্থানান্তরগত (ইনতিকালী) প্রভাব সাব্যস্ত করে। সুতরাং আমাদের কাছে সংক্রমণ দুই প্রকার:— সূচনাগত সংক্রমণ এবং স্থানান্তরগত সংক্রমণ। সূচনাগত সংক্রমণই হলো অস্বীকারের দ্বারা উদ্দিষ্ট; আর তা হলো সেই বিশ্বাস, যা জাহিলিয়াতে ছিল। কেননা তারা বিশ্বাস করত যে, সংক্রমণ নিজে নিজেই প্রভাব ফেলে, অর্থাৎ তাকদীরের পূর্ববর্তিতা ছাড়াই। তাই শরীয়ত এই বিশ্বাস অস্বীকার করে এসেছে তাঁর ﷺ এই বাণী দিয়ে ((لا عدوى)) "কোনো সংক্রমণ নেই"। কিন্তু সেখানে স্থানান্তরগত সংক্রমণও রয়েছে, যার দ্বারা আমরা বোঝাতে চাই অসুস্থ থেকে সুস্থের দিকে রোগ স্থানান্তরিত হওয়া — আল্লাহ তাআলার তাকদীরে, নিজে নিজে নয়। আর এটি দলিলসমূহ সাব্যস্ত করেছে।

এ কারণেই বুখারী ও অন্যরা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ((لا عدوى...الحديث)) "কোনো সংক্রমণ নেই... (হাদীসের বাকি অংশ)" — আর তাতে রয়েছে: এক বেদুইন বলল:— হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে সেই উটগুলোর কী হলো, যেগুলো বালুকাভূমিতে যেন হরিণের মতো (সুস্থ-সবল) থাকে, তারপর একটি পাঁচড়া-আক্রান্ত উট তাদের সঙ্গে মেশে এবং তাদের পাঁচড়া-আক্রান্ত করে ফেলে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

((فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ))

> "তাহলে প্রথমটিকে কে সংক্রমিত করল?"

আর এটি সেই বেদুইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে জাগা সংশয়ের সমাধান। কেননা সে ধারণা করেছিল যে, নবী ﷺ যখন বললেন ((لا عدوى)) তখন তিনি স্থানান্তরগত সংক্রমণ বোঝাচ্ছেন। তাই তিনি তার থেকে সংশয় দূর করলেন তাঁর এ বাণী দিয়ে ((فمن أعدى الأول)) — অর্থাৎ তিনি সেই স্থানান্তরগত সংক্রমণ বোঝাচ্ছেন না, যে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে; বরং তিনি সূচনাগত সংক্রমণ বোঝাচ্ছেন।

সুতরাং মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা — যাতে কোনোভাবেই কোনো সন্দেহ স্পর্শ করে না — যে রোগ সূচনাগতভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই, এবং অসুস্থ থেকে সুস্থের দিকে তার স্থানান্তর আল্লাহ তাআলার তাকদীর ছাড়া কখনোই হয় না। আর এই শাখা-মাসআলাটি আহলুস সুন্নাহর কাছে "আসবাব" (কার্যকারণ) সংক্রান্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বের করা হয়েছে — আল্লাহ তাঁদের মৃতদের প্রতি রহম করুন এবং জীবিতদের অবিচল রাখুন। আর তা হলো: কারণগুলো প্রভাব ফেলে, কিন্তু নিজে নিজে নয়; বরং আল্লাহ সেগুলোকে প্রভাব-সৃষ্টিকারী বানিয়েছেন বলেই। আর সুস্থ ব্যক্তির অসুস্থের সঙ্গে মেলামেশা সংক্রমণের কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু তা নিজে নিজে প্রভাব ফেলে না, বরং আল্লাহ তাআলা তা চাইলে ও নির্ধারণ করলেই প্রভাব ফেলে।

আর দেখুন, নবী ﷺ কীভাবে এই দুই প্রকারের মধ্যে সমন্বয় করেছেন তাঁর এ বাণী দিয়ে — তাঁর উপর সালাত ও সালাম:

لا عدوى, وفر من المجذوم فرارك من الأسد

> "কোনো সংক্রমণ নেই; আর কুষ্ঠরোগী থেকে পালিয়ে যাও যেভাবে তুমি সিংহ থেকে পালাও।"

("বর্ণনা করেছেন বুখারী") সুতরাং তাঁর বাণী ((لا عدوى)) — এতে রয়েছে সেই জাহিলি বিশ্বাসের অস্বীকৃতি যে সংক্রমণ নিজে নিজেই প্রভাব ফেলে; আর তাঁর বাণী ((وفر من المجذوم)) — এতে রয়েছে স্থানান্তরগত সংক্রমণের সাব্যস্তকরণ, যা নিজে সত্তাগতভাবে আল্লাহ তাআলার তাকদীর, মহান ও সুউচ্চ সত্তার ইচ্ছা এবং তাঁর হিকমতের অধীন।

আর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يوردن ممرض على مصح

> "রোগাক্রান্ত পশুর মালিক যেন কিছুতেই সুস্থ পশুর মালিকের (পালের) কাছে (পানি পান করাতে) না নিয়ে আসে।"

আর এক বর্ণনায়:

لا توردوا الممرض على المصح

> "তোমরা রোগাক্রান্ত (পশুর মালিক)-কে সুস্থ (পশুর মালিক)-এর কাছে এনো না।"

(মুত্তাফাকুন আলাইহি) আর এই তাখরীজ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে উত্তরের দিকটি স্পষ্ট হয়ে যায়, এবং দলিলগুলোর মধ্যে আর কোনো সংশয় বা বিশৃঙ্খলা অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ ও সর্বোচ্চ।

সংক্রমণ-বিষয়ক দুই হাদীসের সমন্বয়

কোনো সংক্রমণ নেই	কুষ্ঠরোগী থেকে পালাও যেভাবে সিংহ থেকে পালাও
অস্বীকৃত: সূচনাগত সংক্রমণ	সাব্যস্ত: স্থানান্তরগত সংক্রমণ
জাহিলি বিশ্বাস — সংক্রমণ নিজে নিজেই প্রভাব ফেলে	অসুস্থ থেকে সুস্থের দিকে আল্লাহর তাকদীরে রোগ স্থানান্তর
বেদুইনকে নবী: তাহলে প্রথমটিকে কে সংক্রমিত করল?	রোগাক্রান্ত পশুর মালিক সুস্থ পশুর মালিকের কাছে না আনা

দুটি সহীহ নসের মধ্যে কখনো বিরোধ নেই — লেখকের মূলনীতি

এক নজরে

- ★ বাহনে তাওয়াফ কেবল ওজরে; ওজর ছাড়া হেঁটেই উত্তম
- ★ মাথার কষ্টে ইহরামে মুণ্ডন জায়েয, ফিদইয়াসহ
- ★ দুর্বল ও রোগী ফজরের আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারবে; অক্ষম হলে ওকীল
- ★ ইহরামে হিজামা ও ইনজেকশনে ফিদইয়া নেই
- ★ কুকুর পাত্রে মুখ দিলে সাতবার ধোয়া, একবার মাটি দিয়ে
- ★ ঘুমের আগে আগুন নেভানোর আদেশ ওয়াজিব — লেখকের মত
- ★ সংক্রমণ নিজে নিজে প্রভাব ফেলে না; সবই আল্লাহর তাকদীরে

যাচাই করুন

1. রোগের কারণে হেঁটে তাওয়াফ করতে অক্ষম হাজী কী করবেন?

ক. তাওয়াফ ছেড়ে দেবেন

খ. ওজর না থাকলেও বাহনে চড়বেন

গ. বাহনে চড়ে তাওয়াফ করবেন; দোষ নেই

2. অজ্ঞান ব্যক্তির আরাফায় অবস্থান সম্পর্কে লেখকের প্রাধান্য কী?

ক. শুদ্ধ নয়

খ. শুদ্ধ

গ. বাতিল, দম ওয়াজিব

3. ইহরাম অবস্থায় হিজামা বা ইনজেকশনে কী বলা হয়েছে?

ক. ফিদইয়া ওয়াজিব

খ. হজ বাতিল

গ. ফিদইয়া নেই

4. কুকুর পাত্রে মুখ দিলে কী করতে বলা হয়েছে?

ক. একবার ধোয়া

খ. সাতবার ধোয়া, একবার মাটি দিয়ে

গ. কিছুই লাগবে না

5. কোনো সংক্রমণ নেই বাক্যে কী অস্বীকার করা হয়েছে?

ক. সব প্রকার সংক্রমণ

খ. স্থানান্তরগত সংক্রমণ

গ. সূচনাগত সংক্রমণ — নিজে নিজেই প্রভাব ফেলার জাহিলি বিশ্বাস

6. ঘুমের আগে আগুন নেভানোর আদেশ সম্পর্কে লেখকের মত কী?

ক. মুস্তাহাব

খ. ওয়াজিব; সারিফ নেই

গ. মুবাহ

উত্তর: ১–গ, ২–খ, ৩–গ, ৪–খ, ৫–গ, ৬–খ

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

অ্যালকোহলযুক্ত ওষুধ, লিঙ্গ-পরিবর্তন, চিকিৎসাসংক্রান্ত মুআমালাত, ধূমপান ও সিহর

প্রশ্ন ৩৩

অ্যালকোহল (কুহুল) সংবলিত ওষুধ ব্যবহারের হুকুম কী? দলিল ও মূলনীতিসহ তা বর্ণনা করুন।

উত্তর: আমি বলি:— প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে — আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন — যে, মুসলিমের জন্য একটি শরীয়ত রয়েছে, যা তাকে পরিচালনা করে। সুতরাং যা ইচ্ছা তা দিয়ে চিকিৎসা করার কিংবা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করার স্বাধীনতা তার নেই; বরং শরঈ সীমারেখা ও রক্ষণীয় নিয়ন্ত্রণবিধিসমূহ মেনে চলা অপরিহার্য — সেগুলো মেনে চলা ছাড়া ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো কল্যাণ নেই, কোনো সাফল্য নেই, কোনো সংশোধনও নেই। তাই যখনই এই কাজ বা এই ওষুধের মধ্যে শরঈ বিরোধিতার কিছু থাকবে, তখন মুসলিমের জন্য তা করা কিংবা তা গ্রহণ করা জায়েয নয়। উত্তরের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশের আগে এ কথাটি প্রতিষ্ঠিত করে নেওয়া অপরিহার্য।

এটি জানা হলে জেনে রাখুন, অ্যালকোহল (কুহুল) পদার্থটি নেশা-উদ্রেককারী পদার্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত; বরং তা মদের প্রাণ ও তার ভিত্তি, এবং মদের ভেতরকার নেশা সৃষ্টির কারণও সেটিই। আর যে বস্তু থেকে এই অ্যালকোহল নিষ্কাশন করা হয়েছে, তার দিকে আমরা কখনোই তাকাব না; কেননা বিধান একটাই, তার কোনো ভিন্নতা নেই। কারণ শরীয়তে অ্যালকোহল মদেরই বিধান গ্রহণ করে, যেহেতু তার সমস্ত রূপে ও বিচিত্র আকারে তা মদই — তা শস্যদানা ও ফলমূল থেকে হোক, কিংবা রাসায়নিক পদ্ধতিতে অন্য কোনো পদার্থ থেকে নিষ্কাশিত হোক; বিধান একটাই।

আর আপনি ভালোভাবেই জানেন যে, মদের হারাম হওয়া সেই বিধানগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যা দ্বীনের অপরিহার্য বিষয় হিসেবে জানা যায়। যে ব্যক্তি তার হারাম হওয়াকে অস্বীকার করে, সে কাফির-মুরতাদ; তাকে তিন দিন তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে — যদি তাওবা করে (তবে ভালো), অন্যথায় তাকে কাফির হিসেবে হত্যা করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

> নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিবেদী ও ভাগ্য-নির্ণায়ক তীর — এসব ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান তো কেবল মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে চায়। তবে কি তোমরা বিরত হবে? (সূরা আল-মায়িদা: ৯০-৯১)

আর মুতাওয়াতির সুন্নাহ থেকে বহু প্রসিদ্ধ দলিল মদের হারাম হওয়ার ব্যাপারে সাব্যস্ত হয়েছে, এবং ইসলামের অনুসারীগণ ইজমা করেছেন যে, মদ হারামসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এর ভিত্তিতে বলা যায়, ওষুধ তৈরিতে অ্যালকোহল প্রবেশ করানো হারাম, এবং এমন ওষুধ সেবন করাও হারাম যাতে এমন অ্যালকোহল রয়েছে যার সত্তা তাতে রূপান্তরিত (ইস্তিহালা) হয়ে যায়নি। এর পরিবর্তে অন্যান্য বৈধ ওষুধ গ্রহণ করা ওয়াজিব; এ ব্যাপারে মুসলিমদের কোনো বিকল্প-স্বাধীনতা নেই। যে ওষুধেই অ্যালকোহল রয়েছে, মুসলিমের জন্য তা দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয নয় — সুতরাং তা দিয়ে চিকিৎসা করাও জায়েয নয়, তা বিক্রি করাও জায়েয নয়, তা ক্রয় করাও জায়েয নয়; আর শাসকদের উপর ওয়াজিব তা ধ্বংস করে দেওয়া। বরং যে ব্যক্তি জানতে পারল যে কোনো ওষুধে এই অ্যালকোহলজাত বস্তুর কিছু রয়েছে, তার উপর ওয়াজিব তা নষ্ট করে ফেলা এবং সে বিষয়ে ইলমের অধিকারীদের কাছে লেখা, যাতে তাঁরা সে ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে লেখেন।

আর যাঁরা ওষুধ আমদানির দায়িত্বে রয়েছেন তাঁদের উপর ওয়াজিব, তাঁরা মুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবেন এবং এই অ্যালকোহলযুক্ত ওষুধের কোনো কিছুই দেশে প্রবেশ করাবেন না — তাতে অ্যালকোহলের অনুপাত কম হোক বা বেশি, কোনো পার্থক্য নেই। এ সবই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং তীব্রভাবে হারাম; কেননা দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির অনুসরণে বলা হয়: যার অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার অল্প পরিমাণও হারাম। কুরআনের যে-কোনো দলিল যা মদকে হারাম করে, তা-ই এই ওষুধের হারাম হওয়ার দলিল; এবং সুন্নাহর যে-কোনো দলিল যা মদকে হারাম করে, তা-ই এই ওষুধের হারাম হওয়ার দলিল।

তবে আপনি ভালোভাবেই জানেন যে, এই বিধানটি তখন — যখন অ্যালকোহলের অনুপাত পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, অর্থাৎ তার রং, স্বাদ ও গন্ধের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই — এমন অবস্থায় পৌঁছায়নি। কিন্তু যদি তা নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো চলে যায়, তবে তার কোনো বিধান নেই; তখন তা অস্তিত্বহীনের মতো, আর অস্তিত্বহীন বস্তুর কোনো বিধান নেই। কিন্তু যদি তাতে অ্যালকোহল পদার্থটি এখনও অবশিষ্ট থাকে, তবে তা দিয়ে চিকিৎসা করা হারাম, কারণ তা মদ; আর নিয়ন্ত্রণবিধিতে প্রতিষ্ঠিত যে, হারাম দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয নয়।

যদি আপনি বলেন:— নিরুপায় অবস্থার (দারূরাত) কারণে কি তা দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয নয়? তবে আমি বলি:— ইলমের অধিকারীগণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, চিকিৎসা নিরুপায়তার অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তা এই মূলনীতির অধীনে পড়ে না যে, "নিরুপায় অবস্থা নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে দেয়।" আরও বলা হয়:— কোনো কোনো ওষুধে অ্যালকোহল রাখা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে; নতুবা এমন বৈধ পদার্থ তো রয়েছে, যা এর কাজ এর চেয়ে ভালোভাবেই সম্পন্ন করে। তাই মূলত এর কোনো নিরুপায়তাই নেই, কারণ সহজলভ্য বৈধ বিকল্প রয়েছে যা এর প্রয়োজন মিটিয়ে দেয় — সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই।

এর সঙ্গে আরও যোগ করুন যে, অ্যালকোহলযুক্ত ওষুধ এমন কিছু রোগীকেও দেওয়া হয়, যাদের রোগ "হাজত" (প্রয়োজন) স্তরেই পৌঁছায়নি, "দারূরাত" (নিরুপায়তা) স্তরের তো প্রশ্নই ওঠে না; আর তা এ কারণে যে, কোনো কোনো চিকিৎসক — আল্লাহ তাঁদের হিদায়াত দিন — এসব ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে দেওয়ার ব্যাপারে ঢিলেঢালা প্রশস্ততা দেখান, ফলে এসব ওষুধ সবার জন্য সাধারণ হয়ে গেছে। বরং বহু চিকিৎসক — আল্লাহ তাআলা তাঁদের হিদায়াত দিন — কখনো কখনো কেবল প্রতিরোধমূলক অবস্থাতেও তা দিয়ে দেন। সুতরাং এই ঢিলেঢালা প্রশস্ততার মোকাবিলায় এ দরজা মজবুতভাবে ও শক্তভাবে বন্ধ করে দেওয়া অপরিহার্য; যারা এসব ওষুধ মুসলিমদের দেশে নিয়ে আসে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অপরিহার্য, এবং যেসব ফার্মেসি সম্পর্কে জানা গেছে যে তারা এ ধরনের ওষুধ বিক্রি করে, তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা অপরিহার্য; কেননা এগুলো রোগ, ওষুধ নয়। আর ইলমের অধিকারীদের কাছে জানা কথা যে, মদ চূড়ান্তভাবে হারাম। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক জ্ঞানী।

অ্যালকোহলযুক্ত ওষুধ

করুন	করবেন না
✓ বৈধ বিকল্প ওষুধ গ্রহণ ওয়াজিব	✗ এমন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা, তার বিক্রি ও ক্রয় — জায়েয নয়
✓ রং, স্বাদ, গন্ধসহ সব বৈশিষ্ট্য চলে গিয়ে পদার্থটি নিঃশেষ হলে তার বিধান নেই	✗ অ্যালকোহলের অনুপাত কম হোক বা বেশি — কোনো পার্থক্য নেই
	✗ "নিরুপায়তা" দিয়ে যুক্তি — চিকিৎসা নিরুপায়তার অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়

প্রশ্ন ৩৩ — অ্যালকোহল মদেরই বিধান গ্রহণ করে

প্রশ্ন ৩৪

যেসব অস্ত্রোপচারে লিঙ্গ পরিবর্তন করা হয় — পুরুষকে নারীতে এবং নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত করা হয় — সেগুলোর হুকুম কী? দলিলসহ তা বর্ণনা করুন।

উত্তর: আমি বলি:— আমি আপনাকে মহান ও সুউচ্চ আল্লাহর নামে অনুরোধ করছি, আপনি সর্বদা ও চিরদিন আপনার প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাইবেন অন্তরের বক্রতা থেকে, লজ্জা চলে যাওয়া থেকে এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে। আল্লাহর কসম, আমরা ধারণাও করিনি যে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের পড়বে — কিন্তু এ ধরনের সংবাদগুলো অনুসন্ধান করার পর আমরা দেখতে পেলাম যে এই চিন্তাগুলো মুসলিমদের দেশে ঢুকে পড়েছে, এবং মুসলিমদের দেশে ইতিমধ্যেই এ ধরনের কয়েকটি অস্ত্রোপচার বাস্তবে সম্পন্ন হয়েছে — মহান ও সুউচ্চ আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। তাই এর হুকুম অনুসন্ধান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ল। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তা খুঁজে পেতে আমাদের কোনো কষ্টই হয়নি, কারণ তা অত্যন্ত স্পষ্ট। সেটি হলো নিশ্চিত হারাম হওয়া — যাতে আপনার অন্তরে সামান্যতম সন্দেহও প্রবেশ করা জায়েয নয়। আমি মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তা হারাম; আর আমি এ কথা প্রবৃত্তির বশে বলছি না, বরং দলিলের আলোয় পথপ্রাপ্ত হয়েই বলছি। আর তা কয়েকটি দিক থেকে:—

প্রথম: আল্লাহ তাআলার বাণী:

ولآمرنهم فليغيرن خلق الله

> এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করবে। (সূরা আন-নিসা: ১১৯)

দলিল গ্রহণের দিকটি হলো, আয়াতটি অনর্থক ক্রীড়াচ্ছলে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি পরিবর্তন করার হারাম হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করেছে; আর এ ধরনের অস্ত্রোপচারে অনর্থক ক্রীড়াচ্ছলে, প্রবৃত্তির অনুসরণে এবং শয়তানি দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি পরিবর্তন করা হয়। কেননা পাপাচারী শল্যচিকিৎসক পুরুষকে নারীতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে

পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষদ্বয় সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলে; আর নারীকে পুরুষে রূপান্তরের ক্ষেত্রে স্তনদ্বয় কেটে ফেলে এবং নারীদেহে বিদ্যমান জননপথ বিলুপ্ত করে দেয়। সুতরাং এই আয়াতটি এ সবকিছুকে হারাম করে এবং জানিয়ে দেয় যে তা শয়তানের কাজ। তাই এতে রয়েছে যে-কোনো চিকিৎসাগত উদ্দেশ্যবিহীন নিছক লিঙ্গ-পরিবর্তন অস্ত্রোপচারের নিশ্চিত হারাম হওয়ার ঘোষণা।

দ্বিতীয়: ইসলামের অনুসারীদের কাছে প্রতিষ্ঠিত যে, কাযা ও কদরের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব, এবং নির্ধারিত তাকদিরের উপর ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وكان أمر الله قدراً مقدوراً

> আর আল্লাহর নির্দেশ সুনির্ধারিত তাকদির। (সূরা আল-আহযাব: ৩৮)

আর আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ

> নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। (সূরা আল-কামার: ৪৯)

আর তাকদিরের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা ধ্বংসের আলামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত; এই অস্ত্রোপচারগুলো তাকদিরের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশেরই একটি প্রকাশরূপ। কেননা আল্লাহ তাআলা যদি নির্ধারণ করে থাকেন যে সে পুরুষ হবে, আর সে নারীতে রূপান্তরিত হতে চায়, তবে এটি তার মহান ও সুউচ্চ প্রতিপালকের তাকদিরের উপর অসন্তুষ্টি। তেমনি যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন যে সে নারী হবে, অথচ সে তাতে সন্তুষ্ট নয় এবং পুরুষ হতে চায় — এটিও তার প্রতিপালকের তাকদিরের উপর অসন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আর তাকদিরের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা জায়েয নয়। সুতরাং জামার বুক ছিঁড়ে ফেলা, চুল ছেঁড়া ও গালে চড় মারা যদি হারাম এবং কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয় — কারণ তা তাকদিরের উপর অসন্তুষ্টি — তবে মূলগতভাবে লিঙ্গ পরিবর্তন করার অবস্থা কী হবে? নিঃসন্দেহে তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হারাম, কারণ তা অসন্তুষ্টি প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত। তাকদিরের ব্যাপারে মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো আত্মসমর্পণ, ধৈর্য ও সন্তুষ্টি; আর অসন্তুষ্টি কাযা-কদরে কুফরির শাখাসমূহের একটি শাখা — আমরা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর আপনি ভালোভাবেই জানেন যে, যে ব্যক্তি তাকদিরের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, সে নিজের জন্য মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রতাপান্বিত মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিই অনিবার্য করে নেয়। তিনি ﷺ বলেছেন:

((فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ))

> যে সন্তুষ্ট থাকল, তার জন্য সন্তুষ্টি; আর যে অসন্তুষ্ট হলো, তার জন্য অসন্তুষ্টি।

আল্লাহই সাহায্যকারী।

তৃতীয়: আল্লাহ তাআলা বলেন:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما

اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

> আর তোমরা সেসবের কামনা করো না, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। পুরুষরা যা অর্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে, আর নারীরা যা অর্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে। (সূরা আন-নিসা: ৩২)

এই আয়াত থেকে দলিল গ্রহণের দিকটি হলো, মহান ও সুউচ্চ আল্লাহ পুরুষদেরকে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দিয়ে খাস করেছেন, এবং নারীদেরকেও কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দিয়ে খাস করেছেন; প্রত্যেকের জন্য তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে আদেশ দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাদের দুই পক্ষকে যা দিয়ে খাস করেছেন তাতেই তারা যেন পরিতুষ্ট থাকে ও সন্তুষ্ট থাকে, এবং একজন যেন অপরজনের বৈশিষ্ট্যের কামনা না করে। কেননা এই কামনা সেই সত্তার প্রতি কটাক্ষ, যিনি এই বিশেষায়ণ নির্ধারণ করেছেন; সুতরাং এই কামনা মহান ও সুউচ্চ স্রষ্টার প্রতিই কটাক্ষ। আর যেসব অস্ত্রোপচারে লিঙ্গ পরিবর্তন করা হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে দুই লিঙ্গের একজন কর্তৃক অপরজনের বৈশিষ্ট্যের কামনাই। কেননা নারী পুরুষদের বৈশিষ্ট্যের কামনা করে, তাই এই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সে পুরুষ হতে চায় পুরুষত্বের বৈশিষ্ট্য লাভের জন্য; আর পুরুষ নারীদের বৈশিষ্ট্যের কামনা করে, তাই এই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সে নারী হতে চায় নারীদের বৈশিষ্ট্য লাভের জন্য। আর এ সবকিছুই তাঁর বাণী "ولا تتمنوا" (তোমরা কামনা করো না) দ্বারা নিষিদ্ধ। এটি একটি নিষেধাজ্ঞা, আর উসূলে প্রতিষ্ঠিত যে, নিষেধাজ্ঞা হারাম হওয়া বোঝায় — যদি না কোনো ঘুরিয়ে দেওয়া কারণ (সারিফ) থাকে; আর এই আয়াতকে ঘুরিয়ে দেয় এমন কোনো কারণ আমরা জানি না, সুতরাং মূল বিধান হারাম থাকাই বহাল। আমরা আরও বলি:— এখানে নিষেধ করা হয়েছে নিছক কামনা করা থেকেই, অর্থাৎ পুরুষের জন্য জায়েয নয় নারীদের বৈশিষ্ট্যের কামনায় ডুবে থাকা, এবং নারীর জন্য জায়েয নয় পুরুষের বৈশিষ্ট্যের কামনায় ডুবে থাকা। সুতরাং যখন নিছক এই কামনা থেকেই নিষেধ করা হয়েছে, তখন যে ব্যক্তি কামনার প্রাচীর অতিক্রম করে বাস্তব বাস্তবায়নে চলে যায় এবং চিকিৎসকদের হাতে নিজেকে সঁপে দেয় যাতে তারা তার জন্য এই পাপাচারী শয়তানি অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করে — তার হুকুম কী হবে? নিঃসন্দেহে তখন হারাম হওয়া আরও তীব্র এবং নিষেধাজ্ঞা আরও জোরালো। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

চতুর্থ: মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

لعن رسول الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات

والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عزوجل

রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন সেসব নারীর উপর যারা উল্কি অঙ্কন করে ও যারা উল্কি অঙ্কন করায়, যারা ভ্রু উপড়ে ফেলে ও যারা উপড়ে ফেলায়, এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের ফাঁক তৈরি করে — যারা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার সৃষ্টি পরিবর্তনকারিণী।

এ থেকে দলিল গ্রহণের দিকটি হলো, হাদীসে উল্লিখিত এই কাজগুলোর কারণে কর্তার উপর লানত করা হয়েছে, আর হাদীসের শেষে হারাম হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে — তা হলো তাঁর বাণী: "((المغيرات خلق الله))" (আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনকারিণী)। অথচ এসব কাজ করা সত্ত্বেও নারী নারী হিসেবেই বর্ণিত হতে থাকে। তাহলে যে নারী নারী থেকে পুরুষে সম্পূর্ণরূপে নিজের লিঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করে, তার অবস্থা কী হবে? দাঁতের ফাঁক তৈরি করা, উল্কি অঙ্কন করা এবং ভ্রু থেকে কয়েকটি লোম কেটে ফেলা যদি লানত অনিবার্য করে, তবে যে নারী নিজের স্তনদ্বয় ও জরায়ু কেটে ফেলে, নারীদেহের জননপথ বিলুপ্ত করে দেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই ঊরুর মাঝে চামড়ার একটি অংশ প্রতিস্থাপন করে তাকে পুরুষাঙ্গের আকারে গড়ে তোলে — তার অবস্থা কী? নিঃসন্দেহে লানত আরও তীব্র হবে এবং তার তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হবে। আর ইলমের অধিকারীগণ — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, কিয়াসুল আওলাবি (অগ্রাধিকারমূলক কিয়াস) দলিল। সুতরাং পরিবর্তনের রূপ যত তীব্র হবে, লানত তত তীব্র হবে এবং হারাম হওয়া তত জোরালো হবে। আল্লাহই সাহায্যকারী।

পঞ্চম: বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে নিজের সনদে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات

مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.((

রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন সেসব পুরুষের উপর যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে, এবং সেসব নারীর উপর যারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।

এই হাদীস থেকে দলিল গ্রহণের দিকটি স্পষ্ট। তা হলো, এই হাদীস প্রমাণ করেছে যে, দুই লিঙ্গের একজনের অপরজনের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম, এবং এই কাজটি কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এর কর্তার উপর লানত করা হয়েছে। আর নিয়ন্ত্রণবিধি বলে:— যে গুনাহের কাজের উপর লানত আরোপ করা হয়, তা কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এই ধরনের শল্যচিকিৎসা এমন এক উপায়, যার মাধ্যমে এই হারাম কাজটিতে পৌঁছানো হয় — যা

কবিরা গুনাহ হিসেবে গণ্য। বরং এর হারাম হওয়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, আরও জোরালো ও আরও তীব্র। কেননা এই অস্ত্রোপচারে পুরুষ ভেতরে-বাইরে প্রকৃত নারী হতে চায়, আর এটি হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর উপযুক্ত। নারীও তেমনি নিছক পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য করে না, বরং সে প্রকৃত পুরুষ হতে চায়; আর এটিও হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর উপযুক্ত। এই হাদীস এবং এর পূর্বেরটি এ মাসআলায় সুস্পষ্ট নস। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

ষষ্ঠ: সেসব হাদীস, যেগুলো খাসি করা (খিসা) থেকে নিষেধ করে। যেমন উসমান ইবনু মাযউন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস — তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি এমন একজন মানুষ যার উপর যুদ্ধাভিযানে স্ত্রীবিহীন থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ে; আপনি কি আমাকে খাসি হওয়ার অনুমতি দেবেন, যাতে আমি খাসি হয়ে যাই? তিনি ﷺ বললেন:

لا ولكن عليك بالصيام فإنها مخفرة

> না; বরং তুমি সিয়াম পালন করো, কেননা তা (প্রবৃত্তির) দমনকারী।

আর সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له

لاختصينا

> রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ইবনু মাযউনের বৈরাগ্য (তাবাত্তুল) গ্রহণের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন; আর তিনি যদি তাঁকে অনুমতি দিতেন, তবে আমরা খাসি হয়ে যেতাম। — মুত্তাফাকুন আলাইহি

আর ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

كنا نغزو مع رسول الله وليس لنا شيء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن

ذلك, ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا

تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

> আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধাভিযানে যেতাম, আর আমাদের সঙ্গে কিছুই থাকত না। তখন আমরা বললাম: — আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করলেন, তারপর আমাদের জন্য অনুমতি দিলেন যে আমরা কাপড়ের বিনিময়ে নারীকে বিবাহ করতে পারি। তারপর তিনি আমাদের সামনে তিলাওয়াত করলেন: "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম

> করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" (সূরা আল-মায়িদা: ৮৭) — মুত্তাফাকুন আলাইহি

আর এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার হাদীস অনেক। এগুলো থেকে দলিল গ্রহণের দিকটি হলো, বলা হবে:— যখন খাসি করার সঙ্গে হারাম হওয়া সম্পৃক্ত, যাতে কেবল অঙ্গটির কার্যকারিতায় পরিবর্তন ঘটে — তখন আল্লাহর দোহাই, সম্পূর্ণ পরিবর্তনের অবস্থা কী হবে? নিঃসন্দেহে তা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর উপযুক্ত। আর এটি কিয়াসুল আওলাবি, এবং তা দলিল — যেমনটি আমরা অন্য এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

সপ্তম: শরঈভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, যা হারামের দিকে পৌঁছে দেয় তা হারাম। আর এই ধরনের শল্যচিকিৎসা শরীয়তে নিষিদ্ধ জিনিসকে শারীর (শরীয়তপ্রণেতা)-এর অনুমতি ছাড়াই বৈধ করে নেওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে; কেননা এতে পুরুষ ও নারী উভয়েরই লজ্জাস্থান উন্মোচন করা হয় এবং তা বারবার বহুবার ঘটে। অথচ শরঈ দলিলসমূহ সেই উন্মোচনের হারাম হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করেছে; আর এই শল্যচিকিৎসায় এই উন্মোচনের কোনো নিরুপায় প্রেরণাও নেই, মূলত কোনো প্রয়োজনও নেই। সুতরাং যেহেতু এই পাপাচারী শল্যচিকিৎসা এই নিষিদ্ধ কাজে পৌঁছে দেয়, তাই তা নিজেও নিষিদ্ধ হয়ে যায় — কারণ যা হারামের দিকে পৌঁছে দেয় তা হারাম। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক জ্ঞানী।

অষ্টম: এই পাপাচারী অপরাধমূলক অস্ত্রোপচারগুলোকে জায়েয বলার মধ্যে রয়েছে এক বিরাট ক্ষতি — যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তা ছাড়াও। তা হলো, এই পরিবর্তন বংশধারা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার দিকে নিয়ে যায়, অথচ শরীয়তে বংশধারা বৃদ্ধির আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা পুরুষ যদি নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে নারী হয়ে যায়, তবে সে কি নারী যা করে — গর্ভধারণ, সন্তানপ্রসব ও লালনপালন — সবই করবে? অবশ্যই না। আর নারী যদি নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ হয়ে যায়, তবে সে কি পুরুষ যা করে — সহবাস ইত্যাদি — তা করবে? অবশ্যই না। বরং এই পরিবর্তনের দ্বারা সে পুরুষত্বের বৈশিষ্ট্য হারাবে এবং এর দ্বারা নারীর বৈশিষ্ট্যও অর্জন করবে না। তেমনি নারীও নারীর বৈশিষ্ট্য হারাবে এবং এর দ্বারা পুরুষের বৈশিষ্ট্যও অর্জন করবে না। ফলে এই পরিবর্তনের পর পুরুষ থেকে যাবে — না সে প্রকৃত পুরুষ, না সে প্রকৃত নারী; আর নারীও পরিবর্তনের পর থেকে যাবে — না সে প্রকৃত নারী, না সে প্রকৃত পুরুষ। সুতরাং পুরুষ পরিবর্তনের পর সহবাসে সক্ষম হবে না, কারণ সে তার অঙ্গ ও অণ্ডকোষদ্বয় সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলেছে; আর নারীও মূলত গর্ভধারণ করতে পারবে না, কারণ সে জরায়ু ও তৎসংশ্লিষ্ট অংশ কেটে ফেলেছে। আর এটি সমাজের ধস নামিয়ে দেয়; কারণ এই সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তিদের নিয়ে — পুরুষ ও নারী নিয়ে। সুতরাং প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে, তবে সমাজ ধসে পড়বে ও দুর্বল হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা উম্মাহর মর্যাদা চলে যাবে। আর আমরা আদিষ্ট যে, এমন প্রতিটি জিনিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াব যা উম্মাহকে এই খাদের দিকে নিয়ে যায় — যাতে রয়েছে উম্মাহর ধ্বংস, তার শক্তির পতন, তার বন্ধনগুলোর ছিন্ন হওয়া ও তার মর্যাদার অপগমন। আর দেখুন, শয়তান কীভাবে এসব দলের অন্তরে পৌঁছে গেছে! সে তাদের কাছ থেকে কেবল জন্মনিয়ন্ত্রণেই সন্তুষ্ট হয়নি, বরং ধাপে ধাপে তাদেরকে লিঙ্গ পরিবর্তন পর্যন্ত নিয়ে গেছে — যাতে মূলত কোনো বংশধারাই না হয়। এই ক্ষতিগুলোই যথেষ্ট, যাতে আমরা এই পাপাচারী, জালিম ও অত্যাচারী অস্ত্রোপচারগুলোর উপর নিশ্চিত হারাম হওয়ার হুকুম দিই; বরং এগুলোর একটি ক্ষতিই এর জন্য যথেষ্ট, তাহলে সবগুলো একত্রে হলে কী হবে? হে আল্লাহ, হিদায়াতের পর অন্তরের বক্রতা থেকে আমরা আপনার আশ্রয় চাই। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

নবম: এই জালিম ও অভিশপ্ত অস্ত্রোপচারগুলোকে জায়েয বলা, যার লিঙ্গ পরিবর্তন করা হয়েছে তার উপর প্রযোজ্য শরঈ বিধানগুলোতে বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায়। কেননা পুরুষ নারীতে লিঙ্গ পরিবর্তনের পর কি হিজাব, বিবাহ, অভিভাবকত্ব, মিরাস ইত্যাদিতে নারীর বিধান গ্রহণ করবে, নাকি সে নিজের বিধানের উপরই থাকবে? তেমনি নারী যদি নিজের লিঙ্গ পুরুষে রূপান্তরিত করে, তবে সে কি এসবে পুরুষের বিধান গ্রহণ করবে, নাকি নিজের বিধানের উপরই থাকবে? মাসআলা ও বিতর্ক বেড়ে যাবে এবং বিষয়গুলো বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। কেননা প্রত্যেকে নিজ নিজ লিঙ্গে বহাল থাকা সত্ত্বেও আমরা বহু ক্ষেত্রে জটিলতার দুর্গমতার কারণে কিছু কিছু মাসআলা সুনির্দিষ্ট করতে পারি না; তবে এই পাপাচারী ও জালিম পরিবর্তনের পর কী হবে? এই ক্ষতিটি শরীয়ত-প্রণয়নের মূলেই আঘাত হানে। আর মূলনীতিতে

প্রতিষ্ঠিত যে, শরীয়ত এসেছে কল্যাণসমূহ অর্জন ও পূর্ণ করার জন্য এবং ক্ষতিসমূহ রহিত ও হ্রাস করার জন্য। এর ভিত্তিতে এই পরিবর্তন সর্বদিক থেকে ক্ষতি; এতে কল্যাণের কোনো দিকই নেই। সুতরাং যেহেতু তা নিখাদ ক্ষতি, তাই তা থেকে নিষেধ করা হবে এবং এর দরজা সর্বদিক থেকে বন্ধ করা হবে; কখনোই তা খোলার অনুমতি দেওয়া হবে না। আর মূলত এ মাসআলাটি আলোচনা ও বিতর্কের অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়াই জায়েয নয়, কারণ কিতাব ও সুন্নাহর দলিল দ্বারা এবং সহীহ নকলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুস্পষ্ট বিবেক দ্বারা এর ফয়সালা হয়ে গেছে। আর শরীয়তের যেসব গ্রন্থে চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার অনেকগুলোতে এই মাসআলাটি অনুসন্ধান করার পরও আমি এতে কোনো মতবিরোধকারী দেখিনি। তাই আমার জ্ঞানের সীমার মধ্যে থেকে আমি বলি:— এই অস্ত্রোপচারগুলোর হারাম হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের আলিমগণের মধ্যে কোনো মতবিরোধকারী আছেন বলে আমি জানি না। যদি আপনি এতে কোনো মতবিরোধকারীর সন্ধান পান, তবে এ ব্যাপারে হক তা-ই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি সেসব দলিল দ্বারা যা আমরা উত্তরে আপনার জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর যদি এতে কোনো মতবিরোধকারী না থাকেন, তবে ইজমাও এই অস্ত্রোপচারের হারাম হওয়ার দলিলসমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু আমরা তা দাবি করছি না, কারণ এটি একটি নব-উদ্ভূত মাসআলা এবং এতে ইজমার দাবি করা কষ্টসাধ্য ছাড়া সম্ভব নয়। তবে এতটুকু বলার অবকাশ আমার আছে:— আমি যতটুকু অবগত হয়েছি, সে অনুযায়ী এর হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ আছে বলে জানি না। আর এটিই সেই উত্তর, যা দিতে আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্য করেছেন; অনুসন্ধান করলে এর চেয়ে বেশিও প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু এই লেখার সময়ে আমার সামনে এতটুকুই উপস্থিত হয়েছে। আর আমাদের প্রতিপালক আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক জ্ঞানী।

লিঙ্গ-পরিবর্তন অস্ত্রোপচার হারাম হওয়ার নয়টি দিক

- [ ] ১. আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করা (নিসা ১১৯)
- [ ] ২. তাকদীরে অসন্তুষ্টি প্রকাশ
- [ ] ৩. অপরের বৈশিষ্ট্য কামনা (নিসা ৩২)
- [ ] ৪. সৃষ্টি পরিবর্তনকারিণীদের ওপর লানতের হাদীস, তাতে অগ্রাধিকারমূলক কিয়াস
- [ ] ৫. পুরুষ-নারী একে অপরের সাদৃশ্য গ্রহণকারীদের ওপর লানত
- [ ] ৬. খাসি করা থেকে নিষেধাজ্ঞার হাদীস
- [ ] ৭. লজ্জাস্থান উন্মোচনের মতো হারামে পৌঁছে দেয়
- [ ] ৮. বংশধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজ দুর্বল হয়
- [ ] ৯. হিজাব, বিবাহ, অভিভাবকত্ব, মিরাসে শরঈ বিধানে বিশৃঙ্খলা

লেখক জানান, এতে মতবিরোধকারী আছেন বলে তাঁর জানা নেই; নব-উদ্ভূত মাসআলায় তিনি ইজমা দাবি করেন না

প্রশ্ন ৩৫

মুআমালাত (লেনদেন) অধ্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসাসংক্রান্ত বিধানগুলো কী কী? দলিল ও বিস্তারিতসহ তা বর্ণনা করুন।

উত্তর: আমি বলি:— এটি একটি ব্যাপক প্রশ্ন, যার উত্তরে বহু শাখা-মাসআলা একত্র হয়। সহজ ও সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে আমি এই শাখাগুলোকে কয়েকটি মাসআলায় ভাগ করছি:—

{প্রথম মাসআলা} নিঃসন্দেহে পাগলামি (জুনূন) এক প্রকার রোগ। ফকীহগণ — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — পাগলামির অস্তিত্বের উপর বহু বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে:

- তার বেচা-কেনা শুদ্ধ না হওয়া।
- তার ইজারা দেওয়া ও ইজারা নেওয়া শুদ্ধ না হওয়া।
- তার উপর হাওয়ালা (ঋণ-স্থানান্তর) করা এবং তার পক্ষ থেকে হাওয়ালা করা শুদ্ধ না হওয়া।
- তার যামানত ও কাফালত শুদ্ধ না হওয়া, অর্থাৎ তার কাফীল বা যামিন হওয়া শুদ্ধ নয়।
- তার অসিয়ত শুদ্ধ না হওয়া।
- তার হাদিয়া ও হিবা শুদ্ধ না হওয়া, অর্থাৎ সে যদি কাউকে হাদিয়া দেয় বা কাউকে কিছু দান করে, তবে তা শুদ্ধ হবে না।
- তার ঋণ দেওয়া এবং তার কাছ থেকে ঋণ নেওয়া শুদ্ধ না হওয়া।
- তার উকীল হওয়া ও উকীল নিযুক্ত করা শুদ্ধ না হওয়া, অর্থাৎ তার কারও উকীল হওয়া শুদ্ধ নয়, এবং তার কাউকে উকীল নিযুক্ত করাও শুদ্ধ নয়।
- তার পক্ষ থেকে কোনো আপস-মীমাংসা (সুলহ) সংঘটিত হলে তা শুদ্ধ না হওয়া।
- তার কাছ থেকে কিছু ধার নেওয়া বা তাকে কিছু ধার দেওয়া শুদ্ধ না হওয়া, অর্থাৎ তার ধারদাতা বা ধারগ্রহীতা হওয়া উপযুক্ত নয়।
- তার কাছে আমানত রাখা বা তার কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা শুদ্ধ না হওয়া, অর্থাৎ তার আমানত-অর্পণকারী বা আমানত-রক্ষক হওয়া উপযুক্ত নয়।
- তার ওয়াকফ ও সদকা শুদ্ধ না হওয়া।
- তার নিজে বিবাহের আকদ সম্পাদন করা শুদ্ধ না হওয়া।

এসবের কোনোটিই তার পক্ষ থেকে শুদ্ধ হয় না, কারণ এগুলোর শর্ত হলো — এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে তা সংঘটিত হওয়া, যার লেনদেন করার যোগ্যতা (আহলিয়াত) রয়েছে; অর্থাৎ যে এসব বিষয়ের দায়িত্ব নেবে সে যেন লেনদেনে অনুমোদিত হয়। আর পাগল ব্যক্তি লেনদেনে অনুমোদিত নয় এবং এই যোগ্যতার অধিকারীও নয়।

{দ্বিতীয় মাসআলা} রোগী। আমাদের কাছে মুআমালাত অধ্যায়ে তার জন্য বহু বিধান রয়েছে:—

- তার মধ্যে রয়েছে: খিয়ার (বিকল্প বেছে নেওয়ার অধিকার) জায়েয হওয়া — অর্থাৎ "খিয়ারুল মুসতারসিল", সেই ব্যক্তির খিয়ার যে কিছু ব্যাধির কারণে বুদ্ধির ঘাটতির দরুন বেচাকেনায় প্রায়ই প্রতারিত হয়, অর্থাৎ তার বুদ্ধিতে রোগ থাকার কারণে। এর দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয় হাব্বান ইবনু মুনকিযের হাদীস — তিনি বেচাকেনায় প্রতারিত হতেন, তাই নবী ﷺ তাঁকে বললেন: ((إذا بايعت فقل لا خلابة)) "যখন তুমি বেচাকেনা করবে, তখন বলবে: কোনো ধোঁকা চলবে না।" — এবং তিনি তাঁকে তিন দিনের খিয়ার দিয়েছিলেন।
- তার মধ্যে রয়েছে: এমন রোগে আক্রান্ত রোগীর উপর হাজর (সম্পদ-ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা) আরোপ করা, যে রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা করা হয় — যাকে বলা হয় "মারাযুল মাখূফ" (আশঙ্কাজনক রোগ)। সেই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দানসমূহ কেবল এক-তৃতীয়াংশ ছাড়া নিষিদ্ধ, অর্থাৎ তার জন্য নিজ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি ব্যবহার করা জায়েয নয়। সে যদি এর বেশি দান করে, তবে তা ওয়ারিসদের অনুমতি ছাড়া জায়েয হবে না। এর দলিল তাঁর ﷺ বাণী: ((إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم)) "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মৃত্যুর সময় তোমাদের প্রতি তোমাদের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সদকা করেছেন, তোমাদের আমল

বৃদ্ধির জন্য।" — ইবনু মাজাহ ও দারাকুতনী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। আর কারণ হলো, আশঙ্কাজনক রোগের অবস্থায় তাতেই তার মৃত্যু হওয়াটাই প্রবল ধারণা, ফলে মূল সম্পদ থেকে তার দান ওয়ারিসের প্রতি অবিচার হয়ে যায়; তাই তা অসিয়তের মতোই এক-তৃতীয়াংশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

- তার মধ্যে রয়েছে: যে ব্যক্তির মৃত্যুর আশঙ্কাযুক্ত রোগ রয়েছে, সে যদি তালাক দেয়, তবে তার তালাক ধর্তব্য নয়। কারণ এখানে প্রবল ধারণা হয় যে, সে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার মিরাস থেকে বঞ্চিত করার নিয়ত করছে। তাই তার উদ্দেশ্যের বিপরীত আচরণ করে এ অবস্থায় তার তালাক কার্যকর হয় না।
- তার মধ্যে রয়েছে: শারীকা (অংশীদারত্ব) অধ্যায়ে। ফকীহগণ — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — স্পষ্ট বলেছেন যে, কোনো মানুষ যদি অন্যের সঙ্গে "শারিকাতুল আবদান" (শ্রমভিত্তিক অংশীদারত্ব) করে, তারপর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে তার অংশীদার চাইলে তার উপর নিজের বদলে অন্যকে দাঁড় করানো আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ এই ধরনের অংশীদারত্ব উভয়ের প্রত্যেকের শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে অপরজন একাই কাজ করবে অথচ লাভে দুজনই অংশীদার — আর এটি জুলুম। তাই অংশীদার যদি বলে:— তোমার বদলে কাজ করার মতো কাউকে দাঁড় করাও, তবে অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে নিজের বদলে এমন কাউকে দাঁড় করানো যে তার পক্ষ থেকে কাজ করবে।

{তৃতীয় মাসআলা} হাজর (সম্পদ-ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা) অধ্যায়। হাজর আরোপিত হয় "মা'তূহ" (বুদ্ধিবিকৃত) ও "সাফীহ" (নির্বোধ)-এর উপর; আর "আতাহ" (বুদ্ধিবিকৃতি) ও "সাফাহ" (নির্বুদ্ধিতা) দুই প্রকার রোগ। সুতরাং মা'তূহ ও সাফীহকে আর্থিক লেনদেনের সুযোগ দেওয়া হবে না, এবং তাদের অভিভাবকই তাদের সম্পদের তত্ত্বাবধান করবেন। কারণ তাদের বুদ্ধিতে এসব ব্যাধি নেমে আসা সত্ত্বেও যদি তাদেরকে নিজেদের সম্পদে লেনদেন করতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তাদের সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তাদের সম্পদ রক্ষার জন্য শরীয়ত তাদের উপর হাজর আরোপ করেছে — যতক্ষণ না এই কারণটি দূর হয়। সুতরাং মা'তূহের বুদ্ধি পূর্ণ হলে এবং বিচক্ষণতা অর্জনের মাধ্যমে সাফাহ দূর হলে, তাদের মধ্যে বিচক্ষণতা প্রত্যক্ষ করার পর তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً...الآية بعدها

> আর তোমরা নির্বোধদেরকে তোমাদের সেই সম্পদ দিয়ো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জীবনধারণের অবলম্বন করেছেন... (এবং এর পরের আয়াত)। (সূরা আন-নিসা: ৫)

{চতুর্থ মাসআলা} অসিয়ত অধ্যায়ে। ফকীহগণ — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — স্পষ্ট বলেছেন যে, আশঙ্কাজনক রোগে আক্রান্ত রোগীর উপর ওয়াজিব হলো অসিয়ত লিখে রাখা, যদি তার জিম্মায় এমন অধিকার থাকে যা অলিখিত ও অনথিভুক্ত। আর তা এজন্য, যাতে মানুষের অধিকার নষ্ট না হয়; এবং কারণ এই অনথিভুক্ত অধিকারগুলো অসিয়ত লিখে নথিভুক্ত করা ছাড়া জানা যায় না। সুতরাং তখন অসিয়ত লেখা ওয়াজিব, কেননা মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর এ অবস্থায় অসিয়ত ছাড়া তা সম্পন্ন হয় না; তাই তা ওয়াজিব হবে — কারণ যা ছাড়া ওয়াজিব সম্পন্ন হয় না, তা ওয়াজিব।

{পঞ্চম মাসআলা} ফকীহগণ — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — স্পষ্ট বলেছেন যে, কোনো মানুষের কাছে যদি কোনো দাস থাকে এবং সে তাকে এমন রোগে আক্রান্ত পায় যা তাকে কাজ থেকে অচল করে দেয়, অথচ ক্রেতা এই রোগ সম্পর্কে জানত না এবং বিক্রেতা তা গোপন করেছিল — তবে দাসের মধ্যে এই রোগের উপস্থিতি সেসব

ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর দ্বারা "খিয়ারুল আইব" (ত্রুটিজনিত বিকল্পাধিকার) সাব্যস্ত হয়। ফলে ক্রেতাকে বিকল্প দেওয়া হবে — হয় সে "আরশ" গ্রহণ করবে, অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় দাসের মূল্য এবং এই রোগসহ তার মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য; অথবা সে দাসটি ফেরত দেবে এবং যা কিছু পরিশোধ করেছিল তার সবই ফেরত নেবে। সুতরাং দাসের মধ্যে যে রোগ তাকে কাজ থেকে অচল করে দেয় কিংবা তার জন্য কাজ পূর্ণ করা অসম্ভব করে তোলে, তা ফকীহগণের — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — কাছে সেসব ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর দ্বারা খিয়ার সাব্যস্ত হয়।

{ষষ্ঠ মাসআলা} ফকীহগণ — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, অজ্ঞান (মুগমা আলাইহি) ব্যক্তির কথার উপর ঘুমন্ত ব্যক্তির বিধান প্রয়োগ করা হয়। আর যেহেতু ঘুমন্ত ব্যক্তির কথা শরঈভাবে ধর্তব্য নয়, তেমনি অজ্ঞান ব্যক্তির কথাও ধর্তব্য নয়। এর ভিত্তিতে অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষ থেকে শুদ্ধ হবে না — না বেচা, না কেনা, না দাসমুক্তি, না ইসলাম গ্রহণ, না মুরতাদ হওয়া, না বিবাহ, না তালাক, না অসিয়ত; এবং অজ্ঞান অবস্থায় সে যা মুখে উচ্চারণ করে তার জন্য তার উপর কোনোভাবেই পাকড়াও নেই। তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি (ইকরার) শুদ্ধ নয়, ওয়াকফ নয়, সদকা নয়, দান বা হিবা নয়, হাওয়ালা নয়, এবং এ ছাড়া অন্য কোনো লেনদেনও শুদ্ধ নয়। কারণ এসব বিষয়ের জন্য আহলিয়াত (যোগ্যতা) শর্ত, আর অজ্ঞান ব্যক্তি লেনদেনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে — কেননা অজ্ঞানতার আকস্মিক অবস্থা তার বুদ্ধিকে ঢেকে দিয়েছে; আর অজ্ঞানতা এক প্রকার রোগ, যেমনটি সুবিদিত।

রোগ ও লেনদেনের বিধান

অবস্থা	হুকুম
পাগল	বেচা-কেনা, ইজারা, ওয়াকফ, সদকা, বিবাহের আকদ ইত্যাদি শুদ্ধ নয়; লেনদেনের যোগ্যতা (আহলিয়াত) নেই
আশঙ্কাজনক রোগ (মারাযুল মাখূফ)	সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি দান ওয়ারিসদের অনুমতি ছাড়া জায়েয নয়; তালাক ধর্তব্য নয়
বুদ্ধির ঘাটতিতে প্রায়ই প্রতারিত	খিয়ারুল মুসতারসিল — হাব্বান ইবনু মুনকিযের হাদীস
শ্রমভিত্তিক অংশীদার অসুস্থ হলে	অংশীদার চাইলে নিজের বদলে অন্যকে দাঁড় করানো ওয়াজিব
মা'তূহ ও সাফীহ	হাজর; বিচক্ষণতা প্রত্যক্ষ করার পর সম্পদ সোপর্দ
আশঙ্কাজনক রোগী, জিম্মায় অনথিভুক্ত অধিকার	অসিয়ত লিখে রাখা ওয়াজিব
রোগাক্রান্ত দাস, ক্রেতা না জেনে কিনলে	খিয়ারুল আইব — আরশ গ্রহণ বা ফেরত
অজ্ঞান ব্যক্তি	ঘুমন্ত ব্যক্তির বিধান; বেচা-কেনা, ইসলাম গ্রহণ, বিবাহ, তালাক, অসিয়ত কিছুই শুদ্ধ নয়

প্রশ্ন ৩৫ — মুআমালাত অধ্যায়ের চিকিৎসাসংক্রান্ত বিধান

প্রশ্ন ৩৬

ধূমপানের হুকুম কী? দলিলসহ তা বর্ণনা করুন।

উত্তর: আমি বলি:— ধূমপান হারাম, এর হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এর হারাম হওয়ার দলিল কিতাব, সুন্নাহ, কিয়াস ও সহীহ বিবেচনা। তার বিবরণ নিম্নরূপ:—

কিতাব থেকে দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

> এবং তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেন এবং তাদের উপর অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেন। (সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭)

তাঁর বাণী "الخبائث" (অপবিত্র বস্তুসমূহ) একটি বহুবচন, যার উপর "আলিফ-লাম আল-ইসতিগরাকিয়্যা" (ব্যাপকতাবোধক আলিফ-লাম) প্রবেশ করেছে; আর ব্যাপকতাবোধক আলিফ-লাম বহুবচনের উপর প্রবেশ করলে তাকে ব্যাপকতা দান করে। ফলে তাতে সমস্ত অপবিত্র বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়। আর ধোঁয়া (তামাক) তার গঠন-উপাদানে অপবিত্র বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তার প্রভাবে অপবিত্র বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং তার গন্ধে অপবিত্র বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তা অপবিত্র বস্তুসমূহের মধ্যেই গণ্য। সুতরাং যেহেতু তা অপবিত্র বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তাই তা হারাম হবে; কেননা তিনি বলেছেন: "ويحرم عليهم الخبائث" (এবং তিনি তাদের উপর অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেন)।

দলিলসমূহের মধ্যে আরও রয়েছে তাঁর বাণী:

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

> আর তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না। (সূরা আল-বাকারা: ১৯৫)

আর বিবেকবান নির্ভরযোগ্য চিকিৎসকদের ইজমা রয়েছে যে, ধূমপান তাৎক্ষণিক বা বিলম্বিত ধ্বংসের কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত; মোদ্দাকথা, তা ধ্বংসের কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যা কিছু ধ্বংসের কারণ, বান্দাকে তার পথে চলা থেকে নিষেধ করা হয়েছে; কেননা বান্দাকে তার নিজের ব্যাপারে আমানতদার করা হয়েছে, তাই নিজেকে এমন কিছুর সামনে উন্মুক্ত করা তার জন্য জায়েয নয় যাতে রয়েছে তার ধ্বংস ও বিনাশ। এর অনুরূপ তাঁর বাণী:

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك

عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً

> আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর যে সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করে তা করবে, অচিরেই আমি তাকে আগুনে দগ্ধ করব; আর তা আল্লাহর জন্য সহজ। (সূরা আন-নিসা:

২৯-৩০)

আর ধূমপান আত্মহত্যার কারণসমূহের একটি কারণ, কেননা তা মারাত্মক ক্যান্সার রোগসমূহের প্রধান কারণ — যেমনটি মুসলিম ও কাফির চিকিৎসকগণ সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দলিলসমূহের মধ্যে আরও রয়েছে তাঁর বাণী:

ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

আর তোমরা অপচয় করো না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না। (সূরা আল-আ'রাফ: ৩১; অনুরূপ সূরা আল-আন'আম: ১৪১)

এবং তাঁর বাণী:

ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً

আর তুমি অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (সূরা আল-ইসরা: ২৬-২৭)

অপচয়ের বহু রূপ রয়েছে; তার একটি রূপ হলো এমন কিছুতে অর্থ ব্যয় করা যার পেছনে কোনো ফলাফল নেই এবং যা থেকে কোনো কল্যাণ অর্জিত হয় না। তাহলে এমন কিছুতে অর্থ ব্যয় করার কী অবস্থা, যার ক্ষতি তাৎক্ষণিক ও বিলম্বিত উভয়ভাবেই? নিঃসন্দেহে তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে। আর ধূমপান — চিকিৎসকদের সাক্ষ্যে, বরং ধূমপায়ীদের নিজেদের সাক্ষ্যেই — এমন যে, তার পেছনে কোনো ফল অর্জিত হয় না এবং তার পেছনে কোনো লাভ নেই; উপরন্তু তা পারিবারিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাতে অর্থ ব্যয় করা শরীয়তে নিষিদ্ধ অপচয় ও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

দলিলসমূহের মধ্যে আরও রয়েছে আবু দাউদ তাঁর সুনানে যা বর্ণনা করেছেন — তিনি বলেন: আমাদেরকে হারুন ইবনু আবদিল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনু বিশর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ থেকে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি বলেছেন:

نهى رسول الله عن الدواء الخبيث

> রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র ওষুধ থেকে নিষেধ করেছেন। — হাদীসটি সহীহ

সুতরাং শারী (শরীয়তপ্রণেতা) যখন অপবিত্র ওষুধ থেকে নিষেধ করেছেন — যদিও তা ওষুধ, তবু তার অপবিত্রতার কারণে তা হারাম করা হয়েছে — তখন সেই ধোঁয়ার কী অবস্থা, যা অপবিত্র বস্তুসমূহের সর্দার এবং যা ওষুধের মধ্যে গণ্যই নয়; বরং তা মরণঘাতী রোগ ও তীব্র বিষ? নিঃসন্দেহে তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ; আর নিষেধাজ্ঞা হারাম হওয়া দাবি করে। এটি কিয়াসুল আওলার অন্তর্ভুক্ত, আর উসূলে প্রতিষ্ঠিত যে তা দলিল।

দলিলসমূহের মধ্যে আরও রয়েছে সেই হাদীস:

والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس

> আর গুনাহ হলো তা, যা তোমার অন্তরে খচখচ করে এবং যা মানুষ জেনে ফেলুক তা তুমি অপছন্দ করো।

আর ধূমপায়ীদের মধ্যে যারা বিবেকবান, তারা ধোঁয়ার কদর্যতা জানে এবং মানুষ তাদের ব্যাপারে জেনে ফেলুক — তা তারা অত্যন্ত অপছন্দ করে। এ কারণেই তারা যখন এটি করতে চায়, তখন দেয়ালের আড়ালে ও বন্ধ দরজার পেছনে লুকিয়ে পড়ে, যাতে কেউ তাদের না দেখে। আর আপনি দেখবেন, তারা যখন মানুষের সমাবেশে যায়, তখন প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেদের থেকে সেসব গন্ধ ও লক্ষণ দূর করতে, যা মানুষকে তাদের প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে দেয়। তাদের এই আচরণই বুঝিয়ে দেয় যে, তা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তবে যার লজ্জা চলে গেছে, আল্লাহ যার অন্তর্দৃষ্টির আলো নিভিয়ে দিয়েছেন এবং যে মানুষের সামনে এটিকে সৌন্দর্য মনে করে ও এতে বাহাদুরি দেখায় — তার কোনো ধর্তব্যতা নেই, তার স্বভাবের বিকৃতি ও ভেতরের বিধ্বস্ততার কারণে।

এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর নেই যে, আমরা কোনো ধূমপায়ীর ব্যাপারে জানি না যে সে "বিসমিল্লাহ" দিয়ে ধূমপান শুরু করেছে, এবং তাদের কারও ব্যাপারে জানি না যে সে "আলহামদুলিল্লাহ" দিয়ে তা শেষ করেছে। কারণ ধোঁয়া তাদের কাছে খাদ্যও নয়, পানীয়ও নয়, এমন কোনো নিয়ামতও নয় যার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা হয় ও শেষে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়। বরং তা তাদের কাছে এক বিপদ, যাতে তারা আক্রান্ত হয়েছে; এক ত্রুটি ও ঘাটতি, যা তারা নিজেদের ভেতরে অনুভব করে অথচ অন্যদের কাছে তা স্পষ্ট করে বলে না।

আর আল্লাহর দোহাই, ধূমপায়ী সিগারেট শেষ করার পর তা নিয়ে কী করে? সে তা পায়ের নিচে পিষে ফেলে — কারণ তা তার কাছে এক তুচ্ছ ও হেয় বস্তু, তার অন্তরে তার কোনো মূল্য ও মর্যাদা মোটেই নেই। বরং ধোঁয়া যদি তার সঙ্গীদের কাছে নিয়ামত হতো, তবে তারা পায়খানা ও প্রস্রাব-পায়খানার স্থানে তা করাকে রুচিসম্মত মনে করত না; কিন্তু তাদের অনেকেই পায়খানার জায়গায় ধূমপান করতে কোনো অস্বস্তি বোধ করে না, এবং শেষ হলে তা মলের গর্তেই ছুঁড়ে ফেলে — তার কোনো তোয়াক্কা না করে, কারণ তা তার কাছে মূলত কোনো বস্তুই নয়। তার কাছে যদি তা সম্মানার্হ হতো, তবে সে তার সঙ্গে এমন আচরণ করত না।

বরং আমরা যদি ধূমপায়ীকে জিজ্ঞেস করি এবং বলি:— আপনার মত কী, যদি আপনি এমন কাউকে দেখেন যে পাঁচ রিয়াল মূল্যের একটি নোট পোড়াচ্ছে? সে দিয়াশলাই নিয়ে এই নোটটি পোড়াতে শুরু করল — তার ব্যাপারে আপনার মত কী? আমার ধারণা সে বলবে:— এ লোকটি পাগল, কারণ সে নিজের সেই সম্পদ নষ্ট করছে যা উপার্জন করতে সে কষ্ট করেছে। তখন আমরা তাকে বলব:— তাহলে সেই ব্যক্তির অবস্থা কী, যে নিজের সম্পদ দিয়ে ধোঁয়া কেনে যাতে তা জ্বালিয়ে তা দিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, ঠোঁট ও সমগ্র দেহ পোড়ায়, এবং নিজের সম্পদ দিয়ে নিজ দেহে সেসব

ধ্বংসাত্মক রোগ ও মারণব্যাধি রোপণ করে, যেগুলো থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই এবং যেগুলোর পরিণতি হয় মৃত্যু? সে কি নিন্দার অধিকতর যোগ্য নয়? নিঃসন্দেহে বিবেকবান বলবে:— হ্যাঁ।

তবে তা এক বিরাট বিপদ ও আকস্মিক ফিতনা, যা থেকে বেরোনোর কোনো পথ নেই — ঈমান বৃদ্ধি করা, (আল্লাহর) মুরাকাবা রোপণ করা, ভয়ের স্তরসমূহ পূর্ণ করা, সংকল্পের দৃঢ়তা, বর্জনের ব্যাপারে ইচ্ছার সত্যতা, ধূমপায়ী সঙ্গীদের সঙ্গ ত্যাগ করা, তাদের মেলামেশা থেকে দূরে থাকা, নিজেকে বোঝানো যে এর কোনো উপকারিতা নেই, এ থেকে সতর্ককারী ও এর বিপদ বর্ণনাকারী প্রচারপত্র পাঠ করা, এবং এর ক্ষতি ও এর শরঈ হুকুম সম্পর্কে জানা — এগুলো ছাড়া। আমি মহান ও সুউচ্চ আল্লাহর কাছে তাঁর নামের অসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন প্রত্যেক মুসলিমকে এই ফিতনা থেকে রক্ষা করেন, আমাদের ও আমাদের ভাইদের এ থেকে হেফাজত করেন, আমাদের নফসের অনিষ্ট ও আমাদের আমলের মন্দ থেকে আশ্রয় দেন, এবং আমাদের সঙ্গে তাঁর ক্ষমা, দানশীলতা ও উদারতার আচরণ করেন। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক জ্ঞানী।

ধূমপান হারাম: লেখকের দলিল

ধূমপান হারাম, এতে কোনো সন্দেহ নেই

- **আ'রাফ ১৫৭** — অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম; ধোঁয়া তার অন্তর্ভুক্ত
- **বাকারা ১৯৫** — নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না
- **নিসা ২৯-৩০** — নিজেদেরকে হত্যা করো না
- **অপচয় ও অপব্যয়** — আ'রাফ ৩১; ইসরা ২৬-২৭
- **অপবিত্র ওষুধ থেকে নিষেধ** — অগ্রাধিকারমূলক কিয়াস
- **অন্তরে খচখচ করা গুনাহ** — মানুষ জেনে ফেলুক তা অপছন্দ করা
- **বর্জনের পথ** — ঈমান বৃদ্ধি, সংকল্প, ধূমপায়ী সঙ্গ ত্যাগ, ক্ষতি ও হুকুম জানা

প্রশ্ন ৩৬

প্রশ্ন ৩৭

সিহরের সংজ্ঞা দিন। এর কি কোনো বাস্তবতা আছে? সাহির (জাদুকর) কীভাবে তার কাজ সম্পন্ন করে? আর যে ব্যক্তি এর কিছুতে আক্রান্ত হয়েছে, তার চিকিৎসা কীভাবে করা হয়?

উত্তর: সিহর হলো — এমন জিনিস, যার কারণ গোপন ও সূক্ষ্ম; এটি এর ভাষাগত সংজ্ঞা। আর শরঈ পরিভাষায় তা হলো: কতগুলো গিঁট, যা বাঁধা হয়, এবং শয়তানি ঝাড়ফুঁক (রুকইয়া), যা পড়া হয় এবং এসব ইবলিসি ঝাড়ফুঁকসহ গিঁটগুলোর উপর ফুঁ দেওয়া হয়; ফলে আল্লাহ তা চাইলে যাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে আক্রান্ত হয়। তা অন্তরসমূহে ও দেহসমূহে প্রভাব ফেলে; ফলে সে অসুস্থ হয়, মারা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে; আর এর মধ্যে এমনও আছে যাতে মানুষ পাগল হয়ে যায় — আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আর এর বাস্তবতার ব্যাপারে: সালাফ ও সমস্ত ইমামের মাযহাব হলো, এর বাস্তবতা রয়েছে — প্রকাশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা; তা কেবল বাস্তবতাহীন কল্পনামাত্র নয়, বরং তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা। এর দলিল হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইজমা। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

والصحيح أن للسحر حقيقة, وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة ا.هـ.

"সঠিক কথা হলো, সিহরের বাস্তবতা রয়েছে। জমহুর এ ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং সাধারণ আলিমগণ এ মতেই রয়েছেন। কিতাব এবং সহীহ ও প্রসিদ্ধ সুন্নাহ এর উপরই প্রমাণ বহন করে।" — উদ্ধৃতি শেষ

কিতাব থেকে দলিলসমূহের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার বাণী:

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسدٍ إذا حسد

বলো, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের প্রতিপালকের কাছে — তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা ঘনিয়ে আসে, গিঁটে ফুঁ-দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে, এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (সূরা আল-ফালাক: ১-৫)

আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে আদেশ দিয়েছেন সেসব জাদুকরিণীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইতে, যারা সিহরের গিঁটে ফুঁ দেয় — যা প্রমাণ করে যে এর প্রকৃত প্রভাব রয়েছে। কেননা যার কোনো বাস্তবতাই নেই, তা থেকে নবী ﷺ-কে আশ্রয় চাওয়ার আদেশ কীভাবে দেওয়া হবে? আর এটি সিহরের বাস্তবতা থাকার সবচেয়ে সুস্পষ্ট দলিলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

দলিলসমূহের মধ্যে রয়েছে তাঁর বাণী:

يفرقون به بين المرء وزوجه

তারা তা দিয়ে স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। (সূরা আল-বাকারা: ১০২)

আর এই বিচ্ছেদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা।

দলিলসমূহের মধ্যে রয়েছে তাঁর বাণী:

وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن الله

> আর তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তা দিয়ে কারও ক্ষতি করতে পারে না। (সূরা আল-বাকারা: ১০২)

আর অনুমতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এই ক্ষতিটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষতি, যার অনুভবযোগ্য প্রভাব রয়েছে।

আর সাহির কীভাবে তার কাজ সম্পন্ন করে — জেনে রাখুন, সাহির শয়তানদের সাহায্য গ্রহণ করা এবং তারা যেসব কথা ও কাজ পছন্দ করে সেগুলো আগে পেশ করা ছাড়া তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না। যেমন উচ্ছৃঙ্খলতা, কুফরি, তাওহীদ জবাই করে ফেলা, এমন তিলিসমাত (দুর্বোধ্য মন্ত্র) পাঠ করা যাতে রয়েছে আল্লাহ তাআলাকে গালি দেওয়া ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে গালি দেওয়া, এবং মুসহাফ ও শরীয়তকে সামগ্রিক ও বিস্তারিতভাবে অবমাননা করা। আর সাহির শয়তানদের কাছ থেকে শেখা ছাড়া কখনোই সিহর করতে সক্ষম হয় না, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر

> তারা মানুষকে সিহর শেখাত এবং যা বাবিলে হারুত ও মারুত — দুই ফেরেশতার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল (তাও)। আর তারা দুজন কাউকে শেখাত না যতক্ষণ না বলত: আমরা তো কেবল পরীক্ষা, সুতরাং তুমি কুফরি করো না। (সূরা আল-বাকারা: ১০২)

সিহর: সংজ্ঞা ও বাস্তবতা

সিহর

ভাষাগত অর্থ
যার কারণ গোপন ও সূক্ষ্ম

শরঈ অর্থ
গিঁট ও শয়তানি ঝাড়ফুঁক, তাতে ফুঁ; আল্লাহ চাইলে আক্রান্ত হয়

প্রভাব
অসুস্থতা, মৃত্যু, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, পাগলামি

বাস্তবতা
সালাফ ও সমস্ত ইমামের মাযহাব — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা আছে

সূরা ফালাক
গিঁটে ফুঁ-দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয়

বাকারা ১০২
বিচ্ছেদ ঘটায়; আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ক্ষতি করতে পারে না

সাহিরের পদ্ধতি
শয়তানদের পছন্দের কুফরি কথা ও কাজ; শেখা ছাড়া সম্ভব নয়

প্রশ্ন ৩৭

আর এর চিকিৎসার পদ্ধতি — এবং এই প্রশ্নে আমাদের কাছে এটিই উদ্দিষ্ট; পূর্বের বিষয়গুলো আমরা কেবল ভূমিকা হিসেবেই উল্লেখ করেছি। এর চিকিৎসা কয়েকটি পদ্ধতিতে হয়, যার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তিনটি:—

প্রথম: ইলাহি ওষুধসমূহ — দুআ ও রুকইয়াহ শরইয়্যাহ।

দ্বিতীয়: সিহর বের করে এনে তা বাতিল করে দেওয়া।

তৃতীয়: সিহরের কষ্ট যে স্থানে পৌঁছেছে, সেখান থেকে নিষ্কাশন (ইস্তিফরাগ)।

সিহরের চিকিৎসার তিন প্রসিদ্ধ পদ্ধতি

১ **প্রথম**
ইলাহি ওষুধ — দুআ ও রুকইয়াহ শরইয়্যাহ

২ **দ্বিতীয়**
সিহর বের করে এনে তা বাতিল করে দেওয়া

৩ **তৃতীয়**
সিহরের কষ্ট যে স্থানে পৌঁছেছে সেখান থেকে নিষ্কাশন (ইস্তিফরাগ)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস এ সবের মূল ভিত্তি

আর এ সবকিছুর মূল ভিত্তি হলো উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, নবী ﷺ-এর উপর সিহরের ঘটনায়। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর বনু যুরাইকের এক ব্যক্তি সিহর করেছিল, যাকে বলা হতো লাবীদ ইবনুল আ'সাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এমন কল্পনা হতো যে তিনি কোনো কাজ করেছেন অথচ তিনি তা করেননি।

অবশেষে যখন এক রাত বা এক দিন এলো, আর তিনি আমার কাছে ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন এবং আবার তাঁর কাছে দুআ করলেন, তারপর বললেন:

يا عائشة, أشعرت أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب, قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم, قال: في أي شيء؟ قال: في مشطٍ ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر, قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان

হে আয়িশা, তুমি কি জানতে পেরেছ যে, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে যে বিষয়ে ফতোয়া চেয়েছিলাম, তিনি সে বিষয়ে আমাকে ফতোয়া দিয়েছেন? আমার কাছে দুজন লোক এলো; তাদের একজন আমার মাথার কাছে বসল এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে। তখন তাদের একজন অপরজনকে বলল:— লোকটির কষ্ট কী? সে বলল: — তার উপর সিহর করা হয়েছে। সে বলল:— কে তার উপর সিহর করেছে? সে বলল:— লাবীদ ইবনুল আ'সাম। সে বলল:— কোন জিনিসে? সে বলল:— একটি চিরুনি ও চিরুনিতে জড়ানো চুলে এবং পুরুষ খেজুরগাছের মোচার খোলে। সে বলল:— আর তা কোথায়? সে বলল:— যারওয়ান কূপে।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের একদল নিয়ে সেখানে গেলেন; তিনি এসে বললেন:

يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء, وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين

হে আয়িশা, এর পানি যেন মেহেদি ভেজানো পানি, আর এর খেজুরগাছের মাথাগুলো যেন শয়তানের মাথা।

আমি বললাম:— হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি তা বের করে আনলেন না? তিনি বললেন:

قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شراً, فأمر بها

أي بالبئر فدفنت

আল্লাহ তো আমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন; তাই আমি অপছন্দ করলাম যে এর মাধ্যমে মানুষের উপর কোনো অনিষ্ট উসকে দিই। — তারপর তিনি সেটির — অর্থাৎ কূপটির — ব্যাপারে আদেশ দিলেন, ফলে তা মাটিচাপা দেওয়া হলো। — মুত্তাফাকুন আলাইহি

নবীর ওপর সিহরের ঘটনা: ক্রম

১ **সিহর করল**
বনু যুরাইকের লাবীদ ইবনুল আ'সাম

২ **নবীর দুআ**
তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, আবার দুআ করলেন

৩ **দুজন লোকের কথোপকথন**
সিহরের জিনিস চিরুনি, চুল ও খেজুরের মোচার খোল; স্থান যারওয়ান কূপ

৪ **নবী কূপে গেলেন**
সাহাবীদের একদলকে নিয়ে

৫ **কূপের ব্যাপারে আদেশ**
কূপ মাটিচাপা দেওয়া হলো

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা — মুত্তাফাকুন আলাইহি

আর এই হাদীসটি সিহরের চিকিৎসার কয়েকটি পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করেছে। সেগুলো নিম্নরূপ:—

প্রথম: একমাত্র আল্লাহ তাআলার দিকে সত্যিকারের আশ্রয়গ্রহণ, এবং উপস্থিত অন্তর ও বিষণ্ন-সত্যনিষ্ঠ কণ্ঠে তাঁর কাছে বেশি বেশি দুআ করা — সঙ্গে দুআর অধ্যায়ে রক্ষণীয় আদবগুলো মেনে চলা। কেননা সিহরে আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা নিরুপায়ের অবস্থা; আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ

> কে নিরুপায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করেন? (সূরা আন-নামল: ৬২)

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

> আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকারবশত মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা গাফির: ৬০)

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا

دعان...الآية

> আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, (বলে দাও) নিশ্চয়ই আমি নিকটে; আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই... (আয়াতের বাকি অংশ)। (সূরা আল-বাকারা: ১৮৬)

আর বান্দা যেন দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, তার মহান ও সুউচ্চ প্রতিপালকই দুআ কবুলকারী, প্রয়োজন পূরণকারী ও দুশ্চিন্তা দূরকারী; এবং যে তাঁকে ডাকে তার দুআ তিনি ফিরিয়ে দেন না — বিশেষত তাদের মধ্যে যে নিরুপায়। আর আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত জিনিস হলো দুআ। সে যেন মুক্তির জন্য তাড়াহুড়া না করে, এবং যেন জানে যে, যা তার উপর এসেছে তা তাকে এড়িয়ে যেত না, আর যা তাকে এড়িয়ে গেছে তা তার উপর আসত না। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন, আল্লাহকে ভয় করুন — হে সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যার উপর এ ধরনের কিছু নির্ধারণ করেছেন — এই মহান দরজাটির ব্যাপারে; কেননা এটিই মুক্তির দরজা। আর কতই না সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে কঠিন মুহূর্তে এই দরজায় প্রবেশ করে!

এর উপর প্রমাণ বহন করে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাণী: "((دعا الله ودعاه))" (তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন এবং আবার তাঁর কাছে দুআ করলেন), অর্থাৎ তিনি দুআ বারবার করলেন এবং মুক্তি, শিফা ও সুস্থতার জন্য তাঁর মহান ও সুউচ্চ প্রতিপালকের কাছে বারবার অনুনয় করলেন।

আর মুক্তির জন্য আপনার দুআয় আপনার আগ্রহ যেন থাকে কবুলের সময়গুলোতে — যেমন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, নফল সালাতের পর, আযানের সময় ও তার পরে এবং ইকামতের আগে, সিজদার অবস্থায়, বৃষ্টি বর্ষণের সময়, সফরের অবস্থায় ইত্যাদি; সঙ্গে অন্তর ও দ্বীনকে আল্লাহ তাআলার জন্য নিখাদ করা। কেননা আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকেও উত্তাল ঢেউ থেকে নাজাত দিয়েছিলেন, যখন তারা দ্বীনকে তাঁর জন্য নিখাদ করে তাঁকে ডেকেছিল; আর আপনি তো মুমিন, সুতরাং নিঃসন্দেহে আপনি কবুল হওয়ার অধিকতর যোগ্য।

আর সাবধান, তারপর সাবধান — আপনি যেন না বলেন:— আমি দুআ করলাম, দুআ করলাম, কিন্তু আমার দুআ কবুল হলো না; কেননা এটি দুআ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর হারাম খাওয়া থেকে দূরে থাকুন, কেননা তা দুআ কবুল না হওয়ার কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি আপনাকে সেই হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি:

ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام

فأنى يستجاب لذلك

> তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং সে হারাম দিয়ে প্রতিপালিত — তবে কীভাবে তার দুআ কবুল হবে?

আর দ্বীনদার ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের এবং রাত জেগে সালাত আদায়কারীদের কাছে দুআ চাওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করুন। আর আপনার দুআর আগে সদকা পেশ করুন, এবং সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আবারও সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

সিহর ও দুআ: লেখকের নির্দেশনা

করুন

- ✓ একমাত্র আল্লাহর দিকে সত্যিকারের আশ্রয়; উপস্থিত অন্তরে বেশি দুআ
- ✓ কবুলের সময়ে দুআ — রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, সিজদা, আযান ও ইকামতের মাঝে
- ✓ দ্বীনদার ও রাত জেগে সালাত আদায়কারীদের কাছে দুআ চাওয়া
- ✓ দুআর আগে সদকা পেশ করা

করবেন না

- ✗ "দুআ করলাম, কিন্তু কবুল হলো না" বলা
- ✗ হারাম খাওয়া — দুআ কবুল না হওয়ার কারণ

আর আমাদের কাছে এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যাঁকে আমরা বিশ্বাস করি — এক নারী সিহরে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং রাকীগণ তাঁর ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিজের শহরের ও শহরের বাইরের এমন কোনো রাকী বাকি রাখেননি যাঁর কাছে তিনি বসেননি; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁদের কারও হাতে তাঁর শিফা নির্ধারণ করেননি। যখন তাঁর উপর বছরের পর বছর দীর্ঘ হয়ে গেল এবং দুশ্চিন্তা তীব্র হয়ে উঠল, তখন এক রাতে তাঁর অন্তর ফেটে পড়ল এবং

অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি সেই রাতের শুরু থেকে ফজরের কিছু আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করে গেলেন যেন তিনি তাঁকে এই বিপদ থেকে সুস্থ করে দেন — বিনীত অন্তরে ও অবিরল অশ্রুতে। অতঃপর ফজরের কিছু আগে তাঁর দুই চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো, এবং তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে আকাশ থেকে একটি সাদা পাখি নেমে এলো এবং তাঁকে তার ডানা দিয়ে কয়েকবার আঘাত করল। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় জেগে উঠলেন, আর তাঁর মধ্যে কোনো ব্যথা-বেদনা অবশিষ্ট ছিল না। তিনি বেরিয়ে গেলেন নিজের পরিবারকে ফজরের সালাতের জন্য জাগাতে; তাদের কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে ইনিই সেই অমুক নারী, যাঁর যন্ত্রণা দীর্ঘ হয়েছিল এবং যাঁকে রোগ খেয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এ তো আল্লাহরই অনুগ্রহ ও রহমত। তিনি তাঁকে প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করলেন — অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু, নিজ বান্দাদের প্রতি সূক্ষ্মদর্শী।

সুতরাং দুআ, দুআ — হে বিপদগ্রস্তগণ! কেননা সিহরের চিকিৎসার সর্বোত্তম পথ হলো আল্লাহ তাআলার দিকে আশ্রয় নেওয়া, ইলাহি চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণ করা, বেশি বেশি দুআ করা এবং মহান ও সুউচ্চ তাঁর উপর সত্যিকারের ভরসা করা।

এক নজরে

- ★ অ্যালকোহলযুক্ত ওষুধ হারাম; চিকিৎসা নিরুপায়তার অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়
- ★ লিঙ্গ-পরিবর্তন অস্ত্রোপচার নিশ্চিত হারাম
- ★ পাগল ও অজ্ঞান ব্যক্তির লেনদেন শুদ্ধ নয়
- ★ আশঙ্কাজনক রোগে এক-তৃতীয়াংশের বেশি দান ওয়ারিসদের অনুমতি ছাড়া জায়েয নয়
- ★ ধূমপান হারাম
- ★ সিহরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা আছে — সালাফ ও ইমামগণের মাযহাব
- ★ সিহরের চিকিৎসায় সর্বোত্তম পথ: আল্লাহর দিকে আশ্রয় ও ইলাহি চিকিৎসা

যাচাই করুন

1. অ্যালকোহলযুক্ত ওষুধ সম্পর্কে লেখকের হুকুম কী?

ক. অল্প হলে জায়েয | খ. মাকরূহ | গ. হারাম; তা দিয়ে চিকিৎসা, বিক্রি ও ক্রয় জায়েয নয়

2. লিঙ্গ-পরিবর্তন অস্ত্রোপচারের হুকুম কী?

ক. প্রয়োজনে জায়েয | খ. মাকরূহ | গ. নিশ্চিত হারাম

3. আশঙ্কাজনক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ওয়ারিসদের অনুমতি ছাড়া কতটুকু দান করতে পারে?

ক. পুরো সম্পদ | খ. অর্ধেক | গ. সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয়

4. ধূমপান সম্পর্কে লেখকের হুকুম কী?

ক. মাকরূহ | খ. মুবাহ | গ. হারাম

5. সিহর সম্পর্কে সালাফ ও ইমামগণের মাযহাব কী?

ক. কল্পনামাত্র, বাস্তবতা নেই | খ. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা আছে | গ. কেবল মানসিক রোগ

6. পাগল ব্যক্তির বেচা-কেনা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. শুদ্ধ | খ. অভিভাবক ছাড়াই শুদ্ধ | গ. শুদ্ধ নয়, কারণ লেনদেনের যোগ্যতা নেই

উত্তর: ১–গ, ২–গ, ৩–গ, ৪–গ, ৫–খ, ৬–গ

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

সিহর নিরাময়ের বাকি পদ্ধতি, কৃত্রিম প্রজনন, মাদকের ক্ষতি, জাবীরার বিধান ও মানুষের রক্ত

দ্বিতীয় পদ্ধতি: সিহরকে তার স্থান থেকে বের করে এনে তা নষ্ট করে দেওয়া। এটি গিঁটের সিহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা নবী ﷺ যখন কূপ থেকে সিহর বের করে আনলেন, তখন তাঁর যে কষ্ট ছিল তা চলে গেল — যেন তিনি বাঁধন থেকে মুক্ত হলেন। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, বের করে আনামাত্রই সিহরের প্রভাব চলে যায়, ইনশাআল্লাহ। আর যদি এর সঙ্গে গিঁটগুলো খোলা এবং মুআওবিযাতাইন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠ যুক্ত করে কাজটি পূর্ণ করা হয়, তবে তা আরও উত্তম, ইনশাআল্লাহ। কেননা বাইহাকীর «দালাইল»-এ বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা যখন নবী ﷺ-এর উপর করা সিহর বের করলেন, তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে মুআওবিযাতাইন নিয়ে এলেন এবং বললেন:

يا محمد قل أعوذ برب الفلق وحل عقدة من شر ما خلق

وحل عقدة, حتى فرغ منها ثم قال قل أعوذ برب الناس وحل

عقدة, حتى فرغ من السورة وحل العقد كلها

হে মুহাম্মদ! বলুন — «قل أعوذ برب الفلق» — আর একটি গিঁট খুলুন; «من شر ما خلق» — আর একটি গিঁট খুলুন; এভাবে তিনি সূরাটি শেষ করলেন। এরপর তিনি বললেন — «قل أعوذ برب الناس» — আর একটি গিঁট খুলুন; এভাবে সূরাটি শেষ হলো এবং সব গিঁটই খুলে গেল।

আর আহমদ, তাবারানী «আল-কাবীর»-এ, ইবনু আবী শাইবা এবং নাসাঈ «আল-কুবরা»-য় যাইদ ইবনু আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে নবী ﷺ-এর উপর করা সিহরের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, তাতে আছে:

فبعث رسول الله علياً فاستخرجها فجاء بها, فحللها

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন; তিনি তা বের করে আনলেন, নিয়ে এলেন এবং গিঁটগুলো খুলে দিলেন।

এই হাদীসটি মুতলাক (শর্তহীন) আর তার আগেরটি মুকাইয়াদ (শর্তযুক্ত); আর সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম হলো, মুতলাককে মুকাইয়াদের উপর বহন করা হয়।

এখন যদি আপনি বলেন: সিহরগ্রস্ত ব্যক্তি এই গিঁটগুলোর জায়গা কীভাবে চিনবে? তবে আমি বলি: কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে —

তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো দুআ। কেননা নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টি তখনই উন্মোচিত হয়েছিল, যখন তিনি দুআ করলেন, দুআ করলেন এবং দুআ করলেন।

তার মধ্যে আরেকটি হলো ঘুমের মধ্যে সৎ স্বপ্ন। মানুষ যদি এমন স্বপ্ন দেখে যা এর প্রতি ইঙ্গিত করে, তবে সে স্বপ্নে দেখা জায়গাটি দেখুক।

তার মধ্যে আরেকটি হলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনুমান করা — বাড়ির আশপাশে, শৌচাগারে, গাছপালায়, ঘরের চারপাশে এবং যেসব জায়গায় সে সাধারণত বসে, সেসব জায়গায় খোঁজা; আর এ ব্যাপারে সে চেষ্টার কসুর না করুক।

তার মধ্যে আরেকটি হলো আছর-করা শয়তানের সংবাদ দেওয়া — জিনদের অবস্থা ও তাদের প্রচুর মিথ্যা বলার স্বভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কারী কয়েকবার তাকে পরখ করার পর। শয়তান যদি কোনো জায়গা নির্দিষ্ট করে দেয় এবং তার সত্যবাদিতার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয়, তবে সে জায়গাটি খুঁজে দেখা হোক — যদি তাতে কোনো ফাসাদ না থাকে। এই পদ্ধতিতে কত কত কত গিঁটের জায়গা শনাক্ত করা গিয়েছে!

তার মধ্যে আরেকটি হলো সাহেরের নিজের সংবাদ দেওয়া — সে যেসব গিঁট বেঁধেছে ও যাতে তার সিহর প্রয়োগ করেছে সেগুলোর জায়গা সম্পর্কে; আর তা তখনই হয়, যখন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

কিন্তু হে আমার ভাই, সাবধান! গণক ও যাদুকরদের কাছে গিয়ে এর জায়গা চিনতে যেয়ো না; কেননা তাতে তুমি তোমার তাওহীদ ধ্বংস করবে, তোমার ঈমান হত্যা করবে এবং যেখান থেকে তুমি শরীরের আরোগ্য চাইছ, সেখান থেকেই তোমার দুর্বলতা বেড়ে যাবে।

সিহরের গিঁটের স্থান চেনার উপায়

করুন	করবেন না
✓ দুআ — নবীর কাছে বিষয়টি দুআর পরই উন্মোচিত হয়েছিল	✗ গণক ও জাদুকরের কাছে যাওয়া — তাওহীদ ধ্বংস, ঈমান হত্যা
✓ ঘুমের মধ্যে সৎ স্বপ্ন	
✓ বাড়ির আশপাশে, গাছপালায়, বসার জায়গায় অনুসন্ধান	
✓ আছর-করা শয়তানের সংবাদ — জিনদের মিথ্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কারী কয়েকবার পরখের পর, প্রবল ধারণা হলে, ফাসাদ না থাকলে	
✓ সাহেরের নিজের সংবাদ — কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করলে	

দ্বিতীয় পদ্ধতির ধারাবাহিকতা

তৃতীয় পদ্ধতি: ইলম, আমানত, দ্বীনদারি ও অভিজ্ঞতার জন্য পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে রুকইয়াহ শরইয়্যাহ চালিয়ে যাওয়া; অথবা সিহরগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেই নিজের উপর পাঠ করা — যদি সে কোনো ক্ষতি ছাড়া তা করতে সক্ষম হয়। আমরা আগেই সেই আয়াতগুলো উল্লেখ করেছি যেগুলো দিয়ে রুকইয়াহ করা হয়; প্রসঙ্গের উপযোগিতার কারণে এখানে সেগুলো আবার উল্লেখ করছি। তাই আমি বলি:—

প্রথমত: সূরা আল-ফাতিহা। কেননা এটি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে এটিই শিফা। বিছা-দংশিত ব্যক্তির ঘটনায় যেমন এসেছে, তেমনই এটি বারবার পাঠ করা মুস্তাহাব।

দ্বিতীয়ত: সূরা আল-বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াত। আর পুরো সূরাটি পাঠ করা কিংবা — যদি পাঠ করা সম্ভব না হয় — অন্তত ক্যাসেট থেকে হলেও তা শোনা মুস্তাহাব; কেননা হাদীসে এসেছে যে, তা গ্রহণ করা বরকত, তা বর্জন করা আক্ষেপ, আর যাদুকরেরা তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।

তৃতীয়ত: আয়াতুল কুরসী, এবং তা বেশি বেশি পাঠ করা।

চতুর্থত: সূরা আল-বাকারার শেষ আয়াতগুলো।

পঞ্চমত: «قل هو الله أحد», «قل أعوذ برب الفلق» ও «قل أعوذ برب الناس» — সেগুলো অনেকবার পুনরাবৃত্তি করাসহ।

ষষ্ঠত: আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করা:

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان...

> আর তারা সেটার অনুসরণ করল, শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বের বিরুদ্ধে যা আবৃত্তি করত... (সূরা আল-বাকারা: ১০২) — পূর্ণ আয়াতটি।

সপ্তমত: সূরা আল-আ'রাফে আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين

> তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করবে, নয় আমরাই নিক্ষেপকারী হবো। (সূরা আল-আ'রাফ: ১১৫)

আর এর পরে ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ আয়াতও পাঠ করুন — এগুলো সবই একশর পরের আয়াত (অর্থাৎ ১১৬ থেকে ১২২)।

অষ্টমত: সূরা ত্বহায় আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করা:

قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى

> তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করবে, নয় আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হবো। (সূরা ত্বহা: ৬৫)

আর ছেষট্টিতম, সাতষট্টিতম, আটষট্টিতম, ঊনসত্তরতম ও সত্তরতম আয়াত (অর্থাৎ ৬৬ থেকে ৭০)।

নবমত: সূরা ইউনুসে আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করা:

وقال فرعون ائتوني بكل ساحرٍ عليم

> আর ফিরআউন বলল, আমার কাছে প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে নিয়ে এসো। (সূরা ইউনুস: ৭৯)

আর এর পরে আশিতম, একাশিতম ও বিরাশিতম আয়াত (অর্থাৎ ৮০ থেকে ৮২) পাঠ করুন — আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তার সবই বারবার পুনরাবৃত্তি করাসহ।

সিহরে পাঠের আয়াত ও সূরা

- [ ] সূরা আল-ফাতিহা
- [ ] সূরা আল-বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াত; সম্ভব হলে পুরো সূরা বা ক্যাসেটে শোনা
- [ ] আয়াতুল কুরসী — বেশি বেশি
- [ ] সূরা আল-বাকারার শেষ আয়াতগুলো
- [ ] ইখলাস, ফালাক ও নাস — অনেকবার
- [ ] সূরা আল-বাকারা ১০২
- [ ] সূরা আল-আ'রাফ ১১৫ থেকে ১২২
- [ ] সূরা ত্বহা ৬৫ থেকে ৭০
- [ ] সূরা ইউনুস ৭৯ থেকে ৮২

তৃতীয় পদ্ধতি — নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে রুকইয়াহ শরইয়্যাহ, অথবা ক্ষতি ছাড়া নিজে পাঠ

চতুর্থ পদ্ধতি: তিনবার গোসল করার মতো পরিমাণ পানি নিয়ে আসবেন — যদি তা যমযমের পানি হয় তবে তা আরও ভালো, আরও ভালো। আর সাতটি বরই (সিদর) পাতা নিয়ে এসে দুই পাথরের মাঝে পিষে সেই পানিতে দেবেন। এরপর পানির উপর ফুঁ দিয়ে আমরা আপনাকে যেসব আয়াতের কথা আগে বলেছি সেগুলো পাঠ করবেন, এবং সিহরগ্রস্ত ব্যক্তি তা দিয়ে তিন দিন গোসল করবে। এটি একটি পরীক্ষিত ও উপকারী চিকিৎসা। আমাদের পিতৃতুল্য মহামান্য আল্লামা ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, এটি কোনো কোনো সালাফ থেকে বর্ণিত।

পঞ্চম পদ্ধতি: ইস্তিফরাগ (নিষ্কাশন — বমি বা রেচনের মাধ্যমে ভেতরের জিনিস বের করে দেওয়া) দিয়ে তার মোকাবিলা করা। বিষয়টি এই যে, সিহর কখনো পাকস্থলীতে জমে থাকতে পারে — যেমন যদি তা পান করানো বা খাওয়ানো হয়ে থাকে; তখন রুকইয়াহর সঙ্গে সঙ্গে আপনি দেখবেন সিহরগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবলভাবে বমি করছে। এটি খুবই ভালো, কারণ এই নিষ্কাশনের মাধ্যমে তার থেকে প্রভাবটি চলে যায়, ইনশাআল্লাহ। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো, সিহরগ্রস্ত ব্যক্তি যে জায়গায় সবসময় ভারী ভাব অনুভব করে এবং যেখানে সিহর তার উপর প্রভাব ফেলেছে বলে বোঝে, সেই জায়গায় হিজামা (শিঙা লাগানো) করা। ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ তাঁর «মুসনাদ»-এ আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলার হাদীস থেকে সনদসহ মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন:

أن النبي احتجم على رأسه حين طب

> নবী ﷺ যখন «তুব্ব» করা হলো — অর্থাৎ যখন তাঁর উপর সিহর করা হলো — তখন তিনি মাথায় হিজামা করালেন।

কিন্তু এই হাদীসটি দুর্বল, কারণ এটি মুনকাতি' (সনদ বিচ্ছিন্ন)। তবে হিজামার প্রতি উৎসাহদানকারী সাধারণ দলিলগুলো এবং এটি যে নববী চিকিৎসাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত — তা তো বহাল থাকেই। এই মাসআলার উপর আলোচনার এ-ই হলো কিছু নমুনা। আর আল্লাহ আমাদের রব — তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

সিহর নিরাময়ের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পদ্ধতি

১ **দ্বিতীয়**
সিহর বের করে নষ্ট করা; গিঁট খোলা ও মুআওবিযাতাইন পাঠ যুক্ত করলে উত্তম

২ **তৃতীয়**
নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে রুকইয়াহ শরইয়্যাহ, অথবা নিজে পাঠ

৩ **চতুর্থ**
সাত সিদর পাতা পিষে পানিতে দিয়ে, আয়াত পাঠ ও ফুঁ দিয়ে তিন দিন গোসল

৪ **পঞ্চম**
ইস্তিফরাগ — বমির মাধ্যমে নিষ্কাশন; ভারী জায়গায় হিজামা

চতুর্থ পদ্ধতিতে ইবনু বায রহিমাহুল্লাহর ফতোয়া আছে এবং তা কোনো কোনো সালাফ থেকে বর্ণিত

প্রশ্ন ৩৮

কৃত্রিম প্রজনন (তালকীহ সিনাঈ) বলতে কী বোঝানো হয়? এর মধ্যে কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম? দলিলসহ তা স্পষ্ট করুন।

উত্তর: আমি বলি:— কৃত্রিম প্রজনন বলতে বোঝানো হয় — চিকিৎসাশাস্ত্রীয় নলের (টেস্টটিউব) হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পুরুষের বীর্যের সঙ্গে নারীর ডিম্বাণুর মিশ্রণ ঘটানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। এর উদ্দেশ্য হলো গর্ভধারণ কামনা করা। এই প্রশ্নটি কয়েকটি ফিকহ পরিষদের সামনে পেশ করা হয়েছিল, এবং তাঁদের উত্তরের সারকথা ছিল নিম্নরূপ:— আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান যে এই প্রজনন-প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেছে, তা সাতটি পদ্ধতির বাইরে নয়:—

প্রথম পদ্ধতি: স্বামীর কাছ থেকে নেওয়া শুক্রাণুর সঙ্গে তার জন্য পরনারী এমন অন্য একজন নারীর কাছ থেকে নেওয়া ডিম্বাণুর নিষেক ঘটানো হবে, তারপর এই নিষিক্ত ডিম্বাণুটি তার নিজের স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করা হবে। এই পদ্ধতিটি সর্বসম্মতভাবে হারাম। কারণ এই ডিম্বাণুটি তার স্ত্রীর জরায়ুতে থাকা হালাল নয়, আর মূলত তার বীর্য অন্য নারীর ডিম্বাণুর সঙ্গে মেশানোই হালাল নয়। কেননা এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন এই গর্ভ কোনো শরঈ গর্ভ নয়। কারণ সন্তানটি দ্বিতীয় নারীর — অর্থাৎ যিনি তার স্ত্রী — তাঁর সন্তান নয়, যেহেতু ডিম্বাণুটি তাঁর ডিম্বাণু নয়। আবার এই সন্তান তার নিজেরও সন্তান হবে না, কারণ ডিম্বাণুর মালিক নারীটি তার শরঈ স্ত্রী নয়, যেহেতু তাদের মধ্যে কোনো আকদ নেই। ফলে এতে বংশপরিচয়ের সংমিশ্রণ ঘটে এবং ইজ্জত-আবরুর লঙ্ঘন হয়। অথচ শরীয়তের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ইজ্জত ও বংশধারার সংরক্ষণ; এ কারণেই যিনা হারাম করা হয়েছে বহু কারণে, আর সেই কারণগুলোর একটি হলো বংশপরিচয়ের সংমিশ্রণ। সন্তান লাভ ও গর্ভধারণের এই পদ্ধতিটি ঠিক সেই একই ইল্লত (কারণ) বহন করে, যার জন্য যিনা হারাম করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: স্বামী নয় এমন কোনো পুরুষের শুক্রাণুর সঙ্গে স্ত্রীর ডিম্বাণুর নিষেক ঘটানো হবে, তারপর তা সেই স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করা হবে যাঁর কাছ থেকে গর্ভধারণ কাম্য। এই পদ্ধতিটিও সর্বসম্মতভাবে হারাম; এর ইল্লত ঠিক আগের পদ্ধতির ইল্লতেরই অনুরূপ।

তৃতীয় পদ্ধতি: স্বামীর শুক্রাণুর সঙ্গে তার নিজের স্ত্রীরই ডিম্বাণুর নিষেক ঘটানো হবে, তারপর এই নিষিক্ত ডিম্বাণুটি নিয়ে অন্য এক স্বেচ্ছাসেবী নারীর জরায়ুতে স্থাপন করা হবে। এই পদ্ধতিটিও সর্বসম্মতভাবে হারাম — প্রথম পদ্ধতিতে আমরা যে কারণ দেখিয়েছি সে কারণেই; বরং এটি তার আগেরগুলোর চেয়েও কঠিনতরভাবে হারাম।

চতুর্থ পদ্ধতি: এক পরপুরুষের শুক্রাণুর সঙ্গে অন্য এক পরনারীর ডিম্বাণুর বাহ্যিক নিষেক ঘটানো হবে, তারপর এই নিষিক্ত ডিম্বাণুটি সেই স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করা হবে যাঁর কাছ থেকে গর্ভধারণ কাম্য। এই পদ্ধতিটি তার আগেরগুলোর চেয়েও কঠিনতরভাবে হারাম, কারণ এতে দুটি পক্ষই বহিরাগত (আজনাবী); আর আগের পদ্ধতিগুলোতে বহিরাগত পক্ষ ছিল একটি।

পঞ্চম পদ্ধতি: স্বামীর শুক্রাণু ও তার প্রথম স্ত্রীর ডিম্বাণুর মধ্যে বাহ্যিক নিষেক ঘটানো হবে, তারপর এই ডিম্বাণুটি নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করা হবে। এই পদ্ধতিটিও হারাম — সেই একই ইল্লতে, যা দিয়ে আমরা প্রথম পদ্ধতির কারণ ব্যাখ্যা করেছি।

ষষ্ঠ পদ্ধতি: স্বামীর নিজের শুক্রাণুর সঙ্গে স্ত্রীর নিজেরই ডিম্বাণুর বাহ্যিক নিষেক ঘটানো হবে, তারপর এই নিষিক্ত ডিম্বাণুটি নিয়ে সেই ডিম্বাণুর মালিক স্ত্রীর নিজেরই জরায়ুতে স্থাপন করা হবে। এই পদ্ধতিটি জায়েয, ইনশাআল্লাহ; কারণ এতে শরঈ দিক থেকে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় নেই। বরং এতে রয়েছে সন্তান লাভ ও উম্মতের সংখ্যাবৃদ্ধির কল্যাণ বাস্তবায়ন। তবে অপরিহার্য শর্ত হলো — এর দিকে ডাকে এমন অনিবার্য প্রয়োজন থাকতে হবে; এর দায়িত্ব নেবেন নির্ভরযোগ্য মুসলিম চিকিৎসকগণ; এবং তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হবেন যে, এই শুক্রাণু ও এই ডিম্বাণু হুবহু সেগুলোই যা এই দম্পতির কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। আর এসবের কোনো একটিতেও যখনই সন্দেহ দেখা দেবে, তখনই ওয়াজিব হলো তা বর্জন করা এবং এই নিষেক প্রক্রিয়া সম্পাদনে অগ্রসর হওয়া হারাম।

সপ্তম পদ্ধতি: স্বামীর শুক্রাণু নিয়ে নারীর যোনিপথে বা জরায়ুর উপযুক্ত স্থানে অভ্যন্তরীণভাবে প্রবেশ করানো হবে — নারীর ডিম্বাণু থেকে কিছুই বাইরে না নিয়ে; আর এই নারী বলতে আমি তার স্ত্রীকেই বোঝাচ্ছি। এই পদ্ধতিটিও জায়েয, তবে ষষ্ঠ পদ্ধতিতে আমরা যেসব বিষয়ে জোর দিয়েছি সেগুলোর উপর জোর দেওয়াসহ।

তাঁরা যে ফতোয়া দিয়েছেন, এটিই তার সারকথা; এবং আমাদের কাছে তা শুদ্ধ হওয়ার কারণে আমরাও তা-ই বলি। এই পদ্ধতিগুলোর যা অতিবাহিত হলো তা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রথম পাঁচটি পদ্ধতিই হারাম; এর ইল্লত হলো — শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর এমন জায়গায় অবস্থান নেওয়া, যেখানে তার থাকা হালাল নয়। আর ষষ্ঠ ও সপ্তম পদ্ধতি দুটি জায়েয। আমাদের কাছে এটিও স্পষ্ট হয় যে, প্রথম পাঁচটি পদ্ধতিতে স্বামী ও যাঁর কাছ থেকে গর্ভধারণ কাম্য সেই স্ত্রীর বাইরের একটি পক্ষ রয়েছে; আর কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়ায় তৃতীয় পক্ষের প্রবেশ এসব পদ্ধতি হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ। পক্ষান্তরে ষষ্ঠ ও সপ্তম পদ্ধতিতে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই; বরং তা কেবল স্বামী ও যাঁর কাছ থেকে গর্ভধারণ কাম্য সেই স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

কৃত্রিম প্রজননের সাত পদ্ধতি

পদ্ধতি	হুকুম
১. স্বামীর শুক্রাণু + পরনারীর ডিম্বাণু, স্ত্রীর জরায়ুতে	সর্বসম্মত হারাম
২. পরপুরুষের শুক্রাণু + স্ত্রীর ডিম্বাণু, স্ত্রীর জরায়ুতে	সর্বসম্মত হারাম
৩. স্বামী-স্ত্রীর নিষিক্ত ডিম্বাণু, অন্য নারীর জরায়ুতে	সর্বসম্মত হারাম; আগেরগুলোর চেয়েও কঠিন
৪. পরপুরুষ + পরনারীর নিষিক্ত ডিম্বাণু, স্ত্রীর জরায়ুতে	আরও কঠিনতর হারাম
৫. স্বামীর শুক্রাণু + প্রথম স্ত্রীর ডিম্বাণু, দ্বিতীয় স্ত্রীর জরায়ুতে	হারাম
৬. স্বামীর শুক্রাণু + স্ত্রীর ডিম্বাণু, সেই স্ত্রীর জরায়ুতে	জায়েয, ইনশাআল্লাহ — অনিবার্য প্রয়োজন, নির্ভরযোগ্য মুসলিম চিকিৎসক ও নিশ্চয়তাসহ; সন্দেহ হলে হারাম
৭. স্বামীর শুক্রাণু স্ত্রীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো	জায়েয, ষষ্ঠ পদ্ধতির শর্তসহ

প্রথম পাঁচটি হারাম — কারণ তৃতীয় পক্ষ; ষষ্ঠ ও সপ্তমে তৃতীয় পক্ষ নেই

প্রশ্ন ৩৯

শুক্রাণু ব্যাংক (বীর্য-ব্যাংক) প্রতিষ্ঠা করা কি জায়েয? এর কারণ ব্যাখ্যাসহ বলুন।

উত্তর: আমি বলি:— এটি হারাম, কোনোভাবেই জায়েয নয়। এ ব্যাপারে আহলুল ইলমের — আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন — মধ্যে কোনো মতভেদ আছে বলে আমি জানি না। এর কারণ বীর্যের নাপাকি নয় — না; কারণ আমাদের কাছে বিশুদ্ধ মত হলো, বীর্য পবিত্র। বরং এর কারণ হলো বীর্য বিক্রি করা হারাম। কেননা বীর্য — অর্থাৎ মানুষের বীর্য — বিক্রি করা কোনোভাবেই জায়েয নয়, এবং এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ আছে বলে আমরা জানি না। আরেকটি কারণ হলো, এসব ব্যাংকে আদৌ কোনো উপকারিতা নেই; কেননা তা থেকে কিছু নিয়ে কোনো নারীর ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করা কোনোভাবেই জায়েয নয় — সে নারী যে-ই হোক; এবং কোনো অবস্থাতেই সেই বীর্য কোনো নারীর যোনিপথে বা জরায়ুতে প্রবেশ করানো জায়েয নয় — সে নারী যে-ই হোক। এসবই হারাম — মাকাসিদের (উদ্দেশ্যগত) হারাম, নিছক ওয়াসাইলের (উপায়গত) হারাম নয়; বরং এ তো হুবহু যিনাই, কেবল সঙ্গমের প্রক্রিয়াটি ছাড়া। কেননা এসব ব্যাংকে এমন পুরুষদের বীর্য থাকে, যাদের পরিচয় জানা যায় না। অথচ ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ করা অপরিহার্য, বংশধারাকে এসব ধ্বংসস্থল থেকে রক্ষা করা অপরিহার্য, আর মুসলিমের জন্য রয়েছে এমন শরীয়ত যা তাকে শাসন করে।

আমাদের জানামতে সমস্ত ফিকহ পরিষদই শুক্রাণু সংরক্ষণ করাকে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করেছেন — এই আশঙ্কায় যে, শুক্রাণু মিশে যাবে, ফলে বংশপরিচয় মিশে যাবে এবং পৃথিবীর ব্যবস্থাই নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং যেসব পাশ্চাত্যপ্রেমী

মানুষ — যারা পশ্চিমের কোলে লালিত-পালিত এবং তাদের নর্দমা থেকে পানি পান করেছে — এর দাবি জানায়, তারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুক। আর শাসকের উপর ওয়াজিব হলো, তাদের ধমকানো এবং তাদের ও তাদের মতো লোকদের এমন কঠোর তা'যীর দেওয়া, যা তাদেরকে বংশধারার বিনষ্টি, মূল্যবোধের ধ্বংস ও সমাজের বিপর্যয় ঘটায় এমন জিনিসের দাবি জানানো থেকে বিরত রাখবে।

আমার জানামতে — আর সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই — মুসলিম ভূখণ্ডের কোথাও এসব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি; তবে সেগুলো রয়েছে কাফিরদের কাছে, যাদের শাসন করার মতো কোনো দ্বীন নেই এবং শিষ্টাচার শেখানোর মতো কোনো শরীয়ত নেই। কিন্তু এখান-ওখান থেকে কিছু অধঃপতিত মানুষের পক্ষ থেকে দাবি ওঠে, যারা শরীয়তবিরোধী কাজ ছাড়া আর কিছুতেই পরিচিত নয়। আল্লাহ তাদের দূর করুন, তাদের বিতাড়িত করুন, তাদের কলম ভেঙে দিন, তাদের মুখ বন্ধ করে দিন এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করুন — আমীন।

সারকথা হলো, কোনো অবস্থাতেই শুক্রাণু সংরক্ষণ করা জায়েয নয়। কারণ আমরা যা উল্লেখ করেছি — বীর্য বিক্রি করাও জায়েয নয়, তা হিবা করাও জায়েয নয়, তা সদকা করাও জায়েয নয় — এবং এতে যে বংশপরিচয়ের সংমিশ্রণ ও ইজ্জত-আবরুর ধ্বংস রয়েছে সে কারণে। আর আল্লাহ আমাদের রব — তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

শুক্রাণু ব্যাংক

করুন

- ✓ বংশপরিচয় ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ অপরিহার্য

করবেন না

- ✗ শুক্রাণু ব্যাংক প্রতিষ্ঠা — হারাম
- ✗ বীর্য বিক্রি, হিবা বা সদকা করা
- ✗ ব্যাংকের বীর্য দিয়ে কোনো নারীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করা
- ✗ ব্যাংকের বীর্য কোনো নারীর যোনিপথ বা জরায়ুতে প্রবেশ করানো

লেখকের মতে বীর্য পবিত্র; হারামের কারণ নাপাকি নয়, বরং বিক্রি হারাম ও বংশপরিচয়ের সংমিশ্রণ

প্রশ্ন ৪০

মাদকদ্রব্য ব্যবহারের কিছু ক্ষতি সামগ্রিকভাবে আমাদের বলুন।

উত্তর: আমি বলি:— ক্ষতিসমূহ অত্যন্ত বেশি; আমরা সেগুলো নিম্নরূপে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি:—

প্রথম: স্বাস্থ্যের অবনতি, তার পশ্চাদগমন ও তা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয়: স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা।

তৃতীয়: মানসিক বিশৃঙ্খলা।

চতুর্থ: শ্বাসতন্ত্রের বিশৃঙ্খলা।

পঞ্চম: বুদ্ধির বিকৃতি এবং ধীরে ধীরে তা লোপ পাওয়া।

ষষ্ঠ: আসক্তি — আর এটিই ক্ষতির সূচনা ও অনিষ্টের উদ্বোধন, কেননা সেবনকারীর পক্ষে তা ছেড়ে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

সপ্তম: পরিপাকতন্ত্রে বিশৃঙ্খলা — ফলে সে ক্ষুধামান্দ্য, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময়ে আক্রান্ত হয়।

অষ্টম: বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্বপ্রীতি এবং অন্যদের সঙ্গে মেলামেশাকে অপছন্দ করা।

নবম: ধমনী ফেটে যাওয়া — আর তা ঘটে যখন মাদকের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

দশম: চিন্তাশক্তিতে ত্রুটি।

একাদশ: অনুভূতির বিশৃঙ্খলা এবং তার ফলে মেধার স্তর নেমে যাওয়া, নিস্তেজতা ও ভোঁতা হয়ে যাওয়া।

দ্বাদশ: মাদকদ্রব্য শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়।

ত্রয়োদশ: আল্লাহর যিকির ও সালাত থেকে বাধা দেওয়া।

চতুর্দশ: যকৃতের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

পঞ্চদশ: ডিওডেনামের (গ্রহণী) কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

ষোড়শ: মুখ কালো হয়ে যাওয়া, দাঁত ঝরে পড়া ও মাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়া।

সপ্তদশ: মাদকের প্রভাবাধীন অবস্থায় আত্মহত্যা করা বা অন্যকে হত্যা করা।

অষ্টাদশ: পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়া ও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়া।

ঊনবিংশ: সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়া।

বিংশ: দ্বীন নষ্ট হয়ে যাওয়া।

একুশতম: প্রস্রাব বা পায়খানা বেরিয়ে যাওয়া এবং তা নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা।

বাইশতম: দীর্ঘস্থায়ী মাথাব্যথা।

তেইশতম: অতিরিক্ত বমি হওয়া।

চব্বিশতম: রক্ত পুড়ে যাওয়া ও নষ্ট হয়ে যাওয়া।

পঁচিশতম: বংশধারা বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়া।

ছাব্বিশতম: কফ বেড়ে যাওয়া।

সাতাশতম: গায়রত (আত্মমর্যাদাবোধ) লোপ পাওয়া।

আটাশতম: শারীরিক রোগপ্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়া।

ঊনত্রিশতম: মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রকে রক্ত জমাট বাঁধার (স্ট্রোক) ঝুঁকির মুখে ফেলা।

ত্রিশতম: বুক সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া ও দ্রুত রেগে যাওয়া।

একত্রিশতম: মস্তিষ্কের কোষ ধ্বংস করা।

বত্রিশতম: চোখ লাল হয়ে যাওয়া, জিহ্বা ভারী ও শুষ্ক হয়ে যাওয়া।

তেত্রিশতম: কথা ও কাজের কদর্যতাকে খারাপ মনে না করা।

চৌত্রিশতম: বহু ক্ষেত্রে ইজ্জত-আবরু নষ্ট হয়ে যাওয়া।

পঁয়ত্রিশতম: যৌনক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া বা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়া।

ছত্রিশতম: পাকস্থলীর ঘায়ে (আলসার) আক্রান্ত হওয়া।

সাঁইত্রিশতম: প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা।

আটত্রিশতম: আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

ঊনচল্লিশতম: এতে আসক্ত ব্যক্তিকে «তীনাতুল খাবাল» পান করানো হবে — আর তা হলো জাহান্নামবাসীদের দেহনিঃসৃত রস।

চল্লিশতম: তা তার সেবনকারীর জন্য লাঞ্ছনা, ভগ্নদশা, ব্যক্তিত্ব ও ভাবগাম্ভীর্যের বিলুপ্তি অনিবার্য করে দেয়।

একচল্লিশতম: প্রচণ্ড হাই তোলা, মুখ দিয়ে লালা ঝরা, চোখের পানি গড়িয়ে পড়া, নাকের নিঃসরণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়া, প্রচণ্ড ঘাম হওয়া এবং আবহাওয়া ঠান্ডা বোধ হওয়া — বিশেষ করে হেরোইনে আসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে।

বিয়াল্লিশতম: হাত-পা কাঁপা ও তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা।

তেতাল্লিশতম: অকালবার্ধক্য।

চুয়াল্লিশতম: মদ্যাসক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে এবং তার অধীনে থাকা ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে মানুষের অনাগ্রহ — ফলে তারা তাদেরকে বিয়েও দেয় না, তাদের থেকে বিয়েও করে না।

পঁয়তাল্লিশতম: কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া।

ছেচল্লিশতম: পাগলামি — আর এটি গাঁজা (হাশীশ) সেবনকারীদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ের প্রভাব।

সাতচল্লিশতম: উচ্চ রক্তচাপ।

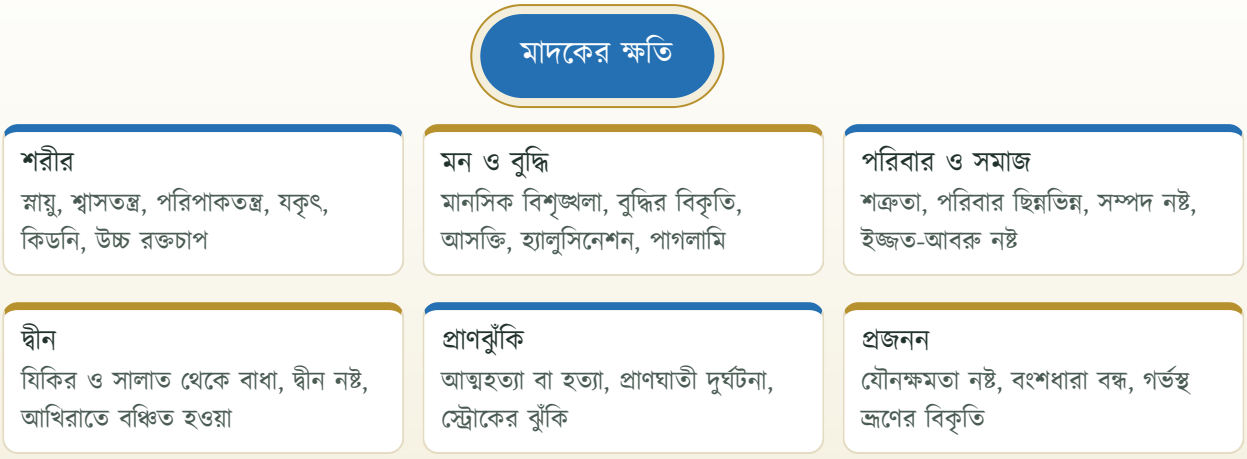
আটচল্লিশতম: হ্যালুসিনেশন (অলীক দর্শন-শ্রবণ)।

ঊনপঞ্চাশতম: গর্ভস্থ ভ্রূণের বিকৃতি — যদি সেবনকারী গর্ভবতী নারীদের কেউ হয়।

পঞ্চাশতম: এটি সমস্ত কদর্যতার জননী এবং সর্বপ্রকার অনিষ্টের দ্বার।

এ তো কিছু ক্ষতি মাত্র। এর একটি ক্ষতিও যদি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি শোনে, তবে তা তার জন্য সতর্ক হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আর যে ভ্রূক্ষেপই করে না, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও সর্বোচ্চ।

মাদকের ক্ষতি: ধরনভিত্তিক সারসংক্ষেপ



প্রশ্ন ৪০ — লেখক পঞ্চাশটি ক্ষতি গণনা করেছেন; এখানে ধরনভিত্তিক সংক্ষেপ

প্রশ্ন ৪১

জাবীরা (ভাঙা হাড়ে বাঁধা পট্টি/ব্যান্ডেজ) সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট ফিকহি বিধানগুলো কী? আর এর ও মোজার (খুফ) মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: আমি বলি:— এই বিধানগুলো খুব বেশি নয়; তবে আমরা তা আপনার জন্য নিম্নরূপে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি:—

প্রথম বিধান: বিশুদ্ধ মত ও সুন্দর অগ্রগণ্য অভিমত হলো — জাবীরার উপর মাসাহ করা জায়েয, যদিও তার আগে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত না হয়ে থাকে। এটি আহলুল ইলমের কারও কারও অভিমতের বিপরীত — আল্লাহ ফিরদাউসে আ'লায় তাঁদের অবস্থান উন্নীত করুন এবং একজন আলিমকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে যে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হয়, আল্লাহ তাঁদেরকে তা দান করুন। এর দলিল হলো — শরঈ শর্তারোপের মূলনীতি হলো তা সহীহ ও স্পষ্ট শরঈ দলিলের উপর তাওকীফি (নস-নির্ভর) হওয়া। অথচ জাবীরার উপর মাসাহ জায়েয হওয়ার জন্য পূর্বে পবিত্রতা থাকা আবশ্যক করে — এমন কোনো দলিল কিতাব থেকে, সহীহ সুন্নাহ থেকে, ইজমা থেকে, শুদ্ধ কিয়াস থেকে কিংবা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা ও পর্যালোচনা থেকে আমি জানি না। আর যেখানে দলিল নেই, সেখানে মূলনীতি হলো এই শর্তটি না থাকা। উসূলে এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো শর্তহীনতা (ইতলাক); আর সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, মূলনীতির উপর অটল থাকাই মূল — যতক্ষণ না তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার মতো দলিল আসে। অথচ আমরা এমন কোনো শরঈ সীমাবদ্ধকারী জানি না যা আমাদের এই মূলনীতি থেকে সরিয়ে নেয়; সুতরাং যেখানে তা থেকে সরানোর মতো কিছু নেই, সেখানে ওয়াজিব হলো তার উপরই অটল থাকা। আরও কারণ — জাবীরা তো হঠাৎ করেই এসে পড়তে পারে, ফলে মানুষ আগে থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে সক্ষম হয় না, কেননা তা সম্ভবই নয়। আর আগে পবিত্রতা অর্জনের দায়িত্ব চাপানো শরীয়তের অভিপ্রেত লাঘব, সহজীকরণ ও সংকট দূরীকরণের পরিপন্থী। এর ভিত্তিতে বলা যায়, জাবীরার উপর মাসাহ করা জায়েয — যদিও তার আগে পবিত্রতা না থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

দ্বিতীয় বিধান: নিশ্চিতভাবে ওয়াজিব হলো — চিকিৎসক যেন পট্টি বাঁধার ক্ষেত্রে কেবল ভাঙার জায়গা এবং তা বাঁধার জন্য যতটুকু পার্শ্ববর্তী অংশ প্রয়োজন, তার বেশি অতিক্রম না করেন। সুতরাং প্রয়োজন ও নিরুপায়তার পরিমাণ ছাড়িয়ে যাওয়া তাঁর জন্য জায়েয নয়। কারণ এটি নিরুপায়তার পবিত্রতা, আর কাওয়ায়িদে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, নিরুপায়তাকে তার পরিমাণ অনুযায়ীই নির্ধারণ করা হয়। এর ভিত্তিতে, চিকিৎসক যদি এর বিপরীত করে প্রয়োজনের জায়গা ছাড়িয়ে যান, তবে রোগীর উপর ওয়াজিব হলো সেই অতিরিক্ত পরিমাণটুকু — যতটুকুর প্রয়োজন নেই — সরিয়ে ফেলা; যদি তা সরাতে গিয়ে স্বাভাবিকের অতিরিক্ত কোনো ক্ষতি না হয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তৃতীয় বিধান: জাবীরার উপাদান পবিত্র হওয়া ওয়াজিব; সুতরাং নাপাক কোনো জিনিস দিয়ে পট্টি বাঁধা জায়েয নয়। এটি চিকিৎসকদের কাছে জানা বিষয়ই — সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আরও কারণ, নাপাক জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয নয়; আরও কারণ, সালাতের শর্তগুলোর একটি হলো নাপাকি দূর করা — সুতরাং নাপাক জাবীরা লাগানো সালাতের বাতিল ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার দিকে নিয়ে যায়; আরও কারণ, নাপাকি ব্যবহার করা আমাদের জন্য হারাম, আর আল্লাহ এই উম্মতের শিফা তাদের জন্য যা হারাম করেছেন তার মধ্যে রাখেননি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

চতুর্থ বিধান: জাবীরাকে পুরোপুরি মাসাহ করা ওয়াজিবে আইন; সুতরাং জাবীরার সব দিকই মাসাহ করা অপরিহার্য। কারণ এটি ধোয়ার বদল (বদল), আর ধোয়া অঙ্গটিকে তো পুরোটাই ধুতে হয়; তেমনি মাসাহ করলেও পুরোটাই মাসাহ করতে হবে। কাওয়ায়িদে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, বদলের হুকুম মূলের হুকুমই — যদি না পৃথককারী দলিল থাকে। সুতরাং যে অঙ্গের উপর জাবীরা আছে সেই অঙ্গটি যেহেতু পুরোটাই ধোয়া ওয়াজিব, তেমনি জাবীরার ক্ষেত্রেও তা পুরোটাই মাসাহ করা ওয়াজিব — একে সেই অঙ্গ ধোয়ার মর্যাদায় নামিয়ে আনার জন্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পঞ্চম বিধান: জাবীরা মাসাহ করার ক্ষেত্রে একবারই যথেষ্ট — এমনকি তা যদি এমন অঙ্গের উপর হয় যা সুস্থ থাকলে তিনবার ধোয়া হতো, তবুও। কারণ শরীয়তের মূলনীতি হলো, যেসব জিনিস মাসাহ করা হয় তাতে পুনরাবৃত্তি নেই — যদি না দলিল থাকে। জাবীরার পবিত্রতা তো মাসাহর পবিত্রতা; তাই তাতে একবারই যথেষ্ট। আরও কারণ, তা বারবার মাসাহ করলে জাবীরা নষ্ট হয়ে যেতে পারে — যা সুবিদিত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ষষ্ঠ বিধান: এর নিচের অংশ সেরে গেলে তা খুলে ফেলা ওয়াজিব; প্রয়োজনের পরিমাণের চেয়ে বেশি সময় তা রেখে দেওয়া তার জন্য জায়েয নয়। কারণ এটি নিরুপায়তার পবিত্রতা, আর সুপ্রতিষ্ঠিত যে নিরুপায়তাকে তার পরিমাণ অনুযায়ীই নির্ধারণ করা হয়। আরও কারণ, মূল কাজটি করা সম্ভব হলে বদলের দিকে যাওয়া হয় না; আর মূল হলো অঙ্গটি ধোয়া, জাবীরা মাসাহ করা তার বদল — আর বদল তখনই শরীয়তসম্মত হয় যখন মূলটি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, যেমনটি সুবিদিত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সপ্তম বিধান: অঙ্গের উপর দৃঢ়ভাবে লাগানো প্লাস্টার/আঠালো পট্টিও জাবীরার হুকুম গ্রহণ করে; যেমন ক্ষতের উপর লাগানো পট্টি, পিঠের হার্নিয়া চিকিৎসার জন্য পিঠে লাগানো পট্টি, এবং হাঁটু, কনুই, বাহু ও আঙুল ইত্যাদি গাঁটে বাঁধা ব্যান্ডেজ — এই সব জিনিসই জাবীরার হুকুম গ্রহণ করে। কারণ ইল্লতের দিক থেকে সেগুলো জাবীরার সঙ্গে মিলে যায়; তাই হুকুমেও সেগুলো তার মতোই। কেননা শরঈভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, শরীয়ত সদৃশ জিনিসগুলোর মধ্যে পার্থক্য করে না এবং অসদৃশ জিনিসগুলোকে একত্র করে না।

অষ্টম বিধান: মানুষ যদি ওযু অবস্থায় থাকে এবং জাবীরার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় তা খুলে ফেলে, তবে তার পবিত্রতা বহাল থাকে, বাতিল হয় না; বরং সে তার পবিত্রতার উপরই আছে। কারণ সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যে ইবাদত শরঈ দলিলের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়েছে তা শরঈ দলিল ছাড়া বাতিল হয় না। আরও কারণ, সুপ্রতিষ্ঠিত যে ওযু ভঙ্গের কারণগুলো তাওকীফি (নস-নির্ভর); অথচ জাবীরা খুলে ফেলায় ওযু ভেঙে যায় — এমন কোনো দলিল কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা বা কিয়াস থেকে আমরা জানি না। সুতরাং যেখানে দলিল নেই, সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি হলো — মূলের উপরই অটল থাকা ওয়াজিব, যতক্ষণ না তা থেকে সরানোর দলিল আসে। আরও কারণ, জাবীরাসহ তার পবিত্রতা শরঈ পন্থাতেই সম্পন্ন হয়েছে; আর যা শরীয়তনির্দেশিত পন্থায় সম্পন্ন হয়েছে, তা সহীহ ও স্পষ্ট শরঈ দলিলের নির্দেশনা ছাড়া ভঙ্গ হয় না। আরও কারণ, বাতিল করা — অর্থাৎ জাবীরা খোলার কারণে ওযু বাতিল করা — একটি শরঈ হুকুম; আর ফকীহদের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, শরঈ হুকুমগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সহীহ ও স্পষ্ট দলিলের মুখাপেক্ষী। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

নবম বিধান: এই জাবীরা যদি পানি দিয়ে মাসাহ করলে নষ্ট হয়ে যায়, অথবা পানি তার ভেতরে ঢুকে গিয়ে ব্যথা বেড়ে যাওয়া বা আরোগ্য বিলম্বিত হওয়ার মাধ্যমে ক্ষতের ক্ষতি হয়, তবে মাসাহর ওয়াজিব রহিত হয়ে তা তায়াম্মুমে স্থানান্তরিত হয়। আর তার তায়াম্মুম হবে ওযু পুরোপুরি শেষ করার পর; সুতরাং ওযু শেষ করলে সে যে অংশে পানি পৌঁছায়নি সেই অংশটির নিয়তে তায়াম্মুম করবে — কেবল এটুকুই ওয়াজিব। এর ভিত্তিতে আপনি জানতে পারলেন যে,

এই জাবীরার জন্য মাসাহ ও তায়াম্মুম — দুটোই একত্র করার কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই; বরং তা বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন ও অতিরঞ্জন। বরং সে যদি মাসাহ করতে সক্ষম হয় তবে সেটিই ওয়াজিব; আর যদি তাতে অক্ষম হয় তবে সে তায়াম্মুমে স্থানান্তরিত হবে — এটিই শরীয়তসম্মত। আর একটি অঙ্গের জন্য দুই পবিত্রতা একত্র করা সঠিক নয়; বরং তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুলগুলোর একটি।

আপনি এটিও জানলেন যে, যারা ওযুর অঙ্গগুলোর মাঝখানে তায়াম্মুম দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটায় তাদের ভুল কোথায়। কেননা জাবীরা যদি — উদাহরণস্বরূপ — বাম হাতে থাকে এবং শরঈ ওজরের কারণে সে তা পানি দিয়ে মাসাহ করতে না পারে, তখন কিছু মানুষ যখন সেই বাম হাত ধোয়ার পর্যায়ে পৌঁছায় যেটিতে জাবীরা রয়েছে, তখন ওযু থামিয়ে দেয়, তারপর তায়াম্মুম করে, তারপর ফিরে এসে ওযু পূর্ণ করে — এটি নিঃসন্দেহে ভুল। বরং মাসাহে অক্ষমতার সঙ্গে তায়াম্মুম কেবল ওযুর শেষেই হবে। ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة ا.هـ.

> ওযুর অঙ্গগুলোর মাঝখানে তায়াম্মুম দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটানো বিদআত। — উদ্ধৃতি শেষ।

দশম বিধান: বিশুদ্ধ মত ও সুন্দর অগ্রগণ্য অভিমত হলো — জাবীরার উপর মাসাহর কথা বলার জন্য জাবীরা পুরো অঙ্গ জুড়ে থাকা আবশ্যক নয়; বরং তার উপর মাসাহ করা জায়েয, যদিও তা অঙ্গের কেবল এক-চতুর্থাংশও ঢেকে থাকে — যেমন ধরুন তা আঙুল থেকে বাহুর মাঝামাঝি পর্যন্ত। তাহলে কেবল এই পরিমাণের উপরই মাসাহ করা জায়েয; আর অঙ্গের বাকি অংশ যেহেতু সুস্থ, তাই তা ধোয়া ওয়াজিব। এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

একাদশ বিধান: জেনে রাখুন, ক্ষত হয় খোলা থাকবে, নয় ঢাকা থাকবে। যদি খোলা থাকে, তবে তার তিনটি অবস্থা — ক্রমানুসারে:— প্রথম: ধোয়ায় যদি তার ক্ষতি না হয়, তবে ধোয়াই ওয়াজিব। দ্বিতীয়: ধোয়ায় ক্ষতি হয় কিন্তু মাসাহে ক্ষতি হয় না, তবে তখন মাসাহ করাই ওয়াজিব। তৃতীয়: মাসাহেও যদি ক্ষতি হয়, তবে তখন ওযু শেষ করার পর তার জন্য তায়াম্মুম করাই ওয়াজিব। আর যদি ঢাকা থাকে, তবে তার কেবল দুটি অবস্থা — দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ক্ষতের তিন অবস্থা

১ **প্রথম**
ধোয়ায় ক্ষতি না হলে ধোয়া ওয়াজিব

২ **দ্বিতীয়**
ধোয়ায় ক্ষতি, মাসাহে না হলে মাসাহ ওয়াজিব

৩ **তৃতীয়**
মাসাহেও ক্ষতি হলে ওযু শেষ করার পর তায়াম্মুম ওয়াজিব

খোলা ক্ষতের তিন অবস্থা; ঢাকা ক্ষতের কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা

দ্বাদশ বিধান: জেনে রাখুন — আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন — জাবীরার উপর মাসাহ করা হয়, যদিও তা বড় নাপাকির (হাদাসে আকবার) ক্ষেত্রে হয়। সুতরাং হায়েযগ্রস্ত বা নিফাসগ্রস্ত নারী যখন পবিত্র হয়, কিংবা জুনুবী ব্যক্তি যখন গোসল করতে চায় আর তাদের উপর জাবীরা থাকে, তখন তারা তার উপর মাসাহ করবে।

ত্রয়োদশ বিধান: জেনে রাখুন, জাবীরার কোনো সময়সীমা নেই; বরং তার সময় হলো তা লাগানো থেকে শুরু করে আরোগ্য পর্যন্ত। সুতরাং মোজার (খুফ) মতো তাতে কোনো সময়সীমা নেই, এবং মোজার উপর তাকে কিয়াস করাও সঠিক নয়। আর আল্লাহ আমাদের রব — তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

জাবীরার তেরো বিধান: সারসংক্ষেপ

- [ ] ১. পূর্ণ পবিত্রতা আগে না থাকলেও মাসাহ জায়েয — লেখকের তারজীহ
- [ ] ২. প্রয়োজনের জায়গার বেশি ঢাকা জায়েয নয়
- [ ] ৩. জাবীরার উপাদান পবিত্র হওয়া ওয়াজিব
- [ ] ৪. পুরোপুরি মাসাহ ওয়াজিব
- [ ] ৫. একবার মাসাহই যথেষ্ট
- [ ] ৬. নিচের অংশ সেরে গেলে খুলে ফেলা ওয়াজিব
- [ ] ৭. দৃঢ়ভাবে লাগানো প্লাস্টার ও আঠালো পট্টিও জাবীরার হুকুমে
- [ ] ৮. ওযু অবস্থায় জাবীরা খুললে ওযু বহাল থাকে
- [ ] ৯. মাসাহে ক্ষতি হলে ওযুর শেষে তায়াম্মুম; মাসাহ ও তায়াম্মুম একত্র নয়
- [ ] ১০. পুরো অঙ্গ না ঢাকলেও মাসাহ জায়েয; বাকি অংশ ধোয়া
- [ ] ১১. ক্ষতের তিন অবস্থা
- [ ] ১২. বড় নাপাকির ক্ষেত্রেও মাসাহ
- [ ] ১৩. কোনো সময়সীমা নেই; আরোগ্য পর্যন্ত

প্রথম বিধানে কিছু আলিম ভিন্ন মত পোষণ করেন; লেখকের তারজীহ এখানে বর্ণিত

আর প্রশ্নে যে বলা হয়েছে — «এর ও মোজার উপর মাসাহর মধ্যে পার্থক্যগুলো কী?» —

তবে আমি বলি:— এতে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে:—

তার মধ্যে একটি: জাবীরার উপর মাসাহ হলো নিরুপায়তার মাসাহ ও আযীমাত (মূল বিধান); আর মোজার উপর মাসাহ হলো প্রশস্ততার মাসাহ ও রুখসত (ছাড়)।

তার মধ্যে একটি: জাবীরার উপর মাসাহ পুরোপুরি করা ওয়াজিব; আর মোজার উপর মাসাহতে কেবল তার উপরিভাগ মাসাহ করলেই যথেষ্ট — তার নিচের দিক ও পাশ ছাড়াই।

তার মধ্যে একটি: জাবীরার উপর মাসাহতে কোনো সময়সীমা নেই, বরং তার সময়সীমা হলো কেবল প্রয়োজন; আর মোজার উপর মাসাহ মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত দ্বারা সময়সীমাবদ্ধ।

তার মধ্যে একটি: জাবীরার উপর মাসাহতে পূর্বে পবিত্রতা থাকা আবশ্যক নয়; আর মোজার উপর মাসাহতে পূর্বে পবিত্রতা থাকা শর্ত।

তার মধ্যে একটি: জাবীরার উপর মাসাহ বড় ও ছোট — উভয় নাপাকির ক্ষেত্রেই হয়; আর মোজার উপর মাসাহ কেবল ছোট নাপাকির (হাদাসে আসগার) ক্ষেত্রেই হয়।

তার মধ্যে একটি: জাবীরা কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গে সীমাবদ্ধ নয় — তা মাথায়, হাতে, পায়ে বা পিঠে ইত্যাদি যেকোনো জায়গায় হতে পারে; আর মোজা কেবল দুই পায়ের জন্যই নির্দিষ্ট।

তার মধ্যে একটি: জাবীরার উপর মাসাহ সম্ভব না হলে তার পরিবর্তে তায়াম্মুম করা হয়; আর মোজার উপর মাসাহর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা হয় না।

লেখার সময় আমার স্মরণে যে পার্থক্যগুলো এসেছে, এই হলো তার সমষ্টি। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

জাবীরা ও মোজার উপর মাসাহের পার্থক্য

জাবীরা	মোজা
নিরুপায়তার মাসাহ, আযীমাত	প্রশস্ততার মাসাহ, রুখসত
পুরোটা মাসাহ ওয়াজিব	কেবল উপরিভাগ মাসাহই যথেষ্ট
সময়সীমা নেই; প্রয়োজন পর্যন্ত	মুকীম এক দিন এক রাত; মুসাফির তিন দিন তিন রাত
আগে পবিত্রতা আবশ্যক নয়	আগে পবিত্রতা শর্ত
বড় ও ছোট — উভয় নাপাকিতে	কেবল ছোট নাপাকিতে
যেকোনো অঙ্গে হতে পারে	কেবল দুই পায়ে
মাসাহ সম্ভব না হলে তায়াম্মুম	মাসাহর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা হয় না

প্রশ্ন ৪২

মানুষের রক্ত সংক্রান্ত চিকিৎসাশাস্ত্রীয় ফিকহি বিধানগুলো কী? দলিল, কারণ-ব্যাখ্যা ও মূলনীতি-নির্ধারণসহ তা স্পষ্ট করুন।

উত্তর: আমি বলি:— এটি একটি বিস্তৃত প্রশ্ন। বিষয়টি যাতে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়, সে জন্য আমি একে কয়েকটি মাসআলায় বিন্যস্ত করছি:—

প্রথম মাসআলা: বিশুদ্ধ মত — ইনশাআল্লাহ — হলো, দুই রাস্তা ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে মানুষের শরীর থেকে রক্ত বের হলে তাতে ওযু ভঙ্গ হয় না — তা যেভাবেই বের হোক। এর দলিল আছারী (বর্ণনাভিত্তিক) ও নাযারী (বিবেচনাভিত্তিক) — উভয় প্রকারেরই।

আছারী দলিল হলো আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ তাঁর «সুনান»-এ যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদের কাছে আবূ তাওবা ইবনু নাফি' বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক

থেকে, তিনি বলেন: আমাকে সাদাকা ইবনু ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, আকীল ইবনু জাবির থেকে, তিনি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে; জাবির বলেন:

خرجنا مع رسول الله يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا ينتهي حتى يهرق دماً في أصحاب محمد, فخرج يتبع أثر النبي فنزل النبي منزلاً فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب, اضطجع المهاجري وقام الأنصاري وأتى الرجل, فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم, فوضعه فيه فنزعه, حتى رماه بثلاثة أسهمٍ ثم ركع وسجد, ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب, ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال: كنت في سورةٍ أقرأها فلم أحب أن أقطعها

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম — অর্থাৎ যাতুর রিকা'র যুদ্ধে। তখন এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক লোকের স্ত্রীকে আঘাত করল (বন্দি করল)। ফলে সে কসম করল যে, মুহাম্মদের সাহাবীদের মধ্যে রক্ত না ঝরানো পর্যন্ত সে থামবে না। সে নবী ﷺ-এর পদচিহ্ন ধরে বেরিয়ে পড়ল। নবী ﷺ এক জায়গায় অবতরণ করলেন এবং বললেন: «আমাদের পাহারা দেবে এমন কে আছে?» তখন মুহাজিরদের একজন ও আনসারদের একজন এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন: «তোমরা গিরিপথের মুখে থাকো।» জাবির বলেন: দুজন যখন গিরিপথের মুখে গেলেন, তখন মুহাজির ব্যক্তি শুয়ে পড়লেন আর আনসারি ব্যক্তি (সালাতে) দাঁড়ালেন। এমন সময় সেই লোকটি এলো; সে যখন তাঁর অবয়ব দেখল, বুঝে ফেলল যে তিনি দলটির প্রহরী। তখন সে তাঁকে একটি তীর ছুড়ল, তা তাঁর গায়ে বিদ্ধ হলো; তিনি তা টেনে বের করলেন। এভাবে সে তাঁকে তিনটি তীর ছুড়ল; এরপর তিনি রুকু ও সিজদা করলেন। তারপর তিনি তাঁর সঙ্গীকে জাগালেন। লোকটি যখন বুঝল যে তারা তার ব্যাপারে টের পেয়ে গেছে, তখন সে পালিয়ে গেল। মুহাজির ব্যক্তি যখন আনসারির গায়ে রক্তের অবস্থা দেখলেন, বললেন: সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর ছোড়ার সময়ই আপনি আমাকে জাগালেন না কেন? তিনি বললেন: আমি একটি সূরা পাঠ করছিলাম, তা কেটে দিতে আমার ভালো লাগল না। — «হাদীসটি সহীহ»

এটি ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, হাকিম, বাইহাকী, দারাকুতনী এবং আহমদ «মুসনাদ»-এ বর্ণনা করেছেন। এ থেকে দলিল গ্রহণের দিক হলো — এই আনসারি সাহাবী তাঁর সালাত চালিয়ে গেলেন, কাটলেন না। আর এ ধরনের ঘটনার বিস্তারিত সেনাপতি ও সেনাদলের আমীর ﷺ-এর কাছে গোপন থাকে না — বিশেষত যখন তিনিই সেই প্রহরী, যাঁকে তাদের পাহারার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। অথচ বর্ণিত হয়নি যে, রক্ত বের হওয়া সত্ত্বেও সালাত চালিয়ে যাওয়ার কারণে তিনি ﷺ সেই আনসারির উপর আপত্তি করেছেন। আর উসূলে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, তাঁর ﷺ-এর অনুমোদন (ইকরার) হুজ্জত।

আর এ কথা বলা যাবে না যে — অর্থাৎ এই ঘটনাটি — তাঁর থেকে দূরে ঘটেছে; কারণ আমরা বলব: নিঃসন্দেহে তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আমরা এ কথাও বলব: যে ঘটনা তাঁর মজলিসের বাইরে ঘটেছে, তার সঙ্গে যদি কোনো শরঈ হুকুমের সম্পর্ক থাকত, তবে আল্লাহ তাআলা তা তাঁর নবী ﷺ-এর কাছে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন; কারণ তা যদি সৃষ্টির কাছে গোপন থাকেও, স্রষ্টার কাছে — যিনি মহান ও সুউচ্চ — তা গোপন থাকে না।

এর সমর্থনে আরও প্রমাণ হলো — মুসলিমগণ জিহাদে সবসময়ই তাঁদের ক্ষত নিয়ে সালাত আদায় করতেন, আর তাঁদের তলোয়ারে রক্ত লেগে থাকত; অথচ নবী ﷺ তাঁদেরকে তাঁদের গায়ে ও তলোয়ারে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে ফেলার আদেশ দিতেন না। হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: মুসলিমগণ সবসময়ই তাঁদের ক্ষত নিয়ে সালাত আদায় করতেন। হাফিজ (ইবনু হাজার) «আল-ফাতহ»-এ বলেছেন:

وقد صح أن عمر صلى بالناس وجرحه يثعب دماً ا.هـ.

> আর এটি সহীহভাবে প্রমাণিত যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন, অথচ তাঁর ক্ষত থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছিল। — উদ্ধৃতি শেষ।

তাউস, মুহাম্মদ ইবনু আলী, আতা ও হিজাযবাসীগণ বলেছেন: রক্তে ওযু নেই। তাউস থেকে বর্ণিত আছারটি ইবনু আবী শাইবা সহীহ সনদে মুত্তাসিল করেছেন। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা একটি ফোড়া টিপলেন, তা থেকে রক্ত বের হলো, কিন্তু তিনি ওযু করেননি। হাসান রহিমাহুল্লাহ প্রবহমান রক্ত ছাড়া অন্য রক্তে ওযু আবশ্যক মনে করতেন না। আর ইবনু আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রক্ত থুতু ফেলেছেন এবং সালাত চালিয়ে গেছেন। এ তো হলো আছারী দলিলের দিক।

আর নাযারী দলিল হলো — কাওয়ায়িদে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সম্পন্ন হওয়া ইবাদত শরঈ দলিল ছাড়া ভঙ্গ হয় না; এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ওযু ভঙ্গের কারণগুলো তাওকীফি; এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, বাতিল করা একটি শরঈ হুকুম, আর শরঈ হুকুমগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সহীহ ও স্পষ্ট দলিলের মুখাপেক্ষী। এর মাধ্যমে আপনি জানলেন যে, এই মাসআলায় বিশুদ্ধ মত হলো — রক্ত বের হওয়া ওযু ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। এর ভিত্তিতে, যার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে অথচ সে ওযু অবস্থায় আছে, যে ক্ষতে আক্রান্ত হয় ও যার রক্ত ঝরে, এবং যে রক্তদান করে — এদের সবাই যদি ওযু অবস্থায় থাকে, তবে নিছক রক্ত বের হওয়ার কারণে তাদের ওযু ভাঙে না, বরং তা তার অবস্থাতেই বহাল থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

দ্বিতীয় মাসআলা: বিশুদ্ধ মত — ইনশাআল্লাহ — হলো, মানুষের রক্ত পবিত্র। সুতরাং তা যদি তার কাপড়ে লাগে, তবে তা ধোয়া তার উপর ওয়াজিব নয়; তবে কেবল পানি দিয়ে হালকা করে তার চিহ্নটি ঢেকে দেওয়া তার জন্য মুস্তাহাব। এর পবিত্র হওয়ার দলিল হলো প্রথম মাসআলায় যেসব দলিল অতিবাহিত হয়েছে সেগুলো। আরও কারণ, জিনিসপত্রের মূলনীতি হলো পবিত্রতা; আর মূলনীতির উপরই অটল থাকা মূল, যতক্ষণ না তা থেকে সরানোর দলিল আসে। অথচ

মানুষের রক্ত নাপাক হওয়ার দলিল হওয়ার যোগ্য এমন কোনো সরানোর দলিল আমি জানি না। হ্যাঁ, আহলুল ইলমের অধিকাংশ এই মতে যে তা নাপাক; কিন্তু দলিল গ্রহণ তো সংখ্যাধিক্য দিয়ে হয় না, বরং তা হয় দলিলের সঙ্গে সামঞ্জস্যের মাধ্যমে। আর এই মাসআলাটি ইজমার মাসআলাগুলোর অন্তর্ভুক্তও নয়; সুতরাং মানুষের রক্তের নাপাকির উপর ইজমা বর্ণনা করা কোনো শুদ্ধ ও যাচাইকৃত বর্ণনা নয়। তাই অগ্রগণ্য মত — ইনশাআল্লাহ — হলো মানুষের রক্ত পবিত্র। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

তৃতীয় মাসআলা: জেনে রাখুন — আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন — ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যুগের অপরিহার্যতাগুলোর অন্তর্ভুক্ত, কেননা তার প্রতি অনিবার্য প্রয়োজন ডাকছে; আর দুনিয়ার সব দেশেই এটি চালু আছে — বিশেষত এ যুগে দুর্ঘটনা ও যুদ্ধ যেভাবে বেড়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে। এই শাখা-মাসআলাটি প্রাণ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত হয়; আর এর উপর — অর্থাৎ প্রাণ সংরক্ষণের অপরিহার্যতার উপর — দলিলসমূহ মুতাওয়াতির পর্যায়ে এসেছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

চতুর্থ মাসআলা: জেনে রাখুন — আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন — রক্ত বিক্রি করা জায়েয নয়। এর দলিল হলো তাঁর ﷺ থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত যে, তিনি রক্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আরও কারণ, রক্ত মানুষের তরল অঙ্গসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর মানুষের অঙ্গগুলোকে কেনাবেচার মাধ্যমে অবমাননা করা জায়েয নয়। সুতরাং রক্ত বিক্রি করা জায়েয নয়। আর তাঁর ﷺ থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন:

إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জিনিস হারাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন।

তবে এ থেকে ব্যতিক্রম হলো জরুরি জীবনরক্ষাকারী (ইসআফী) অবস্থাগুলো — যদি সেখানে কোনো রক্তদাতাও না থাকে এবং ব্লাড ব্যাংকও না থাকে। তখন যে পরিমাণে নিরুপায়তা দূর হয়, সেই পরিমাণ রক্ত কেনা জায়েয। কারণ শরঈভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ক্ষতি করা যাবে না ও ক্ষতির বদলা ক্ষতি দিয়ে দেওয়া যাবে না; ক্ষতি দূর করতে হবে; এবং নিরুপায়তা নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে দেয়। এমতাবস্থায় ক্রেতার জন্য মূল্য পরিশোধ করা হালাল, আর গুনাহ হবে গ্রহীতার উপর। আর এই মানবিক ও কল্যাণকর কাজটি সম্পাদনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য হিবা বা পুরস্কার হিসেবে অর্থ দেওয়াতেও কোনো বাধা নেই; কারণ তা তখন অনুদানের অন্তর্ভুক্ত হবে, বিনিময়ভিত্তিক লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

পঞ্চম মাসআলা: জেনে রাখুন — আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন — কেউ যদি কাউকে অনুদান হিসেবে রক্ত দেয়, তবে এর দ্বারা তাদের দুজনের মধ্যে কোনো ধরনের বিধানই সংযুক্ত হয় না। সুতরাং স্বামী যদি তার স্ত্রীকে রক্ত দেয়, তবে তা তাদের মধ্যকার সম্পর্কের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না — অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো ধরনের হারাম হওয়া ছড়ায় না। কারণ কিছু মানুষ ধারণা করতে পারে যে, রক্তদানের দ্বারা তা-ই প্রতিষ্ঠিত হয় যা দুধপান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় — আর এটি ভুল ধারণা, সঠিকের বিপরীত। কেননা দুধপানের (রিদা'র) বিধানগুলো কেবল দুই বছরের ভেতরে পাঁচবার দুধপানের সঙ্গেই খাস। আর রক্তদানের সঙ্গে বিবাহ কিংবা মাহরাম হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে রক্ত দেওয়া জায়েয, এর উল্টোটাও জায়েয; এবং যে নারীকে সে রক্ত দিয়েছে তাকে বিয়ে করাও পুরুষটির জন্য জায়েয, তেমনি নারীটিই যদি রক্তদাতা হয় তবুও জায়েয। আর কোনো পরপুরুষ যদি কোনো পরনারীকে রক্ত দেয়, তবে তাদের মধ্যে কোনো প্রকারের মাহরামিয়্যাত সৃষ্টি হয় না; কারণ নিছক রক্তদানের দ্বারা মাহরামিয়্যাত ছড়ায় — এমন কোনো দলিল নেই, আর দুধপানের উপর একে কিয়াস করাও সঠিক নয় দুয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণে; আর উসূলে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, পার্থক্যের সঙ্গে কোনো কিয়াস চলে না।

ষষ্ঠ মাসআলা: জেনে রাখুন — আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন — রক্তদাতার কাছ থেকে রক্ত নেওয়ার পর তা বিশেষ পাত্রে সংরক্ষণ করা হলে তা «দামুন মাসফূহ» (প্রবাহিত রক্ত) হয় না, তার উপর তার হুকুম প্রযোজ্য হয় না এবং তার উপর একে কিয়াসও করা যায় না। বরং রক্তদাতার কাছ থেকে নলের মাধ্যমে সরাসরি রোগীর কাছে রক্ত নেওয়া হলেও তা «দামুন মাসফূহ» হয় না। আহলুল ইলমের যাঁরা বলেছেন যে এটি প্রবাহিত রক্ত এবং তা দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয নয় — তাঁরা এমন কথা বলেছেন যার কোনো দলিল নেই; তাঁরা মানুষের উপর প্রশস্ত জিনিসকে সংকীর্ণ করেছেন এবং সম্ভাবনামাত্র একটি বিষয়ের কারণে উম্মতকে কষ্ট, দুর্ভোগ ও সংকটে ফেলেছেন — আর এটি সমীচীন নয়। সুতরাং এসব আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতিতে সংগৃহীত এই রক্ত বিশুদ্ধ মতানুসারে পবিত্র রক্ত এবং তা দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয। আর এটিই আমরা যে বিষয়ে ফতোয়া দিই। আর আল্লাহ আমাদের রব — তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

সপ্তম মাসআলা: জেনে রাখুন, রক্তদানের ব্যাপারে মূলনীতি হলো — এটি একটি মানবিক কাজ ও শরঈ ইহসান, যার জন্য দাতার প্রতিদান ও সওয়াবের আশা করা যায়; আর আমাদের কাছে এটি শরীয়তের মানদূব (উৎসাহিত) কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত, কারণ তা সাধারণ ও ব্যক্তিগত — উভয় কল্যাণ বাস্তবায়ন করে। কিন্তু এই মানদূব বিধানটি জরুরি, আকস্মিক ও নিরুপায় জীবনরক্ষাকারী অবস্থাগুলোতে ফরযে কিফায়ার স্তরে উন্নীত হয় — যদি রোগীর রক্তের গ্রুপটি এমন হয় যা বিরাট একদল মানুষের মধ্যে সহজলভ্য। তখন যে রোগীর প্রাণরক্ষা এই দানের উপর নির্ভরশীল, তার জন্য রক্তদান ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়; পর্যাপ্তসংখ্যক লোক তা সম্পাদন করলে বাকিদের থেকে গুনাহ রহিত হয়ে যায়।

আর যদি এই গ্রুপটি বিরল হওয়ার কারণে গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া না পাওয়া যায়, তবে জরুরি ও আকস্মিক নিরুপায় অবস্থাগুলোতে — অর্থাৎ যেসব অবস্থায় প্রাণরক্ষা ও অঙ্গকে বিনষ্টি থেকে বাঁচানো এর উপর নির্ভরশীল — সেই রক্তদান ফরযে আইন হয়ে যায়। আর যদি এই ব্যক্তিটি ছাড়া আর কোনো রক্তদাতাই না পাওয়া যায়, তবে রক্তদান তার উপর ফরযে আইন হয়ে যায়। তবে এর শর্ত হলো — রক্তদাতার নিজের ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা; কারণ শরঈভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ক্ষতি দিয়ে ক্ষতি দূর করা হয় না; এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কোনো জিনিসের মালিক নিজেই তার প্রতি অন্যদের চেয়ে বেশি হকদার — যদি সে নিজেই তার মুখাপেক্ষী হয়।

আর রক্তদাতা তার কিছু রক্ত নেওয়ার পর মাথায় যে ঘোরানো ভাব অনুভব করে, তা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার; তার কোনো রেশ থাকে না, ইনশাআল্লাহ — কারণ তা দ্রুতই চলে যায়। সুতরাং এটি এমন কোনো ক্ষতি নয়, যা জরুরি জীবনরক্ষাকারী অবস্থাগুলোতে নিরুপায় মানুষদের রক্তদান থেকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আরও কারণ, এই ঘোরানো ভাব তো মূলত রক্তদান মুস্তাহাব হওয়ার অবস্থাতেই তা থেকে বাধা দেয় না; তাহলে তা ফরযে কিফায়া বা ফরযে আইন হওয়ার অবস্থায় কীভাবে বাধা দেবে? আর আল্লাহ আমাদের রব — তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

মানুষের রক্ত: লেখকের মাসআলাসমূহ

বিষয়	হুকুম
দুই রাস্তা ছাড়া অন্য স্থান থেকে রক্ত বের হলে	লেখকের মতে ওযু ভঙ্গ হয় না
মানুষের রক্ত	লেখকের অগ্রগণ্য মত: পবিত্র; আহলুল ইলমের অধিকাংশের মত: নাপাক
ব্লাড ব্যাংক	অনিবার্য প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠা করা যুগের অপরিহার্যতা
রক্ত বিক্রি	জায়েয নয়; জীবনরক্ষাকারী জরুরি অবস্থায় প্রয়োজন পরিমাণ কেনা জায়েয
রক্তদানের ফলে	দুধপানের মতো মাহরামিয়্যাত ছড়ায় না; স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে রক্ত দিতে পারে
সংরক্ষিত বা নলের মাধ্যমে নেওয়া রক্ত	লেখকের ফতোয়া: প্রবাহিত রক্ত নয়; চিকিৎসা জায়েয
রক্তদান	মানদূব; জরুরি অবস্থায় ফরযে কিফায়া; অন্য দাতা না থাকলে ফরযে আইন, দাতার ক্ষতি না হলে

প্রশ্ন ৪২ — লেখকের ইজতিহাদ

এক নজরে

- ★ সিহরের ইলাজ: দুআ ও রুকইয়াহ, বের করে বাতিল, নিষ্কাশন, সিদর-পাতার গোসল
- ★ সিহরের স্থান চিনতে গণক ও জাদুকরের কাছে যাওয়া নিষেধ
- ★ কৃত্রিম প্রজনন: প্রথম পাঁচ পদ্ধতি হারাম; ষষ্ঠ ও সপ্তম জায়েয শর্তসহ
- ★ শুক্রাণু ব্যাংক হারাম; বীর্য বিক্রি, হিবা, সদকাও জায়েয নয়
- ★ জাবীরার উপর মাসাহ: সময়সীমা নেই; মোজার সঙ্গে পার্থক্য বহু
- ★ লেখকের অগ্রগণ্য মতে মানুষের রক্ত পবিত্র; অধিকাংশ আহলুল ইলম নাপাক বলেন
- ★ রক্ত বিক্রি জায়েয নয়; রক্তদান মানদূব, জরুরি অবস্থায় ফরযে কিফায়া বা আইন

যাচাই করুন

1. কৃত্রিম প্রজননের কোন পদ্ধতিগুলো জায়েয বলা হয়েছে?

ক. প্রথম পাঁচটি | খ. সবগুলো | গ. ষষ্ঠ ও সপ্তম — স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ

2. শুক্রাণু ব্যাংক সম্পর্কে লেখকের হুকুম কী?

ক. হারাম | খ. প্রয়োজনে জায়েয | গ. মাকরূহ

3. জাবীরার উপর মাসাহের সময়সীমা কী?

ক. এক দিন এক রাত | খ. তিন দিন তিন রাত | গ. কোনো সময়সীমা নেই; আরোগ্য পর্যন্ত

4. মাসাহ সম্ভব না হলে তায়াম্মুম কার ক্ষেত্রে?

ক. মোজার ক্ষেত্রে | খ. জাবীরার ক্ষেত্রে; মোজার ক্ষেত্রে হয় না | গ. উভয়ের ক্ষেত্রে

5. মানুষের রক্ত সম্পর্কে লেখকের অগ্রগণ্য মত কী?

ক. নাপাক | খ. সন্দেহজনক | গ. পবিত্র

6. রক্ত বিক্রি সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. সবসময় জায়েয | খ. জায়েয নয়; জীবনরক্ষাকারী জরুরি অবস্থায় প্রয়োজনে কেনা জায়েয | গ. মাকরূহ

উত্তর: ১-গ, ২-ক, ৩-গ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-খ

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ময়নাতদন্ত, ওয়াসওয়াসার চিকিৎসা ও প্রতিবন্ধীদের হুকুম

অষ্টম মাসআলা:— জেনে রাখো — আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করুন — যদি কোনো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার দুর্বলতা তীব্র হয়ে ওঠে, আর অন্যের রক্ত তার দেহে সঞ্চালন করা (blood transfusion) ছাড়া তাকে শক্তি জোগানোর বা তার চিকিৎসার আর কোনো পথ না থাকে, এবং সেটিই তাকে বাঁচানোর উপায় হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়, আর অভিজ্ঞ-বিশেষজ্ঞদের প্রবল ধারণা হয় যে এতে সে উপকৃত হবে — তবে অন্যের রক্ত দিয়ে তার চিকিৎসা করাতে কোনো অসুবিধা নেই, যদিও দুজনের দ্বীন ভিন্ন হয়। সুতরাং কাফির থেকে — এমনকি সে হারবী (যুদ্ধরত) কাফির হলেও — মুসলিমের দেহে রক্ত সঞ্চালন করা যাবে; আর মুসলিম থেকে কাফিরের দেহে রক্ত সঞ্চালন করা যাবে এ শর্তে যে সে হারবী না হয়। আমাদের দেশের স্থায়ী কমিটি (আল-লাজনাতুদ দায়িমা) এ কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ কাফির থেকে মুসলিমের দেহে রক্ত সঞ্চালন করা হলে তা মোটেই কোনো প্রভাব ফেলে না, এবং এর উল্টোটিও তেমনই। আর এ কথা এ জন্য বলা হলো যে, কিছু মানুষ নিজের দেহে কাফিরের রক্ত সঞ্চালন করাতে সংকোচ বোধ করে এবং এর বিরোধিতা করে — এই ধারণা থেকে যে তা তার দ্বীনের ওপর প্রভাব ফেলবে। তাই এই ভ্রান্ত ধারণাটি দূর করার জন্য সতর্কতাস্বরূপ বিষয়টি আমরা উল্লেখ করলাম। আল্লাহ আমাদের রব, তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

নবম মাসআলা:— জেনে রাখো — আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করুন — সঠিক মত হলো, জরুরি-আপৎকালীন (emergency) অবস্থায় নিরুপায় রোগীকে রক্ত দেওয়ার জন্য তার অনুমতি নেওয়া অপরিহার্য নয়। কারণ তখন তার অনুমতি ধর্তব্যই নয়; বরং যদি তার জীবন কিংবা তার কোনো অঙ্গের অস্তিত্ব এই রক্ত-সঞ্চালনের ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে তার জন্য এটি প্রত্যাখ্যান করাই জায়েয নয়। কারণ প্রাণ ও অঙ্গ সংরক্ষণ শরীয়তের সেই অপরিহার্য বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো রক্ষা করা ওয়াজিব।

আর একথা বলা যাবে না যে, "চিকিৎসার মূল বিধান তো জায়েয হওয়া; তাহলে আপনারা কেন তার ওপর অনুমতি দেওয়াকে ওয়াজিব করছেন?" — কারণ আমরা বলব:— হ্যাঁ, চিকিৎসার মূল বিধান জায়েয হওয়াই; তবে চিকিৎসার মধ্যে এমনও আছে যা ওয়াজিব হয়ে যায়, আর তা ঠিক এই ধরনের অবস্থাতেই। কেননা রোগী তখন এমন প্রবল নিরুপায় অবস্থায় পড়ে যে, তার জীবন বাঁচাতে তাকে রক্ত সঞ্চালন করা ছাড়া উপায় থাকে না। আর সাধ্যের ভেতরের উপায়-উপকরণ দিয়ে জীবন রক্ষা করা ওয়াজিব, সাধ্যের ভেতরের উপায়-উপকরণ দিয়ে অঙ্গ রক্ষা করাও ওয়াজিব; আর এই আপৎকালীন অবস্থায় তাকে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করা ছাড়া সেটি সম্পন্ন হয় না। সুতরাং সেটিই ওয়াজিব হয়ে যায়, কারণ শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি হলো — যা ছাড়া ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, তা-ও ওয়াজিব। আরও কারণ, এই নিরুপায় অবস্থায় তাকে রক্ত সঞ্চালন করা একটি ওয়াজিব বিষয়কে বাস্তবায়িত করে, আর কায়িদা-মূলনীতিতে প্রতিষ্ঠিত যে — ওয়াজিবের মাধ্যম-উপায়গুলোও ওয়াজিব। আরও কারণ, তাকে এই পরিমাণ রক্ত সঞ্চালন না করা চিকিৎসা-অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা অনুযায়ী নিশ্চিত ক্ষতি ডেকে আনে, আর কায়িদায় প্রতিষ্ঠিত যে — ক্ষতি দূর করা হবে। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

রক্ত সঞ্চালন: অষ্টম ও নবম মাসআলা

অবস্থা	হুকুম
অন্যের রক্ত ছাড়া উপায় নেই; বিশেষজ্ঞদের প্রবল ধারণা উপকার হবে	দ্বীন ভিন্ন হলেও অসুবিধা নেই
কাফির থেকে মুসলিমের দেহে সঞ্চালন	জায়েয — হারবী কাফির হলেও
মুসলিম থেকে কাফিরের দেহে সঞ্চালন	জায়েয — যদি সে হারবী না হয়
জরুরি অবস্থায় রোগীর অনুমতি	লেখকের সঠিক মতে অপরিহার্য নয়; প্রাণ বা অঙ্গ নির্ভর করলে প্রত্যাখ্যান জায়েয নয়

অষ্টম মাসআলা স্থায়ী কমিটির বরাতে; নবম মাসআলা লেখকের সঠিক মত

প্রশ্ন ৪৩

মানবদেহের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের (organ transplantation) হুকুম কী?

উত্তর/ আমি বলি:— এ মাসআলাটি ফুকাহায়ে কিরাম বহু ফিকহি একাডেমিতে (মাজমাউল ফিকহি) গবেষণা করেছেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন:—

প্রথমত:— মানুষের নিজের দেহের এক স্থান থেকে সেই একই দেহের অন্য স্থানে অঙ্গ স্থানান্তর করা জায়েয — তবে এ বিষয়টি নিশ্চিত করার শর্তে যে, এই অস্ত্রোপচার থেকে প্রত্যাশিত উপকার তার ফলে সৃষ্ট ক্ষতির চেয়ে অগ্রগণ্য; এবং এই শর্তে যে, তা করা হবে কোনো অনুপস্থিত অঙ্গ সৃষ্টি করার জন্য, কিংবা হারিয়ে যাওয়া কোনো অঙ্গ ফিরিয়ে আনার জন্য, কিংবা তার পরিচিত আকৃতি বা কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য, কিংবা কোনো ত্রুটি সংশোধনের জন্য, অথবা এমন কোনো কদর্যতা দূর করার জন্য যা ব্যক্তির মানসিক বা দৈহিক কষ্টের কারণ হয়।

দ্বিতীয়ত:— এক মানুষের দেহ থেকে অন্য মানুষের দেহে অঙ্গ স্থানান্তর জায়েয, যদি সেই অঙ্গটি আপনা-আপনি পুনরুৎপন্ন হয় — যেমন রক্ত ও চামড়া। এ ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, দাতা পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন (কামিলুল আহলিয়্যাহ) হওয়া শর্ত এবং ধর্তব্য শরঈ বৈধতা নিশ্চিত হওয়া শর্ত।

তৃতীয়ত:— রোগজনিত কারণে দেহ থেকে কেটে ফেলা কোনো অঙ্গের অংশবিশেষ থেকে অন্য কোনো ব্যক্তির উপকৃত হওয়া জায়েয — যেমন রোগজনিত কারণে চোখ উপড়ে ফেলার সময় তার কর্নিয়া নিয়ে কোনো মানুষকে দেওয়া।

চতুর্থত:— জীবিত মানুষ থেকে অন্য মানুষের দেহে এমন অঙ্গ স্থানান্তর করা হারাম, যার ওপর জীবন নির্ভরশীল — যেমন হৃৎপিণ্ড।

পঞ্চমত:— জীবিত মানুষ থেকে এমন অঙ্গ স্থানান্তর করা হারাম, যার অপসারণ তার জীবনের কোনো মৌলিক কার্যক্ষমতা অচল করে দেয় — যদিও জীবনের নিরাপত্তা তার ওপর নির্ভরশীল না হয় — যেমন দুই চোখের কর্নিয়া একসঙ্গে স্থানান্তর করা।

ষষ্ঠত:— মৃত ব্যক্তি থেকে এমন জীবিত ব্যক্তির দেহে অঙ্গ স্থানান্তর জায়েয, যার জীবন সেই অঙ্গের ওপর নির্ভরশীল, কিংবা যার কোনো মৌলিক কার্যক্ষমতার নিরাপত্তা তার ওপর নির্ভরশীল — এ শর্তে যে, মৃত ব্যক্তি নিজে তার মৃত্যুর আগে এর অনুমতি দিয়ে গেছেন, অথবা তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা অনুমতি দিয়েছেন; কিংবা মৃত ব্যক্তি অজ্ঞাত-পরিচয় হলে বা তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে মুসলিমদের শাসকের সম্মতি থাকার শর্তে।

সপ্তমত:— লক্ষ রাখা উচিত যে, যে অবস্থাগুলো বর্ণনা করা হলো সেগুলোতে অঙ্গ স্থানান্তর জায়েয হওয়ার ব্যাপারে যে ঐকমত্য, তা এই শর্তসাপেক্ষ যে — অঙ্গ বিক্রির মাধ্যমে তা সম্পন্ন হবে না; কেননা মানুষের অঙ্গকে কোনো অবস্থাতেই ক্রয়-বিক্রয়ের অধীন করা জায়েয নয়।

অষ্টমত:— মৃত ব্যক্তি যদি হারবী কাফির হয়, তবে তার অঙ্গ থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয। কারণ আখিরাতে তাকে শাস্তি দেওয়াই উদ্দিষ্ট; সুতরাং মুসলিম এই অঙ্গটি থেকে উপকৃত হবে, যার পরিণতি তো আগুনই — যা তাকে পুড়িয়ে দেবে। এখানে মাসলাহাত (কল্যাণ) অর্জিত হচ্ছে এবং এর ফলে কোনো মাফসাদা (ক্ষতি) সৃষ্টি হচ্ছে না।

নবমত:— পূর্বে আমরা যে স্থানান্তরের কথা উল্লেখ করেছি, তা এমন হতে হবে যা দারূরাত (অপরিহার্য প্রয়োজন) ও অনিবার্য হাজত (প্রয়োজন) দাবি করে। সুতরাং কেবল উন্নততর-সৌন্দর্যবর্ধক (তাহসীনি) বিষয়ের খাতিরে অঙ্গ স্থানান্তরের কোনো সুযোগ নেই। এ মাসআলায় তাঁরা যা উল্লেখ করেছেন তার সারসংক্ষেপ এই। আল্লাহ আমাদের রব, তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

অঙ্গ প্রতিস্থাপন: ফিকহি একাডেমির সিদ্ধান্ত

অবস্থা	হুকুম
নিজের দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে	জায়েয — উপকার ক্ষতির চেয়ে অগ্রগণ্য হলে
আপনা-আপনি পুনরুৎপন্ন অঙ্গ (রক্ত, চামড়া) অন্যের দেহে	জায়েয — দাতা পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন হলে
রোগজনিত কারণে কেটে ফেলা অঙ্গের অংশ, যেমন কর্নিয়া	জায়েয
জীবিত মানুষ থেকে জীবননির্ভর অঙ্গ, যেমন হৃৎপিণ্ড	হারাম
জীবিত মানুষ থেকে মৌলিক কার্যক্ষমতা অচল করে এমন অঙ্গ, যেমন দুই কর্নিয়া একসঙ্গে	হারাম
মৃত ব্যক্তি থেকে জীবিতের দেহে, জীবননির্ভর হলে	জায়েয — মৃত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীর অনুমতিতে; অজ্ঞাত হলে শাসকের সম্মতিতে
অঙ্গ বিক্রি	কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়
হারবী কাফিরের মৃত দেহের অঙ্গ	উপকৃত হওয়া জায়েয
কেবল তাহসীনি উদ্দেশ্যে	সুযোগ নেই; দারূরাত বা অনিবার্য হাজত লাগবে

প্রশ্ন ৪৩

প্রশ্ন ৪৪

ভ্রূণকে ব্যবহার করা এবং তাকে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের উৎস বানানো কি জায়েয?

উত্তর/ আমি বলি:— সৌদি আরব রাজ্যের ফিকহি একাডেমির পরিষদ (মাজলিসুল মাজমাইল ফিকহি) এ মাসআলাটি গবেষণা করেছেন, এবং এ বিষয়ে পেশ করা প্রতিবেদন ও সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন:—

প্রথমত:— ভ্রূণকে অন্য মানুষের দেহে প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয নয় — কেবল কিছু নির্দিষ্ট অবস্থা ও অপরিহার্য শর্তসাপেক্ষে ছাড়া:— সুতরাং ভ্রূণের অঙ্গ অন্য মানুষের দেহে প্রতিস্থাপনের

উদ্দেশ্যে গর্ভপাত ঘটানো জায়েয নয়; বরং বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকবে স্বাভাবিক গর্ভপাতে — যা ইচ্ছাকৃত নয় — এবং শরঈ ওজরের কারণে সম্পাদিত গর্ভপাতে। আর ভ্রূণ বের করে আনার জন্য অস্ত্রোপচারের আশ্রয় নেওয়া যাবে না, যদি না মায়ের জীবন বাঁচানোর জন্য এই অস্ত্রোপচারই একমাত্র নির্দিষ্ট পথ হয়ে দাঁড়ায়। এরপর, ভ্রূণটি যদি জীবন-ধারণে সক্ষম হয়, তবে চিকিৎসা অবশ্যই তার জীবন টিকিয়ে রাখা ও তা সংরক্ষণের দিকে পরিচালিত হতে হবে — অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য তাকে কাজে লাগানোর দিকে নয়। আর যদি সে জীবন-ধারণে অক্ষম হয়, তবে অপরিহার্য প্রয়োজনের অবস্থাগুলোতেও তার থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নয় — কেবল ধর্তব্য শর্তসাপেক্ষে তার মৃত্যুর পর ছাড়া; অর্থাৎ তার মৃত্যু নিশ্চিত হতে হবে, স্থানান্তরটি এমন হতে হবে যা দারূরাত দাবি করে, এবং তার অভিভাবক তাতে অনুমতি দেবেন।

দ্বিতীয়ত:— অঙ্গ প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের অধীন করা জায়েয নয়।

তৃতীয়ত:— অঙ্গ প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচারগুলোর তত্ত্বাবধান অবশ্যই একটি বিশেষজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করতে হবে। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন ৪৫

[প্রশ্নবাক্যটি উৎসে নেই — বিষয়: জননগ্রন্থি ও প্রজননতন্ত্রের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের হুকুম]

উত্তর/ আমি বলি:— সৌদি আরব রাজ্যের ইসলামী ফিকহ একাডেমির পরিষদে এ মাসআলাটি গবেষণা করা হয়েছে, এবং এ বিষয়ে পেশ করা প্রতিবেদন ও সুপারিশগুলো পর্যালোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে:—

প্রথমত:— জননগ্রন্থি (গোনাড) প্রতিস্থাপন — যেহেতু অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয় যার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে তার বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন ও নিঃসরণ করতে থাকে নতুন গ্রহীতার দেহে প্রতিস্থাপনের পরও, সেহেতু এগুলো প্রতিস্থাপন করা শরঈভাবে হারাম।

দ্বিতীয়ত:— প্রজননতন্ত্রের সেসব অঙ্গ প্রতিস্থাপন, যেগুলোর সঙ্গে বংশগত বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরের কোনো সম্পর্ক নেই — গুরুতর গোপনাঙ্গগুলো (আওরাতে মুগাল্লাযা) ছাড়া — শরঈ দারূরাতের কারণে এবং শরীয়তে ধর্তব্য নিয়ন্ত্রণ ও মানদণ্ড অনুসারে জায়েয। অর্থাৎ দারূরাত তার দাবি করবে, দাতা তাতে অনুমতি দেবেন কিংবা তাঁর পরে তাঁর উত্তরাধিকারীরা অনুমতি দেবেন, তা ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসার পথে হবে না, এবং তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত শরঈ কর্তৃপক্ষ। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

ভ্রূণ ও জননগ্রন্থি প্রতিস্থাপন

বিষয়	সিদ্ধান্ত
ভ্রূণকে অঙ্গের উৎস বানানো	জায়েয নয়, নির্দিষ্ট অবস্থা ছাড়া; প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে গর্ভপাত জায়েয নয়
জীবন-ধারণে সক্ষম ভ্রূণ	চিকিৎসা তার জীবন টিকিয়ে রাখার দিকে হতে হবে
জীবন-ধারণে অক্ষম ভ্রূণ	কেবল মৃত্যু নিশ্চিত হলে, দারূরাত থাকলে, অভিভাবকের অনুমতিতে
অঙ্গ প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচার	সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের অধীন করা জায়েয নয়; তত্ত্বাবধান নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষের
জননগ্রন্থি (অণ্ডকোষ, ডিম্বাশয়)	শরঈভাবে হারাম — বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে
বংশগত বৈশিষ্ট্যহীন প্রজননতন্ত্রের অঙ্গ, গুরুতর গোপনাঙ্গ ছাড়া	শরঈ দারূরাতে শর্তসহ জায়েয

প্রশ্ন ৪৪ ও ৪৫

প্রশ্ন ৪৬

এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে কর্নিয়া স্থানান্তরের হুকুম কী?

উত্তর/ সৌদি আরব রাজ্যের হাইআতু কিবারিল উলামা (জ্যেষ্ঠ আলিমদের পরিষদ) এ মাসআলাটি গবেষণা করেছেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন:—

প্রথমত:— কোনো মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর তার চোখের কর্নিয়া স্থানান্তর করে এমন অন্য কোনো মুসলিম মানুষের চোখে প্রতিস্থাপন করা জায়েয, যে তার জন্য নিরুপায় — যদি প্রবল ধারণা হয় যে এই প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচারটি সফল হবে, এবং যতক্ষণ না তার অভিভাবকরা বাধা দেন। এটি এই কায়িদার ভিত্তিতে যে — দুই মাসলাহাতের মধ্যে উচ্চতরটি বাস্তবায়ন করা হবে, দুই ক্ষতির মধ্যে লঘুতরটি বরণ করা হবে, এবং মৃতের স্বার্থের ওপর জীবিতের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেননা জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে সে দৃষ্টিহীনতার পর দৃষ্টি ফিরে পাবে, নিজে তা থেকে উপকৃত হবে এবং তার মাধ্যমে উম্মাহও উপকৃত হবে; পক্ষান্তরে যে মৃতের কর্নিয়া নেওয়া হলো, তার কিছুই ক্ষতি হয় না — কারণ তার চোখ তো বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার দুই পাতার উপরেরটি নিচেরটির ওপর মিলে গেছে।

দ্বিতীয়ত:— এমন কোনো চোখ থেকে সুস্থ কর্নিয়া স্থানান্তর করা জায়েয, যে চোখটি রোগীর জীবন রক্ষার জন্য কিংবা তা রেখে দিলে তার ওপর বিপদের আশঙ্কার কারণে উপড়ে ফেলা অপরিহার্য বলে চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন; অতঃপর সেই উপড়ে ফেলা চোখ থেকে নেওয়া এই কর্নিয়াটি অন্য কোনো মুসলিমের চোখে প্রতিস্থাপন করা — যে তার জন্য নিরুপায়। কেননা তা উপড়ে ফেলা তো মূলত তার মালিকের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই ছিল, এবং তা অন্যের কাছে স্থানান্তরের ফলে তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না; আর অন্যের চোখে তা প্রতিস্থাপনে তার উপকার রয়েছে। সুতরাং এটিই শরীয়তের দাবি ও মানবিকতার অপরিহার্য চাহিদা। আল্লাহর তাওফীকেই সব; আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

প্রশ্ন ৪৭

হদ্দ বা কিসাসের কারণে কেটে ফেলা অঙ্গ পুনঃসংযোজন করার শরঈ হুকুম কী?

উত্তর/ আমি বলি:— সৌদি আরব রাজ্যের ইসলামী ফিকহ একাডেমির পরিষদ এ মাসআলাটি গবেষণা করেছেন, এবং এ বিষয়ে তাঁদের কাছে পেশ করা প্রতিবেদন ও সুপারিশগুলো পর্যালোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন:—

প্রথমত:— হদ্দ কার্যকর করার জন্য কেটে ফেলা অঙ্গ পুনঃসংযোজন করা শরঈভাবে জায়েয নয়। কারণ হদ্দের চিহ্ন বাকি থাকার মধ্যে রয়েছে শরঈভাবে নির্ধারিত শাস্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, তা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রতিরোধ, এবং বাহ্যত শরীয়তের হুকুমের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানো।

দ্বিতীয়ত:— যেহেতু কিসাস বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি ন্যায়বিচার, জীবনের অধিকার ও সমাজ সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য, সেহেতু কিসাস কার্যকর করার জন্য কেটে ফেলা অঙ্গ পুনঃসংযোজন করা জায়েয নয় — নিম্নলিখিত অবস্থাগুলো ছাড়া:—

প্রথম অবস্থা:— কিসাস কার্যকর হওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (মাজনী আলাইহি) কেটে ফেলা অঙ্গটি পুনঃসংযোজনের অনুমতি দেবেন।

দ্বিতীয় অবস্থা:— অপরাধীর বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিও তার কেটে ফেলা অঙ্গটি পুনঃসংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন।

তৃতীয়ত:— বিচারের রায়ে ভুল হওয়ার কারণে কিংবা তা কার্যকর করায় ভুল হওয়ার কারণে হদ্দ বা কিসাসে কেটে ফেলা অঙ্গ পুনঃসংযোজন করা জায়েয। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

এই হলো তাঁরা এখানে যা উল্লেখ করেছেন তার সারসংক্ষেপ। আর আমরা কিতাবের কলেবর ছোট রাখার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপ করার প্রতি যত্নবান হয়েছি। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

কর্নিয়া ও কেটে ফেলা অঙ্গ

অবস্থা	হুকুম
মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর কর্নিয়া নিরুপায় মুসলিমের চোখে	জায়েয — সফলতার প্রবল ধারণা, অভিভাবকরা বাধা না দিলে
জীবন রক্ষায় উপড়ে ফেলা চোখের সুস্থ কর্নিয়া অন্যের চোখে	জায়েয
হদ্দে কেটে ফেলা অঙ্গ পুনঃসংযোজন	জায়েয নয়
কিসাসে কেটে ফেলা অঙ্গ পুনঃসংযোজন	জায়েয নয়; ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতি বা তাঁর নিজের সংযোজন ব্যতিক্রম
বিচার বা কার্যকরে ভুল হলে	পুনঃসংযোজন জায়েয

প্রশ্ন ৪৬ ও ৪৭

প্রশ্ন ৪৮

ময়নাতদন্ত/শবব্যবচ্ছেদের (তাশরীহ) ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর/ আমি বলি:— সৌদি আরব রাজ্যের হাইআতু কিবারিল উলামা এ মাসআলাটি গবেষণা করেছেন এবং তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, এ বিষয়টি তিন ভাগে বিভক্ত:—

প্রথম:— কোনো ফৌজদারি দাবি যাচাই করার উদ্দেশ্যে ব্যবচ্ছেদ। দ্বিতীয়:— মহামারী-সংক্রামক রোগ যাচাই করার উদ্দেশ্যে ব্যবচ্ছেদ, যাতে তার আলোকে সেগুলো থেকে বাঁচার নিশ্চয়তাদায়ক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

তৃতীয়:— বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে ব্যবচ্ছেদ — শেখা ও শেখানোর জন্য। মতবিনিময়, আলোচনা ও পেশকৃত গবেষণা অধ্যয়নের পর পরিষদ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন:—

بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى أن في إجازتهما تحقيقاً لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين سواءً كانت الجثة جثة معصومة أم لا, وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي فنظراً إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحهما وحيث أن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان وحيث أن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة إلا أنه نظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً كعنايتها بكرامته حياً وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال كسر عظم الميت ككسره حياً ونظراً إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث أن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير

معصومة فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر

"প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ব্যাপারে হাইআতু কিবারিল উলামার পরিষদ মনে করেন যে, এ দুটির অনুমতি দেওয়ার মধ্যে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং মহামারী-রোগ থেকে সমাজের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বহু কল্যাণ বাস্তবায়িত হয়; আর ব্যবচ্ছেদকৃত লাশের সম্মানহানির যে ক্ষতি, তা এর দ্বারা অর্জিত অসংখ্য সর্বজনীন কল্যাণের পাশে ঢাকা পড়ে যায়। এ কারণেই পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন যে, এ দুই উদ্দেশ্যে ব্যবচ্ছেদ জায়েয — লাশটি মাসূম (রক্ত-সুরক্ষিত) হোক বা না হোক। আর তৃতীয় ভাগ, অর্থাৎ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবচ্ছেদের ব্যাপারে: যেহেতু ইসলামী শরীয়ত এসেছে কল্যাণ অর্জন ও তা বৃদ্ধি করতে, ক্ষতি প্রতিরোধ ও তা হ্রাস করতে, এবং দুই ক্ষতির মধ্যে অধিকতর কঠিনটি এড়ানোর জন্য লঘুতরটি বরণ করতে; আর কল্যাণগুলো পরস্পরবিরোধী হলে সেগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্যটি গ্রহণ করা হয়; এবং যেহেতু মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর ব্যবচ্ছেদ মানুষের ব্যবচ্ছেদের বিকল্প হতে পারে না; আর যেহেতু ব্যবচ্ছেদের মধ্যে বহু কল্যাণ রয়েছে, যা চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে প্রকাশ পেয়েছে — সেহেতু পরিষদ মনে করেন যে, মানুষের লাশ ব্যবচ্ছেদ করা মোটের ওপর জায়েয। তবে যেহেতু ইসলামী শরীয়ত মুসলিমের মৃত অবস্থার সম্মানের প্রতি ঠিক তেমনই যত্নবান, যেমন যত্নবান তার জীবিত অবস্থার সম্মানের প্রতি — কারণ আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনু মাজাহ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেছেন: ((মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙা জীবিত অবস্থায় তা ভাঙার মতোই)) — এবং যেহেতু ব্যবচ্ছেদের মধ্যে তার সম্মানের অবমাননা রয়েছে, আর যেহেতু মাসূম নয় এমন মৃতদেহ সহজলভ্য হওয়ার কারণে এ ব্যাপারে দারূরাত অনুপস্থিত, সেহেতু পরিষদ মনে করেন যে এ ধরনের লাশগুলোর ব্যবচ্ছেদেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং বর্ণিত অবস্থায় মাসূম মৃতদের লাশের প্রতি হাত না বাড়ানোই উচিত।" — উদ্ধৃতি শেষ। স্বাক্ষর:— হাইআতু কিবারিল উলামা।

ময়নাতদন্ত: তিন উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য	সিদ্ধান্ত
ফৌজদারি দাবি যাচাই	জায়েয — পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত; লাশ মাসূম হোক বা না হোক
মহামারী-সংক্রামক রোগ যাচাই	জায়েয — একই সিদ্ধান্ত
শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য	মোটের ওপর জায়েয; মাসূম নয় এমন লাশেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, মাসূম মৃতদের লাশে হাত না বাড়ানো

হাইআতু কিবারিল উলামার সিদ্ধান্ত

প্রশ্ন ৪৯

ওয়াসওয়াসা থেকে — বিশেষত আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর সিফাত ও এ জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ওয়াসওয়াসা থেকে — আরোগ্যদায়ক চিকিৎসা ও যথেষ্ট কার্যকর ওষুধ কী? দলিলসহ তা বর্ণনা করুন।

উত্তর/ আমি বলি:— আরোগ্যদায়ক চিকিৎসা ও যথেষ্ট প্রতিষেধক হলো — কিতাব ও সুন্নাহর হিদায়াতকে আঁকড়ে ধরা: আকীদায়, কথায় ও আমলে। এর বিশদ বিবরণ কয়েকটি বিষয়ে:—

তার একটি:— এই ওয়াসওয়াসাগুলো থেকে আল্লাহর কাছে অধিক পরিমাণে আশ্রয় প্রার্থনা করা (ইস্তিআযা)। কারণ এগুলোর উৎস শয়তান; সে তো আকীদার স্বচ্ছতাকে ঘোলা করে এমন জিনিস এবং বুকে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে এমন জিনিস ঢুকিয়ে দিতে উদগ্রীব। বরং এটিই তার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যগুলোর অন্যতম। আর সে এমন এক শত্রু, যে আমাদের এমন দিক থেকে দেখে যেদিক থেকে আমরা তাকে দেখি না। সুতরাং তার ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্তির পথ হলো, আমরা তার থেকে এবং তার ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাইব। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: —

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ﴾

> "বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের কাছে, মানুষের অধিপতির কাছে, মানুষের ইলাহর কাছে — কুমন্ত্রণাদাতা আত্মগোপনকারীর অনিষ্ট থেকে।" (সূরা আন-নাস: ১–৪)

আর আমাদের রব, তিনি মহিমান্বিত ও সুউচ্চ, আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে ইস্তিআযার মাধ্যমেই আমাদের ওপর থেকে তার কর্তৃত্ব দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

﴿فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ﴾

> "সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাদের রবের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই।" (সূরা আন-নাহল: ৯৮–৯৯)

আর এই চিকিৎসাটি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসগুলোর অন্যতম, যা দিয়ে বান্দা মনে উদিত কুপ্রবৃত্তির আক্রমণ প্রতিহত করে। কেননা আল্লাহ তাআলা শয়তানের জন্য অন্তর ও নফসের ওপর একটি পথ রেখেছেন; আর তার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া তার প্রবেশপথের এই দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন — রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله , فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته

"শয়তান তোমাদের কারও কাছে এসে বলে:— এই সৃষ্টি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? সুতরাং যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়।"

সুতরাং যার কাছে এ ধরনের কিছু আসে, তার প্রতি ওসিয়ত হলো — সে যেন এই ওত পেতে থাকা কঠোর শত্রুর থেকে আল্লাহর কাছে অধিক পরিমাণে আশ্রয় প্রার্থনা করে, যাকে আদম-সন্তানের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই সন্তুষ্ট করে না — বাহ্যিক ধ্বংসও, অন্তর্গত ধ্বংসও।

তার একটি:— এই ওয়াসওয়াসাগুলো থেকে বিরত হওয়া, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করা, অন্য কিছুতে ব্যস্ত হয়ে পড়া এবং বর্তমান অবস্থাটি পাল্টে ফেলা। সুতরাং সে যদি একা থাকে, তবে সে যেন এমন কাউকে খুঁজে নেয় যে তার সঙ্গে বসবে; আর যদি চুপ করে থাকে, তবে সে যেন কিছু বলে — যিকির-তাসবীহ কিংবা কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি; বরং দুনিয়ার উপকারী কথাবার্তা হলেও। উদ্দেশ্য হলো, অন্য কিছু দিয়ে সে এগুলো থেকে বিরত হবে। এর দলিল হলো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্বোক্ত হাদীসে যা রয়েছে, তাতে আছে ((ولينته)) — "এবং সে যেন বিরত হয়"। এর ভিত্তিতে বলা যায়, এগুলোতে — অর্থাৎ এই চিন্তা ও ওয়াসওয়াসাগুলোতে — সন্তুষ্ট থাকা জায়েয নয়, সেগুলোর সঙ্গে গা ভাসিয়ে দেওয়াও জায়েয নয়, এবং সেগুলোর সামনে বুদ্ধি ও রূহের দরজাগুলো খুলে দেওয়াও জায়েয নয়। কেননা তা এক মারাত্মক ধ্বংস, কিংবা এক গভীর গর্ত — যে তাতে পড়ে যায়, তার নিরাপত্তা কমে যায়।

তার একটি:— সে বলবে "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি" (آمنت بالله ورسله), এবং এ কথাটি বারবার বলতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহর শত্রু পরাভূত হয় এবং অন্তর ও বুদ্ধির ওপর তার ওয়াসওয়াসার প্রভাব হালকা হয়ে আসে। কেননা এই বাক্যটি তার মূলোচ্ছেদ করে এবং তার অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে। এতে রয়েছে সেই খবীসের সঙ্গে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত আচরণ। কেননা সে এই ওয়াসওয়াসাগুলো দিয়ে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আকীদা নাড়িয়ে দিতে চায়; সুতরাং তুমি যখন বলবে "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি", তখন তার বিভ্রান্তি বেড়ে যাবে, তার দুশ্চিন্তা প্রকট হবে এবং সে তার ওয়াসওয়াসার জন্য অনুতপ্ত হবে। কারণ এই কথার দ্বারা তুমি তোমার ঈমান নবায়ন করলে, তোমার রবকে আঁকড়ে ধরলে, তাঁর দিকে আশ্রয় নিলে এবং তাঁর কাছে পানাহ চাইলে — অথচ হয়তো তুমি এর আগে এ ব্যাপারে গাফিল ছিলে, আর ইবলিস তার এই ওয়াসওয়াসা দিয়ে তোমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিল। ফলে তার ব্যাপারে এ কথাই সত্য হবে যে, সে একটি গর্ত খুঁড়ল আর নিজেই তাতে পড়ল; সে তোমার অকল্যাণ চাইল, আর তা তোমাকে কল্যাণের দিকেই নিয়ে গেল। এ কথার দলিল হলো আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন — রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

لا يزال الناس يقولون ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله ورسله

"মানুষ প্রশ্ন করতেই থাকবে — এটা কী? ওটা কী? — এমনকি তারা বলবে:— এই সৃষ্টি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এ ধরনের কিছু পায়, সে যেন বলে:— আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি।" — "মুত্তাফাকুন আলাইহি" (বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্যে বর্ণিত)।

তার একটি:— বান্দা জানবে যে, এই ওয়াসওয়াসাগুলো ঈমানের স্বল্পতা ও দৃঢ়প্রত্যয়ের দুর্বলতা প্রমাণ করে না; বরং তা সকলের ওপরই আসে — কেবল আল্লাহ তাআলা যাকে রক্ষা করেছেন সে ছাড়া। আরও জেনে রাখুক যে, শরঈ চিকিৎসা দিয়ে এগুলোর মোকাবিলা করা হলে এগুলোর পরিণাম ভালোই হয়। কেননা এই ওয়াসওয়াসাগুলো কোনো কোনো সাহাবীর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল — অথচ তাঁরা ছিলেন উম্মাহর মধ্যে ঈমানে সবচেয়ে পূর্ণ ও ইলমে সবচেয়ে গভীর। সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন:— রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের কিছু লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন:— হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আমাদের অন্তরে এমন কিছু পাই, যা মুখে উচ্চারণ করাকে আমাদের কেউ কেউ ভয়ানক গুরুতর মনে করে। তিনি বললেন:—

أوقد وجدتموه ؟ قالوا: نعم فقال ذاك صريح الإيمان

"তোমরা কি সত্যিই তা পেয়েছ?" তাঁরা বললেন:— হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন:— "এটিই তো সুস্পষ্ট ঈমান।"

আর ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল:— আমার মনে এমন কিছু কথা আসে যে, আমার কাছে কয়লা হয়ে যাওয়াও তা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে অধিক প্রিয়। তখন নবী ﷺ বললেন:—

الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তার (শয়তানের) ষড়যন্ত্রকে ওয়াসওয়াসা পর্যন্তই ফিরিয়ে দিয়েছেন।" — "রিওয়ায়াতু আবি দাউদ" (আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন)।

সুতরাং এ ধরনের ঘটনা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো কোনো সাহাবীর ক্ষেত্রেই ঘটেছে — অথচ তাঁরা ছিলেন ইলমের যুগে — তখন ইলম ও ঈমানে তাঁদের চেয়ে যারা নিচে, তাদের ক্ষেত্রে তা ঘটা তো আরও অধিক যুক্তিসংগত। সুতরাং বান্দা যেন এ ধরনের ওয়াসওয়াসায় বিচলিত না হয়, কিংবা নিজেকে ঈমানের স্বল্পতার অভিযোগে অভিযুক্ত না করে, অথবা নিজেকে দুর্বল-তাকওয়া মনে না করে। এসবের কোনোটাই এ ধরনের ওয়াসওয়াসা প্রমাণ করে না; বরং উল্টোটাই সঠিক — অর্থাৎ শরঈ চিকিৎসা দিয়ে সেগুলো প্রতিহত করা ও মোকাবিলা করাই সুস্পষ্ট ঈমান, যেমন তিনি — আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম — এ ব্যাপারে প্রশ্নকারীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন ((ذاك صريح الإيمان)) "এটিই তো সুস্পষ্ট ঈমান"। বরং তোমার ওপর এ ধরনের ওয়াসওয়াসা উসকে দেওয়ার ব্যাপারে শয়তানের এই আগ্রহই প্রমাণ করে যে, তোমার মধ্যে ঈমান বিদ্যমান — যা তাকে ভীত করেছে এবং যার ওপর সে তার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে হামলা চালিয়েছে। আর ইবনু আব্বাসকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো — কী কারণে আমাদের মধ্যে ওয়াসওয়াসা আসে, অথচ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ওয়াসওয়াসা আসে না — তিনি বললেন:—

وماذا يريد الشيطان بالبيت الخرب

"শয়তান বিরান ঘর নিয়ে কী করবে?"

সুতরাং কোনো অন্তর যদি ঈমানশূন্য হতো, তবে সে এ ধরনের ওয়াসওয়াসার ব্যাপারে আগ্রহীই হতো না। অতএব সুসংবাদ গ্রহণ করো, ভয় পেয়ো না এবং বিচলিত হয়ো না; কেননা পরিণাম ভালোই এবং শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই। আল্লাহই সাহায্যকারী।

তার একটি:— তুমি নিজেকে বোঝাবে এবং সর্বদা তা স্মরণ করিয়ে দেবে যে, এই ওয়াসওয়াসাগুলোর কোনো প্রভাব নেই — যতক্ষণ তা কেবল মনের কথা ও বুকের কুমন্ত্রণার সীমার ভেতরে থাকে, এবং তার সঙ্গে কোনো কাজ, কথা কিংবা এমন গা-ভাসানো যুক্ত না হয় যা তুমি নিজের থেকে দূর করতে সক্ষম। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন — রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها

مالم تعمل أو تتكلم

"নিশ্চয়ই আল্লাহ — তিনি বরকতময় ও সুউচ্চ — আমার উম্মতের বুকে যে ওয়াসওয়াসা জাগে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তা অনুযায়ী আমল করে বা মুখে উচ্চারণ করে।"

আর অপর বর্ণনায় এসেছে ((ما حدثت به أنفسها)) "তাদের মনে যা কিছু উদিত হয়"। এটি তাঁর — তিনি মহিমান্বিত, সুউচ্চ, বরকতময় ও পবিত্র — বিরাট অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। আর জেনে রাখো, শরঈ দায়দায়িত্ব সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত; আর এ ধরনের শয়তানি ওয়াসওয়াসার সূচনাটুকু ঠেকিয়ে দেওয়া বান্দার সামর্থ্যের মধ্যে নেই। কিন্তু সে সেই বিষয়ে দায়বদ্ধ, যা তার ক্ষমতা ও সামর্থ্যের অধীনে — আর তা হলো সেগুলো অনুযায়ী আমল না করা বা সেগুলো নিয়ে কথা না বলা; এবং সে দায়বদ্ধ সেগুলোর সঙ্গে গা-ভাসানো বন্ধ করতে ও শরঈ পন্থায় সেগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। এটি এক বিরাট নিয়ামত ও মহান দান। সুতরাং যার এ ধরনের কিছু ঘটে, তার প্রতি ওসিয়ত হলো — সে যেন নিজেকে গুনাহগার সাব্যস্ত না করে এবং একে গুনাহ ও অপরাধের কাতারে না ফেলে; কেননা সত্যবাদী ও সত্যায়িত ﷺ-এর নসের দ্বারাই তা ক্ষমাকৃত — তবে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে, আর তা হলো:— এর সঙ্গে কোনো কাজ যুক্ত হবে না, কোনো কথা যুক্ত হবে না এবং গা-ভাসানো যুক্ত হবে না; বরং সে সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা কেটে দেওয়ায় তৎপর হবে। আল্লাহই সাহায্যকারী।

তার একটি:— বান্দা এমন সব জিনিস এড়িয়ে চলবে, যা এ ধরনের ওয়াসওয়াসা উসকে দেয়। তার মধ্যে রয়েছে:— অশোভন বিষয়ে প্রশ্ন করা, যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ সূত্রে এসেছে:—

لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا خلق الله الخلق

فَمَنْ خَلَقَ اللهَ ؟))

> "মানুষ পরস্পরকে প্রশ্ন করতেই থাকবে, এমনকি তারা বলবে:— এই সৃষ্টি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?"

সুতরাং বিষয়টির সূচনা তো কাম্য — অর্থাৎ ইলম সম্পর্কে প্রশ্ন করা; কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর পেছনে ছুটতে ছুটতে বান্দার অবস্থা যখন রুদ্ধ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়, সেটিই নিষিদ্ধ এবং তার কর্তা ধ্বংসপ্রাপ্ত। কেননা এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে সে-ই তা উসকে দেওয়ার কারণ হয়েছে; আর হাদীসে এসেছে ((هلك المتنطعون)) "বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়েছে"। তার মধ্যে আরও রয়েছে:— বিশেষত আসমা ও সিফাতের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ (শুবহাত) পড়া বা শোনা এড়িয়ে চলা। কেননা এসব শুবহা অন্তরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় এবং অন্তর্দৃষ্টির আলো নিভিয়ে দেয় — বিশেষত গণমাধ্যমগুলোতে। সুতরাং এ থেকে সর্বাত্মকভাবে সতর্ক থাকো; নিজের ওপর এ দরজা খুলে দিয়ো না, কেননা তা একবার খুলে গেলে অতি কষ্ট ছাড়া আর বন্ধ হতে চায় না। বরং তুমি অগ্রসর হও সেই স্বচ্ছ ঝরনা, সেই সুমিষ্ট-আরোগ্যদায়ক জলাশয়ের দিকে — আর তা হলো কিতাব ও প্রিয়তম নবী ﷺ-এর সুন্নাহ। সালাফের গ্রন্থাবলি অধিক পরিমাণে পড়ো, কেননা সেগুলো তোমাকে ইলম দেয় নির্মল অবস্থায় — তাতে কোনো ভেজাল নেই, কোনো ঘোলাটেপনা নেই। তার মধ্যে আরও রয়েছে:— ইলম ও প্রমাণ ছাড়া আসমা ও সিফাতের অধ্যায়ে অধিক বিতর্ক করা। এটি শরঈভাবে নিষিদ্ধ বিষয় এবং এটি সেই ক্ষতিগ্রস্ত-লাঞ্ছিতদের পরিচয়, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ কল্যাণ চাননি। আরও এমন অনেক কিছু রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, বান্দা সেসব উপকরণ এড়িয়ে চলবে যেগুলোর স্বভাবই হলো এ ধরনের নিন্দনীয় চিন্তা উসকে দেওয়া। আর শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিগুলোর একটি হলো — নিষিদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়া পথগুলো বন্ধ করা (সাদ্দুয যারায়ি)।

তার একটি:— উপকারী শরঈ ইলম অন্বেষণের জন্য নিজেকে অভ্যস্ত করার এবং তাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখার প্রতি পূর্ণ যত্নবান হওয়া — বিশেষত আকীদার অধ্যায়গুলোতে। সুতরাং আহলুল ইলমের মজলিসগুলোর দিকে অগ্রসর হও, তাঁদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসো, দীর্ঘকাল তাঁদের সাহচর্যে থাকো, তাঁদের ইলম ও আখলাকের ঝরনা থেকে পান করো; এবং সালাফে সালিহীনের গ্রন্থাবলির দিকে অগ্রসর হও — সেগুলো অধিক পরিমাণে অধ্যয়ন করো, সেগুলোর ফায়দাগুলো বের করে আনো, এবং তোমার অন্তরের তৃষ্ণার উত্তাপ জুড়িয়ে নাও তাদের দৃঢ়প্রত্যয়ের শীতলতা দিয়ে। সুতরাং সুসংবাদ সেই বান্দার জন্য, যে তার সময় সেগুলোর অধ্যয়নে ব্যয় করল; আর কী সৌভাগ্য সেই অন্তরের, যাতে সেগুলোর ইলম স্থিতি লাভ করল! আর ছেড়ে দাও "অমুকে বলল, তমুকে বলল", "দাও-নাও"-এর বাক-বিতণ্ডা এবং যাওয়া-আসায় সময় নষ্ট করা। আল্লাহ আমাদের ও তোমাকে হিফাযত করুন।

তার একটি:— তুমি সূরা আল-ইখলাস পড়বে। কেননা আবু হুরাইরার হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে ((وليقرأ ﴿ قل هو الله أحد ﴾)) "এবং সে যেন ﴿ قل هو الله أحد ﴾ পড়ে"। কেননা আল্লাহ তাআলাই "আল-আহাদ" — তাঁর সত্তায়, তাঁর সিফাতে, তাঁর নামসমূহে ও তাঁর কর্মে; এবং "আস-সামাদ" — যাঁর জন্য রয়েছে সিফাতের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত রূপ, এবং যিনি স্বীয় সত্তায় প্রত্যেকের একক আশ্রয়। তাঁর কোনো সঙ্গিনী নেই, কোনো সন্তান নেই, কোনো ঊর্ধ্বতন নেই, কোনো অধস্তন নেই। কারণ তিনিই "আল-আউয়াল" — যাঁর আগে কিছু নেই, এবং "আল-আখির" — যাঁর পরে কিছু নেই; যাঁর জন্যই সমস্ত রাজত্ব এবং যাঁর দিকেই সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তন করে; যিনি আহাদিয়্যাত, সামাদিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতে একক; যাঁর মতো কিছুই নেই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং তাঁর সত্তায় তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, তাঁর নামসমূহেও নেই, তাঁর সিফাতেও নেই, তাঁর কর্মেও নেই। তিনি মহিমান্বিত ও সুউচ্চ; পবিত্র ও সৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য থেকে মুক্ত; এবং বিকৃত কল্পনা, মিথ্যা ধারণা, বাতিল আকীদা ও অকেজো চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে সুমহান। আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে তার প্রতি — আল্লাহর উদ্দেশ্য অনুসারে; এবং ঈমান এনেছি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রতি এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যা এসেছে তার প্রতি — আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্য অনুসারে। সুতরাং আমরা এসব অধ্যায়ে প্রবেশ করি না আমাদের মতামত দিয়ে ব্যাখ্যা করতে, কিংবা আমাদের প্রবৃত্তি দিয়ে কল্পনা করতে।

তার একটি:— তুমি অন্তর দিয়ে ও সত্যনিষ্ঠ কণ্ঠে আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক পরিমাণে দুআ করবে, যেন তিনি তোমার অন্তরকে ঈমান, দৃঢ়প্রত্যয়, অবিচলতা ও নিরাপত্তায় ভরে দেন। কেননা কত সত্যনিষ্ঠ দুআই না তার কর্তার দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের কারণ হয়েছে! আর কত কত বিপদ যে দুআর কারণে প্রতিহত হয়েছে ও উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে! সুতরাং তুমি তোমার অন্তরকে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করো — তাঁর কাছে অধিক কাকুতি-মিনতি করে, তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়ে এবং তাঁর আশ্রয়ে ঠাঁই নিয়ে। কতই না উত্তম অভিভাবক, কতই না উত্তম সাহায্যকারী, কতই না উত্তম সহায় ও সাহায্যদাতা ও সমর্থনদাতা, এবং কতই না উত্তম দুআ-কবুলকারী! সুতরাং তাঁর কাছে দুআ করায় সর্বাত্মক চেষ্টা করো — যেন তিনি তোমার থেকে এই ওয়াসওয়াসাগুলো উঠিয়ে নেন, তোমার অন্তরকে "কলবে সালীম" (নিষ্কলুষ অন্তর) বানিয়ে দেন এবং তা ভয় ও তাকওয়ায় ভরে দেন। আর দুআ করাকে দীর্ঘ মনে করো না, উত্তর পেতে দেরি হচ্ছে বলে ভেবো না। সুসংবাদ গ্রহণ করো — কেননা আল্লাহ তার প্রতিদান নষ্ট করেন না, যে সুন্দর আমল করে। আল্লাহ তোমাকে সব অনিষ্ট ও বিপদ থেকে হিফাযত করুন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তার একটি:— এই ওয়াসওয়াসাগুলো যদি তোমার ওপর বেড়ে যায় এবং পূর্বোক্ত চিকিৎসাগুলোতেও না যায়, বরং তোমার সঙ্গে বাড়তে বাড়তে ওয়াসওয়াসায়ে কাহরিয়্যাহ (obsessive compulsive ধরনের বাধ্যতামূলক কুমন্ত্রণা) পর্যায়ে পৌঁছে যায় — তবে আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি ইলম, দ্বীনদারি ও আমানতদারিতে নির্ভরযোগ্য মনোচিকিৎসকদের (psychiatrist) কাছে যাওয়ার জন্য। কেননা কিছু ওয়াসওয়াসার কারণ হয়ে থাকে মানসিক ও মেজাজগত বিশৃঙ্খলা — কোনো কোনো নিঃসরণ (হরমোন) বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার কারণে; আর সেগুলোর চিকিৎসা মনোচিকিৎসকদের কাছেই। এতে কোনো দোষ নেই; কেননা মনোবিজ্ঞান এমন একটি বিদ্যা, যার নিজস্ব উপকরণ ও নিয়মনীতি রয়েছে, এবং তা থেকে বিরাট ফায়দা ও প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জিত হয়েছে। সুতরাং এর দিকটি অবহেলা করা উচিত নয় এবং এর গুরুত্ব উপেক্ষা করাও উচিত নয়। অতএব তাদের কাছে যাও, তুমি যা অনুভব করছ

তার প্রকৃত অবস্থা তাদের জানাও — ইনশাআল্লাহ তুমি তাদের কাছে কল্যাণ পাবে। এই হলো এ ধরনের ওয়াসওয়াসার জন্য যেসব চিকিৎসা আমার মনে এল তার বিবরণ। আমি তাঁর কাছে — তিনি মহিমান্বিত ও সুউচ্চ — তাঁর ইসমে আযমের অসিলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আমাদের ভাইদের এই ওয়াসওয়াসাগুলো থেকে আশ্রয় দেন। নিশ্চয়ই তিনিই এর অভিভাবক ও এর ওপর ক্ষমতাবান, এবং তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

ওয়াসওয়াসার চিকিৎসা: দশ উপায়

- [ ] ১. আল্লাহর কাছে অধিক ইস্তিআযা (আশ্রয়)
- [ ] ২. ওয়াসওয়াসা থেকে বিরত হওয়া ও অন্য কিছুতে ব্যস্ত হওয়া
- [ ] ৩. "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি" বলা
- [ ] ৪. জানা: ওয়াসওয়াসা ঈমানের স্বল্পতা প্রমাণ করে না
- [ ] ৫. মনের কথার সীমায় থাকলে প্রভাব নেই — কাজ, কথা বা গা-ভাসানো যুক্ত না হলে
- [ ] ৬. উসকে দেওয়া বিষয় এড়ানো — অতিরিক্ত প্রশ্ন, শুবহা, বিতর্ক
- [ ] ৭. উপকারী শরঈ ইলম, বিশেষত আকীদার অধ্যায়ে
- [ ] ৮. সূরা আল-ইখলাস পাঠ
- [ ] ৯. অন্তর দিয়ে অধিক দুআ
- [ ] ১০. বেড়ে গেলে নির্ভরযোগ্য মনোচিকিৎসকের কাছে যাওয়া

প্রশ্ন ৫০

প্রতিবন্ধীদের (মুআওয়াক) সঙ্গে সম্পর্কিত চিকিৎসাবিষয়ক হুকুমগুলো কী কী? সেগুলোকে তাদের কায়িদা-মূলনীতির সঙ্গে যুক্ত করে বলুন।

উত্তর/ এ হুকুমগুলো অনেক; তবে আমরা তোমার জন্য তার কিছু অংশ উল্লেখ করছি। সুতরাং আমি বলি:—

প্রথম:— যে হাত বা পা ধোয়া ওয়াজিব, তা যদি কেটে যায়, তবে তার মালিকের ওপর থেকে ধোয়ার ওয়াজিব হুকুম রহিত হয়ে যায় — কারণ যে অঙ্গ ধোয়া ওয়াজিব, সেই স্থানটিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অস্তিত্বহীন অঙ্গ ধোয়ার দায়িত্ব চাপানো তো অসাধ্যের দায়িত্ব চাপানো। আর কায়িদায় প্রতিষ্ঠিত যে — আল্লাহ কোনো প্রাণকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না; কায়িদায় আরও প্রতিষ্ঠিত যে — অক্ষমতার সঙ্গে কোনো ওয়াজিব থাকে না। এটি তখন, যখন কাটাটি পুরো পা টাখনু পর্যন্ত এবং পুরো হাত কনুই পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু যদি কাটাটি ফরযের স্থানের কেবল অংশবিশেষে হয়ে থাকে, তবে কেবল কাটা অংশটুকু থেকেই ফরয রহিত হবে; আর ফরযের বাকি অংশ ধোয়া ওয়াজিব থাকবে।

দ্বিতীয়:— মানুষ যদি কৃত্রিম হাত বা কৃত্রিম পা লাগায়, তবে সেটি কি ধোয়ার ওয়াজিব হুকুমে আসল অঙ্গের স্থলাভিষিক্ত হবে? উত্তর — না, তা এ ব্যাপারে ফরযের স্থলাভিষিক্ত হবে না; সুতরাং তা ধোয়া ওয়াজিব নয়। কারণ শরঈ হুকুমগুলো প্রকৃত হাত ও পায়ের দিকেই নির্দেশিত; আর কৃত্রিমটির সঙ্গে ধোয়ার ওয়াজিব হুকুম সম্পৃক্ত হয় না, বরং তার ওপর

মাসাহ করাও ওয়াজিব নয়। কেননা ধোয়া ও মাসাহ কেবল প্রকৃত হাত ও পায়ের ওপরই হয়ে থাকে। আর কায়িদায় প্রতিষ্ঠিত যে — ফরযের স্থান বিলুপ্ত হয়ে গেলে তাতে যে ফরয ওয়াজিব ছিল তা-ও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়:— সঠিক মত হলো, মানুষ যদি এই কৃত্রিম পায়ের ওপর মোজা পরে, তবে তার ওপর মাসাহ করা তার জন্য ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নতও নয়। কারণ মাসাহ হলো ধোয়ার বদল; আর আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, স্থান বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ধোয়াই রহিত হয়ে গেছে। আর কায়িদায় প্রতিষ্ঠিত যে — মূল বিলুপ্ত হলে তার শাখাও বিলুপ্ত হয়ে যায়; আরও প্রতিষ্ঠিত যে — যার বদল দেওয়া হচ্ছে সেটিই যখন ওয়াজিব নয়, তখন তার বদলও ওয়াজিব নয়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

চতুর্থ:— কেউ যদি এমন অবশ হাতের ওপর হামলা করে, যাতে মোটেই কোনো নড়াচড়া নেই, এবং তা কেটে ফেলে — তবে এটি নিঃসন্দেহে অপরাধ; তবে এতে কিসাস নেই, কেবল দিয়াত (রক্তমূল্য) রয়েছে। কারণ আহলুল ইলম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে কিসাস আদায়ের যেসব শর্ত নির্ধারণ করেছেন তার একটি হলো — নাম ও পূর্ণতায় সমতা। সুতরাং অবশ হাতের বিনিময়ে সুস্থ হাত নেওয়া হবে না, অন্ধ চোখের বিনিময়ে সুস্থ চোখ নেওয়া হবে না, এবং অবশ পায়ের বিনিময়ে সুস্থ পা নেওয়া হবে না। আসহাব (মাযহাবের ফুকাহা) তাঁদের ফিকহবিষয়ক রচিত সাধারণ গ্রন্থগুলোতে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পঞ্চম:— অবশ ব্যক্তি (মাশলূল) তার অবস্থা অনুযায়ী সালাত আদায় করবে; আর আল্লাহ কোনো প্রাণকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সুতরাং সে যদি কিবলামুখী হতে সক্ষম হয়, তবে তা তার ওপর ওয়াজিব; অন্যথায় তার ওপর থেকে তা রহিত হয়ে যাবে, কারণ অক্ষমতার কারণে ওয়াজিবগুলো রহিত হয়ে যায়। সে যদি পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনে সক্ষম হয়, তবে তা তার ওপর ওয়াজিব; আর যদি তাতে সক্ষম না হয়, তবে সে তায়াম্মুম করবে — যদি তাতে সক্ষম হয়; অন্যথায় সে তার অবস্থা অনুযায়ীই সালাত আদায় করবে, কারণ ওয়াজিবগুলো সেগুলোর প্রতি অক্ষমতার কারণে রহিত হয়ে যায়। সুতরাং ওয়াজিবগুলোর মধ্যে যা সে করতে পারে তা-ই করবে, কারণ সাধ্যের ভেতরের জিনিস অসাধ্যের কারণে রহিত হয় না; আর যা সে করতে পারে না, তার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হবে না, কারণ আদিষ্ট কাজগুলো সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত — ক্ষমতা ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ষষ্ঠ:— অবশ ব্যক্তির জন্য জামাআতের সালাতে হাজির হওয়া যদি কষ্টকর ও ক্লেশদায়ক হয়, তবে তার ওপর থেকে সে ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে এবং সে নিজের ঘরেই সালাত আদায় করতে পারবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সপ্তম:— যে অবশ ব্যক্তির জন্য প্রতিটি সালাত তার নিজ ওয়াক্তে আদায় করা কষ্টকর, তার জন্য জোহর-আসর একত্রে এবং মাগরিব-ইশা একত্রে জমা করা জায়েয — জমে তাকদীম (আগে এনে) বা জমে তাখীর (পিছিয়ে), যেটি তার জন্য ও তার অবস্থার জন্য অধিক সহজ। কারণ প্রতিষ্ঠিত বিষয় হলো — জমা করা হলো কষ্ট ও সংকীর্ণতা দূর করার জন্য আপতিত এক রুখসত (ছাড়)। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

অষ্টম:— যে অবশ ব্যক্তি নিজে হজ করতে সক্ষম নয় অথচ তার অর্থ রয়েছে, তার ওপর অপরিহার্য হলো এমন কাউকে নিযুক্ত করা যে তার পক্ষ থেকে হজ ও উমরা করবে। এ ব্যাপারে হাদীসগুলো সুপরিচিত।

নবম:— অবশ ব্যক্তির যদি স্বপ্নদোষ হয়, তবে তার ওপর গোসল করা ওয়াজিব — যদি সে তার আশপাশে এমন কাউকে পায় যে তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। আর যদি না পায়, তবে তার ওপর থেকে গোসলের ওয়াজিব হুকুম রহিত হয়ে তায়াম্মুমে স্থানান্তরিত হবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

দশম:— পেশাব ও পায়খানার নল (ক্যাথেটার) যদি অবশ ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত থাকা অপরিহার্য হয় এবং সালাতের সময় সে তা খুলে ফেলতে সক্ষম না হয়, তবে সে তা নিয়েই সালাত আদায় করবে এবং তার ওপর কিছুই নেই — কারণ অক্ষমতার সঙ্গে কোনো ওয়াজিব থাকে না।

একাদশ:— অবশ ব্যক্তির শরীরে বা কাপড়ে যদি কোনো নাজাসাত পড়ে এবং সে তা দূর করতে সক্ষম না হয়, আর তার কাছে এমন কেউও না থাকে যে তা দূর করে দেবে — তবে সে সালাত আদায় করবে, তার ওপর কিছুই নেই

এবং তার সালাত সহীহ। কারণ নাজাসাত দূর করা সামর্থ্যসাপেক্ষে ওয়াজিব; আর অক্ষমতার ক্ষেত্রে তা রহিত হয়ে যায়, কারণ অক্ষমতার সঙ্গে কোনো ওয়াজিব থাকে না।

দ্বাদশ:— কোনো মুসলিম চিকিৎসক-দল যদি সিদ্ধান্ত দেন যে এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তবে অবস্থা দুটির বাইরে নয়:— হয় সে একেবারেই তা পারবে না, অর্থাৎ তাঁরা যে প্রতিবন্ধিতাকে তার রোযার প্রতিবন্ধক বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা থেকে তার আরোগ্যের আশা নেই; অথবা তা থেকে তার আরোগ্যের আশা রয়েছে। সুতরাং সে যদি এমন হয় যার আরোগ্যের আশা নেই, তবে সে রোযা ভাঙবে এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। আর যদি সে এমন হয় যার আরোগ্যের আশা রয়েছে, তবে সে রোযা ভাঙবে এবং অন্য দিনগুলোতে কাযা করবে — অর্থাৎ তার আরোগ্যের পর। এরপর যদি সে মারা যায় এবং কাযা না করে থাকে ও এই প্রতিবন্ধিতা থেকে আরোগ্য না পেয়ে থাকে, তবে সে গুনাহগার অবস্থায় মরবে না এবং তার ওপর কিছুই নেই। আর যদি তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে সেই দিনগুলোর রোযা রাখেন — যেগুলো বাকি রেখে সে মারা গেছে — তবে তা অত্যন্ত উত্তম, এই হাদীসের ব্যাপকতার কারণে:—

من مات وعليه صوم صام عنه وليه

> "যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার ওপর রোযা বাকি রয়েছে, তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক রোযা রাখবেন।"

— আর তা সহীহ গ্রন্থে রয়েছে।

ত্রয়োদশ:— প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য সমস্ত লেনদেন সহীহ, তাতে কোনো সংশয় নেই — যদি প্রতিবন্ধিতা তার আহলিয়্যাত (আইনি যোগ্যতা) ক্ষতিগ্রস্ত না করে থাকে।

চতুর্দশ:— প্রতিবন্ধিতা যদি মুকাল্লাফ ব্যক্তির আহলিয়্যাতের কিছু অংশ নষ্ট করে থাকে — পুরোটা নয় — এবং আশঙ্কা হয় যে সে তার ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারিত হবে, তবে শরঈভাবে তার জন্য তিন দিনের খিয়ার (বাতিল করার অধিকার) রয়েছে; হিব্বান ইবনু মুনকিযের হাদীসের কারণে, যাতে রয়েছে:—

إذا بايعت فقل لا خلابة, وجعل الخيار ثلاثة أيام

> "তুমি যখন ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন বলবে — কোনো প্রতারণা নয়।" এবং তিনি তিন দিনের খিয়ার নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

পঞ্চদশ:— যে ব্যক্তির দুই হাত ও দুই পা অবশ, তার জন্য অন্য কারও সঙ্গে "শিরকাতুল আবদান" (দৈহিক শ্রমের অংশীদারি ব্যবসা) চুক্তি করা জায়েয নয়। কারণ এই শিরকতের ভিত্তি দেহ দিয়ে কাজ করার ওপর, অথচ তার সমস্ত অঙ্গ অচল হয়ে যাওয়ায় সে দেহ দিয়ে কাজ করতে সক্ষম নয় — তবে যদি সে তার বদলে কাজ করার জন্য কাউকে ভাড়া করে নেয়, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু শিরকতের চুক্তি সম্পাদনের আগে তার অংশীদারকে অবশ্যই এ বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে, যেন সে নিজের বিষয়ে সম্যক অবগত থাকে।

ষোড়শ:— প্রতিবন্ধিতার সঙ্গে যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আহলিয়্যাতের কোনো সম্পর্ক না থাকে, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিবাহ, তালাক, রুজূ (তালাকের পর ফিরিয়ে নেওয়া), অন্যকে উকিল নিযুক্ত করা ও নিজে উকিল হওয়া, কাফালাত ও

যামানত (জামিনদারি ও দায়ভার গ্রহণ), খুলা, যিহার, ঈলা, কসম ও মানত, দাসমুক্তি, ইজারা (ভাড়ায় দেওয়া) ও ইসতিআরা (ধার নেওয়া) ও ইআরা (ধার দেওয়া), ইসতীদা (আমানত রাখা) ও তাওদী (আমানত গ্রহণ) — এ সবকিছুই সহীহভাবে সম্পন্ন হবে, তাতে কোনো সংশয় নেই। কেননা এই চুক্তিগুলোর সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ার কোনো সম্পর্ক নেই, কিংবা প্রতিবন্ধিতার অন্য কোনো প্রকারেরও সম্পর্ক নেই — যতক্ষণ এই প্রতিবন্ধিতা আহলিয়্যাতের ওপর প্রভাব না ফেলে। এই হলো প্রতিবন্ধীদের কিছু হুকুম। আল্লাহ আমাদের রব, তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসাবিষয়ক হুকুম

বিষয়	হুকুম
হাত বা পা কেটে গেলে	কাটা অংশ থেকে ধোয়া রহিত; আংশিক কাটলে বাকি অংশ ধোয়া ওয়াজিব
কৃত্রিম হাত বা পা	ধোয়া বা মাসাহ ওয়াজিব নয়
কৃত্রিম পায়ের ওপর মোজা	সঠিক মতে মাসাহ ওয়াজিব নয়, সুন্নতও নয়
অবশ হাত কেটে ফেলা	কিসাস নেই, দিয়াত রয়েছে
অবশ ব্যক্তির সালাত	সামর্থ্য অনুযায়ী; অক্ষমতায় ওয়াজিব রহিত
জামাআতে হাজির হওয়া কষ্টকর হলে	নিজ ঘরে সালাত
ওয়াক্তে সালাত কষ্টকর হলে	জমউ তাকদীম বা তাখীর জায়েয
ক্যাথেটার খোলা সম্ভব না হলে	তা নিয়েই সালাত
রোযায় অক্ষম, আরোগ্যের আশা নেই	রোযা ভাঙবে; প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে
রোযায় অক্ষম, আরোগ্যের আশা আছে	রোযা ভাঙবে; আরোগ্যের পর কাযা
আহলিয়্যাত ক্ষতিগ্রস্ত না হলে	বিবাহ, তালাক ও লেনদেন সহীহ
আহলিয়্যাতের কিছু অংশ নষ্ট, প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা	তিন দিনের খিয়ার

প্রশ্ন ৫১

ফুকাহায়ে কিরাম তাঁদের গ্রন্থাবলিতে "কিতাবুন নিকাহ"-এ যেসব রোগজনিত ত্রুটির (আইব) কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো কী কী? আর সেগুলোর ফিকহি প্রভাব কী?

উত্তর/ আমি বলি:— এই ত্রুটিগুলোর ব্যাপারে ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ এক সর্বব্যাপী ও সর্ব-প্রতিরোধী কথায় বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তা হলো তাঁর এই উক্তি:—

الصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود لأن الأصل السلامة فكأن هذه الشروط في العقد نقص شيء من الأطراف فكل عيب

ينفر الزوج من الآخر ولا يحصل معه مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار

> "সঠিক মত হলো, বিবাহ সমস্ত ত্রুটির কারণেই ভঙ্গ (ফাসখ) করা যায় — অন্যান্য সব চুক্তির মতোই। কারণ মূল ধরে নেওয়া হয় নিরাপদ-নিখুঁত হওয়া; সুতরাং চুক্তিতে এই শর্তগুলো যেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু ঘাটতির মতো। অতএব যে ত্রুটিই এক স্বামী/স্ত্রীকে অপরজন থেকে বিমুখ করে দেয় এবং যার সঙ্গে বিবাহের উদ্দেশ্য — ভালোবাসা ও দয়া — অর্জিত হয় না, তা-ই খিয়ার সাব্যস্ত করে।" — উদ্ধৃতি শেষ; এটি তাঁর কথা।

তবে এর বিশদ ব্যাখ্যা অপরিহার্য। সুতরাং আমি বলি:— ত্রুটিগুলো নিজেদের প্রকৃতির দিক থেকে দুই ভাগে বিভক্ত:— তার একটি:— যৌন ত্রুটি, যা মূল থেকেই যৌন উপভোগে বাধা দেয় — যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে "জাব্ব" (লিঙ্গ কর্তন), "উন্নাহ" (পুরুষত্বহীনতা) ও "খিসা" (অণ্ডকোষহীনতা); আর নারীর ক্ষেত্রে "রাতক", "কারন" ও "আফাল"। দ্বিতীয়:— এমন ত্রুটি, যা উপভোগে বাধা দেয় না, কিন্তু এমন রোগ যা পূর্ণ দাম্পত্য-সহাবস্থান থেকে বিমুখ করে দেয় — এমনভাবে যে, দারুরাত ছাড়া তার সঙ্গে দাম্পত্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না — যেমন উন্মাদনা (জুনূন), শ্বেতকুষ্ঠ (বারাস), সিফিলিস (যুহরী) ও সংক্রামক রোগসমূহ।

এই হলো ত্রুটিগুলোকে নিজেদের প্রকৃতির দিক থেকে ভাগ করার বিবরণ। আর সেগুলোকে অবস্থানের দিক থেকে ভাগ করলে তা তিন ভাগে বিভক্ত:— যৌথ ত্রুটি, পুরুষের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ত্রুটি, এবং নারীর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ত্রুটি। এবার নাও এগুলোর আরও বিশদ বিবরণ। সুতরাং আমি বলি:—

স্বামীর সঙ্গে যা বিশেষভাবে সম্পর্কিত:— যেমন তার লিঙ্গের সম্পূর্ণ বা আংশিক কর্তন — যদি লিঙ্গের এতটুকু অবশিষ্ট না থাকে যা দিয়ে সহবাস সম্ভব; এবং তেমনই যদি লিঙ্গ বিদ্যমান থাকে কিন্তু তা নিস্তেজ-নিশ্চল, যাতে কোনো চাঞ্চল্য নেই — আর সে-ই "উন্নীন"। ফুকাহাদের নিকট তার হুকুম হলো, তার ব্যাপারে এটি সাব্যস্ত হওয়ার পর তাকে পূর্ণ এক বছর সময় দেওয়া হবে। কারণ চারটি ঋতু অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি তার সমস্যা দূর না হয়, তবে আমরা বুঝব এটি তার সৃষ্টিগত। সুতরাং সে যদি এই এক বছরের মধ্যে সহবাস করে (তবে তো ভালো), নতুবা তার স্ত্রীর জন্য ফাসখের খিয়ার রয়েছে। সে যদি দাম্পত্য টিকিয়ে রাখা বেছে নেয়, তা তার অধিকার; আর যদি ফাসখ বেছে নেয়, তা-ও তার অধিকার — এবং কোনো বিনিময় ছাড়াই।

আর স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত:— তা হলো "রাতক" — অর্থাৎ তার লজ্জাস্থান সৃষ্টিগতভাবেই বন্ধ, যাতে লিঙ্গ প্রবেশ করতে পারে না। এবং "কারন" — তা হলো লজ্জাস্থানে গজিয়ে ওঠা বাড়তি মাংস, যা তা বন্ধ করে দেয়। এবং "আফাল" — তা হলো নারীর দুই পথের মধ্যবর্তী মাংসপিণ্ডে সৃষ্ট ফোলা, যা তার লজ্জাস্থানকে সংকুচিত করে দেয় ফলে তাতে লিঙ্গ প্রবেশ করতে পারে না। এবং "ফাতক" — অর্থাৎ তার পথ ছিঁড়ে যাওয়া, কিংবা পেশাব ও বীর্যের নির্গমনপথের মধ্যবর্তী অংশ ছিঁড়ে যাওয়া। এবং তার লজ্জাস্থানে ক্ষরণশীল ঘা, যা থেকে দুর্গন্ধ বের হয় এবং যা পূর্ণ উপভোগে বাধা দেয়। এবং স্থায়ী ইস্তিহাযা অর্থাৎ রক্তক্ষরণ — কেননা তা স্বভাবতই বিমুখ করে দেয় এবং পূর্ণ উপভোগে বাধা দেয়।

আর যৌথ ত্রুটিগুলো:— যেমন কুষ্ঠ (জুযাম) ও শ্বেতকুষ্ঠ (বারাস) — আমরা এ দুটি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই; এবং উন্মাদনা — যদিও তা মাঝেমধ্যে হয়; এবং মাথার সমস্ত চুল পড়ে যাওয়া, যাতে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না — আর তা হলো "কারা" (টাক); এবং "বাসূর" (অর্শ) ও "নাসূর" (ভগন্দর) — এ দুটি মলদ্বারের রোগ; এবং স্থায়ী সংক্রামক রোগ, যেমন এইডস (AIDS) ও এ জাতীয় রোগ — আমরা তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই; এবং মুখের স্থায়ী দুর্গন্ধ, অর্থাৎ তার গন্ধ এতটাই কদর্য যে তা সহ্য করা যায় না — যদি তা চিকিৎসা দিয়ে বা তা দূরকারী কোনো

কিছু দিয়ে বন্ধ না হয়, এমনকি মিলনের সময়েও না; এবং তীব্র-জটিল মানসিক রোগসমূহ, যেগুলোর স্বভাবই হলো পূর্ণ ভালোবাসা, দয়া, সামঞ্জস্য ও সম্প্রীতিতে বাধা দেওয়া; এবং বিবাহ-চুক্তির আগেকার সিহর (জাদু), যার দ্বারা উদ্দেশ্য নারীকে পুরুষদের থেকে বিরত রাখা কিংবা পুরুষকে নারীদের থেকে বিরত রাখা — কেননা এ অবস্থায় জীবন অত্যন্ত কঠিন এবং এর চিকিৎসা দীর্ঘ হয়, বিশেষত সত্যনিষ্ঠ রাকীদের স্বল্পতা, ঈমানের দুর্বলতা, গুনাহের আধিক্য ও প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে।

ত্রুটিগুলোর বিশদ বিবরণ অনেক; আর ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহু তাআলা যা বলেছেন তা-ই তোমার জন্য সেগুলোকে একত্র করে দেয় — অর্থাৎ যে ত্রুটিই পূর্ণ উপভোগ থেকে বিমুখ করে, তা-ই খিয়ার সাব্যস্ত করে।

আর সেগুলোর ফিকহি প্রভাবের ব্যাপারে — ফুকাহায়ে কিরাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এই ত্রুটিগুলোর দ্বারা খিয়ার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং সেগুলো যদি স্বামীর মধ্যে থাকে, তবে স্ত্রীর জন্য দাম্পত্য টিকিয়ে রাখা বা ফাসখ করার খিয়ার রয়েছে; আর যদি স্ত্রীর মধ্যে থাকে, তবে স্বামীর জন্য দাম্পত্য টিকিয়ে রাখা বা ফাসখ করার খিয়ার রয়েছে; আর যদি তা যৌথ হয়, তবে উভয়ের ক্ষেত্রেই একসঙ্গে খিয়ার সাব্যস্ত। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

বিবাহে রোগজনিত ত্রুটি ও খিয়ার

রোগজনিত ত্রুটি ও বিবাহ ভঙ্গের খিয়ার

নীতি (ইবনুল কাইয়িম)
যে ত্রুটি বিমুখ করে ও বিবাহের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না, তা খিয়ার সাব্যস্ত করে

প্রকৃতি ১
যৌন ত্রুটি যা উপভোগে বাধা দেয়

প্রকৃতি ২
উপভোগে বাধা না দিলেও বিমুখকারী রোগ — জুনূন, বারাস, সংক্রামক রোগ

স্বামীর বিশেষ ত্রুটি
উন্নীনকে পূর্ণ এক বছর সময়; তারপর স্ত্রীর ফাসখের খিয়ার

স্ত্রীর বিশেষ ত্রুটি
রাতক, কারন, আফাল, ফাতক, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, স্থায়ী ইস্তিহাযা

যৌথ ত্রুটি
কুষ্ঠ, বারাস, উন্মাদনা, টাক, অর্শ, স্থায়ী সংক্রামক রোগ, তীব্র মানসিক রোগ, বিবাহপূর্বের সিহর

ফিকহি প্রভাব
যার মধ্যে নেই তার খিয়ার; যৌথ হলে উভয়ের খিয়ার

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

এক নজরে

- ★ প্রয়োজনে কাফির থেকেও রক্ত সঞ্চালন জায়েয; লেখকের সঠিক মতে জরুরি অবস্থায় রোগীর অনুমতি অপরিহার্য নয়
- ★ জীবিত থেকে জীবননির্ভর অঙ্গ প্রতিস্থাপন হারাম; অঙ্গ বিক্রি জায়েয নয়
- ★ ভ্রূণের অঙ্গের জন্য গর্ভপাত জায়েয নয়; জননগ্রন্থি প্রতিস্থাপন হারাম
- ★ হদ্দে কেটে ফেলা অঙ্গ পুনঃসংযোজন জায়েয নয়
- ★ ওয়াসওয়াসা শরঈ চিকিৎসায় প্রতিহত করাই সুস্পষ্ট ঈমান; কাজ ও কথা যুক্ত না হলে ক্ষমাকৃত
- ★ কৃত্রিম হাত-পা ধোয়া বা মাসাহ ওয়াজিব নয়
- ★ বিবাহের ত্রুটিতে খিয়ার; উন্নীনকে এক বছর সময়

যাচাই করুন

1. কাফিরের রক্ত মুসলিমের দেহে সঞ্চালন সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. জায়েয নয় | খ. কেবল মুসলিম থেকেই জায়েয | গ. প্রয়োজনে জায়েয, হারবী কাফির থেকেও

2. জীবিত মানুষ থেকে হৃৎপিণ্ড অন্যের দেহে স্থানান্তর সম্পর্কে হুকুম কী?

ক. জায়েয | খ. অনুমতি থাকলে জায়েয | গ. হারাম

3. ভ্রূণের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে গর্ভপাত সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. জায়েয | খ. কেবল সুন্নত | গ. জায়েয নয়

4. ওয়াসওয়াসার অভিযোগকারী সাহাবীদের নবী কী বললেন?

ক. এটি ঈমানের স্বল্পতার প্রমাণ | খ. এটি গুনাহ | গ. এটিই তো সুস্পষ্ট ঈমান

5. কৃত্রিম হাত বা পা ধোয়া সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. ওয়াজিব | খ. মুস্তাহাব | গ. ওয়াজিব নয়

6. উন্নীন স্বামীকে কতটুকু সময় দেওয়া হবে বলা হয়েছে?

ক. তিন দিন | খ. এক মাস | গ. পূর্ণ এক বছর

উত্তর: ১-গ, ২-গ, ৩-গ, ৪-গ, ৫-গ, ৬-গ

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

মানসিক রোগ, ক্রোধ ও জ্বরের চিকিৎসা; স্বাস্থ্যবীমা, মানব-ক্লোনিং, স্মৃতিভ্রংশ ও তালবীনা

প্রশ্ন ৫২

মানসিক রোগের (الأمراض النفسية) চিকিৎসা কীভাবে করবেন?

উত্তর/ আমি বলি:— শরীয়তসম্মত পন্থা হলো, এর চিকিৎসা করা হবে নববী চিকিৎসার (তিব্বে নববী) মাধ্যমে এবং সেই চিকিৎসার মাধ্যমে যা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বিশিষ্ট শ্রেণি জানেন — এই শর্তে যে তা শরীয়তবিরোধী কোনো কিছু দিয়ে না হয়। এ তো হলো সংক্ষিপ্ত (ইজমালি) কথা। আর বিশদ (তাফসীলি) কথা হলো, এর চিকিৎসা কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে:—

এর অন্যতম:— আল্লাহ তাআলার ওপর আস্থা রাখা, তাঁর সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা, তাঁর ওপর উত্তমরূপে তাওয়াক্কুল করা, সমস্ত বিষয় তাঁর কাছে সোপর্দ করে দেওয়া এবং এতে সওয়াবের আশা রাখা।

এর অন্যতম:— সত্যিকারের তাওবা, যা তার সমস্ত শর্ত পূর্ণ করে।

এর অন্যতম:— শরঈ নিয়ম-নীতি ও রক্ষণীয় আদবসমূহ মেনে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআয় বারবার লেগে থাকা, মুক্তির প্রতীক্ষা করা এবং তাড়াহুড়া পরিহার করা।

এর অন্যতম:— কুরআন, দুআ এবং প্রমাণিত শরঈ তাবীয-বাক্য (তাআবীয) দিয়ে রুকইয়াহ করা — তা নিজে নিজের ওপর করুক (এটিই উত্তম), অথবা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে করাক।

এর অন্যতম:— বেশি বেশি যমযমের পানি পান করার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করা। কেননা হাদীসে এসেছে:—

ماء زمزم لما شرب له

> "যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, তা সে উদ্দেশ্যেই কাজ করে।"

আর আরেক হাদীসে এসেছে:—

إنها مباركة وإنها طعام طعم وشفاء سقم

> "নিশ্চয়ই তা বরকতময়, নিশ্চয়ই তা ক্ষুধা নিবারণকারী খাদ্য এবং রোগের নিরাময়।" — বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও আবু দাউদ; এটি আবু দাউদের শব্দ।

এর অন্যতম:— দ্বীনদার, সৎ ও ইলমের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে তোমার জন্য দুআ করতে বলা।

এর অন্যতম:— কুরআন শোনা ও বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। কেননা এটিই সেই পরীক্ষিত মহৌষধ (তিরিয়াক), রূহ ও দেহের জন্য যার চেয়ে উপকারী আর কিছু নেই।

এর অন্যতম:— এমন দুঃখজনক বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা যা বুককে সংকীর্ণ করে দেয়, এবং যা রূহকে প্রফুল্ল করে ও মনকে প্রশান্তি দেয় সেদিকে মনোনিবেশ করা।

এর অন্যতম:— মানুষের সঙ্গে মেলামেশা খোঁজা এবং একাকিত্ব পরিহার করা।

এর অন্যতম:— মানসিক রোগে বিশেষজ্ঞ নির্ভরযোগ্য মুসলিম চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা নেওয়া, তাঁদের সঙ্গে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া, তাঁদের দেওয়া ওষুধ গ্রহণের নির্ধারিত সময়সূচি রক্ষা করা, এবং নিজের মনকে অবিরত এ কথা বোঝানো যে তাঁরা কেবল উপায় ও উপকরণ মাত্র, আর শিফাদানকারী একমাত্র আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা।

এর অন্যতম:— সুন্দর ধৈর্য (সবরে জামীল), যা অভিযোগ করা এবং ধৈর্যের পরিপন্থী অস্থিরতা বর্জন করাকে অপরিহার্য করে।

এর অন্যতম:— আশাবাদী হওয়া, দীর্ঘ আশা রাখা এবং যতটুকু সম্ভব হতাশার বিরুদ্ধে লড়াই করা।

এর অন্যতম:— এ বিষয়ে যা লেখা হয়েছে তা বেশি বেশি পড়ে এর ওপর যে সওয়াব ও প্রতিদান নির্ধারিত রয়েছে তা জানা।

এর অন্যতম:— ঈমান দিয়ে মনকে শক্তিশালী করা এবং সৎ আমল অর্জনে প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করা — বিশেষত বেশি বেশি যিকির, যা বুক প্রশস্ত করে, হৃদয়কে প্রশান্তি দেয় এবং পথ আলোকিত করে।

এর অন্যতম:— যেসব কারণ এই মানসিক সমস্যাটিকে উস্কে দিয়েছে সেগুলো কেটে ফেলা এবং যথাসাধ্য সেগুলো থেকে দূরে থাকা।

এর অন্যতম:— যদি এসব কারণ দূর করা সম্ভব না হয়, তবে রোগ-উদ্রেককারী পরিবেশটাই বদলে ফেলা। কেননা পরিবেশ পরিবর্তন করা ও আচরণ পরিবর্তন করা মানসিক চিকিৎসার পদ্ধতিগুলোরই একটি পদ্ধতি।

মানসিক রোগের চিকিৎসার উপায়

- [ ] আল্লাহর ওপর আস্থা, সুধারণা ও উত্তম তাওয়াক্কুল
- [ ] সত্যিকারের তাওবা
- [ ] শরঈ আদব মেনে দুআয় লেগে থাকা; তাড়াহুড়া পরিহার
- [ ] কুরআন, দুআ ও প্রমাণিত বাক্য দিয়ে রুকইয়াহ — নিজে নিজের ওপর উত্তম
- [ ] বেশি বেশি যমযমের পানি পান করা
- [ ] দ্বীনদার, সৎ ও আলিম ব্যক্তিদের দুআ চাওয়া
- [ ] কুরআন শোনা ও বেশি বেশি তিলাওয়াত
- [ ] বুক সংকীর্ণকারী বিষয় থেকে দূরে থাকা
- [ ] মানুষের সঙ্গে মেলামেশা; একাকিত্ব পরিহার
- [ ] নির্ভরযোগ্য মুসলিম মানসিক-রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে চিকিৎসা; ওষুধের সময়সূচি রক্ষা
- [ ] সুন্দর ধৈর্য; আশাবাদী হওয়া
- [ ] ঈমান, সৎ আমল ও যিকির দিয়ে মনকে শক্তিশালী করা
- [ ] উস্কে দেওয়া কারণ কেটে ফেলা; সম্ভব না হলে পরিবেশ বদলানো

প্রশ্ন ৫২ — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা একত্রে

তো এগুলোই হলো মানসিক রোগের চিকিৎসার কতিপয় পন্থা। তুমি যদি এগুলো পুনরায় দেখো, তবে দেখতে পাবে যে এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (হিসসি) ও আধ্যাত্মিক (রূহি) — উভয় চিকিৎসাকেই একত্র করেছে। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন ৫৩

ক্রোধের চিকিৎসা কীভাবে করা হয় — দলিলসহ তার ব্যাখ্যা দিন?

উত্তর/ আমি বলি:— জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর রহম করুন, ক্রোধের দুটি চিকিৎসা রয়েছে:— একটি প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা (ইলাজে দাফি) এবং আরেকটি নিরসনমূলক চিকিৎসা (ইলাজে রাফি)।

আর তার প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা হলো, যেসব কারণ ক্রোধকে উস্কে দেয় সেগুলো কেটে ফেলা। আর তা হয় এভাবে: — নিজের মনকে সর্বদা সহনশীলতার (হিলম) অভ্যাস করানো ও সে অনুযায়ী গড়ে তোলা, তাকে জোর করে হলেও তার ওপর ধরে রাখা ও তাকে তাতে বাধ্য করা; তাকে সহনশীলতার ফযীলত স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া যে এটি সেই গুণগুলোর একটি যা আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন; তাকে সর্বদা ক্ষমা ও উপেক্ষার অভ্যাস করানো; আর তোমার অধীনস্থদেরকে — স্ত্রী, সন্তান, খাদেম, শ্রমিক, ছাত্র, অধস্তন কর্মী ও কর্মচারী প্রমুখকে — শিখিয়ে

দেওয়া যে কোন কোন কথা ও কাজ তোমাকে রাগান্বিত করে, যাতে তারা তা এড়িয়ে চলতে পারে। আমরা এটি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে এর ফলাফল অত্যন্ত ভালো।

আরও রয়েছে:— অন্যদেরকে সম্মান করা এবং কথায় বা কাজে তাদেরকে রাগান্বিত না করা; তাদের সঙ্গে আদবের পথ অবলম্বন করা; সর্বদা ও চিরকাল বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার যিকির করা; ক্রোধ থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে তাহাজ্জুদ, বেশি বেশি সদকা ও অন্যান্য সৎকর্মের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া; হৈ-হুল্লোড়, অনর্থক বকবক এবং যে কথার হিসাব তার বক্তারা রাখে না — এমন কথার মজলিস থেকে দূরে থাকা; প্রয়োজন ছাড়া অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা কমিয়ে দেওয়া; এমন নির্বোধের সঙ্গ ত্যাগ করা যে নিজের দুই ঠোঁটের মধ্য থেকে কী বের হচ্ছে তা নিয়ে ভাবে না; হক ছাড়া ঝগড়া ও বিতর্ক পরিহার করা — আর হকের ক্ষেত্রেও আদব রক্ষা করে; এবং অন্যদের পক্ষ থেকে এমন আচরণ প্রকাশ পেলে যা তোমাকে রাগান্বিত করে, তাদের জন্য ওজর খোঁজায় সচেষ্ট হওয়া। আমরা এটিও পরীক্ষা করে দেখেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে ক্রোধ প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় উপায়গুলোর এটি একটি।

আরও রয়েছে:— অন্যদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা ও তাদের কথাকে সর্বোত্তম অর্থে গ্রহণ করা; এবং সহনশীলতা লাভ ও ক্রোধ থেকে দূরে থাকার জন্য বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা। সব মিলিয়ে, যেসব কারণ ক্রোধ ডেকে আনে তার প্রতিটি থেকেই দূরে থাকতে হবে। এ তো হলো তা থেকে বেঁচে থাকার (প্রতিরোধের) কথা।

আর ক্রোধ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর তার চিকিৎসা হলো, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা ও তার লাগাম শক্ত করে ধরা। আর এই ব্যক্তিই সেই "শক্তিশালী" যার প্রশংসা নবী ﷺ করেছেন — শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) ইবনু শিহাবের সূত্রে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ))

> "শক্তিশালী সে নয় যে কুস্তিতে অন্যকে ধরাশায়ী করে; বরং প্রকৃত শক্তিশালী সে-ই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"

এর অর্থ হলো, সে যেন নিজের জিহ্বা ও নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেননা ক্রোধ এমন এক অবস্থা যেখানে সবকিছু উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কারণ তা হলো আগুনের একটি অঙ্গার যা শয়তান আদম-সন্তানের অন্তরে নিক্ষেপ করে। ফলে অধিকাংশ মানুষ তখন নিজেদের কথা ও কাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। তাই নবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে প্রকৃত শক্তিশালী সে-ই, যে এই প্রবল আগন্তুক অনুভূতিকে প্রতিরোধ করতে পারে এবং নিজেকে শক্ত করে ধরে ও নিজের কথা-কাজকে অনুচিত বিষয় থেকে আটকে রেখে তাকে প্রতিহত করতে পারে। এ-ই হলো প্রকৃত শক্তিশালী। সুতরাং শক্তিশালী সে নয় যে বীরপুরুষ ও ষণ্ডামার্কা লোকদের পরাজিত করে; বরং শক্তিশালী সে-ই, যে ক্রোধের সময় ও হৃদয়ের রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠার সময় নিজের নফসকে পরাজিত করে। আর আল্লাহই সাহায্যপ্রার্থনার স্থল।

আর ক্রোধের যেসব চিকিৎসা রয়েছে তার মধ্যে আরও আছে:— তা গিলে ফেলা (কাযমুল গায়য) ও প্রকাশ না করা, সেই সঙ্গে এর ওপর নির্ধারিত মহা প্রতিদান ও বিপুল সওয়াবের আশা রাখা। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ "আল-আদাবুল মুফরাদ"-এ বলেছেন:— আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ ইবনু ইউনুস, তিনি বলেছেন আমাদেরকে হাদীস

বর্ণনা করেছেন আবু শিহাব আবদু রাব্বিহি, ইউনুস থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে; তিনি বলেছেন:—

ما من جرعة أعظم عند الله أجرً من جرعة غيظٍ كظمها عبد, ج ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ ٱللَّهِ ((

"আল্লাহর কাছে সওয়াবের দিক থেকে এমন কোনো ঢোক নেই যা সেই ক্রোধের ঢোকের চেয়ে বড়, যা কোনো বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গিলে ফেলে।"

আর এর সনদ সহীহ। এর আগেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার বাণী:—

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضها السموات والأرض

أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ

والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

"আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও যমীন — যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য; যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান: ১৩৩-১৩৪)

আর যে বিষয় দিয়ে ক্রোধের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে আরও আছে:— বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। শাইখাইন নিজেদের সহীহ-দুটিতে সুলাইমান ইবনু সুরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন:— নবী ﷺ-এর কাছে দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালাগাল করছিল। তাদের একজন রাগে ফেটে পড়ছিল এবং তার চেহারা লাল হয়ে যাচ্ছিল। নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেন:—

إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

> "আমি অবশ্যই এমন একটি বাক্য জানি, সে যদি তা বলত তবে তার এ অবস্থা চলে যেত:— أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই)।"

তখন এক ব্যক্তি উঠে সেই লোকটির কাছে গিয়ে বলল:— তুমি জানো তিনি কী বলেছেন? তিনি বলেছেন:— ((قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)) "তুমি বলো: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।" তখন লোকটি বলল:— তুমি কি আমাকে পাগল মনে করছ? আর এক বর্ণনায় আছে যে নবী ﷺ তাকে বললেন:— ((تعوذ بالله من الشيطان الرجيم)) "তুমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও।" তখন লোকটি বলল:— আমার মধ্যে কি কোনো পাগলামি আছে?

আর যে জিনিস দিয়ে ক্রোধ প্রতিহত করা হয় তার মধ্যে আছে:— চুপ থাকা ও কথা বলা থেকে বিরত থাকা। বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ"-এ নিজের সনদে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

علموا ويسروا علموا ويسروا ثلاث مرات وإذا غضبت فسكت مرتين

> "তোমরা শিক্ষা দাও ও সহজ করো, তোমরা শিক্ষা দাও ও সহজ করো — তিনবার — আর যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো — দুইবার।"

আর এটি হাসান হাদীস।

আর ক্রোধ সংঘটিত হওয়ার পর যে জিনিস দিয়ে তা প্রতিহত করা হয় তার মধ্যে আছে:— অবস্থান পরিবর্তন করা। সুতরাং সে যদি দাঁড়ানো থাকে তবে যেন বসে পড়ে, আর যদি বসা থাকে তবে যেন শুয়ে পড়ে। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন:—

إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب

وإلا فليضطجع

"তোমাদের কেউ যখন দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তখন সে যেন বসে পড়ে। এতে যদি তার ক্রোধ চলে যায় (তো ভালো), নতুবা সে যেন শুয়ে পড়ে।" — "সহীহ হাদীস, বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও অন্যান্যরা"

আর যে জিনিস দিয়ে তা প্রতিহত করা হয় তার মধ্যে আরও আছে:— ওযু দিয়ে তা নিভিয়ে দেওয়া। আবু দাউদ এমন এক সনদে — যাতে দুর্বলতা রয়েছে — বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেছেন:—

إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما

تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

"নিশ্চয়ই ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে, আর শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; আর আগুন তো পানি দিয়েই নেভানো হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয়, তখন সে যেন ওযু করে।"

তো এগুলোই হলো সেসব বিষয়ের সমষ্টি যা দিয়ে ক্রোধের চিকিৎসা করা হয় — সংঘটিত হওয়ার আগে প্রতিরোধ হিসেবে এবং সংঘটিত হওয়ার পর নিরসন হিসেবে। আল্লাহ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে এগুলো মেনে চলার তাওফীক দিন। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

ক্রোধের দুই চিকিৎসা

প্রতিরোধমূলক (দাফি)	নিরসনমূলক (রাফি)
সহনশীলতা, ক্ষমা ও উপেক্ষার অভ্যাস	নিজেকে নিয়ন্ত্রণ — প্রকৃত শক্তিশালী সে-ই
অধীনস্থদের জানানো কী রাগান্বিত করে	ক্রোধ গিলে ফেলা (কাযমুল গায়য)
যিকির, তাহাজ্জুদ, সদকা; অনর্থক মজলিস ত্যাগ	বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া
ঝগড়া ও নির্বোধের সঙ্গ ত্যাগ	চুপ থাকা
অন্যের সম্পর্কে সুধারণা; ওজর খোঁজা; দুআ	দাঁড়ানো থাকলে বসা, বসা থাকলে শোয়া
—	ওযু করা (হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে)

প্রশ্ন ৫৩

প্রশ্ন ৫৪

জ্বরের চিকিৎসায় নবী ﷺ-এর নির্দেশনা (হাদ্‌ই) কী — দলিলসহ তার ব্যাখ্যা দিন?

উত্তর/ আমি বলি:— এর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়া অপরিহার্য। তবে সে চিকিৎসার পাশাপাশি মুসলিমকে অবশ্যই নববী চিকিৎসার প্রতিও যত্নবান হতে হবে; আর তা হলো পানি দিয়ে তা ঠান্ডা করা। কারণ জ্বর হলো দেহের ভেতরের আগুন, তাই তার বিপরীত জিনিস দিয়েই তাকে প্রতিরোধ করতে হবে যা তার কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। আর পানিই সেই জিনিস যা আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে তার প্রভাব দূর করে দেয়। বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেছেন:—

إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم

> "নিশ্চয়ই জ্বর জাহান্নামের উত্তাপের অংশ; সুতরাং তোমরা তা পানি দিয়ে ঠান্ডা করো — অথবা তিনি বলেছেন — যমযমের পানি দিয়ে।"

আর এটি হবে দেহে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে অথবা পানিতে ডুব দেওয়ার মাধ্যমে। দেহে পানি ছিটানোর ব্যাপারে দলিল হলো হাকিম, তাবারানী, আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদে এবং আবু নুআইম "আত-তিব্ব" গ্রন্থে আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে যা বর্ণনা করেছেন — যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

إذا حَمَّ أحدكم فليرش عليه الماء البارد ثلاث ليالٍ من السحر

"তোমাদের কারো যখন জ্বর হয়, তখন তার ওপর যেন তিন রাত সাহরীর সময় ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয়।"

হাফিয (ইবনু হাজার) "আল-ফাতহ"-এ বলেছেন:— এর সনদ শক্তিশালী; আর এটি সহীহ হাদীস। সুতরাং এ হাদীসটি এ কথা জানিয়ে দিল যে ঠান্ডা করা হবে ছিটানোর মাধ্যমে, এবং তা হবে সাহরীর সময়ে।

আর ডুব দেওয়ার ব্যাপারে দলিল হলো নাফি ইবনু জুবাইরের হাদীস; তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

إذا أصابت أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها بالماء البارد فليستنقع في نهرٍ جارٍ وليستقبل جريته بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس وليقل: باسم الله, ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام, فإن برئ وإلا ففي خمسٍ فإن لم يبرأ في خمسٍ, فسبع فإن لم يبرأ في سبعٍ فتسع فإنها لا تكاد تجاوز التسع بإذن الله

"তোমাদের কাউকে যখন জ্বর পেয়ে বসে — আর জ্বর তো আগুনেরই একটি টুকরা — তখন সে যেন তা ঠান্ডা পানি দিয়ে নিভিয়ে দেয়। সে যেন প্রবহমান নদীতে অবগাহন করে, ফজরের সালাতের পরে ও সূর্যোদয়ের আগে তার স্রোতের দিকে মুখ করে দাঁড়ায় এবং বলে:— بسم الله (আল্লাহর নামে)। এরপর সে যেন তাতে তিনবার ডুব দেয়, তিন দিন ধরে। এতে যদি সে সুস্থ হয়ে যায় (তো ভালো), নতুবা পাঁচ দিন; পাঁচ দিনে সুস্থ না হলে সাত দিন; সাত দিনে সুস্থ না হলে নয় দিন। কেননা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তা নয় দিনের বেশি অতিক্রম করে না বললেই চলে।" — "বর্ণনা করেছেন তিরমিযী, হাকিম, ইবনুস সুন্নী ও আবু নুআইম 'আত-তিব্ব'-এ, এবং যাহাবী 'আত-তিব্ব'-এ; এতে দুর্বলতা রয়েছে"

আর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد

"জ্বর হলো জাহান্নামের হাপরসমূহের একটি হাপর; সুতরাং তোমরা তা ঠান্ডা পানি দিয়ে নিজেদের থেকে সরিয়ে দাও।" — "বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ; বূসীরী একে সহীহ বলেছেন এবং সুয়ূতী একে হাসান বলেছেন"

আর পবিত্র শরীয়তে এর চিকিৎসার সারকথা হলো, ছিটানো বা ডুব দেওয়ার মাধ্যমে ঠান্ডা পানি দিয়ে তা ঠান্ডা করা। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

জ্বর: নববী নির্দেশনা

১ **প্রথম**
চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়া অপরিহার্য

২ **সঙ্গে নববী চিকিৎসা**
পানি দিয়ে ঠান্ডা করা — জ্বর জাহান্নামের উত্তাপের অংশ

৩ **ছিটানো**
সাহরীর সময় ঠান্ডা পানি ছিটানো — ইবনু হাজারের মতে সনদ শক্তিশালী

৪ **ডুব দেওয়া**
প্রবহমান নদীতে ডুব — হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে

প্রশ্ন ৫৫

স্বাস্থ্যবীমার (التأمين الصحي) হুকুম কী? আর এ বিষয়ে মূলনীতি কী?

উত্তর/ আমি বলি:— স্বাস্থ্যবীমা দুটি অবস্থার বাইরে নয়:— হয় তা হবে বাণিজ্যিক স্বাস্থ্যবীমা, নয়তো তা হবে সহযোগিতামূলক (তাআওনি) স্বাস্থ্যবীমা।

আর বাণিজ্যিক স্বাস্থ্যবীমার ব্যাপারে কথা হলো, তা তার সমস্ত রূপ ও আকারে হারাম। এর হারাম হওয়ার ব্যাপারে হাইআতু কিবারিল উলামার সিদ্ধান্ত জারি হয়েছে, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামীর অধীন আল-মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর সিদ্ধান্ত জারি হয়েছে, এবং জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর সিদ্ধান্তও জারি হয়েছে। এর হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল-লাজনাতুদ দাইমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা থেকেও কয়েকটি ফতোয়া জারি হয়েছে। এঁরা সকলেই বাণিজ্যিক বীমাকে তার সমস্ত রূপ ও আকারে হারাম বলে ফতোয়া দেন।

আর তা এ কারণে যে, এটি এমন এক লেনদেন যা ঝুঁকির (মুখাতারা) ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর মূলনীতিতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, ঝুঁকির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি লেনদেনই জুয়া। আর জুয়া মাইসিরের অন্তর্ভুক্ত, এবং মাইসিরের হারাম হওয়ার কথা কুরআনে এসেছে আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে:—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ

من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون...الآية

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্য-নির্ণায়ক তীর তো কেবল ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও...(আয়াতের শেষ পর্যন্ত)" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৯০)

আর জুয়া ও মাইসির অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণের অন্তর্ভুক্ত, এবং তা হারাম — যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم

"আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পাদিত ব্যবসা হলে ভিন্ন কথা।" (সূরা আন-নিসা: ২৯)

এর ব্যাখ্যা হলো:— বীমাগ্রহীতা যে অর্থ পরিশোধ করে এক বছর বা তার বেশি বা কম সময়ের জন্য ছাড় লাভ করার উদ্দেশ্যে, হতে পারে সে তা থেকে আদৌ কোনো উপকার পেল না — কারণ সেই সময়ে চিকিৎসাকেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজনই তার হলো না। ফলে সে যে অর্থ পরিশোধ করেছে তাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং চিকিৎসাকেন্দ্র লাভবান হলো। আবার হতে পারে সে তা থেকে অনেক বেশি উপকার পেল এবং যা পরিশোধ করেছিল তার বহুগুণ ছাড়িয়ে গেল; ফলে সে লাভবান হলো এবং চিকিৎসাকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সুতরাং তাদের মধ্যে যে লাভবান, সে তার বাজিতে উপার্জনকারী; আর যে ক্ষতিগ্রস্ত, সে তাতে লোকসানকারী। আর এ কাজটিই হুবহু সেই হারাম জুয়া, যার হারাম হওয়ার কথা পূর্বোক্ত আয়াতে এসেছে।

আরও কারণ হলো, এই লেনদেনে সুস্পষ্ট গারার (অনিশ্চয়তা) রয়েছে। আর সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে:—

أن النبي نهى عن الغرر

"নবী ﷺ গারার (অনিশ্চয়তাযুক্ত লেনদেন) থেকে নিষেধ করেছেন।"

আর মূলনীতিতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যে লেনদেনে গারার রয়েছে এবং যা উদ্দেশ্য করা হচ্ছে তাতে অজ্ঞতা রয়েছে, সে লেনদেন বাতিল।

সব মিলিয়ে, কিতাব, সুন্নাহ ও উসূলের দলিলসমূহ বাণিজ্যিক বীমা তার সমস্ত রূপ ও আকারে হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে — অর্থাৎ তা সম্পত্তির ওপরই হোক, কিংবা জীবনের ওপর হোক, কিংবা স্বাস্থ্য রক্ষার ওপর হোক বা এ জাতীয় যেকোনো কিছুর ওপর হোক; এর সবই হারাম।

আর সহযোগিতামূলক বীমা হলো, কিছু মানুষ বা কিছু দানশীল ব্যক্তি একত্র হয়ে চিকিৎসাকেন্দ্রকে একটি নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ করবেন, অথবা একটি তহবিল-বাক্স স্থাপন করা হবে যাতে দানশীলদের অনুদান জমা হবে — চিকিৎসা বা অন্য প্রয়োজনে অভাবীদের সাহায্য করার জন্য। এতে অনুদানদাতার কাছে কোনো আর্থিক মুনাফা ফিরে আসে না; বরং এর দ্বারা কেবল আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে প্রতিদান ও সওয়াবের প্রত্যাশায় অভাবীদের সাহায্য করাই উদ্দেশ্য। এ ধরনের বীমা জায়েয, এর জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

স্বাস্থ্যবীমার দুই প্রকার

বাণিজ্যিক বীমা	সহযোগিতামূলক (তাআওনি) বীমা
সব রূপ ও আকারে হারাম	জায়েয — এতে কোনো সন্দেহ নেই
ঝুঁকির ওপর প্রতিষ্ঠিত — জুয়া ও মাইসিরের অন্তর্ভুক্ত	অনুদানদাতার কাছে আর্থিক মুনাফা ফেরে না
গারার (অনিশ্চয়তা) আছে — তাই লেনদেন বাতিল	উদ্দেশ্য: আল্লাহর প্রতিদানের আশায় অভাবীদের সাহায্য
হাইআতু কিবারিল উলামা, ফিকহ পরিষদ ও স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত	চিকিৎসাকেন্দ্রে অর্থ প্রদান বা তহবিল-বাক্সে অনুদান

প্রশ্ন ৫৫

প্রশ্ন ৫৬

মানব-ক্লোনিং (الاستنساخ البشري) বলতে কী বোঝায়? শরীয়তে এর হুকুম কী — দলিল ও মূলনীতিসহ তার ব্যাখ্যা দিন?

উত্তর/ আমি বলি:— মানব-ক্লোনিং হলো, কোনো জীব, কোষ বা অণুকে এমনভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা যাতে তা তার বংশগত উপাদানে কোনো ঘাটতি বা সংযোজন ছাড়াই নিষেকজাত প্রজননের পথ ব্যতিরেকে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। একে বলা হয় "নাসখ" (প্রতিলিপিকরণ), "উদ্ভিজ্জ প্রজনন", "কুমারী প্রজনন", "অযৌন প্রজনন" এবং "দেহকোষের মাধ্যমে প্রজনন"। এর সারকথা হলো, বৈধ মিলন ছাড়া বিশেষ কিছু পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি চাওয়া।

আর শরীয়তে এর হুকুম হলো নিশ্চিত ও চূড়ান্তভাবে হারাম। আমি এর দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে হারাম হওয়া বোঝাচ্ছি না; বরং এখানে আমরা কেবল মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়েই কথা বলছি। সুতরাং মানুষ যে এই নিকৃষ্ট, অধঃপতিত ও হারাম প্রক্রিয়ার আওতায় ঢুকবে — তা কোনোভাবেই জায়েয নয়।

আমরা মুসলিম আলিমদের কাউকে জানি না যিনি এর বৈধতার ফতোয়া দিয়েছেন। যদিও তাঁদের কেউ কেউ এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন, তবু আমরা নির্ভরযোগ্য আলিমদের কারো ব্যাপারে শুনিনি যে তিনি একে বৈধ বলেছেন। বরং খ্রিস্টান পাদ্রিরা এবং পাশ্চাত্যের বিবেকবান লোকেরাও এর মুখোমুখি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে।

ফিকহি পরিষদসমূহের বক্তব্য মানব-ক্লোনিং হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। এ ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমীন, শাইখ মুহাম্মাদ সাইয়িদ তানতাবী, শাইখ ফরীদ ওয়াসিল, শাইখ ইউসুফ আল-কারাদাবী

এবং আরও অনেকে — যাঁদের সংখ্যা গণনা করাই কষ্টসাধ্য। বরং জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর দশম অধিবেশনে, যেখানে সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিনিধিত্ব করেছিল, তাঁরা মানব-ক্লোনিং সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন; এবং মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত সেই সম্মানিত পরিষদের পঞ্চদশ অধিবেশনের প্রথম সিদ্ধান্তেই তাঁরা সেই নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করেছেন। আমি মনে করি না যে মুসলিম আলিমদের কোনো আলিম এটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা করবেন।

এটি হারাম হওয়ার দলিল অত্যন্ত বেশি; আমরা তোমার জন্য তার কিছু অংশ উল্লেখ করছি:—

প্রথম:— আল্লাহ তাআলার বাণী:—

إنا خلقنا الإنسان من نطفةٍ أمشاج

> "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে।" (সূরা আল-ইনসান: ২)

দলিল হওয়ার দিকটি হলো, "নুতফাতুন আমশাজ" (মিশ্রিত শুক্রবিন্দু) হলো পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাণু থেকে গঠিত নিষিক্ত বস্তু। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করছেন যে মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত এই পদ্ধতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে এর বিরোধিতা করা হারাম হবে; কারণ যখনই অন্য কোনো পদ্ধতিতে মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তখন আয়াতটি নিছক সংবাদ হওয়ার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে একটি শরঈ বিধানের বর্ণনায় পরিণত হয় — যেমনটি আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে রয়েছে:—

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً

> "আর আল্লাহ কাফিরদের জন্য মুমিনদের ওপর কখনোই কোনো পথ রাখবেন না।" (সূরা আন-নিসা: ১৪১)

দ্বিতীয়:— আল্লাহ তাআলার বাণী:—

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

> "আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও; এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আর-রূম: ২১)

দলিল হওয়ার দিকটি হলো, শরীয়তে বিবাহই বংশবৃদ্ধির ভিত্তি এবং তা-ই ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টির পথ। আর ক্লোনিংয়ের মধ্যে সেই দৃঢ় সম্পর্কের ওপর আঘাত রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা এই বিবাহের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন — যাতে তার ফলাফল হিসেবে সন্তান লাভ ও তাদের বংশপরিচয় সাব্যস্ত হয়।

তৃতীয়:— আল্লাহ তাআলার বাণী:—

هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها

فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا الله

ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكون من الشاكرين

> "তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সঙ্গে মিলিত হলো, তখন সে হালকা গর্ভ ধারণ করল এবং তা নিয়ে চলাফেরা করতে লাগল। অতঃপর যখন সে ভারী হয়ে পড়ল, তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহর কাছে দুআ করল:— যদি আপনি আমাদেরকে একটি সুস্থ-সবল সন্তান দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।" (সূরা আল-আরাফ: ১৮৯)

দলিল হওয়ার দিকটি হলো, আল্লাহ তাআলা এখানে গর্ভধারণের শরঈ পথের সংবাদ দিচ্ছেন — আর তা হলো পুরুষের নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া। এর মধ্যে এ কথার ব্যাখ্যা রয়েছে যে, এর বিরোধী ও এর পরিপন্থী প্রতিটি পথই শরঈ পথ থেকে বিচ্যুতি। আর ক্লোনিংয়ের প্রকৃত রূপ হলো, তা এই শরঈ নির্দেশনা থেকে বেরিয়ে যাওয়া, সিরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে পড়া এবং এমন উদভ্রান্ত-আঁকাবাঁকা পথে প্রবেশ যার সঙ্গে শরঈ আদব ও রক্ষণীয় পদ্ধতির কোনো সম্পর্ক নেই।

চতুর্থ:— আল্লাহ তাআলার বাণী:—

والله جعل لكم من أنفسكم أزوجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين

ج

وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ

> "আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের বানিয়েছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্র দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তু থেকে রিযিক দিয়েছেন। তবে কি তারা বাতিলের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে?" (সূরা আন-নাহল: ৭২)

দলিল হওয়ার দিকটি হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য বংশবৃদ্ধির একটিমাত্র পথ রেখেছেন — আর তা হলো কেবল বিবাহ-বন্ধন। সুতরাং পুত্র ও পৌত্র লাভের শরীয়তসম্মত কোনো পথ এটি ছাড়া নেই; আর এটি আল্লাহ তাআলার নিয়ামতেরই অংশ। আর তাঁর বাণী ·{ أفبالباطل يؤمنون }· ("তবে কি তারা বাতিলের প্রতি ঈমান আনে?") এ কথার দলিল যে, এই আয়াতের শুরুতে শরীয়তে যা নির্ধারিত হয়েছে তা ছাড়া বংশবৃদ্ধি চাওয়ার প্রতিটি পথই সেই বাতিলের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রতি ঈমান না আনা আমাদের ওপর ওয়াজিব। আর মানব-ক্লোনিং সেই বাতিলেরই অন্তর্ভুক্ত; কেননা তা "বাতিল" শব্দটির ব্যাপকতার আওতায় পড়ে — কারণ তা শরঈ পথ, অর্থাৎ বিবাহ-বন্ধন ছাড়া বংশবৃদ্ধির অনুসন্ধান। সুতরাং কুরআনের নস অনুযায়ী ক্লোনিং বাতিল, আর বাতিল হারাম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

পঞ্চম:— আল্লাহ তাআলার বাণী:—

فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ

> "সুতরাং এখন তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তা অন্বেষণ করো।" (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭)

"আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন" — এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সন্তান, জমহুরের মত অনুযায়ী; এটিই ইবনু জারীরের গৃহীত মত, এবং তিনি এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, হাকাম, ইকরিমা, হাসান বসরী, সুদ্দী, রাবী এবং দাহহাক ইবনু মুযাহিম থেকে। আর এটি জানা কথা যে সন্তান কেবল যৌনাঙ্গে মিলনের মাধ্যমেই চাওয়া হয় — আল্লাহ তাআলার বাণী ·{ فالآن باشروهن }· ("সুতরাং এখন তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হও") অনুযায়ী। এটি প্রমাণ করে যে, শরীয়তে আদিষ্ট এই মিলন ছাড়া সন্তান কামনার প্রতিটি পথই নাজায়েয। সুতরাং আল্লাহ আমাদের জন্য যে সন্তান লিখে রেখেছেন তার অন্বেষণ কেবল এভাবেই হতে পারে; এটিই শরঈ পথ, আর এর বাইরে যা কিছু তা বাতিল ও ভেজাল। আর মানব-ক্লোনিং তারই অন্তর্ভুক্ত, কেননা তা মিলন ছাড়াই বংশধর কামনা; সুতরাং তা হারাম।

ষষ্ঠ:— মাকিল ইবনু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস; তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم

> "তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান-প্রসবিনী নারীকে বিয়ে করো; কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে (অন্য উম্মতের ওপর) গর্ব করব।" — "বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ সহীহ সনদে"

সুতরাং নবী ﷺ বংশবৃদ্ধির জন্য একটিমাত্র পথ নির্ধারণ করেছেন — আর তা হলো কেবল বিবাহ। কাজেই পাশ্চাত্যের কাফির চিকিৎসকেরা আমাদের ওপর যেসব পথ চাপিয়ে দিতে চায় তার কোনো পথেই সংখ্যাধিক্য কামনা করা যাবে না

— যাদেরকে কোনো দ্বীন নিয়ন্ত্রণ করে না, কোনো শরীয়ত শিষ্টাচার শেখায় না; বরং তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও কামনার দাস। সুতরাং বিবাহের আদেশ এবং কিয়ামতের দিন তিনি ﷺ আমাদের সংখ্যা দিয়ে অন্যান্য জাতির ওপর গর্ব করবেন — এ সংবাদ প্রমাণ করে যে, এই একটিমাত্র পথ ছাড়া শরীয়তে কোনো বংশবৃদ্ধি নেই। আর ক্লোনিং এ বৈশিষ্ট্য বহন করে না; সুতরাং তা হারাম, কেননা তা শরীয়তে আদিষ্ট বিষয় বর্জনের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সপ্তম:— বংশপরিচয় (নাসাব) ও তার সংরক্ষণ সেই পাঁচটি অপরিহার্য বিষয়ের (দারূরিয়্যাতে খামসা) একটি বলে গণ্য, যেগুলোর সংরক্ষণের নির্দেশ নিয়ে সমস্ত শরীয়ত এসেছে। আর এটি সেই মৌলিক নিয়ন্ত্রকগুলোর একটি, যা অসীম বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে রক্ষা করে। মানুষের ওপর ক্লোনিং প্রয়োগ করতে অগ্রসর হওয়া বংশপরিচয়কে অজ্ঞাত করে দেওয়া এবং সেই বংশধারা ছিন্ন হওয়া থেকে মুক্ত নয়, যার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকারের আত্মীয়তা সম্পর্কিত করেছেন। আর নিষেধাজ্ঞা এমন বহু রূপকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা বংশপরিচয়ে অজ্ঞতা বা তাতে বিরোধ সৃষ্টির দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং মানব-ক্লোনিং বংশপরিচয়ের মিশ্রণ ও বংশধারা ছিন্ন হওয়ার দিকে নিয়ে যায়, আর এটি শরীয়তে হারাম। মূলনীতিতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যা হারামের দিকে নিয়ে যায় তা হারাম।

অষ্টম:— সন্তান জন্মদানের শরঈ পথ হলো বিবাহ-বন্ধন; আর এ ছাড়া সন্তান জন্মদানের যেকোনো পদ্ধতিই শারিয়াতপ্রণেতার (শারি) উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ হবে। আর ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে সন্তান জন্মদান ঘটে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শরঈ পন্থায় কোনো সংযোগ ছাড়াই; সুতরাং তা শারিয়াতপ্রণেতার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ। আর যা শারিয়াতপ্রণেতার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ তা হারাম, তাতে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়।

নবম:— আল্লাহ তাআলা মানুষকে সম্মানিত করেছেন; তিনি বলেছেন:—

ولقد كرمنا بني آدم...الآية

> "আর নিশ্চয়ই আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি...(আয়াতের শেষ পর্যন্ত)" (সূরা আল-ইসরা: ৭০)

এবং সে আয়াতেই তিনি বলেছেন:—

وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً

> "আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা আল-ইসরা: ৭০)

সুতরাং যে কাজ এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের পরিপন্থী, তা থেকে নিষেধ করা হবে। এর ভিত্তিতে অবশ্যই এ বিপদের অনুভূতি জাগ্রত রাখতে হবে যে, মানুষকে যেন এমন কিছু হিসেবে দেখা না হয় যা সম্পদ বাড়ানোর মতো করে বংশবৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করা হয়, কিংবা যেন সে উৎপাদন-বৃদ্ধির অধীন কোনো পণ্য। সুতরাং মানুষকে অপমানকর, কুৎসিত ও ঘৃণ্য আচরণের ক্ষেত্র বানানো জায়েয নয় — যেমনটি মানব-ক্লোনিংয়ের মাসআলায় ঘটছে। এর ভিত্তিতে তা হারাম, কেননা তা এই মানুষটিকে অপমান করার দিকে নিয়ে যায় এবং তা সমগ্র সৃষ্টির ওপর তার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবির পরিপন্থী।

দশম:— শরীয়তে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নিষিদ্ধের দিকে নিয়ে যায় এমন উপায়-উপকরণ বন্ধ করা (সাদ্দুয যারায়ি) এই সরল দ্বীনের মূলনীতিগুলোর একটি মূলনীতি। সুতরাং যে মাধ্যম হারামে পতিত হওয়ার দিকে নিয়ে যায়, তা হারাম। আর মানব-ক্লোনিং গর্ভ ভাড়া নেওয়ার দিকে নিয়ে যায়, আর তা হারাম; এটি বংশপরিচয় নষ্ট হওয়ার দিকে নিয়ে যায়, আর তা হারাম; এটি মানুষকে অপমান করার দিকে নিয়ে যায়, আর তা হারাম; এটি বিবাহ-বন্ধন বর্জনের দিকে নিয়ে যায়, অথচ বিবাহ বর্জন করা ইসলামের দ্বীনের কোনো অংশই নয়; এটি ওয়াজিব ভরণপোষণ অকার্যকর হওয়ার দিকে নিয়ে যায়, কেননা এই ক্লোনকৃত ব্যক্তিরা নিজেদের কোনো পিতা বা মাতার পরিচয় জানে না — তাহলে কে তাদের ভরণপোষণ দেবে? আর এতে তারা অবহেলিত হয়ে পড়বে, তাদের দেখাশোনার কেউ থাকবে না, তাদের অবস্থার খোঁজ কেউ রাখবে না; ফলে তারা সমাজের বোঝা হয়ে বিশৃঙ্খল-উচ্ছৃঙ্খল জনতা হয়ে থেকে যাবে — এসবের কোনোটিই জায়েয নয়। এটি আরও নিয়ে যায় পিতা ছাড়া অন্যের দিকে বংশপরিচয় সম্পৃক্ত করার দিকে, যা আমাদের শরীয়তে চূড়ান্তভাবে হারাম। এটি আরও নিয়ে যায় ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন আত্মীয়দের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দিকে — ফলে না থাকবে পারস্পরিক দয়া, না ভালোবাসা, না স্নেহ, না ইহসান। এটি আরও নিয়ে যায় সমাজ ভেঙে পড়ার দিকে, কারণ সমাজে এমন একটি স্তর গড়ে উঠবে যারা নিজেদের কোনো পিতা বা মাতার পরিচয় জানে না; আর এটি ইসলামী সমাজের কেন্দ্রকে ফাটল ধরানোর, তাকে দুর্বল ও ক্ষীণ করার এবং তার প্রতাপ ও কথার মর্যাদা বিলুপ্ত করার দিকে নিয়ে যায়। এটি আরও নিয়ে যায় উত্তরাধিকার-বিধান অকার্যকর হওয়ার দিকে, কিংবা শরীয়ত অনুযায়ী যে হকদার নয় তাকে তা দিয়ে দেওয়ার দিকে। এটি নিয়ে যায় নারীর সম্মানহানি, তার অপমান এবং এই নিষিক্ত বস্তু তার মধ্যে স্থাপনের জন্য তার সতর উন্মোচনের দিকে। আর এটি নিয়ে যায় সৃষ্টি ও অস্তিত্বদানে আল্লাহ তাআলার একক ক্ষমতার ব্যাপারে দুর্বল বুদ্ধিসম্পন্নদের ফিতনায় পড়ার দিকে। এগুলোই হলো মানব-ক্লোনিং যেসব বিষয়ের দিকে নিয়ে যায় তার কিছু অংশ। আর যেহেতু তা এসব জিনিসের দিকে নিয়ে যায়, সুতরাং তখন তার চূড়ান্ত ও নিশ্চিতভাবে হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না।

একাদশ:— শরীয়তে সাব্যস্ত হয়েছে যে, ক্ষতি প্রতিরোধ করা কল্যাণ অর্জনের ওপর অগ্রগণ্য। আর মানব-ক্লোনিংয়ের মধ্যে ক্ষতিসমূহ অনেক, যেমনটি আমি তোমার কাছে তার কিছু অংশ উল্লেখ করেছি। আমরা যদি এর কল্যাণগুলোর দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাব না যে সেগুলো শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। আর যদি তর্কের খাতিরে ও ছাড় দিয়ে ধরেও নিই যে এতে কোনো কল্যাণ আছে, তবু তা এই এমন ক্ষতিসমূহের পাশে চাপা পড়ে যাবে ও তুচ্ছ হয়ে যাবে, যেসব ক্ষতির মোকাবিলায় কিছুই দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং এই মূলনীতির প্রয়োগে ওয়াজিব হলো তা বন্ধ করা, তার দরজাগুলো শক্ত করে আটকে দেওয়া, তার সঙ্গে জড়িতদের ধমক দেওয়া, তাদেরকে তাযীর-শাস্তি দেওয়া এবং এমন কঠোর শাস্তি দেওয়া যা তাদেরকে ও তাদের মতো অন্যদেরকে এ ধরনের কাজে পুনরায় ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখবে।

দ্বাদশ:— শরীয়তে সাব্যস্ত হয়েছে যে, শরীয়ত এসেছে কল্যাণসমূহ সাব্যস্ত ও পূর্ণ করার জন্য এবং ক্ষতিসমূহ কমানো ও অকার্যকর করার জন্য। আর যেহেতু মানব-ক্লোনিং বহু ক্ষতি বহন করে, সুতরাং শরীয়তে ওয়াজিব হলো তা নিষিদ্ধ করা; কারণ তা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিগুলোকে অকার্যকর করে দিই।

মানব-ক্লোনিং হারাম: লেখকের দলিল

মানব-ক্লোনিং নিশ্চিত ও চূড়ান্তভাবে হারাম

ঐকমত্য
ফিকহি পরিষদসমূহ; জেদ্দার মাজমা ও মক্কার পরিষদ

কুরআনের দলিল
ইনসান ২, রূম ২১, আ'রাফ ১৮৯, নাহল ৭২, বাকারা ১৮৭

হাদীস
প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান-প্রসবিনীকে বিয়ে করো

বংশপরিচয়
পাঁচ অপরিহার্য বিষয়ের একটি; মিশ্রণ ও ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা

শারির উদ্দেশ্য
সন্তান জন্মদানের শরঈ পথ বিবাহ-বন্ধন

মানুষের সম্মান
ইসরা ৭০; মানুষকে উৎপাদনের পণ্য বানানো অবমাননা

ক্ষতির দিক
গর্ভ ভাড়া, ভরণপোষণ ও মিরাসে বিঘ্ন, সমাজে ফাটল

প্রশ্ন ৫৬

তো এগুলোই এই বিষয়টির হারাম হওয়ার প্রমাণবাহী কিছু দিক। এটি যখন জানলে, তখন জেনে রাখো, আমি আমার কোনো কোনো শাইখকে এটি হারাম হওয়ার দলিল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন:— এ বিষয়টির কোনো অস্তিত্বই নেই, কোনো বাস্তবতাও নেই; এগুলো কেবল পাশ্চাত্যের কাফিরদের পক্ষ থেকে এখানে-সেখানে প্রচারিত কিছু প্রবন্ধ মাত্র। আমরা যদি বাস্তবের মাটিতে এর অস্তিত্ব খুঁজি, তবে একে বাস্তবায়িত পাব না; এগুলো কেবল প্রচারমাধ্যমের আতশবাজি। তখন আমি বললাম:— যা-ই হোক, এর হুকুম ও দলিল নিয়ে আমাদের যে আলোচনা পূর্বে গেল, তা কেবল বিধান-নির্ধারণ (তাকরীর) হিসেবেই। সুতরাং যদি এর অস্তিত্ব থাকে, তবে এটিই তাতে নির্ধারিত হুকুম; আর যদি এর অস্তিত্ব না থাকে, তবে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন, মাফ করুন এবং ইলম, আমল ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের ভুল-ত্রুটি ও ঘাটতি উপেক্ষা করুন। আল্লাহ আমাদের রব — তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন ৫৭

স্মৃতিভ্রংশের (فقدان الذاكرة) সঙ্গে সম্পর্কিত ফিকহি বিধানগুলো কী কী?

উত্তর/ আমি বলি:— যে ব্যক্তি স্মৃতি হারিয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিধানগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:—

তার একটি:— স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই শিশুর স্থলবর্তী, যে এখনো বিবেচনাক্ষম (মুমাইয়িয) হয়নি। ফলে তার ওপর থেকে শরঈ দায়িত্বসমূহ (তাকলীফ) রহিত হয়ে যায়; তার ওপর সালাত, সিয়াম, পবিত্রতা, হজ কিংবা এ জাতীয় অন্য কিছুই ওয়াজিব থাকে না। কারণ এই দায়িত্বগুলো দায়িত্বারোপযোগ্য বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত, আর স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই যোগ্যতাই হারিয়েছে — অর্থাৎ তার কোনো বিবেচনাশক্তি নেই এবং তার জন্য তা নেই; সুতরাং তার ওপর কোনো দায়িত্বও নেই।

দ্বিতীয়:— স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়াই হবে না। কারণ সাক্ষ্য গ্রহণের ভিত্তি হলো সাক্ষীর যোগ্যতা, আর স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোনো যোগ্যতা নেই; আর যার যোগ্যতা নেই তার কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

তৃতীয়:— স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবশ্যই একজন অভিভাবক (ওয়ালী) থাকতে হবে — পিতা, ভাই, চাচা কিংবা ওয়াসী (নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক); আর তা না থাকলে বিচারক। কারণ সে নিজে নিজের কাজকর্ম সম্পাদন করার বৈধতা রাখে না, যেহেতু সে "জায়িযুত তাসাররুফ" (স্বাধীন লেনদেনের অধিকারী) নয়। কেননা জায়িযুত তাসাররুফ সে-ই, যার মধ্যে বিবেক, প্রাপ্তবয়স্কতা ও পরিণত বিচারবুদ্ধি (রুশদ) বিদ্যমান; আর স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অ-বিবেচনাক্ষম ব্যক্তির স্থলবর্তী। সুতরাং যে নির্বোধ (সাফীহ) সম্পদ পরিচালনায় দক্ষ নয় তার ওপরই যদি তার রুশদ প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত হাজর (লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা) আরোপ করা হয়, তবে স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তি হাজরের ক্ষেত্রে তার চেয়েও অগ্রগণ্য। আর হাজরের ক্ষেত্রে তার অভিভাবক হবে তার পিতা বা তার ওয়াসী, নতুবা বিচারক — যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

চতুর্থ:— স্মৃতিভ্রংশের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের দায় (দামান) রহিত হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ দামান "খিতাবুল ওয়াদ" (অবস্থাগত বিধান)-এর অন্তর্ভুক্ত, "খিতাবুত তাকলীফ" (দায়িত্বারোপমূলক বিধান)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কোনো জিনিস নষ্ট করে ফেলে, তবে তার ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পঞ্চম:— সঠিক মত — ইনশাআল্লাহু তাআলা — হলো, স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তির যদি সম্পদ থাকে এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব। কারণ তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়াটা বিধানকে তার কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার বিষয়। যাকাতের সঙ্গে যিম্মার (ব্যক্তিগত দায়ের) সম্পর্ক থাকলেও সম্পদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআযকে যখন ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁকে বলেছিলেন:—

صدقة تؤخذ من أموالهم

> "একটি সদকা, যা তাদের সম্পদ থেকে নেওয়া হবে।"

সুতরাং তিনি স্পষ্ট করলেন যে সম্পদের সঙ্গে তার সম্পর্ক অধিকতর শক্তিশালী। আর আমাদের কাছে অগ্রগণ্য মত হলো, পাগলের সম্পদে যাকাত রয়েছে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি এমন শিশুর সম্পদেও যাকাত রয়েছে; সুতরাং স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই (এর অন্তর্ভুক্ত)। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ষষ্ঠ:— স্মৃতিভ্রংশ যদি কখনো দেখা দেয় এবং কখনো চলে যায়, তবে যেসব সালাতের সময়ে তার বিবেক ফিরে আসে সেসব সালাত তার ওপর ওয়াজিব; আর যেসব সময়ে তার স্মৃতি লুপ্ত থাকে, সেসব সময়ের ব্যাপারে তার ওপর কিছুই বর্তাবে না।

সপ্তম:— স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তার দাসদের মধ্য থেকে কোনো দাসকে মুক্ত করে দেয়, তবে তার এই দাসমুক্তি শুদ্ধ হবে না; কারণ সে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যই লেনদেনে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত (মাহজুর আলাইহি)।

অষ্টম:— স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তির যদি স্ত্রী থাকে এবং সে স্মৃতিভ্রংশ অবস্থায় তাকে তালাক দেয়, তবে তার তালাক বাতিল, তা কার্যকর হবে না — কারণ (তালাকের) ইচ্ছা-সংকল্প (কাসদ) অনুপস্থিত।

নবম:— স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এমন কিছু করে ফেলে যা হদ বা কিসাস অপরিহার্য করে, তবে তার ওপর হদও নেই, কিসাসও নেই — কারণ তার বিবেক নেই; অথবা আমরা বলব:— কারণ সে অ-বিবেচনাক্ষম শিশুর স্থলবর্তী। তবে এতে তাকে তাযীর-শাস্তি দিতে কোনো বাধা নেই, কেননা তাযীরের জন্য বিবেক থাকা শর্ত নয়। সুতরাং শাসক যদি তাকে তাযীর দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন, তবে এতে তাঁর কোনো দোষ নেই।

দশম:— স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকার লাভ শুদ্ধ। সুতরাং তার কোনো নিকটাত্মীয় যদি মারা যায় এবং সে তার উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সে তার উত্তরাধিকার পাবে; কারণ উত্তরাধিকার হলো বাধ্যতামূলক মালিকানা লাভ, যার জন্য উত্তরাধিকারীর বিবেক থাকা আবশ্যক নয়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তো এগুলোই হলো স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ফিকহি বিধান। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিধান

- [ ] অ-বিবেচনাক্ষম শিশুর স্থলবর্তী; শরঈ দায়িত্ব রহিত
- [ ] তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়
- [ ] অভিভাবক থাকতে হবে — পিতা, ভাই, চাচা বা ওয়াসী; নতুবা বিচারক
- [ ] ক্ষতিপূরণের দায় (দামান) রহিত হয় না
- [ ] সঠিক মতে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব
- [ ] বিবেক ফিরে এলে সেই সময়ের সালাত ওয়াজিব
- [ ] দাসমুক্তি শুদ্ধ নয়; তালাক বাতিল
- [ ] হদ ও কিসাস নেই; তাযীর দেওয়া যায়
- [ ] উত্তরাধিকার লাভ শুদ্ধ

প্রশ্ন ৫৭

প্রশ্ন ৫৮

মানুষ ও প্রাণীর ওপর ওষুধের পরীক্ষা চালানোর হুকুম কী?

উত্তর/ আমি বলি:— সন্দেহ নেই যে ওষুধের পরীক্ষা একটি অপরিহার্য বিষয়, কেননা ওষুধ অনুমোদিত হওয়া এর ওপরই নির্ভরশীল। কারণ কোনো ওষুধের উপকার ও ক্ষতির পরিমাণ না জেনে মানুষকে তা দেওয়া সম্ভব নয়, আর তা কেবল পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যায়। আর যে ওষুধের অবস্থা এবং তাতে কতটুকু উপকার বা ক্ষতি রয়েছে তা জানা নেই, সে ওষুধ দেওয়া নিশ্চিতভাবে হারাম — কারণ এতে এমন সব ঝুঁকি জড়িত যা কারো অজানা নয়।

এর মাধ্যমেই জানা গেল লোকজ চিকিৎসক (মুতাতাব্বিবীন শাবিয়্যীন) ও তাদের মতো অন্যদের ভুল, যারা একক ও যৌগিক ওষুধ নির্ধারণ করে দেয় অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোনো ইলম নেই; বরং তারা অন্ধের মতো এলোপাতাড়ি হাতড়ে বেড়ায়। এভাবে তারা এক তুচ্ছ পার্থিব উদ্দেশ্যের লালসায় আল্লাহর বান্দাদের ওপর অপরাধ করে। এরা যেন জেনে রাখে, তারা যে ওষুধ নির্ধারণ করেছে তার কারণে সংঘটিত প্রতিটি ক্ষয়ক্ষতির জন্য তারা দায়ী (দামিন) এবং কিয়ামতের দিন তারা এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহই সাহায্যপ্রার্থনার স্থল।

সুতরাং পরীক্ষা চালানোর হুকুম মূলত ওয়াজিব — সেসব ওষুধ থেকে জন্ম নেওয়া ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য এবং ওষুধ থেকে উদ্দিষ্ট উপকার বাস্তবায়নের জন্য।

আর যেহেতু বিষয়টি এমন, সুতরাং এ কথার ওপর জোর দেওয়া অপরিহার্য যে, যেকোনো নতুন ওষুধের গবেষণা অবশ্যই শুরু করতে হবে পরীক্ষাগারের প্রাণীদের ওপর — যেমন ইঁদুর, খরগোশ ও বানর — মানুষের ওপর নয়। কারণ প্রাথমিক পরীক্ষাগুলোর ক্ষতি খুবই মারাত্মক ও গুরুতর হতে পারে। আর এ ধরনের মারাত্মক ক্ষতিসম্পন্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় মানুষকে ব্যবহার করা নিশ্চিতভাবে ও সুস্পষ্টভাবে হারাম। শরীয়তের ইলমের অধিকারী কোনো ব্যক্তি এতে দ্বিমত করেন না, আর চিকিৎসা ও আইনের অধিকারী অন্যরাও নয়। কারণ এটি প্রাণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর ইচ্ছাকৃত অপরাধ, আর এ হুকুম অপরিহার্যভাবে জানা বিষয়।

সুতরাং নতুন ওষুধের প্রাথমিক পরীক্ষা মানুষের ওপর চালানো একেবারেই জায়েয নয়, এমনকি তার সম্মতিতেও নয়। কেননা সে যদি সম্মতি দেয় এবং কোনো অনিষ্টের শিকার হয়, তবে সে নিজের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করল। বরং ওষুধকে অবশ্যই প্রথমে তার প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষাগারের প্রাণীদের ওপর একগুচ্ছ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এরপর যখন তা তার শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে, তখন চূড়ান্ত পরীক্ষাটি মানুষের ওপর চালাতে কোনো বাধা নেই — যদি প্রবল ধারণা হয় যে তা ক্ষতিকর নয়, অর্থাৎ পরীক্ষার অবস্থা এমন হয় যে তা নিরাপত্তার স্তরে পৌঁছে গেছে।

আর প্রাণী ব্যবহারের ব্যাপারে যা স্পষ্ট হয় তা হলো এর বৈধতা। কারণ প্রাথমিক ও শেষ পর্যায়ে প্রাণী ব্যবহার না করে মানুষের ওপর ওষুধ ব্যবহারের পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব নয়; আর কারণ মানুষের কল্যাণের জন্য প্রাণী ধ্বংস করা শরীয়তে জায়েয — যেমন খাদ্যের জন্য বা কুরবানির জন্য ভক্ষণযোগ্য প্রাণী জবাই করা হয়। তেমনি ক্ষতি পৌঁছানোও জায়েয — যেমন আরোহণযোগ্য প্রাণীর পিঠে আরোহণ করা, যদিও এতে তাদের কষ্ট ও ক্ষতি হয়; এবং যেমন প্রাণীকে খাসি করা। কেননা তাঁর ﷺ থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত যে তিনি:—

ضحى بكبشين خصيين

> "দুটি খাসিকৃত দুম্বা কুরবানি করেছেন।" — "বর্ণনা করেছেন আহমাদ, এর সনদ সহীহ"

আর তা করা হয় তাকে মোটাতাজা করার কল্যাণের জন্য, আর এ কল্যাণ মানুষের দিকেই ফিরে আসে। এখন যদি বলা হয়:— এতে কি প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে না? তবে আমি বলব:— এই কষ্ট দেওয়া নিজে থেকে উদ্দিষ্ট নয়; বরং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি উপকারে পৌঁছার জন্য তা অপরিহার্য ছিল, তাই তা জায়েয হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

আর উত্তরের সারকথা হলো:— এ কাজের জন্য নির্ধারিত প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা চালানো সর্বাবস্থায় জায়েয — অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থাতেই হোক বা চূড়ান্ত অবস্থাতেই হোক। আর মানুষের ব্যাপারে কথা হলো, প্রাথমিক পর্যায়ে তার ওপর পরীক্ষা চালানো একেবারেই জায়েয নয়; তবে শেষ পর্যায়ে, যখন ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকার প্রবল ধারণা জন্মে, তখন কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ওষুধ পরীক্ষা: লেখকের হুকুম

১ **পরীক্ষা**
মূলত ওয়াজিব — উপকার ও ক্ষতি জানার জন্য

২ **প্রাথমিক পর্যায়**
পরীক্ষাগারের প্রাণী — ইঁদুর, খরগোশ, বানর

৩ **মানুষের ওপর প্রাথমিক পরীক্ষা**
একেবারেই জায়েয নয়, তার সম্মতিতেও নয়

৪ **চূড়ান্ত পর্যায়**
ক্ষতিকর নয় বলে প্রবল ধারণা হলে মানুষের ওপর বাধা নেই

প্রশ্ন ৫৮

প্রশ্ন ৫৯

তালবীনার সংজ্ঞা দিন; এর হুকুম কী এবং এর চিকিৎসাগত উপকারিতা কী কী?

উত্তর/ তালবীনা হলো এক প্রকার ঝোল-জাতীয় খাবার (হাসা), যা আটা বা তুষ (নাখালা) দিয়ে তৈরি করা হয়; কখনো কখনো তাতে মধুও দেওয়া হয়। একে "তালবীন" বলা হয় এ কারণে যে, তা দুধের শুভ্রতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুন্নাহয় এই ঝোলের উপকারিতা এবং কিছু ব্যাধিতে এর চিকিৎসাগুণ প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস; তিনি বলেছেন:— আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:—

((إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ، وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ))

"নিশ্চয়ই তালবীনা রোগীর হৃদয়কে বিশ্রাম দেয় ও চাঙা করে এবং কিছু দুঃখ দূর করে দেয়।" — "বর্ণনা করেছেন বুখারী"

এ কারণেই আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রোগীর জন্য এবং মৃত্যু-শোকে শোকাহত ব্যক্তির জন্য তালবীন তৈরির নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন:— এটি অপ্রিয় অথচ উপকারী। আর এটি নবী ﷺ পর্যন্ত মারফূ সূত্রেও এসেছে এই শব্দে:—

عليكم بالبغيض النافع: التلبينة

"তোমরা সেই অপ্রিয় অথচ উপকারী জিনিসটি গ্রহণ করো:— তালবীনা।" — "বের করেছেন আহমাদ ও ইবনু

মাজাহ এমন সনদে যাতে দুর্বলতা রয়েছে"

আর তিরমিযী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস থেকে বের করেছেন; তিনি বলেছেন:— রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের কাউকে যখন জ্বর-জ্বালা (ওয়াক) পেয়ে বসত, তখন তিনি হাসা (ঝোল) তৈরির নির্দেশ দিতেন, ফলে তা তৈরি করা হতো। এরপর তিনি তাদেরকে আদেশ করতেন, ফলে তারা তা পান করত। আর তিনি বলতেন:—

إنه ليرتق فؤاد الحزين ويسرو عن فؤائد السقيم كما تسرو

إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها

"নিশ্চয়ই তা শোকাহত ব্যক্তির হৃদয়ের ফাটল জোড়া লাগিয়ে দেয় এবং অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয় থেকে (কষ্ট) সরিয়ে দেয় — যেমন তোমাদের কোনো নারী পানি দিয়ে নিজের মুখ থেকে ময়লা সরিয়ে দেয়।" — "বর্ণনা করেছেন তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও হাকিম; হাকিম বলেছেন:— সনদ সহীহ, তবে তাঁরা দুজন (বুখারী-মুসলিম) এটি বের করেননি। যাহাবীও তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন। আর তিরমিযী বলেছেন:— এটি হাসান সহীহ হাদীস"

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহু তাআলা বলেছেন:—

وهذا الغذاء هو النافع للعليل وهو الرقيق النضيج لا الغليظ النيء, وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء الشعير الذي يطبخ صحاحاً فإنه ينفذ سريعاً ويجلو جلاءً ظاهراً ويغذي غذاءً لطيفاً, وإذا شرب حاراً كان جلاؤه أقوى ونفوذه أسرع وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثروا التلبينة مريحة للفؤاد مسكنة له وتذهب ببعض الأحزان, هذا والله أعلم لأن الغم والحزن يبردان المزاج ويضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح الحاملة لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤها وهذا الحساء يقوي الحرارة الغريزية بزيادة مادتها فتزيل أكثر ما عرض له من الهم والحزن, وقد يقال وهو

أقرب إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية المفرحة, فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية, وقد يقال: إن قوى الحزين تذهب باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء وهذا الحساء يرطبها ويقويها ويغذيها ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض

"আর এই খাদ্যই রোগীর জন্য উপকারী; আর তা হলো পাতলা ও ভালোভাবে সিদ্ধ করা খাদ্য, ঘন ও কাঁচা খাদ্য নয়। তুমি যদি তালবীনার মর্যাদা জানতে চাও, তবে গোটা যব সিদ্ধ করে তৈরি করা যব-পানির (মাউশ শাঈর) মর্যাদা জানো। কেননা তা দ্রুত (দেহে) প্রবেশ করে, সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার করে এবং কোমল পুষ্টি জোগায়। আর যদি গরম অবস্থায় পান করা হয়, তবে তার পরিষ্কার করার ক্ষমতা আরও প্রবল হয়, তার প্রবেশ আরও দ্রুত হয় এবং স্বাভাবিক দেহোত্তাপ (হারারাতে গরীযিয়্যা — শরীরের সহজাত উষ্ণতা) বৃদ্ধিতে তা আরও কার্যকর হয়। তালবীনা হৃদয়ের জন্য আরামদায়ক, তাকে প্রশান্তিদায়ক, এবং তা কিছু দুঃখ দূর করে দেয়। এর কারণ — আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত — এই যে, দুশ্চিন্তা ও দুঃখ মেজাজকে ঠান্ডা করে দেয় এবং স্বাভাবিক দেহোত্তাপকে দুর্বল করে দেয়; কারণ সেই উত্তাপ বহনকারী রূহ হৃদয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যা তার উৎপত্তিস্থল। আর এই ঝোল স্বাভাবিক দেহোত্তাপের উপাদান বাড়িয়ে তাকে শক্তিশালী করে; ফলে তা দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে যা কিছু এসে জুটেছিল তার অধিকাংশ দূর করে দেয়। আবার বলা হয় — এবং এটিই অধিকতর নিকটবর্তী — যে, তা কিছু দুঃখ দূর করে দেয় তার মধ্যকার একটি বিশেষ গুণের কারণে, যা আনন্দদায়ক খাদ্যসমূহের বিশেষ গুণের জাতীয়। কেননা এমন কিছু খাদ্য রয়েছে যা বিশেষ গুণের কারণেই আনন্দ দেয়। আরও বলা হয়:— দুঃখিত ব্যক্তির শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর — বিশেষত তার পাকস্থলীর ওপর — শুষ্কতার আধিপত্যের কারণে, খাদ্য কমে যাওয়ার ফলে। আর এই ঝোল সেগুলোকে সিক্ত করে, শক্তিশালী করে ও পুষ্টি জোগায়; এবং রোগীর হৃদয়ের সঙ্গেও তা অনুরূপ আচরণ করে।" — উদ্ধৃতি শেষ।

আর সবশেষে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষকদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, যব হলো পরিপাকতন্ত্রের মেরামতকারী একটি উপাদান; তা পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ-জ্বালা প্রতিরোধ করে এবং জ্বালাযুক্ত কলাকে (tissue) সুরক্ষা দেয়। আর সন্দেহ নেই যে, যা এমন, তা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে উপকারী জিনিস। আর এ কথাটিই চৌদ্দ শতাব্দীরও বেশি সময় আগে সাব্যস্ত করে গেছেন সেই সত্তা, যিনি মনগড়া কথা বলেন না। সুতরাং আমার রবের সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন ৬০

শোকপালনকারিণী নারীর (মুহিদ্দা) সুরমা ব্যবহারের হুকুম কী? আর সে যদি এর প্রতি নিরুপায় হয়ে পড়ে, তবে কি তার জন্য তা ব্যবহার জায়েয — দলিলসহ তার ব্যাখ্যা দিন?

উত্তর/ আমি বলি:— মূল বিধান হলো, শোকপালনকারিণী নারী সব ধরনের সাজসজ্জা থেকে নিষিদ্ধ। আর শোকপালনের সময় সাজসজ্জা থেকে তার বিরত থাকা একপ্রকার ইবাদত ও নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম, যার দ্বারা সে তার রব জাল্লা ওয়া আলার নৈকট্য অন্বেষণ করে। সুতরাং সে যতক্ষণ তা করতে সক্ষম, ততক্ষণ এতে ত্রুটি করা তার জন্য জায়েয নয়।

আর যেসব সাজসজ্জা থেকে তাকে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে তার একটি হলো সুরমা। সহীহাইনে উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে রয়েছে; তিনি বলেছেন:— এক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল:— হে আল্লাহর রাসূল, আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে এবং তার চোখে ব্যথা হয়েছে; আমরা কি তার চোখে সুরমা লাগাব? তিনি বললেন:— ((لا)) "না" — দুই বা তিনবার; প্রতিবারই তিনি বলছিলেন ((لا)) "না"।

এটি সহীহ, স্পষ্ট ও চূড়ান্ত নস এ ব্যাপারে যে, শোকপালনকারিণী নারীর ওপর সম্পূর্ণরূপে সুরমা পরিহার করা ওয়াজিব — এমনকি চিকিৎসার জন্য তার প্রয়োজন হলেও তা তার জন্য জায়েয নয়। এটিই মূল বিধান।

তবে সে যদি চিকিৎসার জন্য সুরমা লাগাতে নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং এ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে চিকিৎসা করার উপায় না পায়, এবং চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত দেন যে এই বিশেষ ব্যথার চিকিৎসা সুরমা লাগানো ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই — তবে এই নিরুপায় অবস্থায় তখন তার জন্য জায়েয হবে ততটুকু পরিমাণ ব্যবহার করা, যতটুকু দিয়ে তার ক্ষতি দূর হয়, তার বেশি নয়। কারণ নিরুপায় অবস্থা নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে দেয়; কারণ নিরুপায়তা তার পরিমাণ অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়; কারণ ক্ষতি করা যাবে না, পাল্টা ক্ষতিও নয়; কারণ ক্ষতি দূর করা হয়; কারণ দুটি ক্ষতি পরস্পরবিরোধী হলে লঘুতরটি গ্রহণ করে গুরুতরটির প্রতি লক্ষ রাখা হয়; কারণ এ শরীয়তে আমাদের ওপর থেকে সংকীর্ণতা তুলে নেওয়া হয়েছে; এবং কারণ এ দ্বীন সহজ।

আর শোকপালনকারিণী সেই মেয়েটির সুরমা ব্যবহারে নবী ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞাকে এভাবে বোঝা হবে যে, সে নিরুপায় অবস্থায় পৌঁছায়নি; এবং এভাবে যে, তার চোখে সে যে ব্যথার অভিযোগ করছিল তার চিকিৎসার জন্য সুরমাই একমাত্র নির্ধারিত উপায় ছিল না। আর আল্লাহ তাআলার এ বাণীর ব্যাপকতার কারণেও:—

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

> "অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যা তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন — তবে তোমরা যার প্রতি নিরুপায় হয়ে পড়েছ তা ছাড়া।" (সূরা আল-আনআম: ১১৯)

তবে আমরা এই যুগে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ওষুধের বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে, এটিকে অসম্ভবপ্রায় মনে করি যে শোকপালনকারিণী নারী ঠিক সুরমা দিয়ে চিকিৎসা করতেই নিরুপায় হয়ে পড়বে। কেননা চোখের রোগের জন্য নির্ধারিত ওষুধ ও চিকিৎসা অনেক, সেগুলো সুপরিচিত, সবার নাগালের মধ্যে এবং অধিকাংশ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তবু যদি নিরুপায় অবস্থা এসে পড়ে এবং সুরমা ছাড়া তা দূর করার মতো কিছু না পাওয়া যায়, তবে তার জন্য ততটুকুই জায়েয যতটুকু দিয়ে তার নিরুপায়তা দূর হয়, তার বেশি নয়। আর সে যদি পারে যে তা কেবল রাতে ব্যবহার করবে এবং দিনের বেলা মুছে ফেলবে, তবে এটিই অধিকতর উত্তম ও অধিকতর সুন্দর; আর জমহুর আহলুল ইলম এ অনুযায়ীই ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের রব — তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

শোকপালনকারিণী নারী ও সুরমা

করুন

- ✓ নিরুপায় অবস্থা: চিকিৎসকদের সিদ্ধান্তে সুরমা ছাড়া উপায় নেই হলে ততটুকু, যতটুকুতে ক্ষতি দূর হয়
- ✓ পারলে কেবল রাতে ব্যবহার, দিনে মুছে ফেলা — অধিকতর উত্তম; জমহুরের ফতোয়া

করবেন না

- ✗ মূল বিধান: সুরমা ব্যবহার নিষিদ্ধ — চিকিৎসার জন্যও (উম্মু সালামার হাদীস)

প্রশ্ন ৬০ — লেখক বর্তমান যুগে সুরমার প্রতি নিরুপায় হওয়াকে অসম্ভবপ্রায় মনে করেন

এক নজরে

- ★ মানসিক রোগে আল্লাহর ওপর আস্থা, রুকইয়াহ ও নির্ভরযোগ্য মুসলিম বিশেষজ্ঞ — দুই চিকিৎসা একত্রে
- ★ ক্রোধে বসে পড়া, চুপ থাকা, শয়তান থেকে আশ্রয়; কাযমুল গায়য
- ★ জ্বরে হাসপাতালের চিকিৎসার পাশাপাশি পানি দিয়ে ঠান্ডা করার নববী নির্দেশনা
- ★ বাণিজ্যিক স্বাস্থ্যবীমা সব রূপে হারাম; সহযোগিতামূলক জায়েয
- ★ মানব-ক্লোনিং নিশ্চিত হারাম
- ★ সঠিক মতে স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পদে যাকাত ওয়াজিব; তালাক বাতিল
- ★ নতুন ওষুধের প্রাথমিক পরীক্ষা মানুষের ওপর জায়েয নয়

যাচাই করুন

1. বাণিজ্যিক স্বাস্থ্যবীমা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. জায়েয | খ. মাকরূহ | গ. সব রূপ ও আকারে হারাম

2. মানব-ক্লোনিংয়ের হুকুম কী?

ক. নিশ্চিত ও চূড়ান্তভাবে হারাম | খ. প্রয়োজনে জায়েয | গ. মাকরূহ

3. স্মৃতিভ্রংশপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পদে যাকাত সম্পর্কে সঠিক মত কী?

ক. ওয়াজিব নয় | খ. মুস্তাহাব | গ. ওয়াজিব

4. নতুন ওষুধের প্রাথমিক পরীক্ষা মানুষের ওপর চালানো সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. সম্মতি থাকলে জায়েয | খ. ওয়াজিব | গ. জায়েয নয়, সম্মতিতেও নয়

5. দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হলে নবী কী করতে বলেছেন?

ক. হাঁটতে থাকো | খ. বসে পড়ো; না গেলে শুয়ে পড়ো | গ. জোরে কথা বলো

6. শোকপালনকারিণীর সুরমা ব্যবহারের মূল বিধান কী?

ক. জায়েয | খ. মুস্তাহাব | গ. নিষিদ্ধ — চিকিৎসার জন্যও

উত্তর: ১–গ, ২–ক, ৩–গ, ৪–গ, ৫–খ, ৬–গ

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

খাতনা, কর্তিত অঙ্গ ও অঙ্গ-বিক্রয়, অ্যানেস্থেশিয়া, ভিত্তিহীন চিকিৎসা ও তিলিসমাত, রোগের ফযীলত ও রোগী দেখতে যাওয়া

প্রশ্ন ৬১

নারী কি শরঈভাবে খাতনা করবে? এবং কেন?

উত্তর/ আমি বলি:— খাতনা উভয় লিঙ্গের — পুরুষ ও নারীর — ক্ষেত্রেই মাশরূ (শরীয়তসম্মত)। কারণ নবী ﷺ-এর এই বাণীর ব্যাপকতা:—

((خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ))

> "পাঁচটি জিনিস ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত।"

এবং তিনি সেগুলোর মধ্যে ((الختان)) "খাতনা"-র কথা উল্লেখ করেছেন — "মুত্তাফাকুন আলাইহি"। আরও দলিল হলো এই হাদীস:—

((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ))

> "দশটি জিনিস ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত।"

এবং তিনি সেগুলোর মধ্যেও ((الختان)) "খাতনা"-র কথা উল্লেখ করেছেন — "মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন"। আরও দলিল এই হাদীস:—

اختتن إبراهيم بعدما أتت ثمانون سنة واختتن بالقدوم

> "ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আশি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর খাতনা করেছিলেন, এবং তিনি কুদূম দিয়ে খাতনা করেছিলেন।"

এটি সহীহতে রয়েছে। আরও দলিল আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস:—

إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

"যখন সে তার (স্ত্রীর) চার শাখার মাঝে বসে এবং খাতনার স্থান খাতনার স্থানকে স্পর্শ করে, তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।" — "মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন"।

আমাদের নিকট রাজিহ (অগ্রগণ্য) মত — আর প্রকৃত জ্ঞান আমাদের রব জাল্লা ওয়া আলার কাছে — এই যে, পুরুষের ক্ষেত্রে খাতনা ওয়াজিব। কারণ এর উদ্দেশ্য হলো তার পবিত্রতা পূর্ণ করা; কেননা অগ্রভাগের চামড়ার (কুলফা) মধ্যে কিছু না কিছু প্রস্রাব আটকে থাকতেই হয়। আর নারীদের ক্ষেত্রে খাতনার ব্যাপারে রাজিহ মত হলো — তা সুন্নত ও মাকরুমা (সম্মানজনক কাজ)। কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার কামনাকে ভারসাম্যপূর্ণ করা এবং তার দেহে উত্তেজনার উপকরণগুলোকে সংযত করা। খাল্লাল তাঁর সনদে শাদ্দাদ ইবনু আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء

"খাতনা পুরুষদের জন্য সুন্নত এবং নারীদের জন্য মাকরুমা (সম্মানজনক কাজ)।"

আর হাদীসে এসেছে যে, তিনি ﷺ খাফিদা (খাতনাকারিণী)-কে বলেছেন:—

أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج

"সামান্য কেটো, অতিরিক্ত কেটো না; কেননা তা মুখমণ্ডলের জন্য অধিক উজ্জ্বলতাদায়ক এবং স্বামীর কাছে অধিক প্রিয়তা সৃষ্টিকারী।"

আর আল্লাহ, আমাদের রব, সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন ৬২

বড় (প্রাপ্তবয়স্ক) ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে সে কি খাতনা করবে? আর খাতনা কখন হওয়া মুস্তাহাব? দলিলসহ তা বর্ণনা করুন?

উত্তর/ আমি বলি:— হ্যাঁ, বড় ব্যক্তি খাতনা করবে — যদি তার ওপর ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। এর দলিল হলো সহীহতে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস:—

أن إبراهيم اختتن بعدما أتى عليه ثمانون سنة, واختتن بالقدوم

"ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর ওপর দিয়ে আশি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর খাতনা করেছিলেন, এবং তিনি কুদূম দিয়ে খাতনা করেছিলেন।"

তবে চিকিৎসক যদি সিদ্ধান্ত দেন যে তাতে তার ক্ষতি রয়েছে, তাহলে সে খাতনা করবে না। কারণ ক্ষতিসমূহ প্রতিহত করা কল্যাণ অর্জনের ওপর অগ্রগণ্য, এবং কারণ দুটি ক্ষতি পরস্পরবিরোধী হয়ে দাঁড়ালে লঘুতরটি বরণ করে গুরুতরটির প্রতিই লক্ষ রাখা হয়। তেমনিভাবে যদি আশঙ্কা হয় যে খাতনার ভয়ে এবং তা সহ্য করতে না পারার কারণে সে পিছনের দিকে ফিরে যাবে (দ্বীন থেকে ফিরে যাবে), তাহলে তখন তা পিছিয়ে দেওয়া হবে — যতক্ষণ না তার ঈমান বৃদ্ধি পায় ও ইসলামে তার ভিত শক্ত হয়। আর তাঁর কথা (খাতনা কখন মুস্তাহাব?) — এ প্রসঙ্গে আমি বলি:— পুরুষের ক্ষেত্রে খাতনা ওয়াজিব হয় যখন সে বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়, অর্থাৎ যখন তার ওপর তাহারাত ও সালাত ওয়াজিব হয়ে যায়; আবুল আব্বাস ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহু তাআলা এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। তবে উত্তম হলো ছোট থাকতেই তার খাতনা করা, কারণ তা অন্তরের জন্য অধিক শান্তিদায়ক, আরোগ্যের জন্য দ্রুততর এবং ব্যথা ভুলে যাওয়ার জন্য অধিক সহায়ক। আর ইসলামী ভূখণ্ডগুলোর অধিকাংশেই আমাদের জানামতে এটির ওপরই আমল হয়ে থাকে। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

খাতনার হুকুম

বিষয়	হুকুম
পুরুষের খাতনা	লেখকের রাজিহ মতে ওয়াজিব — পবিত্রতা পূর্ণ করার জন্য
নারীর খাতনা	লেখকের রাজিহ মতে সুন্নত ও মাকরুমা (সম্মানজনক কাজ); হাদীস: সামান্য কেটো, অতিরিক্ত কেটো না
প্রাপ্তবয়স্ক নওমুসলিম	খাতনা করবে, ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে; চিকিৎসক ক্ষতির সিদ্ধান্ত দিলে করবে না
ঈমান থেকে পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা	খাতনা পিছিয়ে দেওয়া হবে
সময়	বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হলে ওয়াজিব; ছোট থাকতেই উত্তম

প্রশ্ন ৬১ ও ৬২

প্রশ্ন ৬৩

কর্তিত (দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন) অঙ্গগুলো নিয়ে কী করা হবে? এবং মানবদেহের অঙ্গ বিক্রি করা কি জায়েয? দলিলসহ তা স্পষ্ট করুন?

উত্তর/ আমি বলি:— এই প্রশ্নে দুটি শাখা রয়েছে:—

{প্রথম শাখা} ফুকাহাদের নিকট এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, অংশের হুকুম সমগ্রের হুকুমের মতোই। আর আদম-সন্তানের দেহের ব্যাপারে মৃত্যুর পর শরীয়তসম্মত বিধান হলো তাকে দাফন করা। সুতরাং যেমন গোটা দেহ দাফন করা মাশরূ, তেমনি তার অংশবিশেষ দাফন করাও মাশরূ। এর ভিত্তিতে বলা যায়, মানুষের কোনো অঙ্গ যদি কেটে ফেলা হয়, তবে মাশরূ হলো সেগুলো দাফন করা। আরও কারণ হলো, ফুকাহায়ে কিরাম রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মৃতের দেহ থেকে যে চুল অপসারণ করা হয় তা তার কাফনের মধ্যে তার সঙ্গেই রেখে দেওয়া হবে; সুতরাং তার কর্তিত অঙ্গগুলো তো আরও অগ্রাধিকারযোগ্য — কেননা সেগুলোর সম্মান চুলের সম্মানের চেয়ে অধিক। আরও কারণ, এটিই আল্লাহ তাআলার এই বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ:—

﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾

> "আর আমি অবশ্যই আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি।" (সূরা আল-ইসরা: ৭০)

সুতরাং তাকে সম্মান দেওয়ার দাবিগুলোর একটি হলো এই অঙ্গগুলো দাফন করা। আর এই অঙ্গগুলোতে যদি কোনো ছোঁয়াচে রোগ থেকে থাকে, তবে রোগ-বহনকারী জীবাণু ধ্বংসকারী উপাদান দিয়ে ক্ষতিটি দূর করা মাশরূ, তারপর সেগুলো দাফন করা হবে। সুতরাং হাসপাতালগুলোর উচিত সেই অঙ্গগুলো দাফন করা। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

{দ্বিতীয় শাখা} ফুকাহাদের নিকট এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, বিক্রয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ হয় না, যতক্ষণ না বিক্রেতা বিক্রীত বস্তুর মালিক হয় কিংবা তাতে হস্তক্ষেপের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। এ কারণেই আহলুল ইলম রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা ইজমা করেছেন যে, মানুষ যদি এমন কিছু বিক্রি করে যার সে মালিক নয়, তবে তার সেই বিক্রয় বিশুদ্ধ নয় — যদি মালিক সেই বিক্রয় অনুমোদন না করে। এর ভিত্তিতে, শরঈভাবে মানুষের জন্য নিজের অঙ্গের কোনো কিছু বিক্রি করা জায়েয নয়। কারণ সে সেগুলোর মালিক নয়, এবং সেগুলো বিক্রির অনুমতিপ্রাপ্তও নয়; ফলে সেগুলোর বিক্রয় "যার মালিক নয় তা বিক্রি করা"-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তদুপরি, মানুষের নিজের অঙ্গ বিক্রি করার মধ্যে রয়েছে তার নিজের অবমাননা, অথচ আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং সেগুলোর বিক্রয় তাকে সম্মানিত করা-সংক্রান্ত শারিয়-প্রণেতার উদ্দেশ্যের বিরোধী; আর যা শারিয-প্রণেতার উদ্দেশ্যের বিরোধী তা বাতিল। অধিকাংশ ফকীহ এই কারণটির দ্বারাই যুক্তি দেখান। সারকথা হলো, অঙ্গ বিক্রি করা জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

কর্তিত অঙ্গ ও অঙ্গ বিক্রি

কর্তিত অঙ্গ	অঙ্গ বিক্রি
দাফন করা মাশরূ — অংশের হুকুম সমগ্রের মতো	জায়েয নয়
ছোঁয়াচে রোগ থাকলে জীবাণুনাশক দিয়ে ক্ষতি দূর করে দাফন	মানুষ নিজের অঙ্গের মালিক নয়, বিক্রির অনুমতিপ্রাপ্তও নয়
হাসপাতালগুলোর উচিত দাফন করা	বিক্রয়ে নিজের অবমাননা, অথচ আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন

প্রশ্ন ৬৪

অ্যানেস্থেশিয়া (তাখদীর — অবশকরণ) সংক্রান্ত বিশেষ বিধানগুলো কী কী?

উত্তর/ আমি বলি:— এই বিধানগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:—

প্রথম:— অ্যানেস্থেশিয়ার মূল বিধান হলো নিষেধ, তবে যদি তার জন্য জরুরত (অপরিহার্য প্রয়োজন) দেখা দেয় কিংবা এমন হাজত (প্রয়োজন) দেখা দেয় যা জরুরতের স্থলাভিষিক্ত, তখন তা থেকে ততটুকু পরিমাণ জায়েয — যতটুকু দিয়ে ক্ষতি দূর হয় এবং উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

দ্বিতীয়:— অস্ত্রোপচারের অবশকরণ চলাকালে এবং জ্ঞান ফেরার ঠিক কাছাকাছি সময়ে রোগীর স্বীকারোক্তি বিশুদ্ধ স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে না। কারণ স্বীকারোক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো — স্বীকারকারী বিবেকবান হবে এবং সে কী বলছে তা বুঝবে; অথচ জানা কথা যে, অবশ ব্যক্তি উপলব্ধি ও অনুভূতিহীন। সুতরাং গ্রহণযোগ্যতার শর্ত অনুপস্থিত থাকায় তার স্বীকারোক্তি বিশুদ্ধ নয়। এর মূল ভিত্তি হলো মাইয রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা; কেননা নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেছিলেন ((أبه جنون)) "তার কি পাগলামি আছে?" — যখন তাঁকে বলা হলো সে পাগল নয়, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ((هل شرب خمراً)) "সে কি মদ পান করেছে?" — যখন নেতিবাচক উত্তর দেওয়া হলো, তখন তিনি তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করলেন এবং তার ওপর হদ কায়েম করলেন। এর ভিত্তিতে, রোগীর অবশ অবস্থায় তার থেকে নির্গত কোনো স্বীকারোক্তিই ধর্তব্য নয় এবং তার ওপর কোনো শরঈ প্রভাব আরোপিত হবে না — সেই স্বীকারোক্তি আল্লাহর হকের ব্যাপারে হোক কিংবা বান্দাদের হকের ব্যাপারে হোক। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তৃতীয়:— রোগী যদি তার অবশ অবস্থায় রিদ্দাহর (ধর্মত্যাগের) বাক্য উচ্চারণ করে, তবে তার ওপর সেটির হুকুম প্রযোজ্য হবে না। কারণ সে যা বলছে তা সে উপলব্ধি করছে না। এর মূল ভিত্তি হলো সহীহাইনে মারফূ হিসেবে বর্ণিত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস — সেই ব্যক্তির ব্যাপারে যে নিজের উটনী হারিয়ে ফেলার পর তা ফিরে পেয়েছিল:—

((اللَّهُمَّ أَنتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ))

> "হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার রব — অতিরিক্ত আনন্দের কারণে সে ভুল করে ফেলেছিল।"

উভয় ক্ষেত্রে সাধারণ বিষয়টি হলো ইচ্ছা-সংকল্পের অনুপস্থিতি। আরও কারণ, তাকফীরের শর্তাবলিতে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে কুফরের বাক্যটি বিবেকবান ব্যক্তির কাছ থেকে নির্গত হতে হবে, অথচ অবশ ব্যক্তি তার অবশ অবস্থায় বিবেকশূন্য।

আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

চতুর্থ:— জেনে রাখো — আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করুন — রোগী তার অবশ অবস্থায় এমনভাবে বিবেকহারা বলে গণ্য যে বিষয়ে শরীয়তে সে ওযরপ্রাপ্ত। সুতরাং তার তালাক পতিত হবে না এবং তার থেকে তা বিশুদ্ধও হবে না, কারণ সে পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো। আর আহলুল ইলম ইজমা করেছেন যে পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক পতিত হয় না; সুতরাং অবশ রোগীর ক্ষেত্রেও তদ্রূপ — উভয়ের মধ্যে সাধারণ বিষয় হলো, বৈধ কারণে ও শরীয়তে ওযরযোগ্য অবস্থায় প্রত্যেকের বিবেক লোপ পাওয়া। ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, আহলুল ইলমের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, যে ব্যক্তি বাং (চেতনানাশক) পান করল ফলে তার বিবেক লোপ পেল, তার তালাক কার্যকর নয়। আরও কারণ, সে যা বলছে তার সংকল্পকারী নয়; আর কাওয়াইদে (মূলনীতিতে) এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে চুক্তি ও চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে সংকল্পসমূহ ধর্তব্য। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পঞ্চম:— জেনে রাখো — আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করুন — চিকিৎসকরা যদি রোগীকে পূর্ণরূপে অবশ করেন এবং তার কিছু ফরয সালাত ছুটে যায়, তবে জ্ঞান ফেরার পর ও চেতনা ফিরে আসার পর তার ওপর ওয়াজিব হলো দ্রুত সেগুলো কাযা করা; আর কাযার নির্দেশটি তাৎক্ষণিকতার দাবিদার। কারণ রোগী তার অবশ অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত। হাদীসে এসেছে:—

من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك

> "যে ব্যক্তি কোনো সালাত থেকে ঘুমিয়ে থাকল কিংবা তা ভুলে গেল, সে যখনই তা স্মরণ করবে তখনই যেন তা পড়ে নেয়; এ ছাড়া তার আর কোনো কাফফারা নেই।" — "আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে মুত্তাফাকুন আলাইহি"।

সুতরাং তার ওপর ছুটে যাওয়া সালাত তাৎক্ষণিকভাবে কাযা করা আবশ্যক — অবশ থাকার সময়কাল দীর্ঘ হলেও। আর চিকিৎসকরা যদি এতটা সক্ষম হন যে সালাতের ওয়াক্ত নিকটবর্তী হলে সালাতের পরেই কেবল রোগীকে অবশ করবেন, তবে তা-ই উত্তম। আর এই সালাতটি যদি পরবর্তী সালাতের সঙ্গে একত্র করা যায় এবং অবশ থাকার সময়কাল দ্বিতীয় ফরয সালাতের ওয়াক্তের পর পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে রোগীর জন্য বৈধ যে সে অবশ হওয়ার আগেই দুই সালাত জমে তাকদীম করে একত্র করে নেবে। কারণ জমা করা হলো সংকট দূর করার জন্য আকস্মিক অবস্থার রুখসত। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

অ্যানেস্থেশিয়ার বিধান

বিষয়	হুকুম
অ্যানেস্থেশিয়ার মূল বিধান	নিষেধ; জরুরত বা হাজতে ততটুকু, যতটুকুতে ক্ষতি দূর হয়
অবশ অবস্থায় স্বীকারোক্তি	বিশুদ্ধ নয় — আল্লাহর হক বা বান্দার হক, কোনোটিতেই
অবশ অবস্থায় ধর্মত্যাগের বাক্য	হুকুম প্রযোজ্য হবে না — সে উপলব্ধি করছে না
অবশ অবস্থায় তালাক	পতিত হয় না — পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো
অবশ থাকাকালে ছুটে যাওয়া সালাত	জ্ঞান ফিরলে দ্রুত কাযা ওয়াজিব
সালাতের ওয়াক্ত নিকটবর্তী হলে	সম্ভব হলে সালাতের পরে অবশ করা উত্তম; নতুবা আগে জমউ তাকদীম

প্রশ্ন ৬৪

প্রশ্ন ৬৫

এমন কোন কোন জিনিস আছে, যেগুলোর কথা শরীয়তের দিকে সম্পৃক্ত কিছু লোক কিংবা সাধারণ মানুষ বলে থাকে এবং বিশ্বাস করে যে সেগুলো চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত ও স্বাস্থ্য রক্ষাকারী, অথচ সেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই? সেগুলো প্রত্যাখ্যানের দিকটিও বর্ণনা করুন, এবং তা শরীয়তের মূলনীতির শাখা হিসেবে দেখান?

উত্তর/ আমি বলি:— এ জাতীয় জিনিস অনেক; তবে সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে আমরা বলছি:—

এর অন্যতম:— নেকড়ের চামড়া ঝুলিয়ে তা দিয়ে চিকিৎসা করা, কিংবা এই বিশ্বাস করা যে এর দ্বারা জিন প্রতিহত হয়। এটি একটি ভিত্তিহীন কুসংস্কার এবং শিরকি তাবীয। মুসলিমের জন্য কখনোই জায়েয নয় যে সে এতে বিশ্বাস করবে কিংবা তা ঝোলাবে — না নিজের ঘরে, না নিজের বাহনে, না নিজের সন্তানদের ওপর, না অন্য কোনো কিছুর ওপর। কারণ গায়েবের বিষয়গুলোর ভিত্তি তাওকীফ (নস-নির্ভরতা)-এর ওপর। আরও কারণ, যে ব্যক্তি এমন কোনো কিছুকে কারণ (সাবাব) বলে বিশ্বাস করল যার পক্ষে শরীয়তও দলিল দেয়নি, কদরও দেয়নি — সে শিরকে আসগর (ছোট শিরক) করল; আর কর্তা যদি সেটিকে স্বয়ং-প্রভাবশালী বলে বিশ্বাস করে, তবে তা শিরকে আকবার (বড় শিরক)।

এর অন্যতম:— ঘরের দেয়ালে লবণ-মিশ্রিত পানি ছিটানো, অর্থাৎ যে পানিতে লবণ মেশানো হয়েছে; আর সাধারণ মানুষ ধারণা করে যে এতে জিন ঘর থেকে বিতাড়িত হয়। এটি তাদের অসংখ্য কুসংস্কারের একটি এবং শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই; বিষয়টি গায়েবের, আর গায়েবের বিষয়গুলোর ভিত্তি তাওকীফের ওপর। এর পরিবর্তে যথেষ্ট হলো সম্পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ করা, যেমনটি হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে:—

وإن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

"নিশ্চয়ই শয়তান সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায় যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়।"

এর অন্যতম:— কেউ কেউ যা বলে থাকে যে, চোখের প্রদাহ (রামাদ) প্রতিহত করার একটি উপায় হলো নখ ক্রমের বিপরীতে (এলোমেলোভাবে) কাটা; আর এ ব্যাপারে তারা এই হাদীস বর্ণনা করে ((من قص أظفاره مخالفاً لم ير في عينه رمداً)) "যে ব্যক্তি নিজের নখ ক্রমের বিপরীতে কাটল, সে তার চোখে প্রদাহ দেখবে না।" — এটি বাতিল ও জাল, এর কোনো ভিত্তি নেই। আর যা বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা তার মতোই বাতিল। এই চিকিৎসার কোনো ভিত্তি চিকিৎসাশাস্ত্রেও নেই, গ্রহণযোগ্য অভিজ্ঞতাতেও নেই। সুতরাং ওয়াজিব হলো এতে বিশ্বাস না করা।

এর অন্যতম:— কেউ কেউ যা বলে থাকে যে, মুসহাফের (কুরআনের) দিকে তাকানো চোখের ব্যথার একটি চিকিৎসা; আর এ ব্যাপারে তারা বর্ণনা করে যে, কোনো এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিজের দুই চোখের অভিযোগ করলে তিনি বললেন ((انظر في المصحف :- انظر في المصحف فإني اشتكيت عيني إلى رب العزة فقال لي)) "তুমি মুসহাফের দিকে তাকাও; কেননা আমি রাব্বুল ইয্যতের কাছে আমার চোখের অভিযোগ করেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন:— তুমি মুসহাফের দিকে তাকাও।" — এই হাদীসটি মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল; এর বিশুদ্ধতার কোনো ভিত্তিই নেই এবং এর ওপর মিথ্যার আলামত স্পষ্ট। কেননা নবী ﷺ-এর যুগে মুসহাফ একত্রিতই করা হয়নি। মোটকথা, চোখের ব্যথার চিকিৎসা করা হবে চিকিৎসাবিদদের কাছে এবং রুকইয়াহ শরইয়্যাহর মাধ্যমে। আর এমন চিকিৎসা উদ্ভাবন করা, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো দলিল নাযিল করেননি — তা তো না জেনে আল্লাহর ওপর কথা বলার অন্তর্ভুক্ত।

এর অন্যতম:— কেউ কেউ জ্বরের চিকিৎসায় "হিমারু কাব্বান" (কাঠপোকা-জাতীয় গুবরে পোকাসদৃশ ছোট পোকা)-র কথা বলে থাকে; এটি সেই ছোট প্রাণীটি যা গুবরে পোকার মতো দেখতে এবং যার পিঠে গম্বুজের মতো উঁচু একটি ঢাল থাকে। তারা বলে:— যদি এই পোকাটি নিয়ে একটি কাপড়ের টুকরায় জড়িয়ে জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা জ্বরকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে। এর কোনো ভিত্তি শরীয়তেও নেই, চিকিৎসাশাস্ত্রেও নেই; বরং তা শিরকি তাবীযের অন্তর্ভুক্ত, যা ঝোলানো জায়েয নয়।

এর অন্যতম:— কেউ কেউ যা বলে থাকে টিকটিকি দিয়ে চিকিৎসার ব্যাপারে; সেই কেউ কেউ বলে:— যদি "সাম্মু আবরাস" — অর্থাৎ বড় টিকটিকি — জীবন্ত ধরে একটি বাঁশের নলের মধ্যে রেখে তার মাথা বেঁধে দেওয়া হয় এবং এই নলটি ব্যথার জায়গায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা প্রশমিত হয়। এটি সহীহ দলিলসমূহ দ্বারা হারাম ঘোষিত তাবীযের অন্তর্ভুক্ত, এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে চালু কুসংস্কারগুলোর একটি। এর কোনো ভিত্তি চিকিৎসাশাস্ত্রে নেই, শরীয়তের কোনো দলিলও একে সমর্থন করে না; এটি হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত — আর আল্লাহ এই উম্মতের আরোগ্য সেই জিনিসে রাখেননি যা তাদের ওপর হারাম করেছেন। উপরন্তু শরীয়ত টিকটিকি হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, সুতরাং তাকে জীবিত রেখে দেওয়া শারিয-প্রণেতার নির্দেশের বিরোধী।

এর অন্যতম:— কেউ কেউ যেসব লেখা ও তিলিসমাতের (তাবীযি প্রতীক-লিপি) কথা উল্লেখ করে, যেগুলোর কোনো অর্থ নেই এবং যেগুলো জাদুর তিলিসমাতের অধিকতর নিকটবর্তী। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিব্বে নববী (নববী চিকিৎসা) বিষয়ে রচিত কিছু গ্রন্থে এই জাদুকরী কুসংস্কারগুলো উল্লেখ করা হয়। শাইখ আলাউদ্দীন আল-কাহহাল তাঁর "আল-আহকামুন নববিয়্যা ফিস সিনাআতিত তিব্বিয়্যা" গ্রন্থে এর কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন, শাইখ সাফফারীনী "গিযাউল আলবাব" গ্রন্থেও, এবং দামীরী "কিতাবুল হায়াওয়ান" গ্রন্থেও এর কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন। অথচ ওয়াজিব হলো মানুষের মস্তিষ্ককে এসব কুসংস্কার থেকে পবিত্র করা। দৃষ্টান্ত দেওয়ার খাতিরে আমি তোমাকে একটিমাত্র উদাহরণ উল্লেখ করছি — তা হলো, তারা এই অক্ষরগুলো এই পদ্ধতিতে লেখে:—

ب

ط

د

ز

ھ

ج

و

أ

ح

তারা বলে, এগুলো যদি এভাবে লেখা হয় এবং যে নারীর প্রসব কঠিন হয়ে পড়েছে তার দুই পায়ের নিচে রাখা হয়, তবে সে প্রসব করবে। এসবই বানোয়াট মিথ্যা, এবং এটি শিরকি তাবীযের অন্তর্ভুক্ত; বরং তা চিকিৎসার চেয়ে শয়তানদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার (ইসতিগাসা) অধিকতর নিকটবর্তী। কারণ এই অক্ষরগুলো বড় বড় শয়তানের নামের সাংকেতিক প্রতীক এবং এগুলো এমন জিনিস যা বোঝা যায় না। সুতরাং শরঈভাবে এগুলো ব্যবহার করা জায়েয নয়। ওয়াজিব হলো এসব জিনিস থেকে সতর্ক থাকা ও অন্যদের সতর্ক করা।

এর অন্যতম:— নাক দিয়ে রক্তক্ষরণের (রুআফ) চিকিৎসায় তারা যা বলে থাকে যে, রোগীর কপালে লেখা হবে:— "রক্তের তৈরি এক ফেরেশতা নেমে এসেছে, তার সঙ্গে রক্তের তলোয়ার, তার হাতে রক্তের বর্শা, তা দিয়ে সে রক্ত

কেটে দেয়; হে রক্ত, আদম ও হাওয়ার হক দিয়ে তুমি বন্ধ হয়ে যাও" — এই চিকিৎসা নিষিদ্ধ। কারণ এতে জিনদের বাদশাহদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা (ইসতিগাসা) রয়েছে, এবং এতে সত্তার মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ রয়েছে; এটি বিশুদ্ধ দুআসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো দলিলও বর্ণিত হয়নি।

এর অন্যতম:— ঘরের ছাদে ও উঠানে খাবারের উচ্ছিষ্ট রেখে দেওয়া — এই নিয়তে যে জিন তা থেকে খাবে, ফলে ঘরের অধিবাসীদের থেকে তাদের ক্ষতি দূর হবে। এটি কখনোই জায়েয নয়; বরং এটি এক প্রকার শিরক, কেননা এতে সেই কাজের মাধ্যমে জিনের নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা রয়েছে।

এর অন্যতম:— দামীরী "কিতাবুল হায়াওয়ান" গ্রন্থে সিংহের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছেন — যে ব্যক্তি সিংহের লোম বা তার চামড়া থেকে কিছু নিয়ে নিজের ওপর ঝুলিয়ে রাখে, সে মৃগীরোগ (সরা) থেকে সুস্থ হয়ে যায়; আর তার গোশত পক্ষাঘাত (ফালিজ) থেকে উপকার করে; আর তার লেজ যদি মানুষ নিজের সঙ্গে রাখে, তবে কোনো ষড়যন্ত্রকারীর কোনো কৌশল তার ওপর কাজ করে না; আর তার দুই অণ্ডকোষ যদি লাল বোরাক (সোহাগা) ও মাসতাকী (মস্তকী আঠা) দিয়ে লবণাক্ত করা হয়, শুকানো হয়, গুঁড়া করা হয়, ছাতুর সঙ্গে মিশিয়ে পান করা হয়, তবে তা পেটের ভেতরের সমস্ত ব্যথার জন্য উপকারী — যেমন উদরশূল, কোলিক (ফূলাঞ্জ), অর্শ ও জরায়ুর ব্যথা; আর যে ব্যক্তি সিংহের চর্বি দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও দেহে মালিশ করে, তার মুখমণ্ডল ও দেহের সমস্ত ত্রুটি দূর হয়ে যায়। এসবই হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত; কেননা সিংহ এমন প্রাণী যা খাওয়া জায়েয নয়, আর মরে গেলে তা মৃতদেহ (মায়তা) — আর মৃতদেহ দ্বারা উপকার গ্রহণ জায়েয নয়। চিকিৎসা তো নিরুপায় অবস্থার (ইদতিরার) অন্তর্ভুক্ত নয় যে তাতে হারাম জিনিস ব্যবহার করা জায়েয হবে। মোটকথা, এসব কাজ শরঈভাবে হারাম; আর সিংহ সেই আক্রমণকারী হিংস্র প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে হালাল ও হারাম উভয় সীমানায় হত্যা করা হয় — পাগলা কুকুরের ওপর কিয়াসে আওলার ভিত্তিতে। সুতরাং আমি তাঁর কাছে — জাল্লা ওয়া আলা — প্রার্থনা করি, তিনি যেন দামীরীকে ক্ষমা করেন সেসব প্রাণী-বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে যা তিনি এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন; কেননা তার অনেকগুলোর মধ্যেই শরঈ বিরোধিতা রয়েছে।

এর অন্যতম:— তিনি রহিমাহুল্লাহু তাআলা সুপরিচিত বন্য শূকরের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছেন — তার কলিজা যদি খাওয়া হয় কিংবা কোনো মানুষকে পান করানো হয়, তবে তা বিষাক্ত পোকামাকড়ের দংশনে উপকার করে; আর তার হাড় যদি গুঁড়া করে অর্শরোগী পান করে, তবে সে আরোগ্য লাভ করে ও সুস্থ হয়ে যায়; আর যে ব্যক্তি তার হাড় ঝুলিয়ে রাখে, সে হুম্মাল রিব (চতুর্থ দিনের জ্বর) থেকে আরোগ্য লাভ করে — এবং সেখানে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার শেষ পর্যন্ত। এসবই হারাম চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত, যার হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি রহিমাহুল্লাহু তাআলা — আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন — সেসব চিকিৎসাগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করতেন যাদের রচয়িতারা শরীয়ত-বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য পরিচিত নন। শূকর তো পুরোটাই হারাম — তার গোশত, তার চর্বি, তার বিক্রয়, তার ক্রয়, তা দিয়ে চিকিৎসা — তার সবকিছুই হারাম ও নাপাক। আর আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের আরোগ্য সেই জিনিসে রাখেননি যা তাদের ওপর হারাম করেছেন।

এর অন্যতম:— কোথাও পড়ে যাওয়ার প্রভাবের চিকিৎসা সেই স্থানের মাটি নিয়ে করা, কিংবা সেই স্থানে পানি ছিটিয়ে করা। এটি এমন জিনিস দিয়ে চিকিৎসা যার কার্যকারণ জানা নেই, এবং যা শরীয়তও সাব্যস্ত করেনি, অভিজ্ঞতাও করেনি। বিষয়টি গায়েবের, আর গায়েবের বিষয়গুলো দলিলের ওপর তাওকীফি। সুতরাং এই চিকিৎসা হারাম, জায়েয নয়। এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; কিন্তু প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এর কোনো ভিত্তি নেই।

এর অন্যতম:— দামীরী "কিতাবুল হায়াওয়ান" গ্রন্থে গৃহপালিত গাধার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছেন; তাতে তিনি বিস্ময়কর সব কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার শেষে রয়েছে — গৃহপালিত গাধার কলিজা যদি ভিনেগারে ভিজিয়ে ঝলসে খালি পেটে খাওয়া হয়, তবে তা মৃগীরোগে উপকার করে। এই চিকিৎসা হারাম, কারণ গৃহপালিত গাধার কলিজা নাপাক; বরং তার সবটাই নাপাক ও তার গোশত অপবিত্র। সহীহাইনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন:—

لما كان يوم خيبر بعث النبي أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله

ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس

"খায়বারের দিন যখন এলো, নবী ﷺ আবু তালহাকে পাঠালেন; তিনি ঘোষণা দিলেন — নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত থেকে নিষেধ করছেন, কেননা তা অপবিত্র।"

আর আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের আরোগ্য সেই জিনিসে রাখেননি যা তিনি তাদের ওপর হারাম করেছেন। কিন্তু এগুলো তো বিকৃত উদ্ধৃতি, যা যাচাই করা হয়নি। আল্লাহ এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন।

এর অন্যতম:— সীসা ঢালা (সাব্বুর রাসাস) দিয়ে চিকিৎসা করা; এটি গণকদের চিকিৎসা, তা করাও জায়েয নয় এবং মূলত তাদের কাছে যাওয়াই জায়েয নয়। কারণ সীসা ঢালা তো কেবল একটি বাহ্যিক কৌশল এবং শয়তানদের কাছে তার সাহায্য-প্রার্থনার ওপর আবরণমাত্র। সুতরাং তা কাপে (ফিনজানে) দেখে ভাগ্য বলা এবং বালিতে রেখা টানার মতোই।

এর অন্যতম:— দামীরী রহিমাহুল্লাহু তাআলা — আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন — "কিতাবুল হায়াওয়ান" গ্রন্থে প্রাণীগুলোর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছেন; তিনি বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, সেগুলোর কোনো কোনো অংশ যদি রোগীর ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তবে তা তার উপকার করে; আর সেগুলোর কোনো কোনোটির কিছু অংশ যদি ঘরের দরজার কাছে রাখা হয়, তবে সে ঘরের কাছে কোনো বিপদ ঘেঁষে না। এসবই হারাম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা জায়েয নয়; কারণ এগুলো শিরকি তাবীযের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলিলসমূহ বিশদ বিবরণ দিয়েছে। ইসলামের উলামা শিরকি তাবীয ঝোলানো নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন; আর এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয নয়। আর আল্লাহ, আমাদের রব, সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

ভিত্তিহীন চিকিৎসা: লেখকের ভাষ্য

করুন

✓ চোখের ব্যথার চিকিৎসা চিকিৎসাবিদদের কাছে ও রুকইয়াহ শরইয়্যাহর মাধ্যমে

করবেন না

✗ নেকড়ের চামড়া ঝোলানো — শিরকি তাবীয

✗ ঘরের দেয়ালে লবণ-মেশানো পানি ছিটানো — বিকল্প: সম্পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ

✗ নখ এলোমেলো কাটলে চোখ ওঠা না হওয়ার হাদীস — জাল

✗ মুসহাফের দিকে তাকানো চোখের চিকিৎসা — জাল হাদীস

✗ জ্বরে হিমারু কাব্বান বা ব্যথায় টিকটিকি দিয়ে তাবীয ঝোলানো — শিরকি ও হারাম

✗ অর্থহীন লেখা ও তিলিসমাত; জিনের জন্য উচ্ছিষ্ট খাবার রাখা — শিরক

✗ সিংহ, শূকর ও গৃহপালিত গাধার অংশ দিয়ে চিকিৎসা — হারাম

✗ পড়ে যাওয়ার স্থানের মাটি বা পানি; সীসা ঢালা

প্রশ্ন ৬৫ — গায়েবের বিষয়ের ভিত্তি তাওকীফ (নস-নির্ভর)

প্রশ্ন ৬৬

রোগ সম্পর্কে কিছু সহীহ বর্ণনা উল্লেখ করুন? রোগী দেখতে যাওয়ার (ইয়াদাতুল মারীদ) ফযীলত ও তার হুকুম কী? "হাজরে সিহহী" (স্বাস্থ্য-অবরোধ/কোয়ারেন্টাইন) দ্বারা কী বোঝানো হয়? এবং তার দলিল কী?

উত্তর/ আমি বলি:— এই প্রশ্নে চারটি মাসআলা রয়েছে:—

{প্রথম মাসআলা} রোগ সম্পর্কে কিছু সহীহ বর্ণনা। তার মধ্যে রয়েছে আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনা — তাঁরা দুজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন:—

ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى

الهم يهمه, إلا كُفِّرَ به من سيئاته

"মুমিনের ওপর যে অবিরাম ব্যথা, ক্লান্তি, ব্যাধি বা দুঃখই আপতিত হয় — এমনকি যে দুশ্চিন্তা তাকে ভাবিয়ে তোলে তা পর্যন্ত — তার দ্বারা তার গুনাহসমূহ মোচন করা হয়।" — "তাঁরা দুজন (বুখারী ও মুসলিম) সহীহাইনে

এটি বের করেছেন"।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:— রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুস সাইবের কাছে তাকে দেখতে গেলেন, তারপর বললেন ((مالكِ تزفزفين؟)) "তোমার কী হয়েছে, তুমি কাঁপছ কেন?" তিনি বললেন:— জ্বর, আল্লাহ তাতে বরকত না দিন! তখন তিনি বললেন:—

لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم, كما يذهب الكير

خبث الحديد

"তুমি জ্বরকে গালি দিয়ো না; কেননা তা আদম-সন্তানের গুনাহসমূহ দূর করে দেয়, যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।" — "মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন"।

আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:—

))إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا

صحيحاً

"বান্দা যখন অসুস্থ হয় কিংবা সফর করে, তখন তার জন্য তা-ই লেখা হয় যা সে অবস্থানরত ও সুস্থ থাকা অবস্থায় আমল করত।" — "বুখারী এটি বের করেছেন"।

হারিস ইবনু সুওয়াইদ থেকে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:— আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁকে স্পর্শ করে বললাম:— হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত! তিনি বললেন ((أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم)) "হ্যাঁ, আমার এমন জ্বর হয় যেমন তোমাদের দুজন লোকের জ্বর হয়।" আমি বললাম:— এটি কি এজন্য যে আপনার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে? তিনি বললেন:—

أجل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط

الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها

"হ্যাঁ। কোনো মুসলিমের ওপর রোগ বা তা ছাড়া অন্য কোনো কষ্ট আপতিত হলেই আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ঝরিয়ে দেন, যেমন গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।" — "তাঁরা দুজন সহীহাইনে এটি বের করেছেন"।

উরওয়া থেকে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:— রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حتى

الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا أَوِ النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا((

"মুমিনের ওপর যে রোগ বা ব্যথাই আপতিত হয়, তা তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায় — এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিঁধে কিংবা যে হোঁচট তাকে লাগে তা পর্যন্ত।" — "তাঁরা দুজন সহীহাইনে এটি বের করেছেন"।

তাঁর ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেছেন:—

إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى كحديدة

تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها

"মুমিন বান্দার দৃষ্টান্ত — যখন তাকে জ্বর ও উত্তাপ পেয়ে বসে — সেই লোহার মতো যা আগুনে প্রবেশ করে, ফলে তার ময়লা চলে যায় আর তার ভালো অংশ থেকে যায়।" — "বাযযার এটি বর্ণনা করেছেন"।

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ থেকে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:—

إن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد

"নিশ্চয়ই জ্বর আদম-সন্তানের গুনাহসমূহ দূর করে দেয়, যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।" — "কেবল মুসলিম এটি বের করেছেন"।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

إذا اشتكى العبد المسلم قال الله تعالى للذين يكتبون: اكتبوا له أفضل ما كان يعمل إذا كان طلقاً حتى أطلقه

"মুসলিম বান্দা যখন অসুস্থ হয়, আল্লাহ তাআলা লেখকদের (ফেরেশতাদের) বলেন:— তার জন্য সেই সর্বোত্তম আমলই লিখতে থাকো যা সে মুক্ত-স্বচ্ছন্দ অবস্থায় করত, যতক্ষণ না আমি তাকে মুক্ত করে দিই।" — "সহীহ হাদীস"।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:—

إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله تعالى كما يخلص الكير خبث الحديد

"মুমিন যখন অসুস্থ হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে বিশুদ্ধ করে দেন, যেমন হাপর লোহার ময়লা থেকে তাকে বিশুদ্ধ করে।" — "সহীহ হাদীস"।

আবু দাউদ তাঁর সুনানে নিজের সনদে মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ আস-সুলামী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে — যাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাহচর্য ছিল — বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:—

إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله تعالى في جسده أو في ماله أو في ولده

"নিশ্চয়ই বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি এমন কোনো মর্যাদা পূর্বনির্ধারিত থাকে যা সে নিজের আমল দিয়ে পৌঁছাতে পারেনি, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে তার দেহে, কিংবা তার সম্পদে, কিংবা তার সন্তানে পরীক্ষায় ফেলেন।"

আবু দাউদ বলেন:— ইবনু নুফাইল বাড়িয়ে বলেছেন ((صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل)) "তারপর তিনি তাকে তাতে ধৈর্য ধারণ করান, যতক্ষণ না তাকে সেই মর্যাদায় পৌঁছে দেন যা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে তার জন্য পূর্বনির্ধারিত ছিল।" — "সহীহ হাদীস"।

তো এগুলোই রোগের প্রসঙ্গে ও তার ফযীলত সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি।

{দ্বিতীয় মাসআলা} আর রোগী দেখতে যাওয়ার ফযীলতের ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে মুসলিম তাঁর সহীহতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

إن الله ذو الجلال والإكرام يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني؟ قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لو جدتني عنده...الحديث

"নিশ্চয়ই আল্লাহ — মহিমা ও সম্মানের অধিকারী — কিয়ামতের দিন বলবেন:— হে আদম-সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসোনি কেন? সে বলবে:— হে আমার রব, আমি কীভাবে আপনাকে দেখতে যাব, আপনি তো রাব্বুল আলামীন? তিনি বলবেন:— তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তাকে দেখতে যাওনি? তুমি কি জানতে না যে তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তবে আমাকে তার কাছে পেতে?...হাদীসের বাকি অংশ।"

আবদুল্লাহ ইবনু নাফি থেকে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:— রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

ما من رجل يعود مريضاً ممسياً إلا خرج معه سبعون ألف ملكٍ يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة, ومن أتاه مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملكٍ يستغفرون له حتى يمسي, وكان له خريف في الجنة

"যে কোনো ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা কোনো রোগীকে দেখতে যায়, তার সঙ্গে সত্তর হাজার ফেরেশতা বের হন, যাঁরা সকাল হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ইস্তিগফার করতে থাকেন; আর তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান হয়। আর যে ব্যক্তি সকালবেলা তার কাছে আসে, তার সঙ্গেও সত্তর হাজার ফেরেশতা বের হন, যাঁরা সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ইস্তিগফার করতে থাকেন; আর তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান হয়।" — "আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন; এটি মারফূ ও মাওকূফ উভয় সূত্রেই সহীহ হাদীস"।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:—

من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه منادٍ: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً

"যে ব্যক্তি কোনো রোগীকে দেখতে গেল কিংবা আল্লাহর জন্য তার কোনো ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, তাকে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন:— তুমি পবিত্র হলে, তোমার চলাও পবিত্র হলো, এবং তুমি জান্নাতে একটি আবাস বানিয়ে নিলে।" — "আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান"।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:—

من عاد مريضاً لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها

"যে ব্যক্তি কোনো রোগীকে দেখতে যায়, সে রহমতের মধ্যে সাঁতরাতে থাকে যতক্ষণ না সে বসে; আর যখন সে বসে, তখন সে তাতে ডুবে যায়।" — "মালিক ও আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ উত্তম"।

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم, لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع

"নিশ্চয়ই মুসলিম যখন তার মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফা'-তেই থাকে।"

বলা হলো:— হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের খুরফা কী? তিনি বললেন ((جناها)) "তার ফলসম্ভার।" — "মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন"।

তাঁর থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع

"রোগী দেখতে যাওয়া ব্যক্তি ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফলবাগানেই থাকে।" — "মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন"।

আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

{তৃতীয় মাসআলা} আর এর হুকুম প্রসঙ্গে জেনে রাখো — উলামা এর মাশরূইয়্যাতের (শরীয়তসম্মত হওয়ার) ব্যাপারে ইজমা করেছেন, তবে এই মাশরূইয়্যাতের ধরন নিয়ে মতভেদ করেছেন। আর সত্য — ইনশাআল্লাহু তাআলা — এই যে, তা ফরযে কিফায়া; যদি যথেষ্ট পরিমাণ লোক তা আদায় করে তবে বাকিদের থেকে গুনাহ রহিত হয়ে যায়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহু তাআলা এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। এর দলিল হলো সেই অসংখ্য হাদীস, যেগুলোতে নবী ﷺ বলেন ((حق المسلم على المسلم)) "মুসলিমের ওপর মুসলিমের হক" — এই এই; আর তিনি সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেন ((وعيادة المريض)) "এবং রোগী দেখতে যাওয়া"। দলিলগুলোর আরেকটি হলো তাঁর ﷺ থেকে নির্গত নির্দেশ, যেমন এই হাদীসে রয়েছে ((وإذا مرض فعده)) "আর সে যখন অসুস্থ হয়, তখন তাকে দেখতে যাও" — আর নির্দেশ ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে। দলিলগুলোর আরেকটি হলো বুখারী তাঁর সহীহতে আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني

> "ক্ষুধার্তকে খাওয়াও, রোগীকে দেখতে যাও এবং বন্দীকে মুক্ত করো।"

আর এটি একটি নির্দেশ, আর নির্দেশ ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

{চতুর্থ মাসআলা} "হাজরে সিহহী" (স্বাস্থ্য-অবরোধ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রোগীদেরকে সুস্থদের সঙ্গে মেলামেশা করা থেকে বিরত রাখা। আর এটি তখনকার কথা, যখন তাদের মেলামেশা মারাত্মক ও দুরারোগ্য ব্যাধি সংক্রমণের কারণ হয় — যেমন এইডস, প্লেগ, কুষ্ঠ ইত্যাদি। কারণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় স্বাস্থ্য-অবরোধ শরীয়তে জায়েয; বরং অন্যদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে তা ওয়াজিবের পর্যায়েও পড়তে পারে। আর স্বাস্থ্য-অবরোধে যদি কোনো বিশেষ ক্ষতি ও অনিষ্ট থাকেও, তবু আমরা তা বরণ করে নিই — কারণ এর দ্বারা আমরা একটি সাধারণ ক্ষতি ও সাধারণ অনিষ্ট প্রতিহত করি। আর দুটি ক্ষতি পরস্পরবিরোধী হলে লঘুতরটি বরণ করে গুরুতরটির প্রতিই লক্ষ রাখা হয়; ক্ষতিসমূহ প্রতিহত করা কল্যাণ অর্জনের ওপর অগ্রগণ্য; এবং সাধারণ ক্ষতি বিশেষ ক্ষতির ওপর অগ্রগণ্য। এর দলিল হলো শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে যা বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি — অর্থাৎ প্লেগ সম্পর্কে:—

إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه

> "যখন তোমরা কোনো ভূখণ্ডে এর কথা শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না; আর যখন তা কোনো ভূখণ্ডে দেখা দেয় এবং তোমরা সেখানে থাকো, তখন তা থেকে পালিয়ে বের হয়ো না।"

আর বুখারী তাঁর সহীহতে তাঁর ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন:—

لا يورد ممرض على مصح

> "রোগাক্রান্ত (পশুর মালিক) যেন সুস্থ (পশুর মালিকের) কাছে (নিজের পশু) পানি পান করাতে না নিয়ে যায়।"

আমর ইবনুশ শারীদ থেকে, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন:—

لا تديموا النظر إلى المجذومين

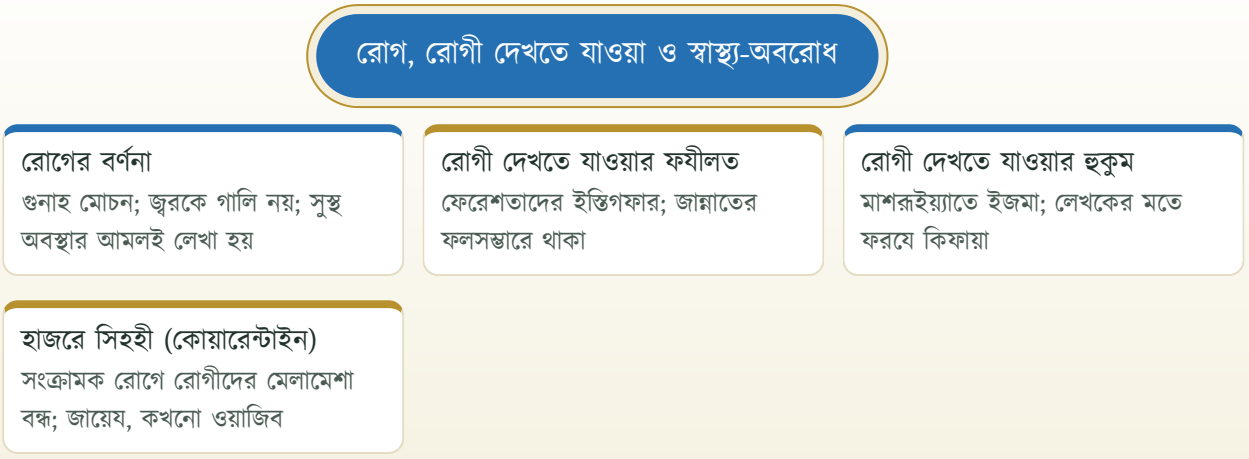
"তোমরা কুষ্ঠরোগীদের দিকে অবিরাম তাকিয়ে থেকো না।" — "ইবনু মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান"।

আর মুসলিম তাঁর সহীহতে, নাসাঈ তাঁর সুনানে, তিরমিযী তাঁর জামিতে এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদলে একজন কুষ্ঠরোগী ব্যক্তি ছিল; তখন নবী ﷺ তার কাছে পাঠালেন:—

((إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ))

"আমরা তো তোমার বাইআত নিয়ে নিয়েছি, সুতরাং তুমি ফিরে যাও।"

প্রশ্ন ৬৬: চারটি মাসআলা



প্রশ্ন ৬৬

আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন ৬৭

কোন কোন রোগে রোগী দেখতে যাওয়া হবে? কাফিরকে কি দেখতে যাওয়া হবে? রোগী দেখতে যাওয়ার সুন্নত কী? এটি বারবার করা কি মাশরূ? এবং কোনো পরপুরুষের জন্য কি নারীকে দেখতে যাওয়া জায়েয? দলিলসহ তা স্পষ্ট করুন?

উত্তর/ আমি বলি:— এই প্রশ্নে কয়েকটি শাখা রয়েছে:—

{প্রথম শাখা} তাঁর কথা (কোন কোন রোগে রোগী দেখতে যাওয়া হবে) — এর উত্তর:— রোগী দেখতে যাওয়া সব ধরনের রোগেই হবে, সেগুলো যত সামান্যই হোক — যেমন চোখের ব্যথা, দাঁতের ব্যথা, মাথাব্যথা ইত্যাদি। সুতরাং সব রোগেই তার আক্রান্তদের দেখতে যাওয়া মাশরূ, আর মারাত্মক ও কষ্টদায়ক রোগগুলোতে তা আরও জোরালোভাবে মুস্তাহাব। আবু দাউদ তাঁর সুনানে যায়দ ইবনু আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:—

عادني رسول الله من وجع كان بعيني

> "আমার চোখে যে ব্যথা ছিল, তার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এসেছিলেন।" — "হাসান হাদীস"।

আর এটি "নিম্নতরটি উল্লেখ করে উচ্চতরটির প্রতি সতর্ক করা"-র অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ এই হাদীস থেকে আমরা বেশ কিছু উপকারিতা লাভ করি; আর এখানে আমাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি উপকারিতা:—

প্রথম:— রোগী দেখতে যাওয়া সামান্য রোগেও হয় — যেমন চোখের ব্যথা।

দ্বিতীয়:— চোখের রোগের চেয়ে যা উচ্চতর, তা তো আরও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই রোগী দেখতে যাওয়ার মুস্তাহাব হওয়ার অন্তর্ভুক্ত; আর এটিই "কিয়াসে আওলাবী", আর অধিকাংশ আহলুল ইলমের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত যে তা দলিল।

{দ্বিতীয় শাখা} তাঁর কথা (কাফিরকে কি দেখতে যাওয়া হবে) — এর উত্তর:— যুদ্ধরত কাফিরকে (কাফির হারবী) কখনোই দেখতে যাওয়া হবে না। কারণ রোগী দেখতে যাওয়া সদয়তা ও ইহসানের অন্তর্ভুক্ত, অথচ আমাদের রব জাল্লা ওয়া আলা আমাদেরকে সেই ব্যক্তির প্রতি সদয়তা ও ইহসান থেকে নিষেধ করেছেন যে দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

﴿ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارکم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ﴾

> "আল্লাহ কেবল তাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে তোমাদের নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করেছে। আর যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো যালিম।" (সূরা আল-মুমতাহিনা: ৯)

আর যিম্মী, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত (মুস্তামিন) ও চুক্তিবদ্ধ (মুআহাদ) কাফিরের ক্ষেত্রে — তাদেরকে দেখতে যাওয়া হবে, যদি এর দ্বারা ইসলাম দ্বারা তাদের উপকৃত হওয়ার আশা থাকে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে। এর দলিল

হলো বুখারী ও অন্যরা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে যা বর্ণনা করেছেন — ইহুদিদের একটি বালক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তখন নবী ﷺ তাকে দেখতে এলেন এবং তার মাথার কাছে বসলেন। তারপর তাকে বললেন ((أسلم)) "তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।" সে তার পিতার দিকে তাকাল, যিনি তার মাথার কাছেই ছিলেন। তার পিতা তাকে বললেন:— আবুল কাসিমের আনুগত্য করো। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর নবী ﷺ উঠে দাঁড়ালেন, আর তিনি বলছিলেন ((الحمد لله الذي أنقذه بي من النار)) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মাধ্যমে তাকে আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" আরও দলিল হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ব্যাপকতা:—

﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা আল-মুমতাহিনা: ৮)

আর সাক্ষাৎ করা সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

{তৃতীয় শাখা} তাঁর কথা (রোগী দেখতে যাওয়ার সুন্নত কী) — এর উত্তর:— এতে সুন্নত হলো:—

প্রথমত:— সে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, বলবে:— "কেমন বোধ করছ?" কেননা নবী ﷺ যখন কোনো রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন তাকে বলতেন ((كيف تجدك)) "তুমি নিজেকে কেমন পাচ্ছ?"

দ্বিতীয়ত:— সে তার জন্য শিফা ও সুস্থতার দুআ করবে — এমন কণ্ঠে যা রোগী শুনতে পায়, যাতে সে তাতে আমীন বলতে পারে। সহীহাইনে সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাসের হাদীসে রয়েছে যে, নবী ﷺ যখন তাঁকে দেখতে গেলেন, তখন তাঁর জন্য দুআ করলেন এবং বললেন:—

اللهم اشف سعداً وأتم له هجرته

"হে আল্লাহ, সাদকে আরোগ্য দান করুন এবং তার হিজরত পূর্ণ করে দিন।"

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:—

من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض

"যে ব্যক্তি এমন কোনো রোগীকে দেখতে যায় যার মৃত্যুর সময় এখনো উপস্থিত হয়নি, এবং তার কাছে সাতবার বলে:— 'আমি মহান আল্লাহ, মহান আরশের রবের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করেন' — তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সেই রোগ থেকে সুস্থ করে দেবেন।" — "আবু দাউদ ও নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ উত্তম"।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—

إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً, أو يمشي لك في جنازة

"যখন কোনো ব্যক্তি রোগী দেখতে আসে, সে যেন বলে:— 'হে আল্লাহ, আপনার বান্দাকে আরোগ্য দান করুন, যাতে সে আপনার জন্য কোনো শত্রুকে আঘাত করতে পারে, কিংবা আপনার জন্য কোনো জানাযায় হেঁটে যেতে পারে।'" — "সহীহ হাদীস"।

তৃতীয়ত:— সে তাকে কল্যাণ ও প্রতিদানের সুসংবাদ দেবে। উম্মুল আলা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন — আমি অসুস্থ থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন, তারপর বললেন:—

أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة

"হে উম্মুল আলা, সুসংবাদ গ্রহণ করো; কেননা মুসলিমের রোগের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ দূর করে দেন, যেমন আগুন সোনা ও রুপার ময়লা দূর করে দেয়।" — "সহীহ হাদীস"।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জ্বরে আক্রান্ত এক রোগীকে দেখতে গেলেন, তারপর বললেন: —

أبشر فإن الله تعالى يقول: هي أي الحمى ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة

"সুসংবাদ গ্রহণ করো; কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন:— এটি — অর্থাৎ জ্বর — আমার আগুন, আমি তা দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার ওপর চাপিয়ে দিই, যাতে তা আখিরাতে আগুন থেকে তার অংশ হয়ে যায়।" — "ইবনু মাজাহ সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন"।

চতুর্থত:— সে তাকে শরঈ ও সহীহ ওয়ার্দ (নিয়মিত পঠিত যিকির), তাআবীয (আশ্রয়প্রার্থনার বাক্য) ও দুআ দিয়ে রুকইয়াহ করবে। এর দলিল আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস; তিনি বলেন:— নবী ﷺ আমাকে দেখতে এলেন, তারপর আমাকে বললেন ((ألا أرقيك برقيةٍ جاءني بها جبرائيل)) "আমি কি তোমাকে এমন এক রুকইয়াহ দিয়ে রুকইয়াহ করব না, যা জিবরাঈল আমার কাছে নিয়ে এসেছেন?" আমি বললাম:— অবশ্যই, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বললেন:—

باسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داءٍ فيك, من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسدٍ إذا حسد

"আল্লাহর নামে আমি তোমাকে রুকইয়াহ করছি; আল্লাহ তোমাকে তোমার ভেতরকার প্রতিটি রোগ থেকে আরোগ্য দান করবেন — গিঁটে ফুঁ দেওয়া নারীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

— তিনবার। "এই হাদীসে কথা রয়েছে (সনদে সমালোচনা আছে)"। আর মুসলিম তাঁর সহীহতে আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন ((يا محمد اشتكيت؟)) "হে মুহাম্মাদ, আপনি কি অসুস্থ?" তিনি বললেন ((نعم)) "হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন:—

باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفسٍ أو عين

حاسدٍ الله يشفيك, باسم الله أرقيك

"আল্লাহর নামে আমি আপনাকে রুকইয়াহ করছি — এমন প্রতিটি জিনিস থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রতিটি প্রাণের অনিষ্ট থেকে অথবা হিংসুকের চোখের অনিষ্ট থেকে; আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নামে আমি আপনাকে রুকইয়াহ করছি।"

আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পঞ্চমত:— সে রোগীর মাথার কাছে বসবে, যদি তা তার জন্য সহজ হয়। কেননা নবী ﷺ যখন সেই ইহুদি বালকটিকে দেখতে গেলেন, তখন তিনি ((قعد عند رأسه)) "তার মাথার কাছে বসেছিলেন।" এতে রোগীর জন্য স্বস্তি ও সঙ্গ-প্রদান রয়েছে, এবং তা তার অধিকতর নিকটবর্তী — যাতে উঁচু কণ্ঠে কথা বলার দ্বারা সে কষ্ট না পায়, এবং রুকইয়াহর জন্যও তা অধিকতর সহজ।

ষষ্ঠত:— সে তাকে ধৈর্যের অপরিহার্যতা এবং ধৈর্যশীলদের সওয়াবের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে; কারণ দলিলসমূহ এ ব্যাপারে ব্যাপক, এবং কারণ এটিই এর যথাযথ স্থান।

সপ্তমত:— সে যদি তার মধ্যে অসন্তোষ (তাসাখখুত) শুনতে পায়, তবে তাকে তা থেকে নিষেধ করবে। কেননা নবী ﷺ এক নারীকে দেখতে গিয়ে তাকে বললেন ((مالكِ يا أم السائب (أو يا أم المسيب) تزفزفين؟)) "হে উম্মুস সাইব (অথবা হে উম্মুল মুসাইয়্যাব), তোমার কী হয়েছে, তুমি কাঁপছ কেন?" তিনি বললেন:— জ্বর, আল্লাহ তাতে বরকত না দিন! তখন তিনি বললেন:—

لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير

خبث الحديد

"তুমি জ্বরকে গালি দিয়ো না; কেননা তা আদম-সন্তানের গুনাহসমূহ দূর করে দেয়, যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।"

অষ্টমত:— তাকে মৃত্যু কামনা করা থেকে নিষেধ করা। কেননা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন অসুস্থ হলেন, নবী ﷺ তাঁকে দেখতে গেলেন; তখন আব্বাস মৃত্যু কামনা করলেন। তাই নবী ﷺ তাঁকে বললেন:—

يا عم لا تتمن الموت فإنك إن كنت محسناً فإن تؤخر تزداد

إحساناً إلى إحسانك خير لك, وإن كنت مسيئاً فإن تؤخر

فتستعتب من إساءتك خير لك فلا تتمن الموت

"হে চাচা, মৃত্যু কামনা করবেন না। কেননা আপনি যদি সৎকর্মশীল হন, তবে আপনার আয়ু বাড়ানো হলে আপনি আপনার ইহসানের সঙ্গে আরও ইহসান বাড়াতে পারবেন — এটি আপনার জন্য উত্তম। আর আপনি যদি মন্দকর্মশীল হন, তবে আয়ু বাড়ানো হলে আপনি আপনার মন্দ কাজ থেকে তওবা করে সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ পাবেন — এটিও আপনার জন্য উত্তম। সুতরাং মৃত্যু কামনা করবেন না।" — "হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন ও সহীহ বলেছেন, এবং যাহাবীও তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন"।

রোগী দেখতে যাওয়ার আট সুন্নত

- [ ] ১. অবস্থা জিজ্ঞাসা — তুমি নিজেকে কেমন পাচ্ছ?
- [ ] ২. শিফা ও সুস্থতার দুআ — রোগী শুনতে পায় এমন কণ্ঠে
- [ ] ৩. কল্যাণ ও প্রতিদানের সুসংবাদ দেওয়া
- [ ] ৪. শরঈ ও সহীহ বাক্য দিয়ে রুকইয়াহ করা
- [ ] ৫. সহজ হলে রোগীর মাথার কাছে বসা
- [ ] ৬. ধৈর্য ও ধৈর্যশীলদের সওয়াব স্মরণ করানো
- [ ] ৭. অসন্তোষ শুনলে নিষেধ করা
- [ ] ৮. মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা

প্রশ্ন ৬৭, তৃতীয় শাখা

আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

{চতুর্থ শাখা} তাঁর কথা (এটি বারবার করা কি মাশরূ) — এর উত্তর:— হ্যাঁ, তা বারবার করা মাশরূ, যদি তাতে রোগীর ওপর কোনো কষ্ট না হয়। বরং যাদের দেখতে যাওয়ায় রোগীর সজীবতা বৃদ্ধি পায়, তাদের ক্ষেত্রে বারবার যাওয়ার মুস্তাহাব হওয়া আরও জোরালো — বিশেষত যখন তার রোগ দীর্ঘ ও কঠিন হয়। এর দলিল হলো:—

أن سعداً لما أصيب يوم الخندق ضرب النبي عليه خيمة في

الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ،((

"সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন খন্দকের দিন আহত হলেন, তখন নবী ﷺ তাঁর জন্য মসজিদে একটি তাঁবু খাটালেন — যাতে কাছ থেকে তাঁকে দেখতে যেতে পারেন।"

এটি সহীহতে রয়েছে; অর্থাৎ যাতে সহজে অনবরত তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করতে পারেন। আর আবু দাউদ এই হাদীসের ওপর অধ্যায় বেঁধেছেন এই কথা বলে (বারবার রোগী দেখতে যাওয়া প্রসঙ্গে অধ্যায়)।

{পঞ্চম শাখা} তাঁর কথা (কোনো পরপুরুষের জন্য কি নারীকে দেখতে যাওয়া জায়েয) — এর উত্তর:— হ্যাঁ, পরপুরুষ হলেও — তবে শর্ত হলো নির্জনতা (খালওয়াত) না হওয়া, সেখানে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকা, নারী সৌন্দর্য-প্রদর্শনকারিণী (মুতাবাররিজা) না হওয়া কিংবা এমন অবস্থায় না থাকা যা তার কাছে পরপুরুষের প্রবেশের অনুমতি দেয় না, এবং ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা। এর দলিল হলো — নবী ﷺ উম্মুল আলাকে দেখতে গিয়েছিলেন। আর মালিক "আল-মুওয়াত্তা"-য় বর্ণনা করেছেন ((أن النبي عاد امرأة مسكينة مريضة)) "নবী ﷺ এক দরিদ্র অসুস্থ নারীকে দেখতে গিয়েছিলেন।" ইবনু আবদিল বার একে মুত্তাসিল সূত্রে সহীহ বলেছেন। আর নবী ﷺ উম্মুস সাইব অথবা উম্মুল মুসাইয়্যাবকে দেখতে গিয়েছিলেন — এটি জায়েয হওয়ার দলিল। এখন যদি তুমি বলো:— এটি নবী ﷺ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তবে আমি বলি:— না। কারণ কাওয়াইদে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, তাঁর ﷺ ক্ষেত্রে যে হুকুমই সাব্যস্ত হয়, তা অনুসারিতভাবে উম্মতের ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হয় — কেবল বিশেষত্বের দলিল থাকলে ভিন্ন কথা। আরও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, মূল বিধান হলো বিশেষত্ব না থাকা, যতক্ষণ না দলিল পাওয়া যায়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। তো এটিই এই প্রশ্নের উত্তরের সারসংক্ষেপ, তার দলিলসহ। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অবগত।

রোগী দেখতে যাওয়া: আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর
কোন রোগে দেখতে যাওয়া হবে	সব রোগে, সামান্য হলেও; মারাত্মক রোগে আরও জোরালো মুস্তাহাব
যুদ্ধরত কাফির (হারবী)	কখনোই দেখতে যাওয়া হবে না
যিম্মী, মুস্তামিন ও মুআহাদ কাফির	দাওয়াতের আশা থাকলে দেখতে যাওয়া হবে
বারবার যাওয়া	মাশরূ, রোগীর কষ্ট না হলে
পরপুরুষের পক্ষে নারীকে দেখতে যাওয়া	জায়েয — নির্জনতা, সন্দেহ ও ফিতনা না থাকলে এবং নারী সৌন্দর্য-প্রদর্শনকারিণী না হলে

প্রশ্ন ৬৭

প্রশ্ন ৬৮

নারীদের দুধের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা কি জায়েয? দলিল ও কারণ-ব্যাখ্যাসহ তা স্পষ্ট করুন?

উত্তর/ আমি বলি:— এই মাসআলাটি আধুনিক মাসআলাগুলোর একটি, এবং এ ব্যাপারে আহলুল ইলমের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। মতগুলো ও সেগুলোর দলিল পর্যালোচনার পর আমরা দেখতে পেয়েছি যে সঠিক মত হলো হারাম হওয়া। সুতরাং এই ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠা করা জায়েয নয় — কয়েকটি দিক থেকে:—

প্রথম:— দুধের ব্যাংক বহু মানুষকে হারাম হয়ে যাওয়ার (নিষিদ্ধতা সৃষ্টির) প্রক্রিয়ার দিকে ঠেলে দেবে; কারণ এতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। হতে পারে কোনো পুরুষ এমন নারীকে বিয়ে করে বসল যার দুধ সে পান করেছে, কিংবা যার মেয়ের দুধ, কিংবা যার মায়ের দুধ সে পান করেছে। এটি এক বিরাট অনিষ্ট, যা মিশ্রণ ও গোলযোগের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং সাদ্দে যারীআ (পথ রুদ্ধ করা)-র ভিত্তিতে তা নিষিদ্ধ করা হবে; আর কাওয়াইদে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সাদ্দে যারীআ এই শরীয়তের মূলনীতিগুলোর একটি।

দ্বিতীয়:— বংশ সংরক্ষণ সেই পাঁচটি অপরিহার্য বিষয়ের (দারূরিয়্যাতে খামসা) অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো নিয়ে শরীয়ত এসেছে। সুতরাং যে কারণই বংশ নষ্ট হওয়া ও মিশ্রিত হওয়ার দিকে নিয়ে যায়, এই অপরিহার্য বিষয়টি রক্ষার্থে তা অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে। আর তথাকথিত এই ব্যাংকগুলোর দুধ যে কোন নারীর দুধ তা জানা যায় না, এবং কোন শিশু তা পান করবে তাও আমরা জানি না। বংশ সংরক্ষণ ওয়াজিব, আর তার মিশ্রণ ও বিনাশ ঘটানো হারাম। কাওয়াইদে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যা ছাড়া হারাম বর্জন সম্পন্ন হয় না, তা বর্জন করা ওয়াজিব এবং তা করা হারাম।

তৃতীয়:— এই ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠা জায়েয বলার মধ্যে রয়েছে কল্পিত অনিষ্টের প্রতি লক্ষ রাখতে গিয়ে বাস্তবে সংঘটিত অনিষ্টের দিকে অগ্রসর হওয়া। কেননা শিশুর দুধপান তো একজন ধাত্রী ভাড়া করেও সম্ভব, যদি তার মা না থাকে; আর এ ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবী নারীর সংখ্যা অনেক। বরং শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মা না থাকলে এবং দুধদানকারিণী নারীও না মিললে মায়ের দুধের পরিবর্তে কৃত্রিম দুধ ব্যবহার করা সম্ভব; তা উদ্দেশ্য পূরণ করে — যদিও তা মায়ের দুধের স্থলাভিষিক্ত হয় না, তবু তা একটি ফাঁক পূরণ করে। এর ভিত্তিতে, এই ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো জরুরত নেই এবং মূলত কোনো হাজতও নেই। সুতরাং সেগুলোর দিকে অগ্রসর হওয়া মানে কল্পিত অনিষ্ট প্রতিহত করার জন্য বাস্তবে সংঘটিত অনিষ্টের দিকে অগ্রসর হওয়া; আর কাওয়াইদে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কল্পিত অনিষ্ট প্রতিহত করার জন্য বাস্তবে সংঘটিত অনিষ্টের দিকে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয় — এটি সুস্পষ্ট।

নারীদের দুধের ব্যাংক হারাম হওয়ার তিন কারণ

কারণ	ব্যাখ্যা
সাদ্দে যারীআ	কেউ দুধ-সম্পর্কীয় নিষিদ্ধ নারীকে বিয়ে করে বসতে পারে
বংশ সংরক্ষণ	দুধ কোন নারীর ও কোন শিশু পান করবে — অজানা
কল্পিত অনিষ্টের জন্য বাস্তব অনিষ্ট	ধাত্রী ভাড়া ও কৃত্রিম দুধ সম্ভব; জরুরত বা হাজত নেই

আহলুল ইলমের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন; লেখকের মতে সঠিক মত হারাম

এক নজরে

- ★ পুরুষের খাতনা ওয়াজিব; নারীর খাতনা সুন্নত ও মাকরুমা — লেখকের রাজিহ মত
- ★ কর্তিত অঙ্গ দাফন করা মাশরূ; অঙ্গ বিক্রি জায়েয নয়
- ★ অ্যানেস্থেশিয়ার মূল বিধান নিষেধ; জরুরত বা হাজতে ততটুকু
- ★ অবশ অবস্থায় স্বীকারোক্তি ও তালাক ধর্তব্য নয়; ছুটে যাওয়া সালাত দ্রুত কাযা
- ★ তাবীয, তিলিসমাত, হারাম প্রাণীর অংশ — ভিত্তিহীন ও নিষিদ্ধ চিকিৎসা
- ★ রোগী দেখতে যাওয়া ফরযে কিফায়া — লেখকের মত
- ★ নারীদের দুধের ব্যাংক হারাম — লেখকের মতে সঠিক মত

যাচাই করুন

1. পুরুষের খাতনা সম্পর্কে লেখকের রাজিহ মত কী?

ক. সুন্নত | খ. মুবাহ | গ. ওয়াজিব

2. মানুষের অঙ্গ বিক্রি সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. জায়েয | খ. প্রয়োজনে জায়েয | গ. জায়েয নয়

3. অবশ অবস্থায় রোগীর তালাক সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. পতিত হয় না — পাগল ও ঘুমন্তের মতো | খ. পতিত হয় | গ. অনুমতি থাকলে পতিত হয়

4. কর্তিত অঙ্গ সম্পর্কে কী মাশরূ বলা হয়েছে?

ক. ফেলে দেওয়া | খ. পুড়িয়ে ফেলা | গ. দাফন করা

5. রোগী দেখতে যাওয়ার হুকুম লেখকের মতে কী?

ক. মুবাহ | খ. সবসময় ফরযে আইন | গ. ফরযে কিফায়া

6. নারীদের দুধের ব্যাংক সম্পর্কে লেখকের মতে সঠিক মত কী?

ক. জায়েয | খ. মাকরূহ | গ. হারাম

উত্তর: ১-গ, ২-গ, ৩-ক, ৪-গ, ৫-গ, ৬-গ

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

দুগ্ধব্যাংক, কৃত্রিম দাঁত, ফার্মাসিস্টের দায় ও চিকিৎসাক্ষেত্রে ফিকহি কাওয়াইদের প্রয়োগ

চতুর্থ:— এই ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠার উপকারিতা হলো শিশুদের সাহায্য করা এবং নারীদের দুধ দ্বারা তাদের উপকার সাধন করা; কেননা উপকারিতার দিক থেকে কোনো কিছুই এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না, এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এর উত্তম সুফল রয়েছে। আর এটি মাসলাহাত (কল্যাণ) বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এগুলো প্রতিষ্ঠার পক্ষে অভিমত দেওয়ার মধ্যে রয়েছে একটি মাসলাহাত বাস্তবায়ন, আর এগুলো বাতিল করে এবং এর দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে অভিমত দেওয়ার মধ্যে রয়েছে এক বিরাট মাফসাদাত (অনিষ্ট) প্রতিহত করা — আর তা হলো বংশধারার মিশ্রণ, বিষয়গুলোর বিনষ্ট হয়ে যাওয়া এবং সমাজের বিপর্যয়। সুতরাং এগুলোর জায়েয হওয়ার পক্ষে অভিমতের মধ্যে রয়েছে একটি মাসলাহাত বাস্তবায়ন, আর জায়েয না হওয়ার পক্ষে অভিমতের মধ্যে রয়েছে মাফসাদাত প্রতিহত করা; আর কাওয়াইদে (মূলনীতিতে) এটি স্থিরীকৃত যে, মাফসাদাত প্রতিহত করা মাসলাহাত অর্জনের ওপর অগ্রগণ্য।

পঞ্চম:— এই ব্যাংকগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ও বাতিল করার পক্ষে অভিমত দেওয়ার মধ্যে যে মাফসাদাত রয়েছে তা এই শিশুটির দৈহিক গঠনের ওপর বর্তায়; আর এই মাফসাদাত কোনো বিরাট মাফসাদাত নয়, এবং তা পুরোপুরি নিশ্চিতও নয়। পক্ষান্তরে এগুলোর জায়েয হওয়া ও খুলে দেওয়ার পক্ষে অভিমত দেওয়ার মধ্যে যে মাফসাদাত রয়েছে তা গোটা সমাজের ওপরই বর্তায়। সুতরাং এখানে দুটি মাফসাদাত, যার একটি অপরটির চেয়ে বড়। আর উসূল ও কাওয়াইদে এটি স্থিরীকৃত যে, যখন দুটি মাফসাদাত পরস্পরবিরোধী হয়, তখন ছোটটিকে বরণ করে বড়টির প্রতি লক্ষ রাখা হয়; আর যখন দুটি ক্ষতি মুখোমুখি হয়, তখন হালকাটিকে বরণ করে কঠিনতরটির প্রতি লক্ষ রাখা হয়।

ষষ্ঠ:— এই ব্যাংকগুলো জায়েয না হওয়ার পক্ষে অভিমত দেওয়ার মধ্যে রয়েছে একটি বিশেষ মাফসাদাত — আর তা হলো সেই মাফসাদাত যা এই শিশুটির ওপর বর্তায়, যে দুধ পান করাবার মতো কাউকে পায় না। আর এগুলো জায়েয হওয়ার পক্ষে অভিমত দেওয়ার মধ্যে রয়েছে একটি সাধারণ মাফসাদাত — তার ওপরও এবং অন্যদের ওপরও। সুতরাং এখানে দুটি ক্ষতি: একটি সাধারণ, একটি বিশেষ। এগুলো জায়েয হওয়ার পক্ষে অভিমত একটি সাধারণ ক্ষতি ধারণ করে, আর এগুলো বন্ধ করে দেওয়া ও নিষিদ্ধ করার পক্ষে অভিমত একটি বিশেষ ক্ষতি ধারণ করে। আর কাওয়াইদে এটি স্থিরীকৃত যে, যখন সাধারণ ও বিশেষ দুটি ক্ষতি পরস্পরবিরোধী হয়, তখন সাধারণ ক্ষতি বিশেষ ক্ষতির ওপর অগ্রগণ্য (অর্থাৎ সাধারণ ক্ষতি দূর করাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়)।

সপ্তম:— এই ব্যাংকগুলো জায়েয হওয়ার পক্ষে অভিমত দেওয়ার মধ্যে রয়েছে সেই শিশুটির ওপর বর্তানো একটি মাসলাহাত, যে দুধ পান করাবার মতো কাউকে পায় না — সুতরাং এটি একটি ছোট মাসলাহাত। আর এগুলো নিষিদ্ধ করার পক্ষে অভিমত দেওয়ার মধ্যে রয়েছে গোটা সমাজের ওপর বর্তানো একটি মাসলাহাত — সুতরাং এতে রয়েছে একটি বড় মাসলাহাত। আর কাওয়াইদে এটি স্থিরীকৃত যে, যখন দুটি মাসলাহাত পরস্পরবিরোধী হয়, তখন ছোটটিকে হাতছাড়া করে বড়টির প্রতি লক্ষ রাখা হয়।

অষ্টম:— যাঁরা এই ব্যাংকগুলো খোলা জায়েয বলেছেন, তাঁরা কেবল শিশুটির মাসলাহাতের দিকেই তাকিয়েছেন; অথচ এই মাসলাহাতের অধিকাংশই দুধপানকারিণীদের দুধ ছাড়াই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তাঁরা তার ওপর থেকে ক্ষতি দূর করতে চান, কিন্তু তাঁরা এদিকে তাকাননি যে, এগুলো খোলা জায়েয বলার ফলে শিশুটির ওপর এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির ওপর আরেকটি ক্ষতি অবধারিত হয়ে গেল। আর কাওয়াইদে এটি স্থিরীকৃত যে, ক্ষতি দিয়ে ক্ষতি দূর করা যায় না, এবং এটিও স্থিরীকৃত যে, হালকা ক্ষতি কঠিনতর ক্ষতি দিয়ে প্রতিহত করা যায় না। আর তাঁরা শিশুটির জন্য যে মাসলাহাত বাস্তবায়ন করতে চান, তার কিছু অংশ কৃত্রিম দুধ দিয়ে বাস্তবায়িত হবে, আর স্বেচ্ছায় দুধপান করানোর মতো নারী পাওয়া গেলে তার দ্বারা, কিংবা ভাড়ায় নেওয়া দুধপানকারিণীর দ্বারা। আর উম্মতের মধ্যে এখনো বহু কল্যাণ

বিদ্যমান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। এতসব বিবেচনায়, তা'সীল (মূলে ফিরিয়ে দেখা) ও তাকঈদ (মূলনীতিতে বিন্যাস) সহকারে অভিমত হলো এই ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ হওয়ার অভিমত, কারণ এতে রয়েছে বিরাট সব মাফসাদাত। আর ভুলে যেয়ো না, বৃহৎ শরঈ কায়িদাটি বলে:— শরীয়তসমূহ এসেছে মাসলাহাতসমূহ সাব্যস্ত করতে ও তা পূর্ণ করতে, এবং মাফসাদাতসমূহ অকার্যকর করতে ও তা কমাতে। আর আমাদের রব আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

দুধের ব্যাংক: মাসলাহাত ও মাফসাদার তুলনা

যুক্তি	সিদ্ধান্ত
শিশুদের সাহায্য (মাসলাহাত) বনাম বংশধারার মিশ্রণ (মাফসাদাত)	মাফসাদাত প্রতিহত করা অগ্রগণ্য
বাতিলের মাফসাদা শিশুর দৈহিক গঠনে; খোলার মাফসাদা সমাজে	ছোটটি বরণ করে বড়টির প্রতি লক্ষ
বিশেষ ক্ষতি (শিশুর) বনাম সাধারণ ক্ষতি (সমাজের)	সাধারণ ক্ষতি দূর করা অগ্রগণ্য
ছোট মাসলাহাত (শিশুর) বনাম বড় মাসলাহাত (সমাজের)	বড়টির প্রতি লক্ষ রাখা
জায়েযের পক্ষের দৃষ্টি কেবল শিশুর মাসলাহাতে	বিকল্প আছে — কৃত্রিম দুধ, স্বেচ্ছাসেবী বা ভাড়ায় নেওয়া ধাত্রী

লেখকের অভিমত: এই ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ

প্রশ্ন ৬৯

দাঁতে সোনার আবরণ পরানোর ফিকহি হুকুম কী? এবং কোনো কোনো দাঁতের দৈর্ঘ্য বাকিগুলোর চেয়ে বেশি হলে সেগুলো সমান করে নেওয়ার হুকুম কী? আর কৃত্রিম দাঁতের পাটি লাগানোর হুকুম কী? পুরোনো দাঁতের বদলে নতুন দাঁত বসানো কি আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে? আর মৃত ব্যক্তিকে দাফনের আগে তার সোনার দাঁতগুলো কি খুলে নেওয়া হবে? এবং জীবদ্দশায় যেসব দাঁত লাগানো হয়েছিল, মৃত্যুর পর সেগুলো কি খুলে নেওয়া হবে? সংক্ষেপে বিষয়টি স্পষ্ট করুন?

উত্তর/ আমি বলি:— এ প্রশ্নে ছয়টি শাখা রয়েছে, তা নিম্নরূপ:—

{প্রথম শাখা} তাঁর কথা (দাঁতে সোনার আবরণ পরানোর হুকুম কী) — এর জবাব হলো:— অবস্থা দুটি সম্ভাবনার বাইরে নয়: হয় তা নারীর ক্ষেত্রে, নয়তো পুরুষের ক্ষেত্রে। যদি তা নারীর ক্ষেত্রে হয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই — প্রয়োজনেই হোক বা সৌন্দর্যের জন্যই হোক, সবই তার জন্য জায়েয; বিশেষত যদি তা তার জাতির প্রচলিত রীতি হয়। কেননা আলিমগণ স্থির করেছেন যে, সোনা ও রুপার যা পরার প্রচলন রয়েছে তা নারীর জন্য জায়েয; এবং আল্লাহ তাআলার বাণীর ব্যাপকতার কারণেও — ﴿أومن ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾ (যে অলংকারের মধ্যে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে স্পষ্ট বক্তব্য দিতে অক্ষম — সূরা যুখরুফ: ১৮)। আর যদি তা পুরুষ হয়, তবে অবস্থা দুটি সম্ভাবনার বাইরে নয়: হয় তা দাঁত শক্ত করে বাঁধার প্রয়োজনের (দারূরাত) দিক থেকে, নয়তো নিছক সৌন্দর্যচর্চার দিক থেকে। যদি তা নিছক সৌন্দর্যচর্চার দিক থেকে হয়, তবে তা জায়েয নয় — কারণ ইমাম আহমাদ ও সুনানের সংকলকগণ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে যা বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু হিব্বান ও হাকিম যা সহীহ বলেছেন, তাতে রয়েছে যে, নবী ﷺ রেশম ও সোনা হাতে নিয়ে বললেন ((هذان حرام على ذكور أمتي, حل لإناثهم)) — "এ দুটি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম, তাদের নারীদের জন্য হালাল।" আর যদি তা দাঁত শক্ত করা ও বাঁধার প্রয়োজনের দিক থেকে হয়, তবে যে পরিমাণে প্রয়োজন দূর হয় সে পরিমাণে জায়েয। সুতরাং দারূরাতের সময়, কিংবা দারূরাতের মর্যাদায় নামিয়ে আনা হাজত (বিশেষ প্রয়োজন)-এর সময় পুরুষের জন্য তার দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধা ও তাতে সোনার আবরণ পরানো জায়েয — দলিল হিসেবে আরফাজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর

হাদীস, ((فاتخذ أنفاً من ذهب, أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه)) — "কুলাব-এর দিনে তাঁর নাক কেটে যায়, ফলে তিনি রুপার একটি নাক বানিয়ে নেন; তাতে দুর্গন্ধ ধরে গেলে তিনি সোনার একটি নাক বানিয়ে নেন।" আর এ কারণেও যে, সোনার একটি বিশেষত্ব রয়েছে — তা মুখের ভেতরে মরিচা ধরে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

{দ্বিতীয় শাখা} তাঁর কথা (কোনো কোনো দাঁত বাড়তি হলে সেগুলো সমান করে নেওয়া কি জায়েয) — এর জবাব হলো:— তা জায়েয, যদি তা নতুন করে সৃষ্ট ত্রুটি দূর করার দিক থেকে হয়। আর যদি সেগুলোর দৈর্ঘ্য তার মালিককে কষ্ট দেয়, তবে যতটুকু দিয়ে কষ্ট ও ক্ষতি দূর হয় ততটুকু সে দূর করবে; কারণ শরীয়তে এটি স্থিরীকৃত যে, ক্ষতি দূর করা হয়। আর এটি দাঁত ঘষে সরু করা কিংবা দাঁতের মাঝে ফাঁক তৈরি করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার অন্তর্ভুক্ত নয়; কেননা এই বাড়তি দাঁতের মালিক সৌন্দর্যচর্চার উদ্দেশ্য করে না, বরং সে এর দ্বারা ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্য করে — আর তা জায়েয।

{তৃতীয় শাখা} তাঁর কথা (কৃত্রিম পাটি লাগানোর হুকুম কী) — এর জবাব হলো:— এতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ তা মুবাহ বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করার অন্তর্ভুক্ত। আর হাদীসে রয়েছে ((تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً)) — "তোমরা চিকিৎসা করো, কেননা আল্লাহ এমন কোনো রোগ রাখেননি যার জন্য তিনি ওষুধ রাখেননি।" আর এটি চিকিৎসারই একটি প্রকার। সুতরাং চিকিৎসার আদেশদাতা ও তা জায়েযকারী সাধারণ দলিলগুলো তাদের ব্যাপকতা দ্বারা এটির জায়েয হওয়া বুঝিয়ে দেয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

{চতুর্থ শাখা} তাঁর কথা (এটি কি আল্লাহর সৃষ্টি পাল্টে দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত) — এর জবাব হলো:— না, এটি আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ﴾ (আর অবশ্যই আমি তাদের আদেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করবে — সূরা নিসা: ১১৯)-এ উল্লিখিত "আল্লাহর সৃষ্টি পাল্টে দেওয়া"র অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এটি কৃত্রিম অঙ্গ — যেমন হাত বা পা — সংযোজনের মতোই; তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এবং এটি তাঁর বাণী ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله...الآية ﴾ (আল্লাহর ফিতরাত, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই...আয়াত — সূরা রূম: ৩০)-এর অন্তর্ভুক্তও নয়, কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলাম। মোটকথা, আক্রান্ত বা ত্রুটিযুক্ত দাঁতের চিকিৎসা এমন কিছু দিয়ে করতে কোনো অসুবিধা নেই যা তার ক্ষতি দূর করে; এবং প্রয়োজন হলে সেগুলো তুলে ফেলে তার জায়গায় কৃত্রিম দাঁত বসাতেও কোনো অসুবিধা নেই — কারণ এটি ক্ষতি দূর করার জন্য মুবাহ চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত, এবং সৃষ্টি পাল্টে দেওয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আর আমাদের রব আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

{পঞ্চম শাখা} তাঁর কথা (মৃত ব্যক্তির দাঁত যদি সোনার হয় তবে কি তা খুলে নেওয়া হবে) — এর জবাব হলো:— হ্যাঁ, এই দাঁতগুলো খুলে নেওয়া হবে; কারণ তা এমন সম্পদ যার হকদার উত্তরাধিকারী, এবং মৃতদের চেয়ে জীবিতরাই এই সোনার অধিক মুখাপেক্ষী। আর তাঁর ব্যাপক বাণীর কারণেও ((من ترك مالاً فلورثته)) — "যে সম্পদ রেখে যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের।" আর জীবদ্দশায় নিছক তা সংযোজন করে নেওয়া সেগুলোকে মূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্মান-মর্যাদা দিয়ে দেয় না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

{ষষ্ঠ শাখা} তাঁর কথা (সাধারণ কৃত্রিম দাঁতগুলো কি খুলে নেওয়া হবে) — এর জবাব হলো:— যা আগে অতিবাহিত হলো তা থেকেই জানা যায় যে, এই কৃত্রিম দাঁতগুলোও এক প্রকার সম্পদ, যা থেকে জীবিতরা উপকৃত হতে পারে। সুতরাং সেগুলো খুলে নিতে কোনো অসুবিধা নেই — এই শর্তে যে, সেগুলোর মূল্য থাকতে হবে এবং আশপাশের অংশে প্রভাব না ফেলে সেগুলো খুলে নেওয়া সম্ভব হতে হবে। এই শর্তগুলো পূরণ হলে তা জায়েয, কারণ তা এক প্রকার সম্পদ যা দ্বারা জীবিতরা উপকৃত হয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

দাঁত সংক্রান্ত হুকুম

বিষয়	হুকুম
নারীর দাঁতে সোনার আবরণ	জায়েয — প্রয়োজনে বা সৌন্দর্যে, বিশেষত প্রচলিত রীতি হলে
পুরুষের নিছক সৌন্দর্যের জন্য সোনা	জায়েয নয় — সোনা পুরুষদের জন্য হারাম
পুরুষের দাঁত বাঁধার দারূরাত বা হাজত	জায়েয, যতটুকুতে প্রয়োজন দূর হয়
বাড়তি দাঁত সমান করা	জায়েয, ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে; দাঁত ঘষে সরু করা বা ফাঁক তৈরি করা থেকে ভিন্ন
কৃত্রিম দাঁতের পাটি	কোনো অসুবিধা নেই — মুবাহ বস্তু দিয়ে চিকিৎসা; সৃষ্টি পরিবর্তন নয়
মৃত ব্যক্তির সোনার দাঁত	খুলে নেওয়া হবে — উত্তরাধিকারীদের সম্পদ
সাধারণ কৃত্রিম দাঁত	খুলে নিতে অসুবিধা নেই — মূল্য থাকলে এবং আশপাশে প্রভাব না ফেললে

প্রশ্ন ৬৯

প্রশ্ন ৭০

চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার উদ্দেশ্যে নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া সফর করা কি জায়েয? আর চিকিৎসাশাস্ত্র পড়া যদি তার জন্য সহশিক্ষা (নারী-পুরুষের মেলামেশা) অপরিহার্য করে তোলে, তবে তার হুকুম কী? এবং চিকিৎসাজগতের নতুন বিষয়ে জানার জন্য চিকিৎসাসংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থিত হওয়া কি জায়েয?

উত্তর/ আমি বলি:— এ প্রশ্নে তিনটি শাখা রয়েছে:—

{প্রথম শাখা} মাহরাম ছাড়া নারীর সফরের কথা — তা কোনোভাবেই জায়েয নয়, হাদীসের ব্যাপকতার কারণে ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)) — "যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, তার জন্য মাহরাম ছাড়া একদিন-একরাতের দূরত্ব সফর করা হালাল নয়।" এটি সহীহ গ্রন্থে রয়েছে। আর এই সফরের কোনো দারূরাতও নেই; উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জনের জন্য ইসলামি দেশগুলোতে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াই যথেষ্ট — আমি বলতে চাচ্ছি এই নারীর নিজ দেশেই। আর নারীর জন্য উচিত নয় যে সে পড়াশোনা কিংবা অন্য কোনো কিছুর জন্য শারীর (শরীয়তপ্রণেতা) -এর আদেশের বিরোধিতা করবে; দুনিয়ায় তার আমল সম্পর্কে সে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। আর যে নারী এ ব্যাপারে বিরোধিতা করল, সে নিজেকে তার রব আয্যা ওয়া জাল্লার শাস্তির সম্মুখে ঠেলে দিল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

{দ্বিতীয় শাখা} সহশিক্ষার কথা — তা সর্বাবস্থায় জায়েয নয়, কারণ এতে রয়েছে ফিতনা এবং নিশ্চিত মাফসাদাত। সুতরাং যুবতীর জন্য সহশিক্ষায় পড়াশোনা করা জায়েয নয়; এবং মূলত এমন কোনো বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করাও তার জন্য জায়েয নয় যেখানে পুরুষরা পাঠদানের দায়িত্বে থাকে — যদি তাদের পাঠদান মুখোমুখি হয়; কারণ এতে রয়েছে মন্দ পরিণাম।

{তৃতীয় শাখা} সেমিনারে উপস্থিত হওয়ার কথা — যদি বক্তা নারীদের মধ্য থেকে হন এবং বাকি উপস্থিত সবাই নারী হয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি উপস্থিতি মিশ্র হয়, তবে ফিতনা প্রতিহত করতে ও বিপর্যয় দূর করতে তার উপস্থিত হওয়া জায়েয নয়; আর এর জন্য কোনো দারূরাতও নেই। কেননা দায়িত্বশীলরা যদি বিষয়টি সহজ করতে

চান, তবে খুব সহজেই সম্ভব যে তাঁরা নারীদের জন্য এমন বক্তৃতা নির্ধারণ করবেন যেখানে পুরুষ থাকবে না, আর পুরুষদের জন্য এমন বক্তৃতা যেখানে নারী থাকবে না। এটিও সম্ভব যে, মিশ্র বক্তৃতাগুলো রেকর্ড করে তা থেকে উপকৃত হওয়া যাবে, কিংবা ইন্টারনেটে তা অনুসরণ করা যাবে; এবং এ বিষয়ে যেসব প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও প্রতিবেদন লেখা হয় তা অনুসরণ করা যাবে। মেলামেশার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই; কেননা পুরুষরা যতদিন নারীদের থেকে দূরে থাকবে, উম্মত ততদিন কল্যাণেই থাকবে। আর আমরা যেন অন্যদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। আল্লাহই সাহায্যপ্রার্থনার স্থল, এবং তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

নারীর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন

করুন

- ✓ বক্তা নারী ও সব উপস্থিত নারী হলে কোনো অসুবিধা নেই
- ✓ মিশ্র বক্তৃতার রেকর্ড, ইন্টারনেট ও প্রবন্ধ থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব

করবেন না

- ✗ চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে মাহরাম ছাড়া সফর — কোনোভাবেই জায়েয নয়
- ✗ সহশিক্ষা — সর্বাবস্থায় জায়েয নয়
- ✗ মিশ্র সেমিনারে উপস্থিত হওয়া — জায়েয নয়

প্রশ্ন ৭০

প্রশ্ন ৭১

কোন কোন অবস্থায় ফার্মাসিস্ট (ওষুধ প্রস্তুত ও বিতরণকারী) দায়ী (যামিন) হবেন?

উত্তর/ আমি বলি:— লেখার সময় আমার স্মরণে যা আসছে তা নিম্নরূপ:—

প্রথম:— যদি সে এই পেশা সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, তবে তার হাত যা অপরাধ ঘটাবে তার জন্য সে দায়ী হবে — চিকিৎসকের ওপর কিয়াস করে, এবং তাঁর ব্যাপক বাণীর কারণে ((من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن)) — "যে চিকিৎসা করল, অথচ ইতঃপূর্বে তার চিকিৎসাজ্ঞান জানা ছিল না, সে দায়ী।"

দ্বিতীয়:— যদি সে রোগীর অভিযোগ শোনামাত্রই নিজের পক্ষ থেকে ওষুধ দিয়ে দেয়, তবে এর ওপর যেসব প্রভাব সৃষ্টি হবে তার জন্য সে দায়ী হবে। তবে এটি শর্তযুক্ত — যদি ওষুধটি এমন হয় যা রোগের সঙ্গে না মিললে ক্ষতি হয়। আর যেসব ওষুধ সাধারণত চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই দেওয়া হয় — যেমন প্যানাডল (البندول) ও এ জাতীয় ওষুধ — সেগুলোর প্রভাবে যা ঘটে তার জন্য তার ওপর কোনো দায় নেই, কারণ প্রথা বিধান-নির্ধারক (আল-আদাতু মুহাক্কামাহ)।

তৃতীয়:— যদি সে চিকিৎসাপত্রে লিখিত ওষুধটি বদলে দিয়ে অন্য একটি ওষুধ দেয়, নিজের ইজতিহাদে এই মনে করে যে সেটি উপাদান ও প্রভাবের দিক থেকে ওটির মতোই — কারণ এটি অবহেলা ও সীমালঙ্ঘন।

চতুর্থ:— যদি সে নিজের ইজতিহাদে ওষুধ সেবনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যদি রোগীর জন্য লেখেন যে সে এই ওষুধটি দিনে তিনবার সেবন করবে, আর ফার্মাসিস্ট ইজতিহাদ করে একবার বা তার বেশি বাড়িয়ে দিল, ফলে ক্ষতি ঘটল — তবে ফার্মাসিস্ট দায়ী হবে, কারণ সে এই বাড়ানোর ক্ষেত্রে অবহেলা করেছে এবং এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে যা তার এখতিয়ারভুক্ত নয়।

পঞ্চম:— যদি সে চিকিৎসকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ওষুধটির স্বরূপ নির্ণয়ে ভুল করে — যেমন ভুলবশত তার হাত নির্ধারিত ওষুধ ছাড়া অন্য ওষুধের দিকে চলে গেল — তবে এ অবস্থায় যে ক্ষতি ঘটবে তার জন্য সে দায়ী হবে।

ষষ্ঠ:— যদি সে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ওষুধের সংমিশ্রণে (তরকীব) ভুল করে। কেননা কিছু ওষুধের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় সংমিশ্রণ প্রয়োজন হয়, যা চিকিৎসক নির্ধারণ করে দেন। সুতরাং ফার্মাসিস্ট যদি এই ওষুধের সংমিশ্রণে ভুল করে এবং ক্ষতি ঘটে, তবে সে তার জন্য দায়ী হবে। এগুলোই সেই অবস্থাগুলো যা লেখার এই মুহূর্তে আমার স্মরণে আসছে। আর আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

ফার্মাসিস্ট কখন দায়ী

- [ ] ১. পেশায় অজ্ঞ হলে
- [ ] ২. অভিযোগ শুনেই এমন ওষুধ দিলে, যা রোগের সঙ্গে না মিললে ক্ষতি হয়
- [ ] ৩. ব্যবস্থাপত্রের ওষুধ বদলে নিজের ইজতিহাদে অন্য ওষুধ দিলে
- [ ] ৪. নিজের ইজতিহাদে ওষুধের মাত্রা বাড়ালে
- [ ] ৫. চিকিৎসকের নির্ধারিত ওষুধ চিনতে ভুল করলে
- [ ] ৬. ওষুধের সংমিশ্রণে ভুল করলে

ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই সাধারণত দেওয়া ওষুধের প্রভাবে (যেমন প্যানাডল) দায় নেই — প্রথা বিধান-নির্ধারক

প্রশ্ন ৭২

স্থায়ী কমিটিকে (আল-লাজনাতুদ দাইমা) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আফিম দিয়ে চিকিৎসা করার হুকুম সম্পর্কে, এবং এমন অন্যান্য পানীয় সম্পর্কে যেগুলোতে মদের কিছু অংশ থাকে — যেমন সিরকা?

উত্তর/ তাঁরা উত্তরে বলেছেন:

لا يجوز التداوي بما حرم الله تعالى من أفيونٍ أو حشيشة أو خمر أو نحو ذلك من مخدرٍ أو مسكرٍ ووضع نسبة من ذلك في الدواء لا يجوز لكن إن وضعت فيه ولم تصل بالدواء إلى درجة أن يسكر كثيره جاز التداوي به لعدم التأثير مع ما أضيف إليه منها فكأنه كالعدم, أما الخل إذا لم يكن أصله خمراً أو كان أصله خمراً وتخلل بنفسه فليس بمخدر ولا مسكر فيجوز

التداوي به وتناوله إداماً أو مع الطعام, وإن كان أصله خمراً وتخلل بصناعةٍ فلا يجوز إحداث ذلك فيه ولا الانتفاع به دواءً ولا إداماً

"আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন — আফিম, গাঁজা, মদ কিংবা এ জাতীয় কোনো মাদক বা নেশাদ্রব্য — তা দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয নয়। এবং ওষুধের মধ্যে এসবের কোনো অংশ মেশানোও জায়েয নয়। কিন্তু যদি তা এতে মেশানো হয়ে যায় এবং ওষুধটিকে এই মাত্রায় না পৌঁছায় যে তার অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তবে তা দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয — কারণ এর সঙ্গে যা মেশানো হয়েছে তার প্রভাব নেই; ফলে তা যেন অস্তিত্বহীনের মতোই। আর সিরকার ব্যাপারে: যদি এর মূল মদ না হয়, কিংবা এর মূল মদ হয়ে থাকে কিন্তু তা নিজে নিজেই সিরকায় পরিণত হয়ে থাকে, তবে তা মাদকও নয়, নেশাদ্রব্যও নয়; সুতরাং তা দিয়ে চিকিৎসা করা এবং তা তরকারি হিসেবে বা খাবারের সঙ্গে গ্রহণ করা জায়েয। আর যদি এর মূল মদ হয় এবং কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় তা সিরকায় পরিণত করা হয়, তবে এতে এমনটি ঘটানো জায়েয নয়, এবং ওষুধ হিসেবেও তা কাজে লাগানো জায়েয নয়, তরকারি হিসেবেও নয়।" — উদ্ধৃতি শেষ।

এটি তাঁদেরই কথা; আল্লাহ আখিরাতে তাঁদের মর্যাদা ও অবস্থান উন্নীত করুন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ৭৩

স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আতরওয়ালা-ভেষজ বিক্রেতাদের দোকানে যে (المر) [মুর — গন্ধরস] পাওয়া যায়, তা চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা সম্পর্কে? এবং যে ঘরে (المر) থাকে সে ঘরে কি ফেরেশতা প্রবেশ করেন না?

উত্তর/ তাঁরা উত্তরে বলেছেন:

المر الذي في دكاكين بعض العطارين حلال لأن الأصل حله ولا نعلم دليلاً يحرمه وأما هذا القول الذي حكيته عن بعض الناس أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه مر فلا نعلم له أصلاً بل هو باطل

"কোনো কোনো আতরওয়ালার দোকানে যে মুর থাকে তা হালাল, কারণ মূলনীতি হলো এর হালাল হওয়া; এবং আমরা এমন কোনো দলিল জানি না যা একে হারাম করে। আর কিছু মানুষের কাছ থেকে তুমি যে কথাটি বর্ণনা করেছ যে, যে ঘরে (মুর) থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না — এর কোনো ভিত্তি আমরা জানি না; বরং তা বাতিল।" — উদ্ধৃতি শেষ।

এটি তাঁদেরই কথা; আল্লাহ আখিরাতে তাঁদের মর্যাদা ও অবস্থান উন্নীত করুন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ৭৪

শাইখ আবদুল আযীয রহিমাহুল্লাহু তাআলাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এমন এক চিকিৎসক সম্পর্কে, যাঁর কাছে নেশাদ্রব্য সেবনকারী কিছু রোগী যাতায়াত করে — তিনি কি তাদের ব্যাপারে রিপোর্ট করবেন? নাকি কী করবেন?

উত্তর/ তিনি উত্তরে বলেছেন:— তোমার ওপর কর্তব্য নসীহত। তুমি তাদের নসীহত করবে, তাওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে, তাদের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে তাদের সাহায্য করবে, এবং তাদের জানাবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন; আর এসব গুনাহে ফিরে যাওয়া থেকে তাদের সতর্ক করবে — আল্লাহ সুবহানাহুর বাণীর কারণে ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ (মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু; তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে — সূরা তাওবা: ৭১), এবং তাঁর সুবহানাহুর বাণী ﴿ والعصر, إن الإنسان لفي خسر, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ (সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে; তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে — সূরা আসর: ১-৩), এবং তাঁর ﷺ বাণী ((الدين النصيحة)) — "দ্বীন হলো নসীহত", এবং নবী ﷺ-এর বাণী ((من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)) — "যে কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখল, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।" — "এ দুটিই ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহতে বর্ণনা করেছেন।" আল্লাহই তাওফীকের অভিভাবক। — উদ্ধৃতি শেষ।

স্থায়ী কমিটি ও ইবনু বাযের ফতোয়া

বিষয়	ফতোয়া
আফিম, গাঁজা, মদ বা মাদক দিয়ে চিকিৎসা; ওষুধে মেশানো	জায়েয নয়
মেশানো হয়ে গেছে, কিন্তু অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে না	চিকিৎসা জায়েয — প্রভাবহীন, অস্তিত্বহীনের মতো
সিরকা — মূল মদ নয়, বা নিজে নিজেই সিরকা হয়েছে	জায়েয
সিরকা — মূল মদ, কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় সিরকা	জায়েয নয় — ওষুধ বা তরকারি হিসেবেও নয়
মুর (গন্ধরস)	হালাল; ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ না করার কথা ভিত্তিহীন ও বাতিল
নেশাদ্রব্যসেবী রোগী ও চিকিৎসকের করণীয়	নসীহত, তাওবায় উদ্বুদ্ধ করা, দোষ গোপন রাখা

প্রশ্ন ৭২, ৭৩ ও ৭৪

এটি তাঁরই কথা; আল্লাহ ফিরদাউসে আ'লায় তাঁর মর্যাদা ও অবস্থান উন্নীত করুন এবং সর্বশক্তিমান অধিপতির নিকট সত্যের আসনে, জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মাঝে আমাদের তাঁর সঙ্গে একত্র করুন। আর আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ৭৫

(لا ضرر ولا ضرار) — "ক্ষতি করা যাবে না, পাল্টা ক্ষতিও করা যাবে না" — এই কায়িদা থেকে চিকিৎসাক্ষেত্রে কীভাবে উপকার নেওয়া যায়?

উত্তর/ আমি বলি:— এই কায়িদার ওপর ফিকহি শাখা-প্রশাখা অত্যন্ত বেশি। এর অন্তর্ভুক্ত হলো:—

- জাদু নিষিদ্ধ হওয়া, কারণ এতে রয়েছে ক্ষতি এবং অন্যের প্রতি ক্ষতিসাধন।
- ভেজাল ওষুধ ক্রয়-বিক্রয় এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ এতে রয়েছে ক্ষতি এবং অন্যের প্রতি ক্ষতিসাধন।
- হাজত ও দারূরাত ছাড়া পুরুষ কর্তৃক নারীর চিকিৎসা এবং নারী কর্তৃক পুরুষের চিকিৎসা এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ এতে রয়েছে নিশ্চিত ক্ষতি এবং সতর উন্মোচন, ফিতনা ও দ্বীন-চরিত্রের বিপর্যয়ের সুস্পষ্ট মাফসাদাত। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে কোনো অসুবিধা নেই।
- এমন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা এর অন্তর্ভুক্ত, যার কোনো দারূরাত নেই এবং যার দিকে ডাকে এমন কোনো হাজতও নেই — কারণ এতে রয়েছে নিশ্চিত ক্ষতি।
- চিকিৎসকের দুশ্চরিত্রতার কারণে, কিংবা তার ও রোগীর মধ্যে পূর্বের কোনো প্রতিহিংসা বা বিবাদ থাকার কারণে কোনো কোনো রোগীর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া এর অন্তর্ভুক্ত।
- এমন ময়নাতদন্ত এর অন্তর্ভুক্ত, যার দিকে হাজত বা দারূরাত ডাকে না — কারণ তা কোনো ন্যায্য কারণ ছাড়াই মৃতের সম্মান লঙ্ঘন, আর ক্ষতি করা যাবে না, পাল্টা ক্ষতিও করা যাবে না।
- শরীয়তে যা হারাম তা দিয়ে চিকিৎসা করা এর অন্তর্ভুক্ত।
- দারূরাত ও হাজত ছাড়াই রোগীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কে চিকিৎসকের মিথ্যা বলা এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ এতে রয়েছে ক্ষতি ও ক্ষতিসাধন।
- সাহায্যের অজুহাতে নার্সদের মধ্যে যাদের সঙ্গে নির্জনতা তার জন্য হালাল নয় তাদের সঙ্গে চিকিৎসকের নির্জনবাস এর অন্তর্ভুক্ত — এটি হারাম, জায়েয নয়; কারণ তার এর কোনো প্রয়োজন নেই, এর ক্ষতি এর উপকারের চেয়ে বড়, এবং এর মাফসাদাতগুলো অস্পষ্ট নয়।
- সন্তান স্বাভাবিক পথে বের করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তাড়াহুড়ো ও প্রসবকক্ষে ভিড়ের অজুহাতে সিজারিয়ান অপারেশন করা এর অন্তর্ভুক্ত — এটি হারাম, জায়েয নয়; কারণ এতে রয়েছে ক্ষতি ও ক্ষতিসাধন।
- এমন অঙ্গ দান করা এর অন্তর্ভুক্ত, যা দাতার ওপর নিশ্চিত কিংবা ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত ক্ষতি অবধারিত করে — তা জায়েয নয়, যদিও দাতা সম্মত হয়।
- সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর সুস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা এর অন্তর্ভুক্ত; তাকে এ থেকে বিরত রাখা অপরিহার্য, কারণ এতে রয়েছে অন্যের প্রতি ক্ষতিসাধন।
- অজ্ঞ হাতুড়ে চিকিৎসককে এই সম্মানিত পেশা চর্চা থেকে নিবৃত্ত করা এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ এতে রয়েছে অন্যের প্রতি ক্ষতিসাধন।
- আর এর মধ্যে রয়েছে সেই চিকিৎসকের সনদ প্রত্যাহার করে নেওয়া জায়েয হওয়া, যার কাছ থেকে রোগীদের সঙ্গে হারাম কাজ প্রকাশ পেয়েছে, যদি নসীহতে সে নিবৃত্ত না হয় — কারণ এই চিকিৎসকের টিকে থাকার মধ্যে রয়েছে নিশ্চিত ক্ষতি।
- আর এর অন্তর্ভুক্ত হলো বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে প্রবেশ ও চিকিৎসার মূল্য বেঁধে দেওয়া জায়েয হওয়া, যদি তারা এতে অতিরিক্ত মূল্য নেয়। আর এটি শাসকের বিশেষ এখতিয়ারভুক্ত; সুতরাং তিনি তাদের ওপর ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণ করবেন — যাতে ঘাটতিও থাকবে না, বাড়াবাড়িও থাকবে না।

আর শাখা-প্রশাখা অনেক। আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ৭৬

(الضرر يدفع بقدر الإمكان) — "সাধ্যানুযায়ী ক্ষতি প্রতিহত করা হয়" — এই কায়িদা থেকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কীভাবে উপকার নেওয়া যায়? সংক্ষেপে?

উত্তর/ আমি বলি:— এই কায়িদার অধীনে বহু চিকিৎসাসংক্রান্ত শাখা রয়েছে; তার কিছু তোমাকে উল্লেখ করছি। তার মধ্যে রয়েছে:—

- প্রত্যাশিত রোগ আসার আগেই আগাম চিকিৎসাগত প্রতিষেধক (টিকা) নেওয়া জায়েয হওয়া।
- যে রোযাদারের জন্য রোযা কষ্টকর হয়ে পড়েছে তার জন্য রোযা ভাঙা জায়েয হওয়া।
- যে ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গটি রেখে দিলে অবশিষ্ট অঙ্গগুলোও নষ্ট হয়ে যাবে বলে প্রবল ধারণা হয়, তা কেটে ফেলা জায়েয হওয়া।
- এইডস রোগীদের ওপর সঙ্গনিরোধ (হাজর) আরোপ করা জায়েয হওয়া।
- ভ্রূণ টিকে থাকলে যদি তার মায়ের প্রাণহানি ঘটে, তবে ভ্রূণ ফেলে দেওয়া জায়েয হওয়া।
- প্রয়োজন দেখা দিলে পুরুষদের জন্য রেশম পরিধান করে চিকিৎসা করা জায়েয হওয়া।
- প্রয়োজন দেখা দিলে সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধা জায়েয হওয়া।
- ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর পুরো ওয়াক্তজুড়ে একটি অজুতেই সীমাবদ্ধ থাকা।
- রোগী তার অবস্থা অনুযায়ী সালাত আদায় করবে, তার সাধ্যের বাইরে কোনো কিছুর ভার তাকে দেওয়া হবে না।
- যে ব্যক্তি পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা করে, তার জন্য তায়াম্মুমে স্থানান্তরিত হওয়া জায়েয হওয়া।
- কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ (রোগী দেখা) নিষেধ করা জায়েয হওয়া, যদি সাক্ষাতে তার ওপর বা তাদের ওপর ক্ষতি হয়।
- রোগীদের সঙ্গে সাক্ষাতে ক্ষতি থাকলে শিশুদের সাক্ষাতে নিষেধ করা।
- রোগীকে প্রকৃত অবস্থা জানালে যদি তার ওপর ক্ষতি হয়, তবে তার কাছে মিথ্যা বলা জায়েয হওয়া।

প্রশ্ন ৭৭

(الضرر لا يكون قديماً) — "ক্ষতি কখনো 'প্রাচীন' (অলঙ্ঘনীয়) হয় না" — এই কায়িদা থেকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কীভাবে উপকার নেওয়া যায়? সংক্ষেপে?

উত্তর/ আমি বলি:— এর শাখা অনেক; তার কিছু অংশ তোমাকে উল্লেখ করছি। আমরা বলি — এর অন্তর্ভুক্ত হলো:—

- কোনো কোনো চিকিৎসাগ্রন্থে থাকা কিছু ভ্রান্ত তত্ত্ব সংশোধন করা ওয়াজিব হওয়া; নিছক সেগুলোর প্রাচীনত্ব সেগুলোর সংশোধনে বাধা হতে পারে না।
- নদীগুলোকে সেগুলোর ওপর খুলে দেওয়া নোংরা নর্দমা থেকে পরিচ্ছন্ন করা ওয়াজিব হওয়া; সেগুলোর প্রাচীনত্ব সেগুলো বন্ধ করে দেওয়ায় বাধা হতে পারে না।
- সেই পুরোনো কারখানা/প্রস্তুতকৃত জিনিস নষ্ট করে দেওয়া ওয়াজিব হওয়া, যা আধুনিক আবিষ্কারে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে; প্রাচীন হওয়ায় কোনো ধর্তব্য নেই।
- সেই গাছগুলো কেটে ফেলা ওয়াজিব হওয়া, যেগুলো টিকে থাকায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়; সেগুলোর প্রাচীনত্ব সেগুলো অপসারণে বাধা হতে পারে না।
- ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য অজ্ঞ হাতুড়ে চিকিৎসকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ওয়াজিব হওয়া; এই পেশা সে পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে — এতে কোনো ধর্তব্য নেই।
- পূর্বে নির্ধারিত কোনো কোনো চিকিৎসাগত নিয়মকানুন সংশোধন করা ওয়াজিব হওয়া, যদি সেগুলো বহাল থাকায় ক্ষতি ও কষ্টভার হয়; সেগুলোর প্রাচীনত্ব সেগুলোর সংশোধনে বাধা হতে পারে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ৭৮

(الضرر لا يزال بمثله) — "ক্ষতি সমপরিমাণ ক্ষতি দিয়ে দূর করা যায় না" — এই কায়িদা থেকে চিকিৎসাক্ষেত্রে কীভাবে উপকার নেওয়া যায়?

উত্তর/ আমি বলি:— এর শাখা অনেক; তার মধ্য থেকে নিম্নোক্তগুলো উল্লেখ করছি। এর অন্তর্ভুক্ত হলো:—

- এমন অস্ত্রোপচার করা জায়েয নয়, যেগুলোর সফল না হওয়ার ব্যাপারেই প্রবল ধারণা।
- এমন অঙ্গ দান করা জায়েয নয়, যেগুলো দাতার নিজেরই প্রয়োজন।
- রোগীকে এমন ওষুধ দেওয়া জায়েয নয়, যা তার জন্য আরেকটি রোগ সৃষ্টি করবে।
- জাদুকর ও গণকদের কাছে যাওয়া জায়েয নয়।
- রোগীর জীবনাবসান ঘটানোর যে আইন পরিচিত, তা শরীয়তে হারাম।
- নারীর জন্য মাসিক বন্ধ করার বড়ি সেবন করা জায়েয নয়, যদি তা ব্যবহারে তার ক্ষতি হয়। আর আমাদের রব আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ৭৯

(الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) — "কঠিনতর ক্ষতি হালকা ক্ষতি দিয়ে দূর করা হয়" — এই কায়িদা থেকে চিকিৎসাক্ষেত্রে কীভাবে উপকার নেওয়া যায়? সংক্ষেপে?

উত্তর/ আমি বলি:— এই কায়িদার অধীনে অন্তর্ভুক্ত হলো:—

- এমন ওষুধ সেবন করা জায়েয হওয়া, যেগুলোতে কিছু বিষ থাকে — যদি সেগুলো ব্যবহারে সাধারণত নিরাপত্তাই ঘটে।
- প্রয়োজন দেখা দিলে অবেদন (অ্যানেস্থেসিয়া) দেওয়া জায়েয হওয়া।
- সেই অঙ্গ কেটে ফেলা জায়েয হওয়া, যা টিকে থাকায় গোটা শরীরের ওপর সাধারণ ক্ষতি হয়।
- গর্ভধারণ নারীর জন্য ক্ষতিকর হলে গর্ভনিরোধক বড়ি সেবন করা জায়েয হওয়া।
- খতনা করা জায়েয হওয়া।
- কোনো কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং আশঙ্কা হয় যে তাকে খতনা করাতে চাইলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে, তবে তাকে এখনই খতনা করানো হবে না, যতক্ষণ না তার ঈমান দৃঢ় হয়।
- চিকিৎসার দারূরাতে সতরের যতটুকু উন্মোচন প্রয়োজন ততটুকু উন্মোচন করা জায়েয হওয়া।
- নির্ভরযোগ্য মুসলিম চিকিৎসকগণ যদি সিদ্ধান্ত দেন যে জরায়ু টিকে থাকায় নারীর প্রাণহানি ঘটবে, তবে তা অপসারণ করা জায়েয হওয়া। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ৮০

(إذا ضاق الأمر اتسع) — "বিষয় সংকুচিত হলে তা প্রশস্ত হয়ে যায়" — এই কায়িদা থেকে চিকিৎসাক্ষেত্রে কীভাবে উপকার নেওয়া যায়?

উত্তর/ আমি বলি:— এর অধীনে বহু শাখা রয়েছে। তার মধ্যে:—

- যে রোগী সালাতের কিছু ওয়াজিব আদায়ে অক্ষম, সেগুলো তার ওপর থেকে রহিত হয়ে যায় — যতক্ষণ না সে সেগুলোতে সক্ষম হয়।
- এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত: দাঁড়ানো কষ্টকর হলে তার জন্য বসে সালাত আদায় করা জায়েয হওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত: পানি ব্যবহারে অক্ষম রোগীর জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয হওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত: রোযা কষ্টকর হলে তার ওপর থেকে রোযার ওয়াজিব রহিত হয়ে যাওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত: পুরোপুরি অক্ষমতার কারণে সে নিজে হজ করতে না পারলে তার ওপর থেকে নিজে হজ করার ওয়াজিব রহিত হয়ে যাওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত: রোগের কারণে যে নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারে না, তার জন্য কঙ্কর নিক্ষেপে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা জায়েয হওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত: নাপাকি দূর করা তার সাধ্যের অন্তর্ভুক্ত না হলে তার ওপর থেকে তা দূর করার ওয়াজিব রহিত হয়ে যাওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত: রোগের কারণে বাহিত অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয হওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত: তার ওপর থেকে নিজে (আদায় করার) ওয়াজিব রহিত হয়ে যাওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত: ইহরাম অবস্থায় প্রয়োজন হলে ফিদইয়াসহ মাথা ঢাকা জায়েয হওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত: সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর হদ কার্যকর না করা।
- এর অন্তর্ভুক্ত: তার জন্য সহজতর হলে দুই সালাত একত্র করা জায়েয হওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত: ওজরের কারণে কিবলামুখী হতে না পারলে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করা জায়েয হওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত: মিনা থেকে দূরের কোনো চিকিৎসাকেন্দ্রে থাকলে এবং রোগগ্রস্ত অবস্থার কারণে মিনায় অবস্থান করতে না পারলে মিনায় রাত্রিযাপন ছেড়ে দেওয়া জায়েয হওয়া।

আর এর ওপর শাখা-প্রশাখা অনেক। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ৮১

(الاضطرار لا يبطل حق الغير) — "নিরুপায় অবস্থা (ইযতিরার) অন্যের হক বাতিল করে না" — এই কায়িদা থেকে চিকিৎসাক্ষেত্রে কীভাবে উপকার নেওয়া যায়? সংক্ষেপে?

উত্তর/ আমি বলি:— এ থেকে কয়েকটি শাখায় উপকার নেওয়া যায়, তা নিম্নরূপ:—

এর অন্তর্ভুক্ত:— সঠিক অভিমত, যা ছাড়া অন্য কিছু বলা জায়েয নয়, তা হলো — এই অজুহাতে কোনো রোগীর ওপর থেকে লাইফ-সাপোর্ট যন্ত্র (আজহিযাতুল ইনআশ) সরিয়ে নেওয়া জায়েয নয় যে, আরেকজন রোগী তার জন্য নিরুপায়। কারণ এর হক সেই ব্যক্তির, যে আগে এসেছে; আর পরবর্তী ব্যক্তির নিরুপায় অবস্থা প্রথম ব্যক্তির হকদারিত্ব রহিত করে না — কেননা দারূরাত অন্যের হক রহিত করে না। এটি স্পষ্ট।

আর এর অন্তর্ভুক্ত:— হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য রোগীদের ভিড় এবং কে অগ্রাধিকারের বেশি হকদার — এ মাসআলাটিতে বিরাট বিপর্যয় ঢুকে পড়েছে; কারণ যে হকদার তাকে বঞ্চিত করা হয় এবং যে হকদার নয় তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় — কেননা তার পক্ষে এমন বড় সুপারিশ থাকে যা কেউ ফেরাতে পারে না। এ ব্যাপারে আমরা বলি:— যে রোগী আগে এসেছে সেই এই শয্যার বেশি হকদার, যদি সে এর জন্য নিরুপায় হয়। আর দ্বিতীয় রোগী যদি নিরুপায় হয়, তবে সে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না তার জন্য আরেকটি শয্যা খালি হয়। নিছক সে — অর্থাৎ দ্বিতীয় রোগী — নিরুপায় হওয়াটা অগ্রাধিকার পাওয়ায় প্রথম রোগীর হক রহিত করে না, কারণ নিরুপায় অবস্থা অন্যের হক

বাতিল করে না। আর যে সুপারিশই এমন পরিণতির দিকে নিয়ে যায় যে, যার হক অগ্রাধিকার তাকে পিছিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা যার হক পশ্চাদ্বর্তিতা তাকে এগিয়ে দেওয়া হয় — তা এক পাপপূর্ণ ও মন্দ সুপারিশ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আর এর অন্তর্ভুক্ত:— অপারেশন কক্ষে প্রবেশ। এতে সবচেয়ে বেশি হকদার সেই নিরুপায় ব্যক্তি, যে আগে এসেছে। সুতরাং সেখানে যদি আরেকজন নিরুপায় রোগী থাকে, তবে প্রথম রোগীর ওপর অগ্রাধিকার পাওয়ার কোনো হক তার নেই; কারণ উভয়েই এই অপারেশনের জন্য নিরুপায়, তবে প্রথমজন অগ্রবর্তিতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। আর কারও অধিকার নেই যে সে একজনকে অপরের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ করবে, কারণ এই সুপারিশ ধারণ করে — যার হক পশ্চাদ্বর্তিতা তাকে এগিয়ে দেওয়া এবং যার হক অগ্রাধিকার তাকে পিছিয়ে দেওয়া। সুতরাং দ্বিতীয় রোগীর নিরুপায় অবস্থা প্রথম রোগীর অগ্রাধিকারের হক বাতিল করাকে বৈধ করে না, কারণ নিরুপায় অবস্থা অন্যের হক বাতিল করে না।

আর এর অন্তর্ভুক্ত:— এটি জানা যে, হাঁপানি ও বক্ষব্যাধির রোগীদের অক্সিজেন নেওয়ার প্রয়োজন হয়; আর বহু হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রচলিত সাধারণ অবস্থা হলো, সেগুলোতে তা অল্পই মজুত থাকে। সুতরাং এটি নিতে প্রয়োজনগ্রস্ত রোগীদের সংখ্যা যদি ভিড় করে, তবে আগে যে এসেছে তাকে আগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে — কারণ প্রথমজন এর জন্য নিরুপায়, দ্বিতীয়জনও এর জন্য নিরুপায়। আর কারও — না চিকিৎসকের, না সুপারিশকারীর — এই অধিকার নেই যে সে একজনের নিরুপায় অবস্থাকে আরেকজন রোগীর নিরুপায় অবস্থার বিনিময়ে পক্ষপাতপূর্ণভাবে অগ্রাধিকার দেবে, কারণ নিরুপায় অবস্থা অন্যের হক বাতিল করে না।

আর এর অন্তর্ভুক্ত:— কিছু চিকিৎসা কেবল পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেই পাওয়া যায়; আর রাষ্ট্র — আল্লাহ তাকে সব কল্যাণের তাওফীক দিন — হকদারিত্ব ও অগ্রবর্তিতা অনুসারে প্রয়োজনগ্রস্তদের বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে অগ্রগামী। সুতরাং একাধিক রোগী যদি বিদেশে চিকিৎসার জন্য সফরে নিরুপায় হয়, তবে আমরা আগে যে এসেছে তাকে অগ্রাধিকার দেব, তারপর তার পরেরজনকে। কারণ আগেরজন নিরুপায়, দ্বিতীয়জনও নিরুপায়। সুতরাং কারও এই অধিকার নেই যে সে পক্ষপাত, আত্মীয়তা বা পরিচয়ের কারণে পরেরজনকে আগেরজনের ওপর অগ্রাধিকার দেবে; কারণ এর দ্বারা সে প্রথমজনের হক রহিত করে দেয়। আর "দ্বিতীয়জন নিরুপায়" — এটি কোনো দলিল নয়; কেননা আমরা বলব:— প্রথমজনও তো নিরুপায়, আর দ্বিতীয়জনের নিরুপায় অবস্থা প্রথমজনের নিরুপায় অবস্থাকে রহিত করে না; কারণ নিরুপায় অবস্থা অন্যের হক বাতিল করে না।

আর এর অন্তর্ভুক্ত:— চিকিৎসাগত স্থানান্তর/উদ্ধার (আল-ইখলাউত তিব্বি)। একাধিক রোগীর যদি এই স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় এবং তাদের একত্র করা সম্ভব না হয়, তবে আগে যে এসেছে তাকে, তারপর তার পরেরজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; এখানে সুপারিশ ঢোকার কোনো অধিকার নেই। বরং যে আগে এসেছে সে-ই অন্যের চেয়ে বেশি হকদার। আর দ্বিতীয় রোগীর চিকিৎসাগত স্থানান্তরের নিরুপায় অবস্থা প্রথম নিরুপায় ব্যক্তির হকদারিত্ব রহিত করে না, কারণ নিরুপায় অবস্থা অন্যের হক বাতিল করে না। এর ওপর বাকিগুলো কিয়াস করে নাও। আর আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

নিরুপায় অবস্থা ও অন্যের হক (প্রশ্ন ৮১)

করুন

- ✓ হাসপাতালের শয্যা, অপারেশন কক্ষ, অক্সিজেন, বিদেশে চিকিৎসা — আগে যে এসেছে সে বেশি হকদার
- ✓ দ্বিতীয় নিরুপায় রোগী অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না জায়গা খালি হয়

করবেন না

- ✗ আরেকজন নিরুপায় বলে লাইফ-সাপোর্ট যন্ত্র সরিয়ে নেওয়া — জায়েয নয়
- ✗ সুপারিশে পেছনের জনকে এগিয়ে দেওয়া — পাপপূর্ণ ও মন্দ সুপারিশ

কায়িদা: নিরুপায় অবস্থা অন্যের হক বাতিল করে না

চিকিৎসাক্ষেত্রে ফিকহি কায়িদার প্রয়োগ

কায়িদা	উদাহরণ (লেখকের তালিকা থেকে)
ক্ষতি করা যাবে না, পাল্টা ক্ষতিও নয়	জাদু; ভেজাল ওষুধ; প্রয়োজন ছাড়া বিপরীত লিঙ্গের চিকিৎসা; দারুরাতহীন অস্ত্রোপচার; হারাম দিয়ে চিকিৎসা
সাধ্যানুযায়ী ক্ষতি প্রতিহত করা হয়	টিকা; রোযা ভাঙা; ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গ কাটা; এইডস রোগীদের সঙ্গনিরোধ; ভ্রূণ টিকলে মায়ের প্রাণহানি হলে ভ্রূণ ফেলা; তায়াম্মুম
ক্ষতি কখনো প্রাচীন (অলঙ্ঘনীয়) হয় না	ভ্রান্ত তত্ত্ব সংশোধন; অজ্ঞ হাতুড়েকে নিষেধাজ্ঞা; ক্ষতিকর নিয়মকানুন সংশোধন
ক্ষতি সমপরিমাণ ক্ষতি দিয়ে দূর করা যায় না	প্রবল ধারণায় ব্যর্থ অস্ত্রোপচার নয়; দাতার প্রয়োজনের অঙ্গ দান নয়; জাদুকরের কাছে যাওয়া নয়
কঠিনতর ক্ষতি হালকা ক্ষতি দিয়ে দূর করা হয়	ওষুধে সামান্য বিষ, নিরাপত্তা সাধারণত থাকলে; প্রয়োজনে অবেদন; গর্ভধারণ ক্ষতিকর হলে গর্ভনিরোধক বড়ি; জরায়ু টিকলে প্রাণহানি হলে অপসারণ
বিষয় সংকুচিত হলে প্রশস্ত হয়	বসে সালাত; তায়াম্মুম; রোযার ওয়াজিব রহিত; কঙ্কর নিক্ষেপে প্রতিনিধি; বাহিত অবস্থায় তাওয়াফ
নিরুপায় অবস্থা অন্যের হক বাতিল করে না	লাইফ-সাপোর্ট, শয্যা, অক্সিজেন ও বিদেশে চিকিৎসায় আগে যে এসেছে

প্রশ্ন ৭৫ থেকে ৮১

প্রশ্ন ৮২

বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে কোনো কোনো চিকিৎসক কিছু রোগীকে বিপুল পরিমাণ ওষুধ লিখে দেন, যার কিছু অংশ হয়তো তাদের প্রয়োজনই হয় না — এর হুকুম কী?

উত্তর/ আমি বলি:— প্রথমেই জেনে রাখো, চিকিৎসক তাঁর কাজের ব্যাপারে আমানতদার এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে এর জন্য হিসাবের সম্মুখীন হবেন। এর ভিত্তিতে তাঁর জন্য জায়েয নয় যে তিনি রোগীর জন্য এমন

কিছু লিখবেন যা তার স্বাস্থ্যগত অবস্থার দাবি নয়। এটি সেই আমানতেরই অংশ যা তাঁর গলায় বাঁধা রয়েছে। আর দলিল দ্বারা এটি স্থিরীকৃত যে, মুমিনদের সঙ্গে প্রতারণা করা, তাদের স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া এবং এ ব্যাপারে তাদের ঠকানো হারাম। যে চিকিৎসক এ কাজে পরিচিতি লাভ করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে একজন হীন ব্যক্তি — এই সম্মানিত ও উচ্চ পেশার উপযুক্ত নয়। তাকে থামিয়ে দেওয়া, কিংবা তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া ওয়াজিব যে সে আর এমনটি করবে না; এবং এই বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রের পরিচালককে লিখিতভাবে জানানো ওয়াজিব যেন তিনি এই চিকিৎসককে এই মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন, কিংবা তার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেন। আর শাসকের অধিকার রয়েছে তাকে যথোপযুক্ত মনে করা শাস্তি (তাযীর) দেওয়ার, যাতে তাকে এই কাজ থেকে দমন ও নিবৃত্ত করা যায় — যে কাজটি তাঁর চিকিৎসাগত আমানতের পরিপন্থী গণ্য হয়। আর এই কাজ মুসলিমদের পারস্পরিক ওয়াজিব নসীহতেরও পরিপন্থী। হাদীসে রয়েছে ((الدين النصيحة)) — "দ্বীন হলো নসীহত"; অপর হাদীসে রয়েছে ((وإذا استنصحك فانصح له)) — "আর যখন সে তোমার কাছে নসীহত চায়, তখন তাকে নসীহত করো"; আরেক হাদীসে রয়েছে ((من غش فليس منا)) — "যে ধোঁকা দিল সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" সুতরাং নসীহতের দাবি হলো, তিনি তার চিকিৎসায় যে ওষুধের প্রয়োজন কেবল ততটুকুই লিখবেন। এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অপরিহার্য; কারণ চিকিৎসকের ওপর যে সবচেয়ে বড় গুণটি ধারণ করা ওয়াজিব, তা হলো আমানত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ﴿ إن عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ﴾ (নিশ্চয়ই আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম; কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে ভীত হলো, আর মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয়ই সে অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ — সূরা আহযাব: ৭২)। আর প্রতিটি ব্যবস্থাপত্রে প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, সেই বাড়তি পরিমাণের জন্য চিকিৎসক দায়ী। আর যে চিকিৎসক নিজের আর্থিক স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়াকে তাঁর রোগীর স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার দেন, তিনি নিশ্চিতভাবেই একজন ব্যর্থ চিকিৎসক — যিনি আখিরাত বিক্রি করে দুনিয়া কিনেছেন, ক্ষণস্থায়ীর কামনাকে আখিরাতের নিয়ামতের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং দ্বীনি ও পেশাগত আমানতের খিয়ানত করেছেন। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। আমরা তাঁর কাছে — জাল্লা ওয়া আলা — প্রার্থনা করি, তিনি যেন যারা এমনটি করে তাদের অন্তরগুলোকে হিদায়াত দেন এবং তাদের সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনেন। আর আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন ৮৩

যাকে "বৈদ্যুতিক সেশন" (আল-জালাসাতুল কাহরাবাইয়্যাহ) বলা হয়, তা দিয়ে চিকিৎসা করার হুকুম কী?

উত্তর/ আমি বলি:— কোনো কোনো ফকীহের এই ধরনের চিকিৎসাকে হারাম বলে হুকুম দেওয়া দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি; তাঁরা দলিল দিয়েছেন এই বলে যে এটি আগুন, আর আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। যেহেতু এ দিয়ে চিকিৎসা করার মাসআলায় বিভ্রান্তি ঘটেছে, তাই আমি এটিকে একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন হিসেবে আলাদা করতে চাইলাম। সুতরাং আমি বলি:— জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর রহম করুন, সরাসরি আকারে বিদ্যুৎ দিয়ে চিকিৎসা করা — যা কিছু কারী (রুকইয়াহকারী) করে থাকেন, আল্লাহ তাআলা তাঁদের হিদায়াত দিন — জায়েয নয়। কারণ তা প্রকৃতপক্ষেই শাস্তি দেওয়া; এবং কারণ তাঁরা এ ধরনের চিকিৎসার অভিজ্ঞ ব্যক্তি নন; এবং কারণ এর ক্ষতি প্রমাণিত হয়ে গেছে — এ ব্যাপারে কোনো কোনো কারীর সম্পর্কে কিছু প্রমাণিত ঘটনা আমরা জানি। আমরা তা উল্লেখ করেছি রুকইয়াহওয়ালাদের কারও কারও কাছ থেকে ঘটে যাওয়া কিছু ভুল-ত্রুটি নিয়ে আলোচনায়; আর তাঁরা সংখ্যায় অল্প — হাতের আঙুলে গোনা যায় এমনও নয়। সুতরাং রুকইয়াহওয়ালাদের জন্য এই চিকিৎসায় দুঃসাহস দেখানো জায়েয নয়। এ বিষয়টি নিষ্পন্ন; এ নিয়ে আলোচনা দীর্ঘ করব না।

আর দ্বিতীয়ত:— জেনে রাখো, বিদ্যুৎ আগুন হওয়ার বাইরে কিছু নয়। আর আগুন দিয়ে চিকিৎসা করার জায়েয হওয়া তার মূলনীতি অনুসারে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে — যেমনটি কি (দাগানো)-এর হাদীসসমূহে

রয়েছে। মুসলিম তাঁর সহীহতে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে, সা'দ ইবনু মুআযের বাহুর শিরায় তীর বিদ্ধ হলে নবী ﷺ তা দাগিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে দেন। এর কোনো কোনো সনদে রয়েছে ((أن النبي كوى سعداً في أكحله بمشقص)) — "নবী ﷺ সা'দের বাহুর শিরায় চওড়া ফলাযুক্ত তীর দিয়ে দাগ দেন।" আর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে ((أن النبي بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه)) — "নবী ﷺ উবাই ইবনু কা'বের কাছে একজন চিকিৎসক পাঠালেন; তিনি তাঁর একটি শিরা কেটে দিলেন, তারপর তা দাগিয়ে দিলেন।" আর আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে ((وكواه أبو طلحة بيده, أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه, وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن, وقال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله حي ثابت وأبو طلحة كواني)) — "আবু তালহা ও আনাস ইবনুন নাদর তাঁকে দাগিয়েছিলেন, এবং আবু তালহা নিজ হাতে তাঁকে দাগিয়েছিলেন। আনাস বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকা অবস্থায় আমাকে যাতুল জানব (পার্শ্বদেশের ব্যথা) থেকে দাগানো হয়েছিল; আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন আবু তালহা, আনাস ইবনুন নাদর ও যায়দ ইবনু সাবিত, আর আবু তালহাই আমাকে দাগিয়েছিলেন।" এটি বুখারীতে রয়েছে। আর শিফা তিনটি জিনিসে রয়েছে — এই হাদীসে তার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে ((أو كية نار)) — "কিংবা আগুনের একটি দাগ।"

আর অন্য কিছু হাদীস এসেছে যেগুলো এ থেকে নিষেধ করে এবং যে তা ছেড়ে দেয় তার প্রশংসা করে। এগুলোর মধ্যে সমন্বয় হলো ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন:

تضمنت أحاديث الكي أربعة أمور: أحدها: فعله والثاني: عدم محبته له, والثالث: الثناء على من تركه, والرابع: النهي عنه, ولا تعارض بينها بحمد الله, لأن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار أو على النوع الذي لا يحتاج إليه, بل يفعل خوفاً من حدوث الداء

"কি (দাগানো) সম্পর্কিত হাদীসগুলো চারটি বিষয় ধারণ করে:— এক:— তাঁর ﷺ তা করা। দুই:— তা তাঁর পছন্দ না হওয়া। তিন:— যে তা ছেড়ে দেয় তার প্রশংসা করা। চার:— তা থেকে নিষেধ করা। আর আল্লাহর প্রশংসাসহ বলছি, এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ তাঁর তা করা প্রমাণ করে যে তা জায়েয; আর তা তাঁর পছন্দ না হওয়া তা থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ করে না। আর যে তা ছেড়ে দেয় তার প্রশংসা — তা প্রমাণ করে যে তা ছেড়ে দেওয়াই অধিক উত্তম ও শ্রেয়। আর তা থেকে নিষেধ করা — তা স্বেচ্ছা-পছন্দের পথে (অর্থাৎ উত্তম কোনটি তা বোঝানোর জন্য), কিংবা সেই প্রকারের ব্যাপারে যার প্রয়োজন নেই, বরং রোগ হয়ে যাওয়ার ভয়ে যা করা হয়।" — উদ্ধৃতি শেষ।

এর ভিত্তিতে আমরা বলি:— বৈদ্যুতিক সেশন দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয। কারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো হালাল হওয়া; এবং কারণ এই বৈদ্যুতিক সেশনগুলোর প্রকৃত স্বরূপ হলো বৈদ্যুতিক শক্তি শোষণ করে শরীরের ভেতরে তাকে গভীর তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা, যা ধমনির রক্ত বৃদ্ধি ঘটায় এবং ফলে চিকিৎসাধীন অংশে অক্সিজেন বাড়িয়ে দেয়; এটি সেই অংশের পুষ্টি জোগায় এবং সেখানে বিপাকক্রিয়া (ইস্তিকলাব) বাড়িয়ে দেয়, ফলে তা তার কাজ কাঙ্ক্ষিত রূপে বা তার কাছাকাছি রূপে সম্পাদন করে। আর এর সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে এবং এটি পরিণামের দিক থেকে নিরাপদ; চিকিৎসকরা কেবল তখনই এটি ব্যবহার করেন যখন এর প্রয়োজন তীব্র হয়। সুতরাং বিদ্যুৎ যদি প্রয়োজন ও দারূরাত অনুপাতে, বিষয়টি জানেন এমন অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তবে তা কি (দাগানো)-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বাইরে কিছু নয়; আর দলিল সাব্যস্ত করেছে যে তা শিফার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শরঈ দলিল ও অভিজ্ঞতালব্ধ দলিল উভয়েই এ থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে একমত হলো। তাই একে নিষিদ্ধ বা হারাম করার কোনো ভিত্তি নেই; সুতরাং প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো জায়েয হওয়া। আর আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

বিদ্যুৎ দিয়ে চিকিৎসা: দুটি ক্ষেত্র

সরাসরি বিদ্যুৎ — রুকইয়াহকারী কারীদের	বৈদ্যুতিক সেশন — অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের
জায়েয নয় — প্রকৃতপক্ষে শাস্তি দেওয়া	লেখকের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত: জায়েয
তাঁরা এ চিকিৎসার অভিজ্ঞ নন; ক্ষতি প্রমাণিত	প্রয়োজন ও দারূরাত অনুপাতে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা
এ বিষয়ে লেখকের আলোচনা পূর্বেও গেছে	কি (দাগানো)-এর অন্তর্ভুক্ত; চিকিৎসার মূলনীতি হালাল

কোনো কোনো ফকীহ একে হারাম বলেছেন; লেখক তাঁদের সঙ্গে একমত নন

প্রশ্ন ৮৪

(تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) — "প্রজাদের ওপর ইমামের কার্যক্রম মাসলাহাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত" — এই কায়িদা থেকে চিকিৎসাক্ষেত্রে কীভাবে উপকার নেওয়া যায়? সংক্ষেপে?

উত্তর/ আমি বলি:— এ থেকে কয়েকটি শাখায় উপকার নেওয়া যায়; তোমাকে নিম্নোক্তগুলো উল্লেখ করছি:—

- এর অন্তর্ভুক্ত:— কোনো কোনো রোগীর ওপর স্বাস্থ্যগত সঙ্গনিরোধ (কোয়ারেন্টাইন) আরোপে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়া, যদি তা সাধারণ মাসলাহাত বাস্তবায়ন করে।
- আর এর অন্তর্ভুক্ত:— কোনো কোনো ওষুধ ক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়া, যদি তাতে সাধারণ মাসলাহাত থাকে।
- আর এর অন্তর্ভুক্ত:— বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোর ওপর মূল্য বেঁধে দেওয়া জায়েয হওয়া, যদি তা সাধারণ মাসলাহাত বাস্তবায়ন করে।
- আর এর অন্তর্ভুক্ত:— নসীহত ও দিকনির্দেশনার পরও যদি কোনো কারী বা চিকিৎসকের কাছ থেকে তাঁদের কাজের পরিপন্থী কিছু প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের কাউকে কাউকে থামিয়ে দেওয়া জায়েয হওয়া।
- আর এর অন্তর্ভুক্ত:— ব্যাপক তাওতীন (স্বদেশীকরণ — নিজ দেশের নাগরিকদের দিয়ে পদ পূরণ) জায়েয হওয়া, যদি তা সাধারণ মাসলাহাতসমূহ বাস্তবায়ন করে।
- আর এর অন্তর্ভুক্ত:— কোনো কোনো স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া জায়েয হওয়া, যদি সেগুলো চিকিৎসার মূলনীতি মেনে না চলে এবং সেগুলো বন্ধ করায় সাধারণ মাসলাহাতসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

- আর এর অন্তর্ভুক্ত:— কোনো কোনো চিকিৎসাগত নিয়মকানুন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়া, যদি সেগুলো প্রণয়নে সাধারণ মাসলাহাতসমূহ বাস্তবায়িত হয়। আর এর ওপর বাকিগুলো কিয়াস করে নাও। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমামের কার্যক্রম মাসলাহাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত

- [ ] সাধারণ মাসলাহাত থাকলে স্বাস্থ্যগত সঙ্গনিরোধে তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব
- [ ] কিছু ওষুধ ক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় আনুগত্য ওয়াজিব
- [ ] বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রের মূল্য বেঁধে দেওয়া জায়েয
- [ ] নসীহতের পরও পরিপন্থী আচরণ করলে কারী বা চিকিৎসককে থামানো জায়েয
- [ ] সাধারণ মাসলাহাত হলে ব্যাপক তাওতীন জায়েয
- [ ] চিকিৎসার মূলনীতি না মানা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা জায়েয
- [ ] চিকিৎসাগত নিয়মকানুন প্রণয়নে তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব

প্রশ্ন ৮৪

প্রশ্ন ৮৫

পুরুষের বীর্য নারীর ভেতরে প্রবেশ ঠেকানোর জন্য রাবারের আবরণ (কনডম) ব্যবহারের হুকুম কী?

উত্তর/ আমি বলি:— এটি জায়েয, ইনশাআল্লাহু তাআলা — এই শর্তে যে স্ত্রী স্বাধীনা হলে তার অনুমতি নিতে হবে। আর এটি আযল (সহবাসের সময় বীর্য বাইরে ফেলা)-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বাইরে কিছু নয়; আর এর জায়েয হওয়ার ব্যাপারে হাদীস এসেছে। শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ((كنا نعزل والقرآن ينزل على عهد رسول الله)) — "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আযল করতাম, আর তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল।" আর আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বনূ মুসতালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম এবং আরবের সম্ভ্রান্ত নারীদের বন্দি করলাম। আমাদের ওপর স্ত্রীবিরহ দীর্ঘ হয়ে পড়ল এবং আমরা মুক্তিপণেরও আগ্রহী হলাম। তাই আমরা চাইলাম উপভোগ করতে ও আযল করতে; ফলে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ((لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون)) — "তোমরা তা না করলেই ভালো; আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যে প্রাণের সৃষ্টি লিখে রেখেছেন, তা হবেই।" — "মুত্তাফাকুন আলাইহি"। সারকথা হলো, তা জায়েয; কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনা হলে তার অনুমতি নেওয়া অপরিহার্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কনডম ও আযল

করুন	করবেন না
✓ জায়েয, ইনশাআল্লাহ — এটি আযলের অন্তর্ভুক্ত	
✓ স্ত্রী স্বাধীনা হলে তার অনুমতি নেওয়া অপরিহার্য	

প্রশ্ন ৮৫ — জাবিরের হাদীস: রাসূলুল্লাহর যুগে আযল করা হতো, আর কুরআন নাযিল হচ্ছিল

এক নজরে

- ★ লেখকের অভিমত: নারীদের দুধের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ — মাফসাদাত প্রতিহত করা অগ্রগণ্য
- ★ পুরুষের নিছক সৌন্দর্যের জন্য সোনা হারাম; কৃত্রিম দাঁতে অসুবিধা নেই
- ★ ফার্মাসিস্ট অজ্ঞ হলে, ওষুধ বদলালে, মাত্রা বাড়ালে বা সংমিশ্রণে ভুল করলে দায়ী
- ★ মাদক দিয়ে চিকিৎসা জায়েয নয়; মুর হালাল
- ★ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের বৈদ্যুতিক সেশন জায়েয; কারীদের সরাসরি বিদ্যুৎ জায়েয নয়
- ★ নিরুপায় অবস্থা অন্যের হক বাতিল করে না — আগে যে এসেছে সে বেশি হকদার
- ★ প্রয়োজন ছাড়া চিকিৎসকের বেশি ওষুধ লেখা আমানতের পরিপন্থী

যাচাই করুন

1. পুরুষের নিছক সৌন্দর্যের জন্য দাঁতে সোনা সম্পর্কে হুকুম কী?

ক. জায়েয | খ. মুস্তাহাব | গ. জায়েয নয়

2. ফার্মাসিস্ট ব্যবস্থাপত্রের ওষুধ বদলে নিজের ইজতিহাদে অন্য ওষুধ দিলে কী হবে?

ক. দায়ী নন | খ. দায়ী — এটি অবহেলা ও সীমালঙ্ঘন | গ. কেবল ইচ্ছাকৃত হলে দায়ী

3. নেশাদ্রব্যসেবী রোগী সম্পর্কে চিকিৎসকের করণীয় কী বলেছেন ইবনু বায?

ক. রিপোর্ট করা | খ. উপেক্ষা করা | গ. নসীহত, তাওবায় উদ্বুদ্ধ করা ও দোষ গোপন রাখা

4. অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের বৈদ্যুতিক সেশন সম্পর্কে লেখকের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত কী?

ক. হারাম | খ. মাকরূহ | গ. জায়েয

5. নিরুপায় অবস্থা অন্যের হক সম্পর্কে কায়িদা কী?

ক. অন্যের হক বাতিল করে | খ. সুপারিশ থাকলে বাতিল করে | গ. অন্যের হক বাতিল করে না

6. চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার জন্য মাহরাম ছাড়া নারীর সফর সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. জায়েয | খ. প্রয়োজনে জায়েয | গ. কোনোভাবেই জায়েয নয়

উত্তর: ১–গ, ২–খ, ৩–গ, ৪–গ, ৫–গ, ৬–গ

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

প্রয়োজন ও দায়মুক্তির কাওয়াইদ, চিকিৎসা-মাসআলায় অগ্রাধিকারযোগ্য মতসমূহ এবং গ্রন্থের সমাপ্তি

প্রশ্ন ৮৬

(الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) — "প্রয়োজন নিরুপায়তার (দরূরত) স্থলাভিষিক্ত হয়, তা সাধারণ হোক বা বিশেষ" — এই কায়িদা থেকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কীভাবে উপকার নেওয়া যায়? সংক্ষেপে?

উত্তর/ আমি বলি:— এ থেকে বিপুলসংখ্যক শাখা-মাসআলায় উপকার নেওয়া যায়; তার কয়েকটি আমরা তোমার জন্য উল্লেখ করছি:—

- এর অন্তর্ভুক্ত:— প্রয়োজনভিত্তিক (হাজিয়্যাহ) অস্ত্রোপচারগুলো জায়েয হওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— জোড়া লেগে থাকা আঙুল আলাদা করার অস্ত্রোপচার করানো জায়েয হওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধা জায়েয হওয়া, যদি প্রয়োজন তার দিকে ডাকে।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— পুরুষের জন্য রেশম পরিধান করে চিকিৎসা নেওয়া জায়েয হওয়া, যদি প্রয়োজন তার দিকে ডাকে।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— অসুস্থ মুহরিমের জন্য মাথা কামানো জায়েয হওয়া — ফিদইয়াসহ — যদি প্রয়োজন তার দিকে ডাকে।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— অক্ষম রোগীর পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপে (রমী) প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয হওয়া।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— রক্ত সঞ্চালনের (blood transfusion) মাধ্যমে চিকিৎসা নেওয়া জায়েয হওয়া, যদি প্রয়োজন তার দিকে ডাকে।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— রক্তব্যাংক (blood bank) প্রতিষ্ঠা করা জায়েয হওয়া, যদি প্রয়োজন তার দিকে ডাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রয়োজন নিরুপায়তার স্থলাভিষিক্ত: উদাহরণ

- [ ] প্রয়োজনভিত্তিক (হাজিয়্যাহ) অস্ত্রোপচার জায়েয
- [ ] জোড়া লেগে থাকা আঙুল আলাদা করার অস্ত্রোপচার জায়েয
- [ ] প্রয়োজনে সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধা জায়েয
- [ ] প্রয়োজনে পুরুষের রেশম পরে চিকিৎসা জায়েয
- [ ] অসুস্থ মুহরিমের মাথা কামানো জায়েয — ফিদইয়াসহ
- [ ] অক্ষম রোগীর পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপে প্রতিনিধি জায়েয
- [ ] প্রয়োজনে রক্ত সঞ্চালন জায়েয
- [ ] প্রয়োজনে রক্তব্যাংক প্রতিষ্ঠা জায়েয

প্রশ্ন ৮৬ — কায়িদা: প্রয়োজন নিরুপায়তার স্থলাভিষিক্ত হয়, সাধারণ হোক বা বিশেষ

প্রশ্ন ৮৭

(الجواز الشرعي ينافي الضمان) — "শরঈ অনুমোদন ক্ষতিপূরণের দায়ের (দামান) পরিপন্থী" — এই কায়িদা থেকে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কীভাবে উপকার নেওয়া যায়? সংক্ষেপে?

উত্তর/ আমি বলি:— এ থেকে কয়েকটি শাখা-মাসআলায় উপকার নেওয়া যায়; তার কয়েকটি আমরা তোমার জন্য উল্লেখ করছি:—

- এর অন্তর্ভুক্ত:— চিকিৎসাশাস্ত্রে দক্ষ চিকিৎসক, যিনি চিকিৎসার স্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী নিখুঁতভাবে চিকিৎসা করেছেন এবং তাতে কোনো ত্রুটি করেননি, তাঁর হাতে যা নষ্ট হয়েছে তার জন্য তিনি ক্ষতিপূরণের দায়ে পড়বেন না।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— অজ্ঞ চিকিৎসাকারী নিঃশর্তভাবে ক্ষতিপূরণের দায়ে পড়বে, কারণ শরীয়ত তাকে এ কাজের অনুমতি দেয়নি।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— চিকিৎসক যদি চিকিৎসার মূলনীতির বিরোধিতা করেন, তবে তিনি ক্ষতিপূরণের দায়ে পড়বেন।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— চিকিৎসক যদি পূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই ওষুধ লিখে দেন, তবে তিনি ক্ষতিপূরণের দায়ে পড়বেন।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— ফার্মাসিস্ট (ঔষধ-বিক্রেতা) ক্ষতিপূরণের দায়ে পড়বেন না, যদি তিনি চিকিৎসকের লিখিত ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রোগীকে ওষুধ সরবরাহ করেন, কারণ তাঁকে এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— ভেষজ (আশশাব) দিয়ে চিকিৎসাকারী, যিনি এ বিষয়ে জ্ঞাত এবং এ বিষয়ে যাঁর সাক্ষ্য রয়েছে, তাঁর চিকিৎসায় যদি কোনো ক্ষতি ঘটে যায় তবে তিনি ক্ষতিপূরণের দায়ে পড়বেন না।
- এর অন্তর্ভুক্ত:— রোগীর অনুমতিক্রমে তার উপর যেসব অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, সেসব অস্ত্রোপচারের স্বীকৃত মূলনীতি মেনে চলার পরও যদি কোনো ক্ষতি ঘটে যায়, তবে যে চিকিৎসকরা তা সম্পাদন করেছেন তাঁদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণের দায় নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

শরঈ অনুমোদন ও ক্ষতিপূরণের দায় (দামান)

অবস্থা	দামান
দক্ষ চিকিৎসক, স্বীকৃত মূলনীতি মেনে নিখুঁত চিকিৎসা করেছেন	ক্ষতিপূরণের দায় নেই
অজ্ঞ চিকিৎসাকারী	নিঃশর্তভাবে দায়ী
চিকিৎসক চিকিৎসার মূলনীতির বিরোধিতা করলে	দায়ী
পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই ওষুধ লিখলে	দায়ী
ফার্মাসিস্ট ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ দিলে	দায় নেই
জ্ঞাত ও সাক্ষ্যপ্রাপ্ত ভেষজ চিকিৎসক	ক্ষতি ঘটলেও দায় নেই
রোগীর অনুমতিতে অস্ত্রোপচার, মূলনীতি মেনে	ক্ষতি ঘটলেও চিকিৎসকদের দায় নেই

প্রশ্ন ৮৭ — কায়িদা: শরঈ অনুমোদন ক্ষতিপূরণের দায়ের পরিপন্থী

প্রশ্ন ৮৮

কিছু চিকিৎসা-মাসআলায় সংক্ষিপ্ত অগ্রাধিকারযোগ্য মতগুলো (তারজীহাত) উল্লেখ করুন?

উত্তর/ আমি বলি:— মাথা ও চোখের উপর — সানন্দে গ্রহণীয়। তা নিম্নরূপ:—

সঠিক মত হলো:— মস্তিষ্কের মৃত্যু (brain death) মৃত্যু বলে গণ্য হবে না এবং তার উপর মৃত্যুর বিধানসমূহ আরোপিত হবে না; কারণ অবশিষ্ট মূল অবস্থাটি হলো রোগীর জীবিত থাকা, আর মৃত্যু সন্দেহযুক্ত — আর নিশ্চিত জিনিস সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না। এবং কারণ অতীতে তার জীবন ছিল, সুতরাং এখনও তা বিদ্যমান; কেননা মূলনীতি হলো — যা যে অবস্থায় ছিল তা সে অবস্থাতেই বহাল থাকে। আর এটি প্রতিষ্ঠিত যে, মূলনীতি হলো স্থানান্তরকারী দলিল (নাকিল) না আসা পর্যন্ত মূল অবস্থার উপরই থেকে যাওয়া।

আর সঠিক মত হলো:— চিকিৎসা গ্রহণে মূল বিধান জায়েয হওয়া, কারণ তা থেকে কল্যাণ (মাসলাহাত) অর্জিত হয়; আর শরীয়ত এসেছে কল্যাণসমূহ প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ করতে এবং অকল্যাণসমূহ রহিত ও হ্রাস করতে।

আর সঠিক মত হলো:— কুরআনের তাবীজ (তামীমা) দিয়ে চিকিৎসা করা হারাম; কারণ তাবীজ নিষেধের ব্যাপারে যেসব দলিল এসেছে তা সাধারণ (আম), আর মূলনীতি হলো — বিশেষীকরণকারী দলিল (মুখাসসিস) না আসা পর্যন্ত মূল বিধানের উপরই থেকে যাওয়া।

আর সঠিক মত হলো:— বাতরোগের (রিউম্যাটিজম) চিকিৎসার জন্য বালা পরা সতর্কতাস্বরূপ জায়েয নয় — কড়া (হালকা) ও কড়ি (ওয়াদা') পরার নিষেধাজ্ঞার উপর কিয়াস করে। হাদীসে এসেছে যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার হাতে পিতলের একটি কড়া; তখন তিনি বললেন:

انزعها...الحديث

এটি খুলে ফেলো... — হাদীসের বাকি অংশ

তো এই বালাটি সেই কড়ারই মতো; আর মূলনীতি হলো, শরীয়ত সদৃশ বস্তুগুলোর মধ্যে পার্থক্য করে না এবং ভিন্ন বস্তুগুলোকে একত্র করে না।

আর সঠিক মত হলো:— যে রোগী পানি ও মাটি উভয়টি ব্যবহারেই অক্ষম, সে নিজ অবস্থা অনুযায়ীই সালাত আদায় করবে এবং তার উপর পুনরায় আদায় (ইআদা) নেই; কারণ অক্ষমতার সঙ্গে কোনো ওয়াজিব থাকে না, আর শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিগুলোর একটি হলো (رفع الحرج) — সংকট দূরীকরণ।

আর সঠিক মত হলো:— ((لا عدوى)) — "কোনো সংক্রমণ নেই" — এই হাদীসটি জাহিলি যুগে প্রচলিত সেই বিশ্বাসের অস্বীকৃতি, যাতে মনে করা হতো সংক্রমণ পূর্বনির্ধারণ ছাড়াই নিজে নিজেই ছড়ায়; এটিই অস্বীকৃত। আর রোগীর সঙ্গে মেলামেশার কারণে আল্লাহ তাআলার তাকদীর অনুযায়ী রোগ স্থানান্তরিত হওয়া — তা তো সাব্যস্ত; কারণ যতদূর সম্ভব দলিলগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা ওয়াজিব। সুতরাং সংক্রমণ স্বতঃসূচনা হিসেবে অস্বীকৃত, আর সংক্রমণ স্থানান্তর হিসেবে সাব্যস্ত।

আর সঠিক মত হলো:— যেসব রোগে আরোগ্যের আশা নেই সেসব রোগীর তওবা শুদ্ধ, যদি তার শুদ্ধতার শর্তগুলো পূর্ণ হয় — যেমন এইডস, প্লেগ ও মুরগির ফ্লু (বার্ড ফ্লু) ইত্যাদি রোগের রোগীরা। সুতরাং সে যদি তার রূহের গড়গড়ানি শুরু হওয়ার আগে তওবা করে, তবে তা শুদ্ধ তওবা বলে গণ্য হবে।

আর সঠিক মত হলো:— প্রয়োজন ও কল্যাণের খাতিরে কাফির চিকিৎসকের কাছে রোগীর চিকিৎসা নেওয়া জায়েয; কারণ উপকারী জিনিসগুলোতে মূল বিধান হলো হালাল হওয়া, আর দলিল ছাড়া তার কোনোটিই নিষিদ্ধ হয় না।

আর সঠিক মত হলো:— ক্ষত জীবাণুমুক্ত করার জন্য সুগন্ধি (তীব) ব্যবহার করা জায়েয, যদি তার প্রয়োজন হয় — যদিও তাতে সামান্য পরিমাণ অ্যালকোহল থাকে।

আর সঠিক মত হলো:— যার হাদাস (অপবিত্রতা) স্থায়ীভাবে ঝরতে থাকে — যেমন মুস্তাহাযা নারী, কিংবা যার প্রস্রাব-ঝরার রোগ (সলসুল বাউল) আছে, অথবা যার বায়ু বা পায়খানা অনিচ্ছায় বেরিয়ে যায় — সে স্থানটি ধুয়ে নেবে, কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেঁধে নেবে, প্রতি সালাতের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে এবং সালাত আদায় করবে; এরপর তার হাদাস বেরিয়ে গেলে তা তার কোনো ক্ষতি করবে না, যতক্ষণ সে ওয়াক্তের ভেতরে আছে। কারণ প্রতিবার কিছু বেরোনোর জন্য তাকে অজুতে বাধ্য করার মধ্যে রয়েছে কষ্ট ও সংকট, আর কষ্ট সহজতা টেনে আনে।

আর সঠিক মত হলো:— জন্মনিরোধক বড়ি ব্যবহার করা জায়েয, যদি তা নারীর ক্ষতি না করে এবং তার স্বামী তাতে অনুমতি দেয়; কারণ মূল বিধান হলো জায়েয হওয়া, আর নিষেধকারীর উপরই দলিল পেশ করা বর্তায়।

আর সঠিক মত হলো:— রক্তদান রোযা বাতিলকারী — হিজামার উপর কিয়াস করে; আর প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো, শুদ্ধ কিয়াস একটি শরঈ প্রমাণ।

আর সঠিক মত হলো:— সৌন্দর্যবর্ধক (তাহসীনি) সমস্ত অস্ত্রোপচার হারাম; কারণ তাতে কোনো নিরুপায়তা (দরূরত) বা প্রয়োজন (হাজত) ছাড়াই হারামে লিপ্ত হওয়া রয়েছে। আর প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো, হারাম বর্জন করা ওয়াজিব; তেমনি হারামের মাধ্যমগুলোও, এবং যা নিষিদ্ধের দিকে পৌঁছে দেয় তা-ও নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ৮৮: সঠিক মত (১)

বিষয়	লেখকের "সঠিক মত"
মস্তিষ্কের মৃত্যু (brain death)	মৃত্যু গণ্য হবে না; জীবিত থাকাই মূল অবস্থা, মৃত্যু সন্দেহযুক্ত
চিকিৎসা গ্রহণ	মূল বিধান জায়েয
কুরআনের তাবীজ (তামীমা) দিয়ে চিকিৎসা	হারাম
বাতরোগের জন্য বালা পরা	সতর্কতাস্বরূপ জায়েয নয় — কড়ার নিষেধাজ্ঞার কিয়াসে
কোনো সংক্রমণ নেই হাদীস	স্বতঃসূচনা অস্বীকৃত; স্থানান্তর সাব্যস্ত
আরোগ্যহীন রোগের রোগীর তওবা	শুদ্ধ, শর্ত পূর্ণ হলে; গড়গড়ানির আগে
কাফির চিকিৎসক	প্রয়োজন ও কল্যাণে জায়েয
ক্ষত জীবাণুমুক্ত করতে সুগন্ধি	জায়েয, প্রয়োজনে; সামান্য অ্যালকোহল থাকলেও
জন্মনিরোধক বড়ি	জায়েয, নারীর ক্ষতি না হলে ও স্বামীর অনুমতিতে
রক্তদান রোযা	রোযা বাতিলকারী — হিজামার কিয়াসে
তাহসীনি সমস্ত অস্ত্রোপচার	হারাম

লেখক এভাবেই প্রতিটি তারজীহ শুরু করেছেন: ‘আর সঠিক মত হলো’

আর সঠিক মত হলো:— আহত রোগীর জন্য তার বিছানার উপর সালাত আদায় করা জায়েয — যদিও তার উপর রক্তের ফোঁটা লেগে থাকে — যদি সে এভাবে ছাড়া সালাত আদায় করতে না পারে; কারণ যে কাজেই সংকট থাকে, তার সঙ্গেই সহজতা আসে।

আর সঠিক মত হলো:— জাবীরার (ব্যান্ডেজ/প্লাস্টার) সমস্ত অংশ মাসাহ করা ওয়াজিব; কারণ বদলের জন্য মূলের হুকুমই প্রযোজ্য।

আর সঠিক মত হলো:— তার উপর মাসাহ করা জায়েয — যদিও তা অপবিত্র অবস্থায় বাঁধা হয়ে থাকে; কারণ তার মাসাহ নিরুপায়তার অন্তর্ভুক্ত, আর তা তো আকস্মিকভাবেই এসে পড়ে, এবং কষ্ট সহজতা টেনে আনে।

আর সঠিক মত হলো:— যে ক্ষত ধোয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা মাসাহ করা ওয়াজিব; আর যদি মাসাহ করার কারণেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে অজু শেষ করার পর তার জন্য তায়াম্মুম করবে; কারণ অক্ষমতার সঙ্গে কোনো ওয়াজিব নেই।

আর সঠিক মত হলো:— কৃত্রিম হাত বা কৃত্রিম পা ধোয়া ওয়াজিব নয়; কারণ ধোয়া ওয়াজিব আসল হাত ও পায়ে, বিকল্পটিতে নয়; আর ফরযের স্থানটিই যখন লোপ পেয়েছে, তখন তাতে যা ওয়াজিব ছিল তা রহিত হয়ে গেছে।

আর সঠিক মত হলো:— জাবীরার উপর মাসাহ এক দিন-রাত দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়; আর তাকে মোজার (খুফ) উপর কিয়াস করা হলো পার্থক্যসহ কিয়াস; আর প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো, পার্থক্যসহ কিয়াস বাতিল।

আর সঠিক মত হলো:— দুই রাস্তা (সাবীলাইন) ছাড়া অন্য স্থান থেকে বের হওয়া রক্ত অজু ভঙ্গকারীগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ অজু ভঙ্গকারী বিষয়গুলো তাওকীফি (নস-নির্ভর), আর এটি প্রতিষ্ঠিত যে, শরঈ দলিল দ্বারা সম্পাদিত ইবাদত শরঈ দলিল ছাড়া ভাঙে না।

আর সঠিক মত হলো:— অচেতন (মুগমা আলাইহি) ব্যক্তির উপর তার ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা ওয়াজিব, যদি অচেতনতার সময়কাল তিন দিন পরিমাণ হয়ে থাকে। এটিই পছন্দ করেছেন সম্মানিত পিতৃতুল্য শায়খ আবদুল আযীয ইবনু বায রহিমাহুল্লাহু তাআলা।

আর সঠিক মত হলো:— রোগীর লিঙ্গ স্পর্শ করা কিংবা তার অণ্ডকোষ স্পর্শ করা অজু ভঙ্গ করে না; কারণ অজু ভঙ্গকারী বিষয়গুলো তাওকীফি।

আর সঠিক মত হলো:— এবং এ ছাড়া অন্য কোনো মত বলা জায়েয নয় — জন্মনিয়ন্ত্রণ (তাহদীদুন নাসল) জায়েয নয়।

আর সঠিক মত হলো:— কল্যাণের খাতিরে মাসিক বন্ধ করার বড়ি ব্যবহার করা জায়েয, যদি তা তার ক্ষতি না করে।

আর সঠিক মত হলো:— নারীর যৌনাঙ্গ থেকে যে রুতূবাত (ভেজা নিঃসরণ) বের হয়, তা অজু ভঙ্গ করে।

আর সঠিক মত হলো:— রোগীর যদি কয়েক ওয়াক্ত ফরয সালাত ছুটে যায়, তবে তার উপর ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর কাযা করা ওয়াজিব; কারণ কাযার ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকতা ওয়াজিব, যেমনটি আদায়ের ক্ষেত্রে। আর কাওয়াইদে প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো, দলিল ছাড়া কাযার হুকুম আদায়ের হুকুমেরই মতো।

প্রশ্ন ৮৮: সঠিক মত (২) – পবিত্রতা ও সালাত

বিষয়	লেখকের "সঠিক মত"
পানি ও মাটি উভয়ে অক্ষম রোগী	অবস্থা অনুযায়ী সালাত; পুনরায় আদায় নেই
নিরন্তর হাদাস	স্থান ধুয়ে বেঁধে প্রতি ওয়াক্তের জন্য অজু; পরে বের হলে ক্ষতি নেই
আহত রোগীর বিছানায় রক্ত লেগে থাকা	সালাত জায়েয, অন্যভাবে না পারলে
জাবীরা	সমস্ত অংশ মাসাহ ওয়াজিব; অপবিত্র অবস্থায় বাঁধা হলেও মাসাহ জায়েয
ক্ষত	ধোয়ায় ক্ষতি হলে মাসাহ; মাসাহেও ক্ষতি হলে ওযুর শেষে তায়াম্মুম
কৃত্রিম হাত বা পা	ধোয়া ওয়াজিব নয়
জাবীরার মাসাহের সময়	এক দিন-রাতে সীমাবদ্ধ নয়; মোজার কিয়াস পার্থক্যসহ বাতিল
দুই রাস্তা ছাড়া অন্য স্থান থেকে রক্ত বের হওয়া	অজু ভঙ্গকারী নয়
লিঙ্গ বা অণ্ডকোষ স্পর্শ	অজু ভঙ্গ করে না
নারীর যৌনাঙ্গের রুতূবাত	অজু ভঙ্গ করে
অচেতন ব্যক্তির ছুটে যাওয়া সালাত	অচেতনতা তিন দিন পরিমাণ হলে কাযা ওয়াজিব — ইবনু বাযের পছন্দ
জন্মনিয়ন্ত্রণ (তাহদীদুন নাসল)	জায়েয নয়
মাসিক বন্ধের বড়ি	জায়েয, ক্ষতি না করলে
কয়েক ওয়াক্ত ছুটে গেলে	ধারাবাহিকভাবে কাযা ওয়াজিব

প্রশ্ন ৮৮

আর সঠিক মত হলো:— চিকিৎসক পরামর্শ দিলে রোগীর জন্য রোযা ভাঙা জায়েয।

আর সঠিক মত হলো:— চোখের ড্রপ রোযা ভঙ্গকারী নয়, যদিও তার স্বাদ গলায় অনুভব করে; কারণ তা অস্বাভাবিক প্রবেশপথ।

আর সঠিক মত হলো:— কানের ড্রপ রোযা ভঙ্গকারী নয়; কারণ তা অস্বাভাবিক প্রবেশপথ থেকে।

আর সঠিক মত হলো:— নাকের ড্রপ রোযা ভঙ্গকারী, যদি তার স্বাদ গলায় অনুভব করে; কারণ তা স্বাভাবিক প্রবেশপথ থেকে।

আর সঠিক মত হলো:— মুখের ড্রপ রোযা ভঙ্গকারী, যদি তার স্বাদ গলায় অনুভব করে; কারণ তা স্বাভাবিক প্রবেশপথ থেকে।

আর সঠিক মত হলো:— সৌদি ভূখণ্ডে যে মত অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া হয় তা হলো, হাঁপানির ইনহেলার (স্প্রে) রোযা ভঙ্গকারীগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ তা ফুসফুসের শ্বাসনালীগুলোর (ব্রংকাই) সঙ্গে কাজ করে, পাকস্থলীতে তার কোনো প্রবেশ নেই।

আর সঠিক মত হলো:— হিজামা করা রোযা নষ্ট করে; কারণ এ ব্যাপারে দলিল সাব্যস্ত হয়েছে।

আর সঠিক মত হলো:— রোযার দিনে ব্রাশ ও পেস্ট ব্যবহার করা জায়েয, যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে এর কিছুই পেটে পৌঁছাবে না; অন্যথায় তা নিষেধ।

আর সঠিক মত হলো:— রমযানের দিনে দাঁত তোলা জায়েয; আর অবশকরণ ইনজেকশনের (চেতনানাশক) স্থান তো কেবল মাড়ি, এবং দাঁত তোলার পর যে রক্ত বের হয় তা অল্প পরিমাণ, যা রোযা নষ্ট হওয়ায় কোনো প্রভাব ফেলে না; আর মূল বিধান হলো জায়েয হওয়া।

আর সঠিক মত হলো:— পুষ্টিদায়ক ইনজেকশনগুলো রোযা নষ্ট করে; কারণ তা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত হয়।

আর সঠিক মত হলো:— যেসব ইনজেকশন পুষ্টিদায়ক নয়, সেগুলো রোযা নষ্ট করে না।

আর সঠিক মত হলো:— ইচ্ছা ছাড়াই যে রক্ত বের হয় — যেমন গাড়ি-দুর্ঘটনা ইত্যাদি — তা রোযা নষ্ট করে না, যদিও তা বেশি পরিমাণে হয়; কারণ সে এতে বাধ্য (মুকরাহ), আর বাধ্য ব্যক্তির উপর কোনো দায় বর্তায় না।

আর সঠিক মত হলো:— রোযা অবস্থায় এন্ডোস্কোপ (মিনযার) দিয়ে পরীক্ষা করানো জায়েয; সৌদি ভূখণ্ডের বহু আলিম এ মতেই ফতোয়া দিয়েছেন।

আর সঠিক মত হলো:— পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নেওয়া রক্ত, যা প্রচলিত বিচারে অল্প, তা রোযা নষ্ট করে না।

আর সঠিক মত হলো:— রোযাদারের জন্য গার্গল করার (কুলকুচি) ওষুধ ব্যবহার করা জায়েয, যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে এর কিছুই তার পেটে ঢুকবে না।

প্রশ্ন ৮৮: সঠিক মত (৩) – রোযা

বিষয়	লেখকের "সঠিক মত"
চিকিৎসক পরামর্শ দিলে রোগীর রোযা	ভাঙা জায়েয
চোখের ড্রপ ও কানের ড্রপ	রোযা ভঙ্গকারী নয় — অস্বাভাবিক প্রবেশপথ
নাকের ড্রপ ও মুখের ড্রপ	রোযা ভঙ্গকারী, স্বাদ গলায় অনুভব করলে
হাঁপানির ইনহেলার	সৌদি ভূখণ্ডের ফতোয়া অনুযায়ী ভঙ্গকারী নয় — ফুসফুসের শ্বাসনালীতে কাজ করে
হিজামা	রোযা নষ্ট করে
ব্রাশ ও পেস্ট	জায়েয, কিছুই পেটে পৌঁছাবে না বলে প্রবল ধারণা হলে
রমযানে দাঁত তোলা	জায়েয
পুষ্টিদায়ক ইনজেকশন	রোযা নষ্ট করে; পুষ্টিদায়ক নয় এমনটি নষ্ট করে না
ইচ্ছা ছাড়া বের হওয়া রক্ত, যেমন দুর্ঘটনায়	রোযা নষ্ট করে না, বেশি হলেও
রোযা অবস্থায় এন্ডোস্কোপ	জায়েয — সৌদির বহু আলিমের ফতোয়া
পরীক্ষার জন্য নেওয়া অল্প রক্ত	রোযা নষ্ট করে না
গার্গলের ওষুধ	জায়েয, পেটে ঢুকবে না বলে প্রবল ধারণা হলে

প্রশ্ন ৮৮ — সৌদি ভূখণ্ডের ফতোয়া ও লেখকের সংক্ষিপ্ত তারজীহ, যেমন আছে

আর সঠিক মত হলো:— রোগী যদি তার ছুটে যাওয়া দিনগুলোর কাযা করার সুযোগ পাওয়ার আগেই মারা যায়, তবে তার উপর কিছুই নেই — মোটেই নেই; কারণ ওয়াজিব বিষয়গুলো সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আর সঠিক মত হলো:— আলসারের রোগীর জন্য রোযা না রাখা জায়েয এবং সে অন্য দিনগুলোতে কাযা করবে; আর যদি তার আরোগ্যের আশা না থাকে, তবে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য দেবে।

আর সঠিক মত হলো:— কিডনি ডায়ালিসিস রোযা বাতিল করে।

আর সঠিক মত হলো:— সুরমা লাগানো রোযা নষ্ট করে না।

আর সঠিক মত হলো:— স্মৃতিশক্তি-হারানো ব্যক্তির উপর থেকে সালাতের দায়িত্ব উঠে যায়; কারণ তার শর্তগুলোর একটি হলো তামযীয (বোধশক্তি), আর সে বোধশক্তিসম্পন্ন নয়।

আর সঠিক মত হলো:— রমযানে বড়দের জন্য সাপোজিটরি ব্যবহার করা জায়েয।

আর সঠিক মত হলো:— যে বৃদ্ধ ভীমরতিগ্রস্ত হয়ে প্রলাপ বকে এবং আশপাশের মানুষকে চেনে না, তার উপর থেকে শরঈ দায়িত্ব উঠে যায়।

প্রশ্ন ৮৮: সঠিক মত (৪) – রোযা ও দায়িত্ব

বিষয়	লেখকের "সঠিক মত"
ছুটে যাওয়া রোযা কাযার সুযোগ পাওয়ার আগে মারা গেলে	কিছুই নেই
আলসারের রোগী	রোযা না রাখা জায়েয; কাযা; আশা না থাকলে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাওয়ানো
কিডনি ডায়ালিসিস	রোযা বাতিল করে
সুরমা লাগানো	রোযা নষ্ট করে না
সাপোজিটরি	রমযানে বড়দের জন্য জায়েয
স্মৃতিহারা ব্যক্তি	সালাতের দায়িত্ব উঠে যায় — বোধশক্তি নেই
ভীমরতিগ্রস্ত বৃদ্ধ যে চেনে না	শরঈ দায়িত্ব উঠে যায়

প্রশ্ন ৮৮

আর সঠিক মত হলো:— মুস্তাহাযা নারীর হুকুম পবিত্র নারীদের হুকুমেরই মতো।

আর সঠিক মত হলো:— নির্বোধ (মাতূহ) ব্যক্তির তালাক কার্যকর হয় না; কারণ তালাকের শর্তগুলোর একটি হলো সংকল্প (কসদ), আর তার কোনো সংকল্প নেই।

আর সঠিক মত হলো:— মৃত্যুরোগে আক্রান্ত রোগীর তালাক কার্যকর হয় না।

আর সঠিক মত হলো:— শরীরে অবশকারী ওষুধের (বিঞ্জ/অ্যানেস্থেশিয়া) ছড়িয়ে পড়া রোযা ভঙ্গ করে না।

আর সঠিক মত হলো:— গর্ভবতী নারী যদি অবয়ব সৃষ্টি হওয়ার আগেই ভ্রূণ ফেলে দেয় এবং তার থেকে রক্ত বের হয়, তবে তা ফাসাদের রক্ত (রোগজনিত রক্ত) — তা সালাত বা রোযা কোনোটিই রহিত করে না।

আর সঠিক মত হলো:— গর্ভপাতে পতিত সন্তান যদি তার মায়ের পেট থেকে রূহ ফুঁকে দেওয়ার পর পড়ে, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার উপর জানাযা পড়া হবে; কারণ সে একটি রূহ।

আর সঠিক মত হলো:— গর্ভবতী নারীর জন্য রোযা না রাখা জায়েয, যদি সে নিজের কিংবা তার সন্তানের ব্যাপারে আশঙ্কা করে।

প্রশ্ন ৮৮: সঠিক মত (৫) – তালাক ও গর্ভ

বিষয়	লেখকের "সঠিক মত"
মুস্তাহাযা নারী	হুকুম পবিত্র নারীদের মতো
নির্বোধ (মাতূহ) ব্যক্তির তালাক	কার্যকর হয় না — সংকল্প নেই
মৃত্যুরোগে আক্রান্ত রোগীর তালাক	কার্যকর হয় না
শরীরে অবশকারী ওষুধ ছড়িয়ে পড়া	রোযা ভঙ্গ করে না
অবয়ব সৃষ্টির আগে ভ্রূণ ফেলা	রক্ত ফাসাদের; সালাত বা রোযা রহিত করে না
রূহ ফুঁকে দেওয়ার পর গর্ভপাতে পতিত সন্তান	গোসল ও জানাযা
গর্ভবতী নারীর রোযা	নিজের বা সন্তানের আশঙ্কায় না রাখা জায়েয

প্রশ্ন ৮৮

আর সঠিক মত হলো:— যে রোগী রোগের কারণে হজ বা উমরার মানাসিক পূর্ণ করতে না পারার আশঙ্কা করে, তার জন্য শর্তারোপ (ইশতিরাত) করা জায়েয; সে বলবে:

وإن محلي حيث حبستني

আর আপনি আমাকে যেখানে আটকে দেবেন, সেখানেই আমার ইহরাম-মুক্তির স্থান।

আর সঠিক মত হলো:— রোগী সেই দুর্বলদের মধ্যে গণ্য, যাদের জন্য মধ্যরাতের পর মুযদালিফা থেকে রওনা হওয়া জায়েয।

আর সঠিক মত হলো:— তাওয়াফের সময় রক্ত বের হওয়া কোনো প্রভাব ফেলে না।

আর সঠিক মত হলো:— অচেতন ব্যক্তির আরাফায় অবস্থান শুদ্ধ, যদিও অচেতনতা দীর্ঘ হয়।

আর সঠিক মত হলো:— যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে গেছে, তার পক্ষ থেকে হজ করা জায়েয।

আর সঠিক মত হলো:— যেসব চিকিৎসক রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের জন্য কঙ্কর নিক্ষেপ (রমী) ত্রয়োদশ দিন পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া জায়েয।

আর সঠিক মত হলো:— পুরুষের খতনা ওয়াজিব, আর নারীর খতনা সুন্নত ও সম্মানজনক।

আর সঠিক মত হলো:— রক্ত বিক্রি করা জায়েয নয়।

আর সঠিক মত হলো:— কাফিরের লাশ ব্যবচ্ছেদ করা জায়েয, মুসলিমের নয়।

আর সঠিক মত হলো:— স্নায়ু কেটে ফেলা জায়েয, যদি এ ছাড়া ব্যথা দূর করার আর কোনো উপায় না থাকে; কারণ ক্ষতি দূর করা হয়।

আর সঠিক মত হলো:— চিকিৎসায় মুসলিম জিনদের ব্যবহার করা জায়েয নয় — পথ রুদ্ধ করার (সাদ্দুয যারীআ) নীতিতে।

আর সঠিক মত হলো:— ক্যান্সারকে "খবীস (নিকৃষ্ট) রোগ" নামে অভিহিত করা উচিত নয়; কারণ রোগ তো কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত এবং তা মুসলিমের জন্য কাফফারা। বরং বলা হবে:— দুরারোগ্য রোগ, কিংবা বিপজ্জনক বা প্রাণঘাতী টিউমার — এ ধরনের কথা।

প্রশ্ন ৮৮: সঠিক মত (৬) – হজ ও অন্যান্য

বিষয়	লেখকের "সঠিক মত"
রোগী হজে বাধার আশঙ্কা করলে	শর্তারোপ (ইশতিরাত) জায়েয
রোগী দুর্বলদের মধ্যে গণ্য	মধ্যরাতের পর মুযদালিফা থেকে রওনা জায়েয
তাওয়াফের সময় রক্ত বের হওয়া	কোনো প্রভাব ফেলে না
অচেতন ব্যক্তির আরাফায় অবস্থান	শুদ্ধ, অচেতনতা দীর্ঘ হলেও
অঙ্গ অকেজো পক্ষাঘাতগ্রস্ত	তার পক্ষ থেকে হজ জায়েয
রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত চিকিৎসক	কঙ্কর নিক্ষেপ ত্রয়োদশ দিন পর্যন্ত পিছানো জায়েয
খতনা	পুরুষের ওয়াজিব; নারীর সুন্নত ও সম্মানজনক
রক্ত বিক্রি	জায়েয নয়
লাশ ব্যবচ্ছেদ	কাফিরের জায়েয, মুসলিমের নয়
স্নায়ু কেটে ফেলা	জায়েয, ব্যথা দূর করার অন্য উপায় না থাকলে
চিকিৎসায় মুসলিম জিন ব্যবহার	জায়েয নয় — সাদ্দুয যারীআ
ক্যান্সারকে "খবীস রোগ" বলা	উচিত নয়

প্রশ্ন ৮৮

এক নজরে

- ★ প্রয়োজন নিরুপায়তার স্থলাভিষিক্ত হয়, সাধারণ হোক বা বিশেষ
- ★ দক্ষ ও সীমালঙ্ঘনহীন চিকিৎসক ক্ষতিপূরণের দায়ে পড়েন না; অজ্ঞ নিঃশর্তভাবে পড়ে
- ★ ফার্মাসিস্ট ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ দিলে দায়ী নন
- ★ মস্তিষ্কের মৃত্যু মৃত্যু গণ্য হবে না — লেখকের সঠিক মত
- ★ তাহসীনি সমস্ত অস্ত্রোপচার হারাম; কুরআনের তাবীজও চিকিৎসার জন্য হারাম
- ★ পুরুষের খতনা ওয়াজিব; নারীর সুন্নত ও সম্মানজনক; রক্ত বিক্রি জায়েয নয়
- ★ গ্রন্থটি লেখক সাধারণ মুসলিমদের জন্য ওয়াকফ করেছেন; মুদ্রণস্বত্ব প্রত্যেক মুসলিমের জন্য

যাচাই করুন

1. দক্ষ চিকিৎসক নিখুঁত চিকিৎসার পরও ক্ষতি ঘটলে কী হবে?

ক. দায়ী হবেন | খ. অর্ধেক দায়ী হবেন | গ. ক্ষতিপূরণের দায়ে পড়বেন না

2. অজ্ঞ চিকিৎসাকারী ক্ষতি করলে?

ক. দায়ী নন | খ. কেবল অবহেলা করলে দায়ী | গ. নিঃশর্তভাবে দায়ী

3. ফার্মাসিস্ট ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ দিলে?

ক. দায়ী | খ. দায়ী নন | গ. কেবল ইচ্ছাকৃত হলে দায়ী

4. লেখকের সঠিক মতে মস্তিষ্কের মৃত্যু সম্পর্কে কী?

ক. মৃত্যু গণ্য হবে | খ. মৃত্যু গণ্য হবে না | গ. চিকিৎসকের রিপোর্টই চূড়ান্ত

5. তাহসীনি অস্ত্রোপচার সম্পর্কে লেখকের সঠিক মত কী?

ক. জায়েয | খ. মাকরূহ | গ. সমস্ত হারাম

6. রক্ত বিক্রি সম্পর্কে সঠিক মত কী?

ক. জায়েয | খ. জায়েয নয় | গ. মুস্তাহাব

উত্তর: ১-গ, ২-গ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-খ

আর এ-ই হলো এসব মাসআলা থেকে কাওয়াইদ ও দলিলসহ যা লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম, তার শেষ। আমি তা তোমাকে উপহার দিচ্ছি তুচ্ছ পুঁজি হিসেবে, তার সমস্ত দোষ-ত্রুটিসহ। তোমার কাছে প্রত্যাশা এই যে, তুমি তা দেখবে দয়া ও করুণার দৃষ্টিতে। সুতরাং যদি তুমি এতে এমন কিছু পাও যা তোমার উপকারে আসে, তবে আমি তোমাকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি — যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই — তুমি এর লিপিবদ্ধকারীর জন্য মাগফিরাত, রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের দুআ করবে। তোমার কাছে এটিই আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আর যদি এতে কোনো উপকার না পাও, তবে তা নিজের থেকে একপাশে রেখে দাও।

আর আমি তাঁর কাছেই — জাল্লা ওয়া আলা — তাঁর মহত্তম নামের অসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর দ্বারা সাধারণ ও বিশেষ উপকার দান করেন, এতে বরকতের পর বরকত নাযিল করেন, এর জন্য হৃদয়সমূহ প্রশস্ত করেন এবং এতে

বোধশক্তির দুয়ার খুলে দেন।

আর আমি আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রাখছি, আমার নিকট উপস্থিত ফেরেশতাদের সাক্ষী রাখছি এবং তালিবুল ইলমদের মধ্যে যারা এটি দেখবেন তাঁদের সাক্ষী রাখছি যে, এটি তাঁর সম্মানিত সত্তার উদ্দেশ্যে সাধারণ মুসলিমদের জন্য ওয়াকফ। আর আমি আমার নিজের জন্য কিংবা আমার পরে আমার সন্তানদের জন্য এ অনুমতি দিচ্ছি না যে, তারা এর মুদ্রণস্বত্ব নিজেদের কাছে সংরক্ষিত রাখবে; বরং মুদ্রণস্বত্ব এই পৃথিবীর বুকে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত।

আর আমি তাঁর কাছেই — জাল্লা ওয়া আলা — তাঁর মহত্তম নামের অসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের কথার, কাজের ও বিশ্বাসের স্খলনগুলো ক্ষমা করে দেন এবং তাঁর রহমত, দানশীলতা ও উদারতা দিয়ে আমাদের সঙ্গে আচরণ করেন। আর আমি তাঁকেই — জাল্লা ওয়া আলা — সাক্ষী রাখছি যে, এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই; বরং সমস্ত কৃতিত্ব — তার প্রথমও, শেষও — আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলারই। এতে আমার ভূমিকা কেবল উদ্ধৃতি ও সংকলন, এর বেশি কিছু নয়। সুতরাং হে আল্লাহ, আপনি আহলে ইলমদের ক্ষমা করুন — তাঁদের প্রথমজন থেকে শেষজন পর্যন্ত — এবং আমাদের পক্ষ থেকে ও ইসলামের পক্ষ থেকে তাঁদের উত্তম প্রতিদান দিন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين وهو أعلى وأعلم .

আর আমাদের শেষ দাওয়াত এই যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই। আর আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর এবং তাঁর পরিবার ও সমস্ত সাহাবীর উপর। আর তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

وقد وقع الفراغ منها بعد صلاة الفجر في اليوم الأول من شهر

جمادى الثانية عام ست وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة

الحبيب ﷺ

আর এটি সমাপ্ত হয়েছে ফজরের সালাতের পর, জুমাদাস সানিয়া মাসের প্রথম দিনে, প্রিয়তম নবী ﷺ-এর হিজরতের এক হাজার চারশত ছাব্বিশ সনে।



আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে

রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464